বর্ধমান জেলার মন্দির : নির্মাণ ও ভাস্কর্য

উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

জয়া বিশ্বাস

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. সৌমিত্র বসু

অধ্যাপক ড. সৌভিক মজুমদার

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৩২

২০২২

Certified that the Thesis entitled

বর্ধমান জেলার মন্দির : নির্মাণ ও অলঙ্করণ

Resubmitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of

DR. SOUMITRA BASU

DR. SOUVIK MAJUMDAR

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor : Souvik Majumdar. Soumitra Basu 7-6-2022

Dr. Souvik Majumdar
Associate Professor
Kabi Joydeb Mahavidyalaya
Illambazar, Birbhum.

Dated : 15.6.22

Dr. Soumitra Basu
Sisirkumar Bhaduri Professor,
Dept. of Drama (Retd.)
University of Rabindra Bharati

Candidate : JAYA BISWAS

Dated : 15.06.2022

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে উপাধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত **'বর্ধমান জেলার মন্দির : নির্মাণ ও ভাস্কর্য'**। আমাদের গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন প্রয়াত অধ্যাপক শ্রীমতি ডঃ দীপান্বিতা ঘোষ মহাশয়। যিনি আমায় উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে গবেষণা কার্যটি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে। এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা সকলেই দুঃখিত এবং মর্মাহত। আমরা সকলেই তাঁর আত্মার শান্তির প্রার্থনা করি এবং আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। এরপর যাঁর একান্ত সহযোগিতায় এবং তত্ত্বাবধানে গবেষণা সন্দর্ভটি সমাপ্ত হয়েছে, তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সৌভিক মজুমদার মহাশয়। ইনি আমায় বিভিন্ন গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন এবং গবেষণা সন্দর্ভটি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর সহযোগিতা ব্যতীত উক্ত গবেষণাটি সম্পূর্ণ করা এককথায় অসম্ভব। তাই আন্তরিকভাবে আমি ডঃ সৌভিক মজুমদার মহাশয়ের প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। এবং আমি ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডঃ সৌমিত্র বসু মহাশয়কে, যিনি ডঃ দীপান্বিতা ঘোষ মহাশয়ার অবর্তমানে আমার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য সম্মতি প্রদান করেছিলেন এবং গবেষণার কার্যে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমায় উপকৃত করেছিলেন। তাই বিশেষভাবে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষেত্রসমীক্ষার কার্য চলাকালীন আমি বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- কালনার শ্রী সিদ্ধেশ্বর আচার্য্য মহাশয়, বৈদ্যপুর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী সনৎ ব্যানার্জী মহাশয়, বর্ধমান সদরের শ্রী ডঃ সর্বজিত যশ মহাশয়, মন্তেশ্বরের শ্রী ধনঞ্জয় সামন্ত মহাশয়, সমুদ্রগড়ের শ্রী মঙ্গল পান মহাশয় প্রমুখ। উক্ত ব্যক্তিগণ আমায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে এবং ক্ষেত্রসমীক্ষার স্থানগুলির পথনির্দেশ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, যার ফলে অক্লেশে বর্ধমান জেলার অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। বৈদ্যপুর গ্রামের নন্দী পরিবারের সদস্যগণের দ্বারা আমি যেরূপ স্বাহায্য পেয়েছি তা কথায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে মোহন নন্দীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উক্ত গ্রামের উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী নিমাই চন্দ্র দে মহাশয়ও আমায় তাঁর সংগৃহীত কিছু লেখাপত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। পূর্বোক্ত সকল ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমার ধন্যবাদ রইল এবং আমি আন্তরিকভাবে তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। যাদের নাম এই মুহূর্তে উল্লেখ করা গেল না, তাঁদের সকলের নিকট আমি ক্ষমাপ্রার্থী এবং তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

উক্ত গবেষণা সন্দর্ভটি প্রস্তুত করার সময় আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা ও বিভিন্ন সংস্থার কার্যালয় দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। গবেষণা সন্দর্ভে যে চিত্রগুলি সংযোজিত হয়েছে, তা আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ। অবশেষে বলা যায় যে, আমাদের গবেষণা সন্দর্ভটি বর্ধমান জেলার মন্দির সমূহের একটি সচিত্র উপস্থাপনা। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের এই সর্ববৃহৎ জেলাটির প্রতিটি গ্রাম- শহরে এবং অলিতে- গলিতে মন্দির রয়েছে, তাই প্রতিটি মন্দিরের সচিত্র উপস্থাপনা, আমাদের এই গবেষণাপত্রের মধ্যে করা সম্ভব হয়ে উঠল না। আশা করি আমাদের এই গবেষণা কার্যটি ভবিষ্যতের গবেষকদের মন্দির সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগাবে।

॥ মুখবন্ধ ॥

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে উপাধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত **'বর্ধমান জেলার মন্দির : নির্মাণ ও ভাস্কর্য'**। মন্দিরগাত্রের মনোমুগ্ধকর ভাস্কর্য এবং মন্দিরগুলির বিভিন্ন গঠনশৈলীর প্রতি আকর্ষণই উক্ত বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সর্বোপরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপিকা ডঃ দীপান্বিতা ঘোষ মহাশয়ার সহযোগিতায় এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিলাম। তিনিই আমায় বর্ধমান জেলার উপর একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক গবেষণা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এই গবেষণা কার্যে সহযোগিতার জন্য, উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ সৌভিক মজুমদার মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় এই দু'জন অধ্যাপকের মূল্যবান পরামর্শকে পাথেয় করে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে পূর্বোক্ত বিষয়টি নিয়ে গবেষণায় উদ্যোগী হয়েছিলাম।

একসময় বাংলায় বিভিন্ন রীতির মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার প্রমাণ বিভিন্ন শিলালিপি থেকে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেছে যে, বাংলায় শিখর মন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টা হয়তো খ্রিস্টীয় পাঁচ- ছয় শতক থেকেই শুরু হয়ে থাকবে। বাংলায় পরবর্তী মন্দির নির্মাণের প্রয়াস দেখা যায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে। পাথর নির্মিত মন্দির দেখা যায় খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে। পাথর ছাড়া, বাংলায় ইঁট দিয়ে মন্দির নির্মাণের ধারাবাহিকতা প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত বহু মন্দিরই ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আবার কিছু মন্দির বিপজ্জনক অবস্থায় বিদ্যমান। খ্রিস্টীয় তেরো শতক বা তারও পরে পশ্চিমবাংলার পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটি পাথরের মন্দিরের সন্ধান মেলে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ'এর পূর্বতন নির্দেশক শ্রীমতী দেবলা মিত্র, তাঁর রচিত 'তেলকুপি' নামক গ্রন্থে; খ্রিস্টীয় দশ থেকে পনেরো শতক অবধি যে, পাথরের বহু শিখর ও পীঢ়া স্থাপত্যযুক্ত শিখর মন্দির নির্মিত হয়েছিল, সে বিষয়ে যথাযথ আলোকচিত্রসহ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। পরবর্তীকালে মূলত খ্রিস্টীয় পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলায় নবপর্যায়ে মন্দির নির্মাণের পুনঃপ্রবর্তন শুরু হয় এবং সেই ধারাবাহিকতা বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বজায় থাকে। আমাদের গবেষণা কার্যের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের জন্য যে সময়সীমাটি নির্বাচন করা হয়েছে, সেটি হল খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী। এর কারণ হিসেবে বলা যায়- খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বহু মন্দির বা দেবালয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। যে মন্দিরগুলি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সক্ষম হয়েছিল, তাদের সংখ্যা নগণ্য। সেই মন্দিরগুলির স্থাপত্যশৈলী ছিল গ্রামবাংলার মাটির চালাঘরের মতো। এই মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্য অলঙ্কার সবক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়না, যদিও মাঝে মধ্যে অলঙ্কার ভাস্কর্য কোন মন্দিরগাত্রের শোভাবর্ধন করে থাকে, তার পরিমাণ হাতে গোনা। তাই এই সময়কালের মধ্যে নির্মিত কোন মন্দির অনুসন্ধান করে সাফল্য পাওয়া যায়নি। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেলেও সেই সকল মন্দিরের ভাস্কর্যের সঙ্গে মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের কোন রূপ সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে মূলত ষোড়শ শতকে চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের প্রভাবে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে, যা ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রভাবই বাংলায় নির্মিত মন্দিরগুলির পুনরুজ্জীবনের প্রধান কারণ, সেকথা বহু মন্দির গবেষকগণই স্বীকার করেছেন। আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রেও এই সময়সীমার মধ্যে নির্মিত বিভিন্ন মন্দিরগুলি অধিক মাত্রায় স্থান পেয়েছে। উক্ত সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ টেরাকোটার সুন্দর মনোমুগ্ধকর ফলকগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফলকগুলি শুধুমাত্র শিল্পীগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যত্রতত্র স্থাপন করেন নি, তাদের দ্বারা উৎকীর্ণ ফলকগুলির মাধ্যমে মন্দিরগাত্রে তৎকালীন সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিকগুলি অধিকমাত্রায় পরিস্ফুট হয়েছিল। পাশাপাশি, উক্ত সময়ে বাংলায় পৌরাণিক বিষয় নির্ভর কাব্য সাহিত্য গুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তারও প্রভাব মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্বে যে স্বল্প

সংখ্যক সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তার কোন প্রভাব মন্দিরগাত্রে পড়েনি। ফলত সকল দিক থেকে আমাদের গবেষণা সন্দর্ভে মূলত পঞ্চদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে নির্মিত মন্দির গুলিকেই অধিকমাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের গবেষণা কার্যটি ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক। ফলত, বিষয়টি নির্বাচনের পরই প্রাথমিক কাজ ছিল, বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে বাংলার মন্দিরগুলিকে দর্শণ করে, সেগুলি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করা। তবে প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, সমগ্র বর্ধমান জেলার প্রতিটি গ্রাম বা শহরাঞ্চল সম্পূর্ণ ক্ষেত্রসমীক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সমগ্র বর্ধমান জেলায় অগণিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত। কোন মন্দির কয়েক'শ বছর বছর পুরনো, আবার কোন পুরনো মন্দিরকে নতুন করে সংস্কার করে তার প্রাচীনত্বকে খর্ব করা হয়েছে। আবার কোথাও অতি প্রাচীন মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই ধরণের অজস্র মন্দির বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাই সমগ্র জেলা ভ্রমণ করে প্রতিটি মন্দিরের পৃথক ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা এবং মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যের বিশ্লেষণ করা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ কার্য। কোন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই বৃহৎ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা কার্য সম্পূর্ণ করা এককথায় অসম্ভব।

'বর্ধমান জেলার মন্দির : নির্মাণ ও ভাস্কর্য' বিষয়টি নির্বাচিত হওয়ার পর আমার প্রাথমিক কাজ ছিল বর্ধমান জেলার গ্রাম-শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মন্দিরগুলির একটি তালিকা প্রণয়ন, এবং তারপর মানচিত্র অনুযায়ী সেই সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করা। এই ক্ষেত্রসমীক্ষা কার্যটি সময়সাপেক্ষ, কারণ সবসময় ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য মন্দির পরিদর্শণে যাওয়া সম্ভব নয়। কখনও বৃষ্টি বা কখনও প্রখর রৌদ্র আবার কখনও ঘন কুয়াশা, এইসব সমস্যা কাজটির গতি মন্থর করে দেয়। ফলে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য উপযুক্ত কয়েকটি মাস নির্বাচন করে মোটরসাইকেল'য়ে করে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে ক্ষেত্রসমীক্ষার কার্যটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষার পরবর্তী কার্য হল, যে সকল মন্দিরগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ কিছু মন্দির নির্বাচন করে সেই সকল মন্দিরগুলির তথ্য বিশ্লেষণ করা। এই নির্বাচিত মন্দিরের তালিকায় সেই সব মন্দিরগুলিকেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলির প্রতিষ্ঠাকাল ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে। কিন্তু সমস্ত মন্দিরগুলির তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়নি। কারণ কোন কোন মন্দির হয়ত মধ্যযুগের আমাদের আলোচিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, অথবা কোন প্রাচীন মন্দির ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়েছে, আবার কোন প্রাচীন মন্দিরকে নতুন করে রঙ করে প্রাচীনতাকে খর্ব করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত কার্যনির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করতে থাকি, যাতে মূল গবেষণাপত্রে বর্ধমান জেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনার ক্ষেত্রে সুবিধা হয় এবং গবেষণা কার্যটি দ্রুত ত্বরান্বিত হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষার কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর মূল গবেষণাপত্রের কাজে অগ্রসর হলাম। প্রথমেই সমগ্র গবেষণা প্রকল্পের বিষয়টি দুটি বিভাগে বিভক্ত করে অধ্যায় বিভাজন করা হল। তারমধ্যে প্রথম বিভাগের প্রথম অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ধমান জেলার অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য; এই জেলার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট; সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ এবং রাজবংশের ইতিহাস ও রাজবাটি বৃত্তের সংস্কৃতি এই সকল বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, তবে উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যায় কিন্তু সীমিত পরিসরের জন্য আলোচনাটিকে আর বিস্তৃত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। পঞ্চম অধ্যায়ে, মধ্যযুগের বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত অধ্যায়ে বাংলার মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী ও ভাস্কর্য নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে, সঙ্গে মন্দিরের স্থায়ীত্ব সম্পর্কিত কিছু তথ্যও উত্থাপন করা হয়েছে।

আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক হওয়ায়, গবেষণা প্রকল্পটির দ্বিতীয় বিভাগে ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক আলোচনাগুলি রাখা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মন্দির সমূহের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত তালিকা থেকে নির্বাচিত কিছু মন্দিরকে ধর্মমত অনুসারে বিভক্ত করে পৃথকভাবে প্রতিটি মন্দিরের ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে। যে তথ্যগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় মন্দিরের পুরোহিত বা মন্দিরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দাদের

সৌজন্যে প্রাপ্ত। তৃতীয় অধ্যায়টি হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । এই অধ্যায়ে টেরাকোটার কারুকার্য সমৃদ্ধ মন্দির সমূহে যে অনিন্দ্যসুন্দর ভাস্কর্য দর্শক মনকে আকৃষ্ট করে, সেইসকল ভাস্কর্যের বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। ভাস্কর্যগুলিকে প্রধানত দুটি বিষয়ে বিভক্ত করে আলোচনাটি বিস্তৃত করা হয়েছে। প্রথমতঃ পৌরাণিক বিষয় এবং দ্বিতীয়তঃ সামাজিক বিষয়। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলি, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্য- সাহিত্য দ্বারা তৎকালীন মন্দির শিল্পীগণ প্রভাবিত হয়ে মন্দির ভাস্কর্যে উক্ত বিষয়গুলিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন দৃশ্যাবলি স্বমহিমায় মন্দিরগাত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। উক্ত বিষয়গুলি মন্দির ভাস্কর্যকে মনোমুগ্ধকর করে তোলার পাশাপাশি নিরক্ষর সাধারণ মানুষকেও সাহিত্য সম্পর্কে অবগত করিয়েছেন। ফলে মন্দির ভাস্কর্য ক্রমশ মানুষের নিকট আকর্ষণীয় এবং শিক্ষার বিষয় হয়ে উঠেছে। সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা যায়, তৎকালীন অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রভাব মন্দির শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল। সমাজের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরের, ভিন্ন জাতি ধর্মের মানুষের পেশা, পোশাক, অলঙ্কার, বিলাসব্যসন, ক্রীড়া, অবসরকালীন জীবনযাপন, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র বিভিন্ন ভাবে মন্দিরগাত্রে স্থান পেয়েছে। মন্দির শিল্পীগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী বা কোন কোন সময় পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী মন্দির সজ্জা করেছেন। উক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত পশু, পাখি, কিন্নর, ফ্লোরা-ফনা, মৃত্যুলতার কারুকার্য মন্দিরগাত্রকে দর্শকের নিকট অধিকমাত্রায় আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল। লক্ষণীয় বিষয় হল, বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার পাশাপাশি পুরুষ- মহিলা, হার্মাদ- জলদস্যু, বিদেশি বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার চিত্রাবলিও মন্দির সজ্জায় স্থান পেয়েছে। পরিশেষে সম্পূর্ণ বিষয়টির সচিত্র বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সবশেষে আমাদের গবেষণা প্রকল্পের একটি উপসংহার রচনা করা হয়েছে। যার মূল বক্তব্য হল, রাঢ় বাংলার মধ্যমণি বর্ধমান জেলাটিকে মন্দির সমৃদ্ধ জেলা বলা হলে খুব ভুল বলা হবে না, কারণ এই জেলার প্রতিটি গ্রাম, প্রান্ত, শহরাঞ্চলে মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়, তা সে অতিপ্রাচীন হোক বা নব নির্মিত। ইতিপূর্বে বর্ধমান জেলার মন্দির সমূহকে কেন্দ্র করে বহু রচনা বিভিন্ন পত্র- পত্রিকায় এবং গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন গ্রন্থে বর্ধমান জেলার নির্দিষ্ট একটি ব্লককে কেন্দ্র করে সেই স্থানের মন্দিরগুলির তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, আবার কোন গ্রন্থে জেলার বিশিষ্ট মন্দির এবং দর্শণীয় স্থানগুলির পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন গ্রন্থেই মন্দিরগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বা ভাস্কর্য সম্পর্কিত অধিক তথ্য পাওয়া যায় না। উক্ত গবেষণাপত্রে বর্ধমান জেলার যে সকল বিশিষ্ট মন্দিরগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য উত্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পরবর্তী সময়ের গবেষকগণ উপকৃত হতে পারেন। এবং সর্বোপরি যে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সেটি হল- মধ্যযুগীয় সাহিত্য ধারার বিভিন্ন লেখক ও সমালোচকগণ শুধুমাত্র সাহিত্যের মধ্যেই তাঁদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, সাহিত্যের পাশাপাশি শিল্পকে তাঁরা তাঁদের আলোচনার বিষয়ের মধ্যে স্থান দেননি, বিশেষ করে মন্দির শিল্পকে। আবার মন্দির সংক্রান্ত বিষয়গুলি কেন্দ্র করে, ডেভিড ম্যাককাচ্চন, তারাপদ সাঁতরা, প্রণব রায় প্রমুখ লেখকবৃন্দ, যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁরা সাহিত্যের বিষয়টি স্পর্শ না করে, কেবলমাত্র মন্দিরের গঠনশৈলী এবং ভাস্কর্যের বিষয়বস্তুর মধ্যেই তাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অর্থাৎ এরা কেউই সাহিত্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মন্দিরগাত্রের বিষয়বস্তুর আলোচনা করেননি। আমাদের গবেষণাকার্যের মূল বিষয়বস্তুই হল, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সঙ্গে মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যের বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার পাশাপাশি লোকায়ত উৎসগুলি দ্বারাও মন্দির শিল্প প্রাভাবিত হয়েছিল। এছাড়া বাংলা সাহিত্যও বিভিন্ন লোকায়ত উৎস থেকে যে সমস্ত সম্পদ আত্তীকৃত করেছিল, তার বিশদ ও সচিত্র উপস্থাপনা মন্দির সজ্জায় লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ কীভাবে সাহিত্য ও শিল্প যুগ্মভাবে বাংলার তথা বর্ধমানের মন্দিরচর্চাকে এক অন্যমাত্রা প্রদান করেছিল সেটাই অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করব। এরপর পরিশিষ্ট অংশকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- **(ক)** মানচিত্র, **(খ)** ব্যক্তিগত চিত্র, **(গ)** চিত্রসূচী এবং **(ঘ)** গ্রন্থপঞ্জি।

আমাদের গবেষণা সন্দর্ভটিতে ‘গবেষণা পদ্ধতি’ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আমাদের গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

॥ গবেষণা পদ্ধতি ॥

‘বর্ধমান জেলার মন্দির : নির্মাণ ও ভাস্কর্য’ শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পটি সম্পাদন করার জন্য যে সব পদ্ধতি তত্ত্ব অবলম্বন করে গবেষণার কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তার নিম্নরূপ-

স্নাতকোত্তর স্তরে যেহেতু মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমার অধ্যয়নের বিশেষ মনোযোগের কেন্দ্র ছিল, তাই আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটি সম্পাদনা করার সময় আমি চেয়েছি চারুকলার ইতিহাসের আঞ্চলিক পাঠগ্রহণ করতে মধ্যযুগের সাহিত্য ও শিল্পচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে। মধ্যযুগের বাংলায় পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ বহু সংখ্যক দেবায়তন প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য মেলে ইতিহাসের স্বীকৃত সূত্রগুলি থেকে। পাশাপাশি বাংলা ভাষা সাহিত্য এই সময়ে সৃজনশীল উৎকর্ষতার শিখর স্পর্শ করে। সাহিত্যের ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ মেলে। গবেষণা প্রকল্পটির গোড়াতে আমার অনুসন্ধানের লক্ষ্য ছিল সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে যদি পারস্পরিক ও পরিপূরক সম্পর্ক আধুনিক ও আধুনিকোত্তর কালে থেকে থাকে, তাহলে মধ্যযুগীয় লোকমানসে সমাজ ও সাহিত্যের পরিপূরকতার রূপটি ঠিক কেমন অবস্থায় ছিল?

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে সব প্রধান ধারাকে সাহিত্যের তত্ত্ববেত্তারা মান্যতা দান করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সংস্কৃত পুরাণের বাংলা অনুবাদ বা অন্যান্য ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ কর্ম। আর দ্বিতীয় ধারাটি হল, মঙ্গলকাব্য। এছাড়া তৃতীয় যে ধারাটি চৈতন্যোত্তর কালে খুবই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেটি হল, পদাবলি কাব্য সাহিত্য। মধ্যযুগের বাংলায় বিশেষত আমার গবেষণা প্রকল্পের নির্ধারিত এলাকা, বর্ধমান জেলায় সাক্ষরতার প্রসার সমাজের সাধারণ প্রবাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। সেক্ষেত্রে মধ্যযুগের সাহিত্যিক সৃষ্টিগুলি লোক সমাজে পৌঁছাত দু’টি পথে। প্রথমত সাহিত্যের অধিকাংশ শাখাগুলি ছিল গেয় বা প্রদর্শন যোগ্য উপস্থাপনার অংশ। তাই অক্ষরজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নব নব সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হতে পারতেন। দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটি ছিল সাহিত্যিক সৃষ্টি কর্মকে স্থায়ীভাবে লোকমানসে প্রোথিত করার- সেটি হল, মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির অলঙ্করণের মাধ্যমে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি গুলিকে শৈল্পিক মাত্রায় উপস্থাপিত করা।

আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটিতে যেহেতু সাহিত্যিক উপাদান, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এবং প্রত্ননৃতাত্ত্বিক উপাদান সম্মিলিত ভাবে ব্যবহার করতে হয়েছে, তাই প্রতিটি উপাদান সংগ্রহ এবং তার থেকে ভাষ্য নির্মাণ করার সময়ে আমাকে যুগপৎ একাধিক পদ্ধতি তত্ত্ব ব্যবহার করতে হয়েছে। আমার গবেষণার সাহিত্যিক উপাদানগুলি মূলত সংগ্রহ করেছি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান গুলি থেকে-

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের গ্রন্থাগার, বৈদ্যপুর লক্ষ্মীকান্ত স্মৃতি গ্রন্থাগার, মন্তেশ্বরের পিপলন গ্রামের গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা, বর্ধমান ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের গ্রন্থাগার, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সংস্থা’র কলকাতা চক্রের কার্যালয়।

মধ্যযুগে রচিত বেশিরভাগ সাহিত্যেরই অঞ্চলভেদে পাঠভেদ বা রূপভেদ দেখা যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি, একাধিক অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত একই সাহিত্যকর্মের তুলনমূলক পাঠগ্রহণ করতে। এখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত পাঠটিকে। কারণ, আমার প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সীমারেখাটি নিবদ্ধ ছিল রাঢ়ের মধ্যমণি বর্ধমান জেলার উপরে।

মন্দিরগুলি দর্শন করতে গিয়েছিলাম আমার গবেষণার প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণটির সুস্পষ্ট মাত্রা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে। কিন্তু ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চার সাম্প্রতিক প্রবণতা অনুযায়ী আমাকে প্রথাসিদ্ধ স্বীকৃত ইঁট, কাঠ, পাথরের নির্জীব উপাদান ছাড়াও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমীক্ষা ও অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছিল। কারণ, অনেক ঐতিহাসিক মন্দিরই আজ- কালের নিয়মে পরিত্যক্ত ও ভগ্নপ্রায় অথবা পরিবর্তিত। আবার বেশ কিছু মন্দিরে আজও পূজাপাঠ যথাবিধি সম্পন্ন হয়ে থাকে। গবেষণা করতে গিয়ে মন্দির

সংস্কৃতির এই প্রাণশক্তি কেমন করে শত শত বছর ধরে টিকে থাকে সে বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করলে, শুরু হয় সাহিত্যের গবেষণার জন্য প্রত্ন-নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। আমার গবেষণা নির্দেশক প্রাথমিক ভাবে প্রত্ন-নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্দিষ্ট নিয়মকানুন সম্পর্কে আমাকে অবহিত করান। যেসব মন্দিরে এখনও নিয়মিত মেলা, মহোৎসব পূজাপাঠ সম্পাদিত হয়ে থাকে প্রথমে সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করলাম। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মন্দির সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জাতি পরিচয় অনুসন্ধান, আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান, রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে লিখিত প্রশ্নমালাসহ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে শুরু করলাম। তারপর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মিথ *(Myth)*, পুরাণ, লোককথা এবং জনস্মৃতির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম। কথা বললাম সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দা, স্বল্পকিছু অন্যধর্মের মানুষের সঙ্গেও কারণ মধ্যযুগের বাংলার মন্দির স্থাপত্য সজ্জার মধ্যে করণ-কৌশলের মধ্যে আমরা যে ধর্মসমন্বয়ের ইঙ্গিতটি লক্ষ করি সেটি বর্তমানকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে কিনা। সবক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উত্তর বা সমাধান মেলেনি। সেইসব ক্ষেত্রে আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রয়োজন। প্রত্ন-নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মূল বিষয়টি অর্থাৎ প্রাচীন থেকে বর্তমান পর্যন্ত কোন একটি বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবহমানতার সূত্র অন্বেষণ প্রকল্পটি আদি থেকে বর্তমান মনুষ্য বসতি ও সভ্যতার বিবর্তনের মধ্যেই নিহিত। তাই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমকালীন জীবন প্রবাহকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করা গেলে তার প্রাচীন উদ্ভব সূত্রটিতে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অলভ্যতা বা অপ্রাপ্তির কারণে যেসব স্থানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা যায় না, সেইসব ফাঁক-ফোঁকরগুলি পূরণ করার জন্যই সাম্প্রতিককালে প্রত্ন-নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতিতত্ত্ব ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়েছি। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে লক্ষ করেছি কোন একটি অঞ্চলে একটি মন্দির সংশ্লিষ্ট এলাকার সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর উপরে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, এমনকি সেইসব প্রভাবের কিছুকিছু এমনই সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য, যে বিশদ ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া সাধারণভাবে গবেষকদের তা নজরে আসে না।

প্রত্নচর্চার স্বীকৃত উপাদানগুলি সংগ্রহ করছি জেলা গ্রন্থাগার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহালয়, পিপলন গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা ইত্যাদি থেকে। এছাড়া বহু মানুষ তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংগ্রহ আমাকে দেখতে দিয়েছেন। প্রতিটি তথ্যই যতদূর সম্ভব অন্যসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতে সচেষ্ট থেকেছি। রাজ্য অভিলেক্ষাগার ও *District Gazetteer* সম্পাদকের অফিস লাইব্রেরী ব্যবহার করে নিঃসংশয় হতে চেয়েছি, বিভিন্ন সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের সত্যাসত্য সম্পর্কে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাহায্য নিয়েছি সমাজ নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের পেশাদার বিশেষজ্ঞের কাছে। এ ব্যাপারে আমাকে সর্বাধিক সাহায্য করেছেন আমার গবেষণার অন্যতম নির্দেশক ডঃ সৌভিক মজুমদার মহাশয়। তিনি নিজে যেহেতু শিল্পী ও ভাস্কর, তাই মন্দির স্থাপত্য ও অলঙ্করণের শৈলীগত বিশ্লেষণের পাঠ তিনি স্বয়ং আমায় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য মন্দিরগুলির বিষয়ে যখন ক্ষেত্রসমীক্ষা সম্পন্ন করি তখন তাঁর কাছে গৃহীত পাঠ আমায় যথাযথ পথ নির্দেশ দিয়ে খুবই সাহায্য করেছে।

এছাড়া বিশেষজ্ঞ স্থাপত্যবিদ শ্রী উন্মেষ কীর্তিকার (মুম্বাই) এর বিশেষ সাহায্য লাভ করেছি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সৌভিক মজুমদারের সৌজন্যে। মধ্যযুগের মন্দিরগুলি যে সব মাল-মশলা দিয়ে নির্মিত হয়েছিল, আধুনিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশদ তথ্য শ্রী কীর্তিকার আমায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই জানা গিয়েছে, মূলত চুন (আধুনিক পাথুরে চুন নয়) শামুখের খোল পুড়িয়ে প্রাপ্ত চুনের সঙ্গে, ইঁটের গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি হত মন্দির গঠনের মশলা। অবশ্য এর সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ জৈব এবং অজৈব উপাদান এমনকি ভেষজ উপাদানও যুক্ত হত। অঞ্চলভেদে এইসব উপাদানগুলির আনুপাতিক তারতম্যও নজরে পড়েছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কলকাতা মণ্ডলের অফিস থেকে প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ বিষয়ে বিশদ তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। মধ্যযুগের মন্দিরগুলি আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে সংস্কার করা যেতে পারে, সে বিষয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের নির্দেশিকা রয়েছে। তাতে স্পষ্টই বলা আছে, যে চুন সুরকির মশলা দ্বারা নির্মিত মন্দিরে সিমেন্ট কংক্রিট ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা যাবে না। চুন সুরকির মশলা ব্যবহার করেই জীর্ণোদ্ধার পর্ব সমাধা করতে হবে। কিন্তু হায়, ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় দেখেছি প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই (দু'একটি অতি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র বাদে) সিমেন্ট কংক্রিট ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার ফলে বিশ্রীভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সংশ্লিষ্ট মন্দিরের গঠন সৌন্দর্য।

উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানীদেরও দ্বারস্থ হতে হয়েছে একাধিকবার। মন্দিরগাত্র সজ্জায় ব্যবহৃত গাছপালা, পশুপাখির মোটিফগুলি সনাক্তকরণের প্রয়োজনে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ সমীর কুমার মুখার্জী (অধ্যক্ষ, বাঁকুড়া সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া) এবং জীববিজ্ঞানী ডঃ নির্মাল্য দাশ (অধ্যাপক, জীববিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ) আমাকে এই কাজে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

সাহিত্যের গবেষণা কেবল সাহিত্যিক উপাদান সংগ্রহ এবং তার আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখার আরও বহুবিধ কারণ বর্তমান। মধ্যযুগের মন্দির স্থাপত্যগুলিকে যদি *'Human spirit in material form'* বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়- তাহলে সেই *'Human spirit'* এর পূর্বাপর অনুসন্ধানও অত্যন্ত জরুরি। কারণ কোন সাহিত্যিক *'Text'* এ এই *'Human spirit'* এর সবটা ধরা পড়ে না, বলা ভালো ধরা দেয় না। সেটি বুঝতে গেলে যে ব্যাপকতর অনুসন্ধান কার্য চালাতে হয়- তা গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি। সাধ্যমত সে চেষ্টাও করেছি। তবে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে আমার সীমাবদ্ধতার ত্রুটিও স্বীকার করা প্রয়োজন। যেমন মন্দির স্থাপত্যের শিল্পী-কারিগররা প্রায় সব ক্ষেত্রেই বৃত্তিত্যাগী। বর্তমান প্রজন্মের সূত্রধরদের তাই মাটির ও কাঠের মূর্তি নির্মাণ ভিন্ন অন্য কাজের কোন অভিজ্ঞতা বা পরম্পরা- বাহিত স্মৃতি- ই নেই। তাই মন্দির স্থাপত্য রচনাকারী শিল্পী কারিগরদের মনোজগৎ এবং আচার, বিশ্বাস, রীতি প্রথার অভিঘাতটি কেমন করে প্রভাবিত করেছিল তাদের সৃষ্টিধারাকে, ক্ষেত্রসমীক্ষা করেও তার অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়েছি। শিল্পী- কারিগরদের পরিবারের মহিলাদের কী ভূমিকা ছিল, এই শিল্পধারা সৃষ্টি- প্রবাহের পশ্চাতে সে তথ্যও পাইনি। তবে আনুষঙ্গিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা অনুমান করতে পারি, প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে মন্দির স্থাপত্য সজ্জা রচনায় কারিগর পরিবারের কিছু অবদান ছিল। কারণ ঘর-গৃহস্থালির অন্তরঙ্গ দৃশ্যকল্প রচনা অথবা নারীদের বেশ- ভূষা, শরীরী- ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে কারিগররা যে কুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তার মধ্যে 'নারী সুলভ' দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধান খুব কঠিন কাজ নয়। অন্তঃপুরের আপাত তুচ্ছ এইসব অকিঞ্চিৎকর বিষয়বস্তু যে ভাবে মন্দির সজ্জায় উঠে এসেছে, নিশ্চয়ই তার পশ্চাতে শিল্পী- কারিগর পরিবারের মহিলাদের অবদান ছিল। কিন্তু হতাশ করেছেন তাঁরাও। বর্তমান প্রজন্মের কারিগর পরিবারের মহিলারা এই বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে পারেননি। তাই স্বভাবতই আমার অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াটির মধ্যে সীমাবদ্ধতা এসেছে। তবে তাদের সঙ্গে কথা বলে উপকৃত হয়েছি অন্য দিক থেকে। তাঁরা তথ্য দিয়েছেন মন্দির সজ্জার কাজে যুক্ত থাকা কারিগরদের *'Taboo'* বিষয়ে। বর্তমানে মন্দির স্থাপত্যের কাজ ছেড়ে দিলেও আশ্চর্যের বিষয় ঐ কারিগররা কিন্তু বিনা প্রশ্নে তাঁদের পরম্পরা বাহিত বিধিনিষেধ গুলি বর্তমানেও মেনে চলেন। গবেষণাটির অসম্পূর্ণতার দিকটি এভাবে মূল তথ্যানুসন্ধান প্রকল্পটিকে ব্যাহত করলেও, শেষ বিচারে বলা যায় প্রাপ্তির সংখ্যাও নেহাৎ- ই উপেক্ষণীয় নয়।

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম বিভাগ **তাত্ত্বিক বিষয় সমূহ**

প্রথম অধ্যায় - বর্ধমান জেলার অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য পৃষ্ঠা- ১

দ্বিতীয় অধ্যায় - বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পেক্ষাপট পৃষ্ঠা- ১০

তৃতীয় অধ্যায় - বর্ধমান জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ পৃষ্ঠা- ১৭

চতুর্থ অধ্যায় -বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস ও রাজবাটি বৃত্তের সংস্কৃতি পৃষ্ঠা- ৪৭

পঞ্চম অধ্যায় - মধ্যযুগে বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য পৃষ্ঠা- ৫৭

দ্বিতীয় বিভাগ **ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক বর্ধমান জেলার মন্দির সমূহ**

প্রথম অধ্যায় - বর্ধমানের মন্দির সমূহের তালিকা প্রণয়ন পৃষ্ঠা- ৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায় - নির্বাচিত মন্দিরের পৃথকভাবে তথ্য সমূহের আলোচনা পৃষ্ঠা- ৭৪

তৃতীয় অধ্যায় - মন্দির সজ্জার বিষয়বস্তু ভিত্তিক আলোচনা পৃষ্ঠা- ১৭২

কথাশেষ পৃষ্ঠা- ২৮৮

পরিশিষ্ট

মানচিত্র পৃষ্ঠা- ২৯২

ব্যক্তিগত চিত্র

চিত্রসূচী পৃষ্ঠা- ২৯৩

গ্রন্থপঞ্জি পৃষ্ঠা- ২৯৭

প্রথম বিভাগ

তাত্ত্বিক বিষয় সমূহ

প্রথম অধ্যায়

॥ বর্ধমান জেলার অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ॥

আয়তন ও চতুঃসীমা -

প্রত্নযুগ ও প্রাচীন ইতিহাসের যুগে বর্ধমানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, অনুরূপ পরিচিতি মধ্যযুগের রচিত ইতিহাস ও সাহিত্যেও পাওয়া যায়। তবে এ সময়ে 'বর্ধমান' জনপদ ব্যতীত বিভাগ বা উপবিভাগেরও উল্লেখ আছে। আবার বর্ধমান শহরের নামকরণ ও এই শহরের অবস্থিতি সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের বক্তব্য এই যে, ধর্মঠাকুরের পূজা বিধানে ধর্ম্মপীঠমালার মধ্যমণি শ্রীবর্ধমান ধর্ম্মপীঠের অবস্থান হল সাতগাছিয়ার নিকটবর্তী বড়োয়াঁ গ্রামে এবং পাথরের মন্দিরের চিহ্নবিশেষ বিলুপ্তপ্রায় নদীখাতের পাশে এখনও বিদ্যমান। তাঁর মতে ভাষাতত্ত্বের বিচারে ধর্মপূজা বিধানোক্ত বর্ধমান নিশ্চয়ই বড়োয়াঁ। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে, কোন কারণে শহর বিধ্বস্ত বা নদী বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় রাজধানী আট –দশ ক্রোশ উজানে আধুনিক বর্ধমানে সরে এসেছিল এবং আধুনিক বর্ধমান শহরের ইতিহাস ষোড়শ শতকের ওদিকে যায় না। তাঁর মতে "প্রাচীন বর্ধমান শহর অবশ্যই দামোদর অথবা তার শাখাপ্রশাখার তীরে অবস্থিত ছিল। এখনকার বর্ধমান দামোদরের তীরবর্তী নয়, দামোদরের শাখা বাঁকা নদীর তীরবর্তী। একদা এই বাঁকা দিয়েই দামোদরের এক প্রধান এবং বারোমাস স্থায়ী স্রোত বইত। সুতরাং প্রাচীন বাঁকা অথবা তার শাখা বেহুলা অথবা সমান্তরাল শাখা খড়ী নদীর তীরে এটি অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করতে হয়। শব্দবিদ্যার সাহায্যে প্রাচীন বর্ধমান নামটির আধুনিক রূপ হওয়া উচিত বড়আন্ বা বড়োয়াঁ।"[১] ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলার জেলা সীমানার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়, যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে (১793 খ্রিঃ) প্রায় একশ বছর ধরে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা নানা কারণে বিভিন্ন জেলার আয়তন ও সীমানা অদল বদল করেছেন। তার মধ্যে প্রধান কারণ হল প্রশাসনিক সুব্যবস্থা। তার জন্য তারা যখনই মনে করেছেন যে তাদের শাসনের, রাজস্ব আদায়ের অথবা বিচার ব্যবস্থার সুবিধা হবে তখনই জেলা গুলিকে ভেঙেছেন গড়েছেন, এক জেলার কতকাংশ অন্য জেলার সঙ্গে জুড়েছেন, আবার সেই একই অংশ পরাতন জেলার সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করেছেন। বিংশ শতাব্দী থেকে মোটামুটি জেলা গুলির বর্তমান সীমানা অনেকটা স্থায়ী হয়েছে বলা যায়।[২] তুর্ক-আফগান আমলে বর্ধমান ভুক্তির বিশাল আয়তন খর্বীকৃত হয়ে বর্ধমান চাকলায় পরিণত হয়। ঔপনিবেশিক পর্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বা বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত বর্ধমান একটি জেলায় পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মহারাজ তেজচন্দ্রের আমলে বর্ধমান জেলা যে আয়তন লাভ করেছিল, স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্তর্গত সেটি ক্রমে হয়ে ওঠে বর্ধমান জেলা। কবি ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত **'বর্ধমান বন্দনা'**য় বর্ধমান ভুক্তি সম্পর্কে লিখেছেন-

> "মালভূমি আর মল্লভূম
> সেনভূমি সেনগড় বীরভূমি আর গোপভূম
> বর্ধমান ভুক্তি সনে ভুক্ত ছিল সবে একদিন
> গঙ্গার পশ্চিমে বঙ্গ বর্ধমান অঙ্গে ছিল লীন।"[৩]

পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলটি 'রাঢ়' নামে পরিচিত তার প্রায় মধ্যবর্তী অংশে বর্ধমান জেলার অবস্থিতি। বর্ধমান জেলা ২২°৫৬' অক্ষাংশ হতে ২৩°৫৩' পর্যন্ত উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°৪৮' দ্রাঘিমাংশ হতে ৮৮°২৫' দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে বিস্তৃত। কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩ ১/২° উত্তর অক্ষাংশ) দুর্গাপুর, গুসকরা, পোষলা, জামালপুর, মেড়তলা প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। বর্ধমান জেলার উত্তর ভাগে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা, পূর্বভাগে ভাগীরথী নদী, হুগলি এবং পশ্চিমে বরাকর নদ, মানভূম ও সাঁওতাল পরগনা জেলা অবস্থিত। তবে জেলার অধিকাংশ স্থানে বরাকর ও দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী নদী প্রাকৃতিক সীমা রচিত করে অন্যান্য জেলা হতে তার অবস্থানকে পৃথক করেছে। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হতে বরাকর নদের পূর্ব তীর পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে জেলার দৈর্ঘ্য ২০৮কি.মি.। পশ্চিমভাগে অজয় নদের দক্ষিণ হতে দামোদরের উত্তরকূল পর্যন্ত বিস্তৃতি প্রায় ২০কি.মি.। আবার জেলার পূর্বাংশে সর্বাধিক বিস্তৃতি দেখা যায় উত্তর কুলা নদী হতে দক্ষিণে দামিন্যা পর্যন্ত অংশে। এই অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০৫কি.মি.। সমগ্র জেলার আয়তনের হিসেব করলে পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের ভূমিভাগের অনুপাতের পরিমাণ হল ৭০:৩০। সেই কারণে হান্টার, পিটারসন প্রমুখ মনীষিগণ মন্তব্য করেছেন যে, বর্ধমান জেলার মানচিত্রের আকৃতি অনেকটা

হাতুড়ীর ন্যায়। আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার ভূখণ্ডটি হল হাতুড়ীর হাতল এবং বর্ধমান, কাটোয়া ও কালনা মহকুমা এই হাতুড়ীর মাথার সদৃশ।[৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মেজর রেনলের জরিপে বর্ধমানের আয়তন ৫১৭৪ বর্গমাইল (১৩৪০০.৬ বর্গকিমি) পাওয়া যায়। তখন বর্ধমান জেলায় আট হাজারের বেশি গ্রাম ছিল এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩লক্ষ ৫৩হাজার। বর্তমানে বরাকর থেকে কালনার প্রান্তে ভাগীরথী পর্যন্ত বর্ধমান জেলার দৈর্ঘ্য ১২০মাইল (১৯৩.১২ কিমি), কালনা ও কাটোয়া মহকুমা বরাবর প্রস্থ প্রায় ৫০মাইল (৮০.৪৭কিমি), কিন্তু আসানসোল মহকুমার প্রস্থ গড়ে ১২ মাইল (১৯.৩১ কিমি)। ১৮৭২খ্রিঃর জরিপে বর্ধমানের আয়তন নির্দিষ্ট হয় ৩৫৮৮ বর্গমাইল (৯২৯২.৯ বর্গকিমি)। ১৯২৭-৩৪ খ্রিঃ জরিপে আয়তন নির্দিষ্ট হয় ২৭০১ বর্গমাইল (৬৯৯৫.৫৬ বর্গকিমি)।[৫] বর্তমান ***Annual Administrative Report of Burdwan Collectorate 2012-2013*** অনুযায়ী বর্ধমানের ভৌগোলিক এলাকা হল ৭০২৪বর্গ কিমি।[৬]

মহকুমা ও থানা -

মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে সমগ্র সাম্রাজ্যকে পনেরোটি সুবায় বিভক্ত করা হয়। পনেরোটি সুবার মধ্যে অন্যতম ছিল বাঙ্গালা সুবা। বাঙ্গালা সুবা উনিশটি সরকারে বিভক্ত হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সম্রাটের পুত্র ফারুক সিয়র জাফর খাঁ অর্থাৎ মুর্শিদকুলি খাঁ'কে বাঙ্গালা সুবায় শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন। জাফর খাঁ সমগ্র বঙ্গদেশকে তেরোটি চাকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বর্ধমান একটি চাকলা। সমগ্র সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ বা সেলিমাবাদের অধিকাংশ মান্দারনের প্রায় অধিকাংশ এবং সাতগাঁও এর কয়েকটি পরগনা নিয়ে গঠিত হয় বর্ধমান চাকলা। বর্ধমান চাকলায় ৬১টি পরগনা ছিল। ১৭৪০খ্রিঃ বর্ধমান চাকলার রাজারূপে চিত্রসেন রায় দিল্লির মোঘল সম্রাট মহম্মদ শাহের সনদ লাভ করেছিলেন।

মহারাজা কীর্তিচাঁদ কয়েকটি পরগনা অধিকার করায় বর্ধমান চাকলার আয়তন বর্ধিত হয়। ১৭৬০খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চাকলা বর্ধমানের দেওয়ানি লাভ করে। ১৭৮৪খ্রিঃ প্রকাশিত সার্ভেয়ার জেম্‌স রেনলের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ধমান চাকলার আয়তন ছিল ৫১৭৪ বর্গমাইল (১৩৪০০.৬ বর্গকিমি)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাকলাগুলির আয়তন খর্ব করে জেলা গঠিত হয়। ১৮৩৭খ্রিঃ বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮৭২খ্রিঃ বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা, জাহানাবাদ, বুদবুদ ও রানিগঞ্জ এই ছয়টি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয় বর্ধমান জেলা। এই সময়েই পরগনার উপবিভাগ হিসেবে থানার প্রচলন হয়।[৭]

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র জেলাকে ছয়টি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- বর্ধমান(১), বর্ধমান(২), আসানসোল, দুর্গাপুর, কাটোয়া ও কালনা। মহকুমাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করে থানার সৃষ্টি হয়েছে। থানার আয়তনের অনুপাত সর্বত্র সমান নয়। প্রয়োজন অনুসারে থানা এলাকা কোনটি ক্ষুদ্র, আবার কোনটি বৃহৎ। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, শিল্পাঞ্চলে নানা ধরনের উপদ্রব অধিক হওয়ার জন্য ঐ সকল স্থানে থানা এলাকার পরিধি ক্ষুদ্র; কিন্তু কৃষি প্রধান এলাকায় উপদ্রব ও অশান্তি কম হওয়ায় আঁউশগ্রাম, ভাতাড়, মেমারী, মঙ্গলকোট, রায়না প্রভৃতি বৃহৎ এলাকাভুক্ত থানাও রয়েছে।[৮]

এই জেলায় মোট ৩৩টি ব্লক। বর্ধমান সদর মহকুমাকে ভাগ করে উত্তর ও দক্ষিণ বর্ধমান নামে দুটি মহকুমার সৃষ্টি হয়েছে। বর্ধমান, কালনা, দাঁইহাট, কাটোয়া, রানিগঞ্জ, আসানসোল ও গুসকরা- পৌরসভার এলাকাধীন।[৯]

ভূ-প্রকৃতি -

বর্ধমানের ভূ-প্রকৃতিকে চারভাগে ভাগ করা যায়, যথা- পলিগঠিত সমভূমি, পলি ও ল্যাটেরাইট গঠিত মিশ্র সমভূমি ও রুক্ষ পার্বত্যময় অঞ্চল। বর্ধমান জেলার ভূ-প্রকৃতিকে গুণগত মান অনুসারে ভাগ করে দেখা গেছে যে আঁউশগ্রাম থানার পশ্চিম অংশ হতে বরাকর নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চলটি তরঙ্গায়িত ভূ-ভাগের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই অংশটিকে সম্পূর্ণভাবে ল্যাটেরাইট অঞ্চলভুক্তও বলা যায় না। জেলার শেষ প্রান্তে কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড় দেখা যায় যেগুলি প্রাচীন শিলা দ্বারা গঠিত এবং এই শ্রেণির পাহাড়গুলি বিন্ধ্য পর্বতের পূর্ব ভাগের প্রসারিত অংশ। বরাকর ও অজয় নদ যেখানে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে, সেই সকল অঞ্চলে এই অনুচ্চ পাহাড় গুলির অবস্থিতি। কল্যাণেশ্বরীতে হালদা পাহাড় সহ যে কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড় বা টিলা দেখা যায় সেগুলির সর্বাধিক উচ্চতা ৫০০ফুটের অধিক নয়। বলা যেতে পারে যে, চিত্তরঞ্জন, সালানপুর, হীরাপুর ও কুলটি থানার মৃত্তিকা রুক্ষ ও পার্বত্যময় অঞ্চলভুক্ত। বর্ধমান জেলার দুই-তৃতীয়াংশ স্থান গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্ভুক্ত হলেও আঁউশগ্রাম, মঙ্গলকোট, ভাতাড়, বর্ধমান, গলসী থানায় গাঙ্গেয় পলি অপেক্ষা অজয়-দামোদরের প্রভাব অধিক। এতদঞ্চল নতুন পলি গঠিত ভূ-ভাগের অন্তর্ভুক্ত হলেও

ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে। নদীর গতিপ্রকৃতির উপর বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে এবং ভূ-প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যতার জন্যই জেলার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীগণের জীবনধারণের প্রণালীও ভিন্ন প্রকৃতির।[১০]

নদ-নদী -

বাংলা নদী মাতৃক দেশ। নদী বাহিত পলিমাটি দ্বারাই বাংলার অধিকাংশ স্থান গড়ে উঠেছে। বর্ধমান জেলার ভূ-প্রকৃতিও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। বর্ধমান জেলার নদ-নদীগুলির বর্তমান প্রবাহপথ পুরাতন প্রবাহপথ হতে অনেকক্ষেত্রে পৃথক। বন্যা, নতুন ভূমির উত্থান ও মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্তিম বাঁধের জন্য অনেকক্ষেত্রে নদ-নদীর গতি প্রবাহ পরিবর্তিত হয়েছে।[১১]

বর্ধমান জেলার প্রধান নদ-নদীগুলি হল- দামোদর, অজয়, ভাগীরথী, বরাকর, ব্রাহ্মণী, খড়ি, বাঁকা, কুনুর, বেহুলা, মুন্ডেশ্বরী, দেবখাল, গাঙ্গুর, কানা-দামোদর, খড়গেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, শিবা, খুদিয়া, নুনিয়া, বাবলা, তমলা, সিঙ্গারণ, চাঁদা, খন্ডেশ্বরী, গৌরী, ইলসরা, ঘিয়া, হরিণখালি, কামাখ্যাখাল, সাইনী, পাঠাননালা, ভনওয়ারখাল, কুজি, কামালের খাল, কাঁটাখাল প্রভৃতি।

দামোদর নদ আসানসোলের বরাকরে তিনটি নদীর সংমিশ্রণে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ক্ষুদে, নুনে, বরাকর নদী নিয়ে দামোদরের জন্ম। বর্ধমানের নদ-নদীগুলি খরস্রোতা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অন্তঃসলিলায় পরিণত হয়। নদীগুলি বহুবার খাত পরিবর্তনের ফলে জেলার ভৌগোলিক আকৃতির বিবর্তন ঘটিয়েছে। অনেকগুলি নদীর অস্তিত্বই নেই, কিন্তু মঙ্গলকাব্যে বা ঐতিহাসিক বিবরণীতে তাদের নামোল্লেখ আছে। যেমন- কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, দামুন্যা গ্রাম রত্নানু নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে এটি একটি খালে পরিণত হয়েছে। তেমনি রামাই পণ্ডিত ভল্লুকা নদীর তীরে বসবাস করতেন। এই নদীটিও একসময় বর্ধমান জেলার এক বিশাল নদীরূপে প্রবাহিত হত। আজও স্থানে স্থানে তার অবশেষ দেখা যায়। এই নদ-নদীগুলির মধ্যে দামোদর অত্যন্ত প্রাচীন নদ এবং বাকী অধিকাংশই হল বর্ষাতি নদ-নদী। নদী বিশেষজ্ঞদের মতে দামোদর ভাগীরথীর থেকেও প্রাচীন। বেহুলা, বাঁকা, গাঙ্গুর, খড়গেশ্বরী প্রভৃতি শাখা নদীগুলি দামোদরের মূলধারা থেকে অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ আকার ধারণ করে গতিপথ তৈরি করে নিয়েছে।[১২]

প্রাচীনকাল হতেই নদীপথে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত এবং রেলপথ ও রাজপথ তৈরি হওয়ার পূর্বে ভাগীরথীই ছিল জেলার পূর্বাঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক পথ। ভাগীরথী নদী বর্ধমান জেলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। গঙ্গা-ভাগীরথীর তীরেই গড়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাচর্চার বহুসংখ্যক কেন্দ্র।[১৩]

দামোদর অত্যন্ত প্রাচীন নদ হওয়ায়, জেলার মানুষের মুখে মুখে উচ্চারণ হয় "ওরে নদ দামোদর তোরে নিয়ে আতান্তর"। 'পশ্চিমবঙ্গের দুঃখের নদ' বলেও এর অখ্যাতি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি রাজ্যের ভ্যালি অথরিটির অনুকরণে এখানে দামোদর ভ্যালি প্রজেক্ট *(Damodar Valley Project)* গঠন করা হয়েছে। এটা একটা বহুমুখী পরিকল্পনা, যার প্রধান উদ্দেশ্য হল- **(ক)** সেচের জল সরবরাহ, **(খ)** বন্যা নিয়ন্ত্রণ, **(গ)** বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, **(ঘ)** জলপথ পরিবহন ও ম্যালেরিয়া নিবারণ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জল সরবরাহের ফলে বর্ধমান জেলার মানুষের মধ্যে এসেছে এক বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন।[১৪]

একসময়ে বর্ধমান জেলার নদ-নদীগুলি প্রবহমান এবং নৌচালনার উপযোগী ছিল মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে দামোদর ও অজয় নদের উপর দিয়ে রানিগঞ্জের কয়লা কলকাতায় পৌঁছাত। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অরণ্যসংহার, ভূপ্রাকৃতিক পরিবর্তন, রেলপথের বিস্তার এবং উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব প্রভৃতি কারণে অধিকাংশ নদ-নদী মজাখাতে পরিণত হয়েছে। দামোদর ও অজয় প্রধান নদ দুটিও নাব্যতা হারাচ্ছে। গ্রীষ্মে এই দুটি নদ যেমন বালুকাময় প্রায় শুষ্কখাতে পরিণত হয়, বর্ষায় তেমনি ভয়াবহ প্লাবন সৃষ্টি করে।[১৫]

বর্ধমান জেলার নদ-নদী সমূহের গতিপথ বিভিন্নযুগে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্ধমানের সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথার উদ্ভবে নদ-নদী সমূহের প্রচুর প্রভাব রয়েছে। নদ-নদীর উপত্যকাকে আশ্রয় করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছে।[১৬] বর্ধমানের গ্রামীণ সভ্যতা ও গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি সকল কালেই নদী নির্ভর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ করে নদীকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করলে অতীত সমৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রের প্রসারলাভ ঘটতে পারবে, এই আশা করা যায়।[১৭]

জলবায়ু -

কর্কটক্রান্তি রেখা বর্ধমান জেলার প্রায় মধ্যেখান দিয়ে দুর্গাপুর, ক্ষীরগ্রাম, পূর্বস্থলীর ওপর দিয়ে প্রসারিত। চিত্তরঞ্জন, চিচুরবিল, উদ্ধারণপুর কর্কটক্রান্তির কিছুটা উত্তরে ২৩০৪৫′ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। বর্ধমান কালনার অক্ষাংশ ২৩০১৫′, জাড়গ্রাম জামালপুরের অক্ষাংশ ২৩০। কাজেই সমগ্র জেলা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু **CWG** ও **AW** টাইপ জলবায়ুর মধ্যে ওঠানামা করে। **CWG** এর অর্থ *Warm temperate rainy climate with mild dry winter of eastern gangetic type of temperature trend* আর **AW** এর অর্থ *Tropical savana climate hot in all seasons but moderately comfortable with only 25°C to 35°C annual range of temperature.* অর্থাৎ জেলার জলবায়ু ক্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র, শীতকালে শুষ্ক ও মৃদুশীত আর সব ঋতুতেই মোটামুটি ক্রান্তীয় সাভানা প্রকৃতির উষ্ণ জলবায়ুর মাঝামাঝি আবহাওয়া বিরাজ করে। *'Annual Administrative Report of Burdwan Collectorate 2012-2013'* অনুযায়ী বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬০ সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ১১০ সেলসিয়াস। এবং এই রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ধমানের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৯৬মি.মি. ও গড় বৃষ্টি হয় বৎসরের ৭৭.৬ দিন।[১৮] জেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত ১৭৫-২২৫সে.মি. এর মধ্যে। মৌসুমী বায়ু হিমালয়ে প্রতিহত হয়ে পশ্চিমদিকে যত অগ্রসর হয় তত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে। শীতকালে বৃষ্টিপাত বিশেষ হয়না এবং উষ্ণতাও বেশ কমে যায়। ভোরের দিকে কুয়াশা দেখা যায়।[১৯]

কৃষিজ ও অরণ্যসম্পদ -

বর্ধমান জেলা কৃষিজাত পণ্যে সমৃদ্ধ। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৮ভাগ কৃষিকর্মে নিযুক্ত। জেলার উত্তর-পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য হয়। পশ্চিমাঞ্চলের মাটি কাঁকর মিশ্রিত ল্যাটেরাইট শ্রেণিভুক্ত বলে কৃষিকার্যের অনুপযোগী। এই অঞ্চলেও কিছু কিছু সংকীর্ণ সমভূমি বা নিম্নভূমিতে কৃষিকার্য হয়। জলসেচের সুবিধার ফলে ক্রমশ অধিক পরিমাণ জমি কৃষিজমিতে পরিণত হয়েছে। অকৃষি গোচারণ ভূমি বা আরণ্যক ভূমি কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।[২০]

বর্ধমান জেলার কৃষিসম্পদের মধ্যে প্রথমেই ধানের কথা উল্লেখ করতে হয়। এখানে তিনপ্রকার ধান উৎপন্ন হয়- আউস, আমন ও বোরো। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় আমন ধান। আলুর উৎপাদন বর্ধমান জেলায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া শিল্পদ্রব্যের কাঁচামাল হিসেবে বর্ধমান জেলায় কিছু পাটও উৎপন্ন হয়ে থাকে। জলসেচের সুবিধা, উর্বর মাটি, উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।[২১]

বর্ধমানে নীল বিদ্রোহের কোনো প্রভাব পড়েনি। বর্ধমানের বর্তমান ভূমি-মালিকানার বিন্যাসে ৪ হেক্টরের উপর জোতের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার এবং মোট জোত সংখ্যা ৬ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ জমির দখলিকার। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর হাতে আছে মোট কৃষিজমির ৪০ শতাংশ, অথচ এরা গ্রামীণ জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ। এই তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে বর্ধমানের বড় রায়তদের ভূমি মালিকানাজাত অর্থনৈতিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ক্ষমতার বিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে বারংবার।[২২]

এরপর আসা যাক বনজ সম্পদের আলোচনায়। স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেশের তথা এ জেলার এক বিশেষ সম্পদ। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, অরণ্যসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে। জেলার বনাঞ্চলকে মোটামুটি তিনভাগ করা যায়-

(ক) সাঁওতাল পরগনা থেকে আসানসোল মহকুমার পশ্চিমপ্রান্ত নিয়ে গঠিত আসানসোল বনাঞ্চল।

(খ) বর্ধমান মহকুমার আঁউশগ্রাম থানা ও ভাতাড় থানার ওড়গ্রাম বনাঞ্চল।

(গ) দুর্গাপুর মহকুমার দুর্গাপুর থেকে অজয়ের উত্তর তীর পর্যন্ত দুর্গাপুর বনাঞ্চল।

এছাড়া বর্ধমান শহরে কৃষ্ণসায়রের ও গোলাপবাগের বিপরীতে রমনা-বাগান।

ময়ূরভঞ্জের ফরেস্টরেঞ্জ থেকে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ হয়ে আঁউশগ্রাম থানার জঙ্গলমহল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে সাধারণত আর্দ্র ক্রান্তীয় পর্ণমোচী জাতীয় বৃক্ষ যথা- শাল, পলাশ, খদির, শিরীষ, শিশু, মেহগনি, বাবলা, মহুয়া বৃক্ষের সমারোহ।

সরকারি তথ্য থেকে জানা যায় ১৯৫১ খ্রিঃ জেলার বনভূমির পরিমাণ ছিল ১২৬.৬০ বর্গমাইল (৩২৭.৮৯ বর্গকিমি)। এর অধিকাংশ অরণ্য ছিল জমিদারদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, কিছু ছিল সরকারি বনবিভাগ ও জমিদারদের যৌথ মালিকানাধীন। ১৯৬১খ্রিঃ এই বনভূমির আয়তন ছিল ২২৭ বর্গমাইল (৫৮৭.৯৩ বর্গকিমি)

আর ১৯৬৪ খ্রিঃ এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬২ বর্গমাইল (৯৩৭.৫৮ বর্গকিমি)। এর মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছিল ১৯৭ বর্গ কিমি.।[২৩]

বর্ধমান জেলার অরণ্যের পরিমাণ কম হওয়ায় বন-সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রও সীমিত। কিন্তু শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে বনভূমি উন্নয়ন করা প্রয়োজন। জনবসতি ও শিল্পপ্রসারের ফলে ক্রমাগত কৃষিযোগ্য ভূমি ও বনভূমি বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠছে। এতৎসত্ত্বেও যে সকল অরণ্যের এখনও অস্তিত্ব আছে, সেগুলিকে রক্ষা করা আশু প্রয়োজন।

ভূমিক্ষয় নিবারণ, বৃষ্টিপাতের অসমতা দূরীকরণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ পুনঃস্থাপনের জন্য এই জেলায় বনভূমির উন্নয়ন করার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু জনবসতি, শিল্প ও কৃষিকার্যের জন্য ভূমির চাহিদাও যথেষ্ট। সুতরাং বন উন্নয়নের জন্য সরকারের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। বনসম্পদ রক্ষার জন্য বর্তমানে কিছু সরকারি উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে তার ফল সুদূরপ্রসারী। প্রায় সমগ্র বর্ধমান জেলা নদীগঠিত সমভূমি এবং বহু ছোট-বড় নদী এই জেলায় প্রবাহিত। নদ-নদীগুলির উভয়পার্শ্বের পতিত জমি বহুকাল ধরে গোচারণক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। ফলে এক শ্রেণির পেশাদার গোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এগুলিকে ব্যবহার করত এবং প্রধানতঃ নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই গোপপল্লীগুলি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে কৃষির চাহিদা মেটাতে গিয়ে ঐ সকল গোচারণ ক্ষেত্রগুলিকে কৃষিকার্যে ব্যবহারের ফলে গোচারণ ক্ষেত্রগুলি সঙ্কুচিত হয়েছে। এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রচুর ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

বর্ধমানের চরভূমি ও বনভূমির অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত। সেকারণে ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রতি লক্ষ রেখে বন, বনসম্পদ ও বন্য জীবজন্তু ধ্বংস করা হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় বনভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার দূরীকরণের জন্য বর্তমানে সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।[২৪]

বনবিভাগ, পঞ্চায়েত ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগীতায় বর্ধমান বনবিভাগে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ৭২টি বনসংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বনকমিটি গঠনের দ্বারা জনসাধারণ যে সুযোগ-সুবিধা পাবেন তার বাইরেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বনবিভাগ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যাতে জঙ্গলের উপর নির্ভরতা কমানো যায় এবং বন সন্নিহিত মানুষের আর্থিক উন্নতি ঘটে।[২৫]

শিল্প -

বর্ধমান হল এমন একটা জেলা, যেটি কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, বৃহদায়তন শিল্প এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে বৃহদায়তন সুসংহত লোহা ও ইস্পাত কারখানা, রেলইঞ্জিন কারখানা ও অন্যান্য বহু কারখানা আছে, আবার কয়লা খনি এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাচুর্য রয়েছে। একই জেলায় এত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন শিল্প, খনিজ দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের যে সমাহার বর্ধমান জেলায় দেখা যায়, তা সমগ্র পৃথিবীতে বিরল। এইদিক থেকে দেখলে বর্ধমান জেলাকে অনন্য বলা যায়।[২৬]

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে বর্ধমান বঙ্গদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে সুসমৃদ্ধ বর্ধমানের বিবরণ দিয়েছেন। এখানকার বস্ত্রশিল্প সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ভারতচন্দ্র এখানে উৎপাদিত বহুবিধ বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। কাটোয়া, দাঁইহাট, মেমারি প্রভৃতি অঞ্চল বস্ত্র উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মানকরের চেলি কাপড় বিখ্যাত ছিল। সকল উৎপন্ন বস্ত্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হত।

তামা এবং পিতলের বাসনের জন্যও বর্ধমান বিখ্যাত ছিল। বর্ধমানের নিকটবর্তী কাঞ্চননগর লৌহ-ইস্পাতের শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। আসানসোল বিখ্যাত ছিল পশমের কম্বলের জন্য। এছাড়াও মাদুর, বাঁশের ঝুড়ি, পেতে (ছোট ঝুড়ি), মোড়া ইত্যাদি, কাঠের কাজ, ঘানির তেল, আখের গুড়, বিড়ি, চিড়ামুড়ি ইত্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকার উপায়।[২৭]

বর্ধমানের প্রধান শিল্প হল কয়লা। রাঢ়ের প্রান্ত জুড়ে চিরবিস্তৃত কয়লাখনি অঞ্চল। ব্রিটিশ সরকার এই কয়লার জন্যই হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত রেলপথ প্রবর্তন করে এবং পরে রানিগঞ্জ পর্যন্ত নিয়ে যায় (১৮৫৪খ্রিঃ)। বর্ধমানের মহারাজারা কয়লা-নিহিত জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও নিজেরা কয়লা শিল্প গড়ে তুলতে যত্নবান হননি। বিদেশিদের এই সমস্ত জমি ইজারা দিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি' ব্যবসা করার সুযোগ পায়। তবু তারই মধ্যে তিনটি বাঙালি প্রতিষ্ঠান দেশিয় কয়লা শিল্পকে উচ্চস্তরে নিয়ে যান।[২৮]

বর্তমানে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল হিসেবে বর্ধমান জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ১৯৭০-৭১ খ্রিঃ দুর্গাপুরে ২০টি বৃহৎশিল্প এবং ৪০টি মাঝারি-ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হয়। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ছাড়াও রানিগঞ্জের *'Bengal Paper Mill'* নামে কাগজের কারখানা, আসানসোলের নিকটবর্তী জেমেরি নামক স্থানে এলুমিনিয়ম কারখানা, রেলের ইঞ্জিন ও বয়লার

তৈরির জন্য চিত্তরঞ্জনে লোকোমোটিভ কারখানা, আসানসোলের নিকটে কন্যাপুরে সেন র‍্যালে কোম্পানির সাইকেল তৈরির কারখানা, বার্ণপুরে লোহার কারখানা প্রভৃতি বর্ধমান জেলার বৃহৎ উল্লেখযোগ্য শিল্প।[২৯]

বর্ধমান জেলার অন্যতম কারিগরি শিল্পকেন্দ্র হিসেবে কাঞ্চননগর ও কামারপাড়া স্থান দুটির নাম উল্লেখ করা যায়। কামারপাড়ার তরবারি ও কাঞ্চননগরের ছুড়ি, কাঁচি, ক্ষুর ছিল বিশ্ববিখ্যাত। লোহার কাজে রাঢ় দেশের খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে আছে।

বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে কাঞ্চননগরের শিল্পের ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে এখানেই গড়ে উঠেছিল পিতল-কাঁসা শিল্প। এই শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশের নির্দিষ্ট সময় জানা যায় না; তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও এর রমরমা ছিল বলে কাঞ্চননগরের কর্মকাররা অনুমান করেন। কাঞ্চননগরের দক্ষিণে ফেরিঘাটে অর্থাৎ কাঠগোলাঘাটে নৌকা তৈরি ও মেরামতির কাজ চলত। এ কাজের জন্য গজাল সরবরাহ হত কাঞ্চননগর থেকে। বর্ধমান জেলার লৌহ-ইস্পাত শিল্পের পরিচয় মুঘল আমল থেকে পাওয়া যায়। আঠারো শতকে বর্ধমান রাজপ্রাসাদে যে সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যেত সেগুলি বেশিরভাগই কামারপাড়ার কর্মকারদের দ্বারা প্রস্তুত হত। উনিশ শতকের শেষদিকে অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার পর থেকে কাঞ্চননগরে যে শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় তা হল ছুড়ি-কাঁচি শিল্প। ঠিক কোন সময় থেকে এর সূচনা হয় তা সঠিক না জানা গেলেও শিল্পকেন্দ্র হিসেবে কাঞ্চননগরের ঐতিহ্য যে অনেক প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বর্ধমানে বণিক বসতি ও কর্মকারদের কারিগরির পরিচয় পাওয়া যায়। এইভাবে কোনোরকম উন্নত মানের যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই কাঞ্চননগরের কর্মকার কারিগররা এখানে এই শিল্পের জন্ম দেয় এবং ভারতের বুকে বর্ধমানকে সুপরিচিত করে তোলে। যদি বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ, বরাকর অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী বীরভূম জেলায় অসংখ্য লোহার খনির উল্লেখ পাওয়া যায়, এ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল যেমন, লোহারপাত, ইস্পাত, টিন ও দস্তার পাত, মহিষের সিং প্রভৃতি কলকাতা থেকে সংগৃহীত হতো। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে এখানে কারিগরি শিল্পের রূপান্তর ঘটেছে। লোহার শিল্প থেকে পিতল শিল্প এবং তারপর (স্বাধীনোত্তর যুগে) সোনা-রুপোর শিল্প। কর্মকার কীভাবে স্বর্ণকারে পরিণত হয়েছে তার সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া না গেলেও এটা বোঝা যায় যে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে দক্ষ ও পরিশ্রমী কারিগরেরা ধাপে ধাপে তাদের বৃত্তি বদল করেছেন।[৩০]

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রেও বর্ধমান জেলার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে অনেক ধানকল *(Rice Mill)*, বেশ কিছু মুড়িকল, চিড়াকল, পাউরুটি তৈরির কারখানা, বিস্কুট তৈরির কারখানা, ইঁটভাটা ইত্যাদি আছে। এগুলির সঠিক সংখ্যা পাওয়া কঠিন। কেননা বর্তমানে নথিভুক্তকরণ *(Registration)* ঐচ্ছিক হওয়ার ফলে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানই সরকারি নথিভুক্ত হয়না। এছাড়াও এখানে শোলাশিল্প একটি বিশিষ্ট শিল্প। দেবদেবীর মূর্তি তৈরি ও অলংকরণে এবং চাঁদমালা প্রভৃতিতে শোলা ব্যবহৃত হয়। ডোকরা শিল্পও একটি বিশিষ্ট ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। এছাড়া অন্যান্য ছোট আয়তনের শিল্পের মধ্যে কাঠের কাজ, কাঁথাস্টিচ, পোড়ামাটির কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, পাথর খোদাই এবং পট শিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রধানত দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বৃহদায়তন শিল্পের সহায়ক শিল্প হিসেবে অনেক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে উঠেছে। এগুলি হল- ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, সেরামিক শিল্প, রিফ্র্যাক্টরি, পলিথিন শীট তৈরি ইত্যাদি। কোনো দেশের শিল্পোন্নয়নে লোহা ও ইস্পাত শিল্প এবং কয়লা শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই এই শিল্পগুলিকে মূল বা বুনিয়াদী শিল্প বলা হয়। বর্ধমানবাসীর এটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে সারা ভারতে এই দুটি মূল বা বুনিয়াদী শিল্পের প্রথম পত্তন হয়েছিল এই বর্ধমান জেলায়। বর্ধমান জেলায় কৃষি, শিল্প, এবং খনিজ উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল এবং আছে। এই জেলার পরিবহন ব্যবস্থা বেশ উন্নত। কাছাকাছি বিহার (অধুনা ঝাড়খণ্ড), ওড়িশা থেকে আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট ইত্যাদি এনে লোহা ও ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার সুবিধা রয়েছে। দক্ষ শ্রমিকও আছে। অন্যান্য শিল্পস্থাপনের সুবিধাও আছে। যে সব জায়গায় দরকার, সেখানে যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের *(Rationalisation)* ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং মূলধনের প্রয়োজনে কোনো কোনো ক্ষত্রে যৌথ উদ্যোগ গঠন করা যেতে পারে। বেসরকারি ক্ষেত্রে মালিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। দেখতে হবে যাতে পরিবেশ দূষণ না হয়। পরিবেশ-বান্ধব পরিকাঠামোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অন্য যে কারণেই সরকার আমদানির উপর বিধিনিষেধ হ্রাস করুন না কেন, তার ফলে দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থহানি যাতে না ঘটে, সেদিকে সরকারকে অবশ্যই সদর্থক নজর দিতে হবে।[৩১] গ্রামীণ সমাজকে শিল্পনির্ভর করতেই হবে। গ্রাম-বাংলার যেখানে এই শিল্পের ঐতিহ্য সুবিদিত সেটাকেই অনুদানে, অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত করতে হবে। গ্রামের কুটির শিল্পকে বড় না হোক, মাঝারি আকার দেওয়ার প্রয়াস নিতে হবে, যাতে গ্রামের মানুষের বেকার সমস্যা কিছুটা হলেও হ্রাস পায়।[৩২]

পূর্বোক্ত গঠনমূলক পদক্ষেপগুলি নিলে বর্ধমান জেলার শিল্পোন্নয়নে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা এবং বাস্তব অবস্থার মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হয়েছে, এই ব্যবধান দূর করা গেলে বর্ধমান জেলা আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।[৩৩]

যোগাযোগ ব্যবস্থা -

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নততর পদ্ধতি একদিকে যেমন জীবনযাত্রার মান উন্নত করে, অপরদিকে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দকে একে অপরের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার বিনিময় করতেও সাহায্য করে। নদীবহুল রাঢ় অঞ্চলে অতীতে পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যম ছিল স্থলপথ ও জলপথ। হস্তী, অশ্ব, রথ, উট, গোযান ও মানববাহিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রব্যসমূহ স্থান হতে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হত। অপরপক্ষে বজরা, পানসী, ছিপনৌকা, ডিঙি, ভেলা, জেলেনৌকা প্রভৃতির সাহায্যে নদীবক্ষে পারাপার ও যাতায়াত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এদেশে উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার না ঘটায় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিচিতি ও ভাবের আদান-প্রদানের বহু বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল।[৩৪]

অষ্টাদশ শতকে বর্ধমানের ও বর্ধমানের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িককালে রচিত গ্রন্থসমূহে। বর্ধমান জেলার মধ্যে এমন বহু রাজপথ সাধারণ পথের পরিচয় জানা যায় যেগুলির মাধ্যমে বর্ধমান জেলার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সহ বাংলা, বিহার ও ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। বর্ধমান হতে কালনা পর্যন্ত পথটি বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে দাবি করা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ পথটির অস্তিত্ব ছিল তেজচাঁদের বহু পূর্বেই। তেজচাঁদের আমলে কালনা রোড সংস্কার সাধিত হয়ে রাস্তার ধারে সরাইখানা বা বিশ্রামাগার নির্মিত হয়, এবং ঐগুলির প্রতিষ্ঠালিপি থেকে বিশ্রামাগারের বিবরণ ও প্রতিষ্ঠা তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়।[৩৫]

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণের ফলে ইংরেজ শাসককূল পূর্বাঞ্চলের মধ্যভাগের এক অরণ্য সমাকূল পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে বিশেষ পরিচিতি লাভ করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে সম্ভবতঃ এই রাস্তা নির্মাণের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ তারা দ্রুত সিপাহী বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।

বর্ধমান জেলার নদীর উপর নির্মিত দুটি সেতু প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। সর্বপ্রাচীন সেতুটি কেতুগ্রাম থানার নৈহাটি সীতাহাটি গ্রাম সংলগ্ন শিবা নদী বা কাঁদড় খালের উপর নির্মিত হয়েছিল। সেতুটি স্থানীয় অধিবাসীগণের নিকট 'মাসীর সেতু' নামেই সমধিক পরিচিত। বর্ধমান জেলায় অবস্থিত দ্বিতীয় প্রাচীন সেতুটি রাজবাড়ির পশ্চিমভাগে নূতনগঞ্জের মধ্যদিয়ে নবাব রোড পর্যন্ত যে রাস্তাটি প্রসারিত হয়েছে, ঐ রাস্তার উপর বাঁকা বা বঙ্কেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত হয়েছিল। ১৭৪২ শকাব্দ বা ১৮২০খ্রিঃ-এ বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ নির্মাণ করিয়েছিলেন এই সেতুটি। সেতুটির উপর প্রতিষ্ঠিত শিলালিপি (বর্তমানে অপসৃত) হতে জানা যায়।[৩৬]

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন সরকারি বিবরণ জানা যায় না। ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দের এক সরকারি প্রতিবেদনে বর্ধমান জেলার আভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য জেলার সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগের নিমিত্ত কয়েকটি পথ পরিচিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেও ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পর হতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ও জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রাস্তাঘাট প্রসারণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি এলাকা ব্যতীত বর্তমানে প্রায় প্রতি অঞ্চলের সঙ্গে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর ও আসানসোলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। সড়ক পরিবহনের দ্রুত প্রসারণ ঘটায় বর্ধমান শহর সদরঘাটে দামোদরের উপর কৃষক সেতু, চরকিতে অজয়ের উপর কাশীরামদাস সেতু ও নবদ্বীপে ভাগীরথীর উপর গৌরাঙ্গ সেতু নির্মাণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাসহ বিহার ও অসম রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় দ্রুততা এসেছে। কলকাতা হতে প্রসারিত হাইওয়েটি কালনা-কাটোয়ার পথে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ৩৪নং জাতীয় সড়কে মিলিত হয়ে উত্তরবঙ্গ ও অসমের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন এনেছে। কলকাতা থেকে বর্ধমান হয়ে শিল্পনগরী দুর্গাপুরে পরিবহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ২নং হুগলি সেতু ও দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে বা ২নং জাতীয় সড়ক।[৩৭]

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রানিগঞ্জে কয়লাখনি আবিষ্কারের পর গুরুভার বহনের নিমিত্ত উন্নত মানের পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে দামোদর ও অজয় নদে দেশি নৌকা ও স্টীমার যোগে কলকাতায় জাহাজ ও জ্বালানীর প্রয়োজনে কয়লা সরবরাহ করা হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভাগীরথী নদী, দামোদর ও অজয় নদের খাতে চড়া পড়ে নদীখাতের গভীরতা নষ্ট হওয়ায় এই জলপথ পরিবহন ব্যবস্থা অলাভজনক তথা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। ইংরেজরা স্বীয় স্বার্থের প্রতি নজর রেখেই ভারতবর্ষে রেলপথ প্রসারে যত্নবান হয়েছিল। পূর্ব ভারতে

রেলপথ প্রসারের ক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের ও বিহারের খনিগুলি থেকে কয়লা, লোহা, এলুমিনিয়াম, তামা প্রভৃতি খনিজপদার্থ সংগ্রহ করে কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা এবং তথাকার কলকারখানায় সস্তায় কাঁচামালের যোগান দেওয়া। সেকারণে বর্ধমান জেলায় রেলপথ প্রসারণের জন্য বিদেশি শাসকদের বিশেষ নজর ছিল। কেবলমাত্র যাত্রী পরিবহনের জন্য রেলপথের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব থাকলেও কোনো তাগিদ ছিলনা। সম্ভবতঃ রেলপথ প্রতিষ্ঠার জন্য ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে পরিবহন ব্যবস্থায় এল দ্রুততা ও নিশ্চয়তা। পরীক্ষামূলকভাবে **১৮৫৪খ্রিঃ ২৮শে** জুন হাওড়া থেকে পান্ডুয়া পর্যন্ত রেলগাড়ী চালান হলেও, প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ী চলেছিল ঐ বছরেরই **১৫ই** আগস্ট তারিখে।[৩৮]

১৯১২খ্রিঃ মে মাস নাগাদ ব্যান্ডেল-কালনা-নবদ্বীপ-কাটোয়া-হাওড়া পর্যন্ত প্রসারিত রেলপথে বিহার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বর্ধমান জেলায় কয়েকটি ন্যারোগেজের রেলপথও নির্মিত হয়, যার ফলে বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে যোগসূত্র অতি সহজ হয়ে যায়।

অতীতের তুলনায় বর্তমানে একদিকে যেমন বর্ধমান জেলায় রাস্তাঘাটের সংখ্যা ও বাসের সংখ্যা বেড়েছে, অনুরূপভাবে রাস্তাঘাটের মানও যথেষ্ট নিম্নগামী হয়ে পড়েছে, যার ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগের অন্তঃ থাকেনা। জেলার কৃষক ও কৃষি-অর্থনীতি রাজপথ পরিবহন ব্যবস্থার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় এদিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে; অন্যথায় পরিবহন ব্যবস্থাও কৃষি-অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে একটা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে।[৩৯]

॥ তথ্যঋণ ॥

১. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯০; পৃ. ১০৬, ১০৭, ১০৮।

২. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; প্রকাশ ভবন; ১৪১৬; পৃ. ৯৪।

৩. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮; পৃ. ৭৬।

৪. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯০; পৃ. ১।

৫. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮; পৃ. ৭৬।

৬. ***Annual Administrative Report of Burdwan Collectorate 2012-2013, Page 9.***

৭. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮; পৃ.. ৭৭-৭৮।

৮. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯০; পৃ. ৪।

৯. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮; পৃ. ৭৯।

১০. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯০; পৃ. ৪১।

১১. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ডিসেম্বর ২০০৯; পৃ. ২৯৩।

১২. দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২; পৃ. ৮।

১৩. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ডিসেম্বর ২০০৯; পৃ. ২৯৬।

১৪. ভট্টাচার্য তরুন সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা ১৪০৩; কলকাতা; প্রকাশক তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; মার্চ ১৯৯৭; পৃ.. ২১৫, ২১৭।

১৫. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮; পৃ.. ৭৮, ৮১।

১৬. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ডিসেম্বর ২০০৯; পৃ. ৩০৩।

১৭. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯০; পৃ. ৮২।

১৮. ***Annual Administrative Report of Burdwan Collectorate 2012-2013, Page.9.***

১৯. চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন; অক্টোবর ২০০১; পৃ. ২০।

২০. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮; পৃ. ৮৩।

২১. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ফেব্রুয়ারী ২০১১; পৃ.. ৩২১, ৪০৫।

২২. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ডিসেম্বর ২০০৯; পৃ. ৪০৫।

২৩. চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন; অক্টোবর ২০০১; পৃ.. ৩৯ - ৪১।

২৪. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯০; পৃ.. ৫৭, ৫৮।

২৫. ভট্টাচার্য তরুন সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা ১৪০৩; কলকাতা; প্রকাশক তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; মার্চ ১৯৯৭, পৃ.. ২১৮, ২১৯।

২৬. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বৰ্দ্ধমান সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ফেব্রুয়ারী ২০১১; পৃ. ৩২০।

২৭. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮; পৃ.. ৮৩ - ৮৫।

২৮. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯; পৃ. ১৬২।

২৯. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮; পৃ.. ৮৭, ৮৮।

৩০. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯; পৃ.. ১৬৫- ১৬৭, ১৬৯, ১৭৫, ১৭৬।

৩১. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বৰ্দ্ধমান সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ফেব্রুয়ারী ২০১১; পৃ.. ৩২২ - ৩২৫, ৩৩১, ৩৩২।

৩২. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯; পৃ. ১৭৭।

৩৩. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বৰ্দ্ধমান সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ফেব্রুয়ারী ২০১১; পৃ. ৩৩২।

৩৪. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯০; পৃ. ১৬২।

৩৫. তদেব, পৃ. ১৭৩।

৩৬. তদেব, পৃ.. ১৮৩, ১৮৫।

৩৭. তদেব, পৃ.. ১৮৭, ১৮৮।

৩৮. তদেব, পৃ.. ১৮৯, ১৯১।

৩৯. তদেব, পৃ.. ১৯২, ১৯৪।

****

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ॥

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বর্ধমানও হারিয়ে ফেলেছে তার প্রাচীনত্বের সঠিক তারিখ। ইতিকথা ও উপকথার সম্মেলনে সৃষ্ট জটিল আবর্তে অনেক তথ্যই আজও প্রকাশের অন্তরালে রয়ে গেছে। বর্তমান বর্ধমান জেলার সৃষ্টি ব্রিটিশ আমলে ১৮৭৯খ্রি.। কিন্তু অতীতে হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ যুগের প্রথমে বহুবার বর্ধমানের সীমার পরিবর্তন হয়েছে। কখনও পার্শ্ববর্তী বিরাট এক এলাকা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আবার কখনও এর আয়তন ছোট হয়েছে। নতুন নতুন রাষ্ট্রের উত্থান পতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সর্বত্রই এরূপে ভাঙাগড়া চলে থাকে।[১] বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও লিপিমালা গুলি থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করেই অগ্রসর হয়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের আলোচিত বিষয়টি মধ্যযুগ কেন্দ্রিক সুতরাং ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিষয়ক আলোচনায় আলোকপাত করব।

জনপদ বিভাগের প্রাচীন ইতিহাস থেকে মনে করা যায় যে, প্রধানত শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য প্রাক্ তুর্ক-আফগান যুগেও ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন করা হত। লক্ষণ সেনের আমলে কঙ্কগ্রাম ভুক্তির নাম পাওয়া যায় এবং মনে হয় সেই সময় কোনো প্রশাসনিক কারণে এই নতুন ভুক্তি গঠিত হয়। প্রাক্ তুর্ক- আফগান যুগে ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয় তুর্ক- আফগান যুগে সরকার, মহল,পরগনা, চাকলা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত হয়। ঔপনিবেশিক যুগে জেলা, মহকুমা, থানা ইত্যাদি বিভাগ হয় এবং জেলা- সীমানার একাধিকবার পরিবর্তন করা হয় প্রশাসনিক কারণে।[২]

প্রাচীন লিপি ছাড়াও দুএকটি প্রাচীন সাহিত্যেও রাঢ়ের উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণ মিশ্রের ‘প্রবোধ চন্দ্রোদয়’ নাটকে(১১শ শতাব্দী) এবং শ্রীধরাচার্যের ‘ন্যায় কন্দলীতে’ (৯৯১খ্রিঃ) দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩]
অষ্টম শতাব্দীর শেষদিকে কম্বোজগণ রাঢ় অধিকার করলে জৈনধর্ম হ্রাস পায় ও রাজধর্ম বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। পুষ্পা নিয়োগী তাঁর ***“Buddhism in Ancient Bengal”*** গ্রন্থে লিখেছেন ***“During the rule of the senas, Buddhism was already in a declining condition, but it had not yet completely disappeared from Bengal. Traces of its existence can be found in the post pala period.”*** [৪] কম্বোজগণ ছিলেন কিরাতবংশীয়। দশম শতাব্দীতে মহীপাল বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। পরবর্তী পালরাজা ধর্মপাল উত্তর রাঢ় এবং রণশূর দক্ষিণ রাঢ়ে নিজ নিজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। একাদশ শতাব্দীতে মহীপালের (৯৮৮- ১০৩৮খ্রিঃ) পুত্র নয়পাল গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সুযোগ বুঝে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ বা ইছাইঘোষ ঢেক্করীতে রাজধানী স্থাপন করে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ঢেক্করী অজয় তীরবর্তী কেন্দুলির নিকট বর্তমানে গড়- জঙ্গল নামে পরিচিত। স্বীয় দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য রামপাল রাঢ় দেশের সামন্ত রাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে মহারাজ বিজয়সেন (১০৯৮বা ১১৫৮খ্রিঃ) রাঢ়ের রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। বিজয়সেন সুশাসক ছিলেন, রাঢ়ে মাৎস্যন্যায় দূর করে তিনি সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেনগণ বহুদিন যাবৎ উত্তর রাঢ়ে সেনভূমে বসবাস করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লালসেন মাতুলবংশের সহযোগে কৌলীন্যপ্রথার সংস্কার করেছিলেন। বাংলার সামাজিক বিবর্তনে বল্লালসেন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। দ্বাদশ শতাব্দের শেষে ১১৭৯খ্রিঃ লক্ষণসেন পিতৃসিংহাসনে বসেন। কিশোর বয়সে উত্তরবঙ্গের গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেন। তাঁর নামে বীরভূমের রাজনগর ‘লক্ষণ নগর’ হয়েছিল। লক্ষণ সেন আঁউশগ্রাম- কাঁকসার গোপভূমি অধিকার করে সেন- পাহাড়ী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই সময়ে রাঢ়ে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা যায়। গৌড় আক্রমণ ও জয় করেন। গৌড় রাজধানী নবদ্বীপ থেকে লক্ষণসেন পালিয়ে গেলেও মালদহে কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন ও তাঁর পুত্র বা আত্মীয়জন এখানে সেখানে ক্ষুদ্র রাজা হিসেবে বেশ কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত চন্দ্রসেন নামে এক রাজা মঙ্গলকোটে রাজত্ব করেন।[৫] এরপর ষোড়শ শতক পর্যন্ত বর্ধমানের নামোল্লেখ বহু সূত্রে পাওয়া গেলেও তার ইতিহাস ছিল বাংলার সাধারণ ইতিহাসে আবৃত। বাংলায় মুঘল আমলের সূচনাকাল থেকেই শহর হিসেবে বর্ধমান স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব নিয়ে ইতিহাসের পাতায় উঠে আসে। বর্তমান শহরে এখন যেখানে রাজবাড়ি

সেখানেই ছিল বাংলা সুবার অন্তর্গত সরকার ফরিদাবাদের মহাল বর্ধমানের সদর কার্যালয় তথা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক প্রশাসনিক কেন্দ্র ও সামরিক চৌকি। আর বর্তমান মহিলা কলেজের জায়গায় ছিল বর্ধমান দুর্গ ও ফৌজদারের কার্যালয়। পাশেই বাদশাহি সড়ক, উত্তর থেকে এসে বর্ধমানের বুকের উপর দিয়ে যা দক্ষিণে চলে গেছে। এই সড়কের পাশেই জগৎবেড় এলাকায় ছিল নবাববাড়ি। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ শাসনের ক্ষেত্রে বর্ধমান তথা বর্ধমান দুর্গের একটি রণনীতিগত গুরুত্ব ছিল। এখান থেকেই মুঘল সৈন্যবাহিনী বাংলার আফগান শাসকদের শায়েস্তা করতে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমের প্রায় স্বাধীন সমর নায়কদের মুঘল প্রশাসনিক কর্তৃত্বে আনার জন্য বারংবার অভিযান চালিয়েছে। বিদ্রোহী গৌড়াধিপতি দাযুদ খাঁ-র বিরুদ্ধে প্রথমে টোডরমল ও পরে মুনীম খাঁ-র সামরিক অভিযান ও বর্ধমান অধিকার(১৫৭৫খ্রিঃ), ওড়িশার পাঠান শাসক কতলু খাঁ কর্তৃক আবার বর্ধমান অধিকার এবং মানসিংহের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনীর বর্ধমান পুনরধিকার(১৫৮৩খ্রিঃ), বর্ধমানের জাগিরদার শের আফগানের স্ত্রী মেহেরুন্নিসা (পরবর্তী কালে জাহাঙ্গীরের পত্নী নুরজাহান) কে ছিনিয়ে নেবার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রেরিত বাংলার সুবাদার কুতুবুদ্দিন কোকের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে বর্তমান সাধনপুরের মাঠে উভয়েরই মৃত্যু(১৬০৭খ্রিঃ), বিদ্রোহী শাহজাদা খুররম (পরবর্তী কালে সম্রাট শাহজাহান) এর বর্ধমান জয় ও বর্ধমানে কিছুদিন অবস্থান- এই রকম একের পর এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বর্ধমানকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এইসব ঘটনা শুরু হবার অনেক আগে থেকেই অবশ্য পীরেরা আসতে শুরু করে দিয়েছিল বর্ধমানে। পায়রাখানা গলিতে খক্করসাহেবের মাজার এবং পীর বহরমের সমাধিস্থল ভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও আজও সর্বধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আকৃষ্ট করে। সুফী পীরেরা সর্বত্রই ধর্মীয় বিভাজনকে অতিক্রম করার পথ দেখিয়েছেন।[৬]

তুর্ক-আফগান রাজত্বকালে বাংলার ইতিহাসে বর্ধমান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল এবং এই যুগেই বাংলার সংস্কৃতিতে বর্ধমানের দান গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে 'বৈষ্ণব সাহিত্যে' দান সবচেয়ে বেশি নবদ্বীপ ছাড়া শ্রীখণ্ড কাটোয়া, কালনা, দেনুড়, ঝামটপুর, বাঘনাপাড়া প্রভৃতি বৈষ্ণবদের ঐতিহাসিক স্থান অধিকাংশই বর্ধমানে এবং কেশবভারতী, নরহরি সরকার, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গৌরীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বর্ধমানবাসী। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'দ্বিতীয় খণ্ড' তে 'গড়বর্ণন' থেকে প্রায় দুশো বছর আগেকার বর্ধমান শহরের মূল্যবান ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র বর্ধমানের পুরাতন গড়ের কথা বলেছেন, কিন্তু গড়গুলির নাম উল্লেখ করেননি। বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ধমানে দেখতে পাওয়া যায়। গড়ের নাম থেকে মনে হয় কতকগুলি প্রাক্ তুর্ক-আফগান যুগে এবং কতকগুলি তুর্ক-আফগান যুগে নির্মিত। যেমন- তালিতগড় বা মহবৎ গড়, খাঁজাহান খাঁর গড়, শক্তিগড়, রামচন্দ্র গড়, আমরাগড়, শেরগড়, পানাগড়, সমুদ্রগড়, রাজগড় প্রভৃতি। বর্ধমান জেলার প্রাচীন স্থানীয় নামের মধ্যেও পূর্বোক্ত যুগের ঐতিহাসিক স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- বর্ধমান সাতসৈকা খণ্ডঘোষ, গোপভূম, সেনভূম, শিখরভূম, সেন পাহাড়ী, চম্পানগর, ইন্দ্রানী, শাহাবাদ হাভেলি, মজঃফরশাহী, আমীরাবাদ, আজমশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, শেরগড় ইত্যাদি। চাঁদ সদাগরের বাস ছিল বলে কথিত আছে চম্পানগরে। বেহুলা-লখিন্দরের শবদেহ গাঙ্গুর বা বেহুলা নদী দিয়ে কলার ভেলায় ভেসে গিয়েছিল। গোপভূমে একদা সদ্গোপ রাজা রাজত্ব করতেন। সেন পাহাড়ীতে লাউসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইছাইঘোষের রাজধানী ছিল। সেনভূমে সম্ভবতঃ লাউসেনের পিতা কর্ণসেনের অথবা তাঁর বংশধরের রাজ্যভুক্ত ছিল।[৭]

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে ভারতের অন্যান্য অংশে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তার থেকে বর্ধমান জেলাও রেহাই পায়নি। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে একদিকে যেমন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ দিল্লির কর্তৃত্ব উপেক্ষা করতে থাকেন, অপরদিকে তেমনই বর্গি ইত্যাদি লুণ্ঠনকারী দল মাথা তুলতে আরম্ভ করে।[৮] ১৭৪২ খ্রিঃর ১৫ই এপ্রিল নবাব আলিবর্দি খাঁ বর্ধমান শহরে উপস্থিত হন, মারাঠা অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য। পরদিন সকালে তিনি শোনেন যে, মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য বর্ধমান শহর ঘেরাও করে ফেলেছে। এরপর লড়াই করতে করতে কাটোয়া হয়ে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার চেষ্টা করেন। এই সময় বর্ধমান শহরের আশে পাশে বর্ধমান থেকে কাটোয়ার পথে চারিদিকের গ্রামাঞ্চলে বর্গিরা যে অত্যাচার করে তা অবর্ণনীয়। বাংলার দুরন্ত শিশুরা আজও যে

বর্গির ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। পশ্চিমবাংলার নবাবি শাসন বেশ কিছুদিনের জন্য প্রায় শেষ হয়ে যায়, তা বলা চলে। এই সময়ে হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে স্থানীয় বহু বনেদী পরিবার ভাগীরথীর পূর্বতীরে পালিয়ে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। একটা সামাজিক বিপর্যয় হয়ে যায় পশ্চিমবাংলায়।[৯] নবাব আলিবর্দির সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বর্গির হাঙ্গামা ভীতিপ্রদ আকার ধারণ করেছিল। বর্গি শব্দের অর্থ মহারাষ্ট্রের সাধারণ সৈন্যদের নিম্নতম শ্রেণি। সাতশ মারাঠা অশ্বারোহী মুর্শিদাবাদ উপকণ্ঠে ধানিপাড়ায় উপস্থিত হয় এবং বাজারে অগ্নিসংযোগ করে। বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করে। সমস্ত জুন মাস কাটোয়া মারাঠাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল। রাজমহল থেকে ভাগীরথীর সমস্ত পশ্চিমতীর মারাঠাদের অধিকার ভুক্ত হওয়ায় মারাঠারা বিপুলভাবে লুণ্ঠন চালায় এবং ভয়াবহ ধ্বংসকার্যে মেতে ওঠে। গঙ্গারাম 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' মারাঠাদের এই অত্যাচারের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে-

"মাঘে ঘেরিয়া বর্গী তবে দেয় সাড়া। / সোনা রুপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া ॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান। / একি চোটে কারু বধ এ পরাণ ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া যাএ। / অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বেঁধে দেয় তার গলা এ ॥
একজনে ছাড়ে তারে অন্য জনা ধরে। / রমণের ডরে ত্রাহি শব্দ করে ॥"

বর্ধমান মহারাজার সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মারাঠাদের বীভৎস অত্যাচার সম্পর্কে লিখেছেন যে, সাহু রাজের সৈন্যদল গর্ভবতী নারী, শিশু, ব্রাহ্মণ, দরিদ্র সকলকেই নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ছাড়াও যে কোনরকম পাপকার্য সম্পাদনা করেছে। বাংলায় মারাঠাদের এই অত্যাচার বর্গির হাঙ্গামা নামে প্রসিদ্ধ।[১০]

প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম হতে বর্ধমানের ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময়ে পাঞ্জাব হতে আগত একজন ব্যবসায়ী পরিবার মোঘল শাসনকর্তার সঙ্গে বিশেষ সুসম্পর্ক স্থাপন করে কালক্রমে এক বিশাল জমিদারির মালিক হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই পরিবারের উত্তরপুরুষগণ চাকলা বর্ধমানের জমিদারসহ বর্ধমানের মহারাজা নামে খ্যাতিলাভ করেন।[১১] মোঘল আমলে বর্ধমান চাকলা মোঘল শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমগ্র বঙ্গদেশের সঙ্গে। তথাপি মোঘল আমলে বর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী ছিল। প্রকৃতপক্ষে বর্ধমানের স্বতন্ত্র ইতিহাস বর্ধমানের জমিদার বা রাজবংশের ইতিহাস।[১২]

মোঘল যুগের শেষদিকের এবং ব্রিটিশ যুগের বর্ধমানের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে রয়েছে বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস। বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গম রায় পুরীতে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব থেকে বর্ধমানে উপস্থিত হয়েছিলেন। বর্ধমানে ব্যবসায়ের অনুকূল পরিবেশ লক্ষ করে তিনি বর্ধমান শহরের পূর্বদিকে বৈকুণ্ঠপুরে বসবাস আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে সঙ্গম রায় বর্ধমানে এসেছিলেন। সঙ্গম রায়ের পৌত্র আবু রায়ের সময় হতেই বর্ধমান রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। ১৬৫৭ খ্রিঃ তিনি সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে বর্ধমানের ফৌজদারের অধীনে রেকাবী বাজার ও মোঘল টুলীর কোতোয়াল এবং চৌধুরী পদলাভ করেন। এরপর তাঁর বংশধরগণ মোঘল সম্রাটের সনদের বলে অনেকগুলি জমিদারি লাভ করেন। কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র জগৎরাম রায় পিতার সমস্ত এবং আরও কয়েকটি জমিদারি লাভ করেন। জগৎরামের পুত্র কীর্তিচাঁদ মেদিনীপুরের চিতুয়া ও চন্দ্রকোণার জমিদারদের এবং বিষ্ণুপুরের রাজাকে পরাজিত করে জমিদারির সীমা আরও বাড়িয়ে নেন এবং প্রয়োজনীয় বাদশাহি সনদ লাভ করেন।[১৩]

১৭৪০খ্রিঃ কীর্তিচাঁদের পরলোক গমন করার পর তাঁর উত্তরাধিকারী হন পুত্র চিত্রসেন। তিনি মণ্ডলঘাট, আরসা ও চন্দ্রকোণা পরগনা নিজ অধিকার আনয়ন করেন বীরভূম, পঞ্চকোট ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে তাঁদের জমিদারির অংশ বিশেষ তিনি স্বীয় জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করেন। চিত্রসেন নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর (১৭৪৪খ্রিঃ) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তিলকচাঁদ রায় রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৩খ্রিঃ দিল্লির বাদশাহ মহম্মদ শাহের কাছ থেকে তিনি চতুর্থ সনদ লাভ করেন। তিলকচাঁদের পরবর্তী রাজারাও মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্, আহম্মদ শাহ্ এবং দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছ থেকে ফর্মানের পর ফর্মান এনে নিজেদের শক্তি ও পদমর্যাদা দৃঢ়তম করেছেন। তিলকচাঁদের আমলেই ১৭৫৭খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌল্লার পতনের পর মীরজাফর বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। এই সময় বর্ধমান, কোম্পানির *(East India Company)* হাতে অর্পিত হয়। তখন বর্ধমানের আয়তন ছিল ৫১৭৪

বর্গমাইল (১৩৪০০.৬ বর্গকিমি) যা বর্তমান বর্ধমান জেলার প্রায় দ্বিগুণ।[১৪] ১৭৭০ খ্রিঃ তিলকচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র তেঁজচাদ নাবালক থাকায় মাতা বিষ্ণুকুমারীর অভিভাবকত্বে জমিদারি পরিচালিত হতে থাকে। রাজকোষ তখন প্রায় শূণ্য। ৭৫টি পরগনায় বিস্তৃত ৭৩ মাইল (১১৭.৪৭ কিমি) দীর্ঘ ও ৪৫ মাইল (৭২.৪১ কিমি) প্রস্থ বর্ধমানের জমিদারির মোট আয়তন তখন প্রায় ৩২৮০ বর্গমাইল (৮৪৯৫.২১ বর্গকিমি)। বার্ষিক রাজস্ব ৪০ থেকে ৪৩ লক্ষ টাকা। ১৬৬৯-৭০ খ্রিঃ বন্যা আর্থিক পরিস্থিতিকে আরও বিপর্যস্ত করে তোলে। ১৭৭৯ থেকে তেঁজচাদ স্বহস্তে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর অবস্থার আরও অধঃপতন ঘটে। একের পর এক স্ত্রী গ্রহণ ও বয়স্য সমভিব্যহারে নির্বিচার বিলাস-ব্যাসনে ডুবে থাকা তেঁজচাদের হঠকারিতা, অপরিনামদর্শিতা, ধৃষ্ট আচরণ ও অমিতব্যয়িতার ফলে ১০বছরের মধ্যেই বাকি খাজনার দায়ে বার্ষিক ৪,৪২,৯১৭টাকা রাজস্বের জমিদারি হাতছাড়া হয়ে যায়, যার মধ্যে কীর্তিচাঁদ অর্জিত চিতুয়া-বরদার জমিদারিও ছিল। তিনি ও তাঁর প্রায় সমস্ত জমিদারিই ৫-১০ বছরের মেয়াদে বহুতর ব্যক্তিকে ইজারা বিলি করে দিয়েছিলেন। ইজারাদারদের নিয়মিত রাজস্ব আদায় না দেওয়া এবং তাদের সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারীদের যোগসাজস মহারাজের রাজস্ব বাকি পড়ার অন্যতম কারণ ছিল। ১৭৯০সাল পর্যন্ত বর্ধমানরাজের যাবতীয় দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা রাজসরকারের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতেই নিষ্পন্ন হত। কিন্তু উপর্যুপরি রাজস্ব বাকি রাখার অপরাধে কোম্পানি তেঁজচাদের হাত থেকে সমস্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি ক্ষমতা কেড়ে নেয়।[১৫]

১৭৯৩খ্রিঃ ভারতে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ চালু হওয়ার ফলে জমিদারের অধিকার যেমন চিরস্থায়ী হল, একইসঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে সরকারের রাজস্ব জমা দিতে না পারলে জমিদারি নিলামের ব্যবস্থাও রইল। তেঁজচাদের মতিগতিতে কোনো পরিবর্তন না দেখে তাঁর হাতে শান্তিরক্ষার নূন্যতম যে ক্ষমতাটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও কোম্পানি দারোগা নিয়োগের মাধ্যমে নিজের হাতে তুলে নেয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য কয়েকটি পরগনা করে দেয়। ১৭৯৭খ্রিঃ আবার বর্ধমানের অনেকগুলি বড় বড় জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। ১৭৯৮ খ্রিঃর ৯ই সেপ্টেম্বর বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যু হলে তেঁজচাদ রাজ্যভার ফিরে পান। ইজারাদারি ও রাজস্ব আদায়ের জন্য অসৎ রাজকর্মচারীদের উপর নির্ভরশীলতার বিপদ বুঝতে পেরে তিনি পরের বছরেই সমস্ত জমি চিরস্থায়ীরূপে নির্দিষ্ট খাজনায় পত্তনি বন্দোবস্ত করে দিলেন। এরফলে বর্ধমানরাজের ধনাভাব দূর হল। অদূরদর্শিতার অজস্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও এটি অবশ্যই তাঁর একটি দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হতে পারে। ১৮০৬খ্রিঃ তিনি বিষ্ণুপুরের জমিদারিটি কিনে নেন।[১৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের অধিকার নামে চিরস্থায়ী হয়েছিল বটে, কিন্তু রাজস্ব জমা দেওয়ার কঠোর নিয়মের ফলে কার্যত তা ক্ষণস্থায়ী হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। বাকি রাজস্বের দায়ে প্রচুর জমিদারি নিলাম হয়ে যেতে লাগল। পত্তনিদারদের সময়মতো মালগুজারি দানে বাধ্য করার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। প্রতাপচাঁদের সক্রিয় উদ্যোগে ১৮১৯খ্রিঃ এই বিষয়ে কোম্পানি তার অষ্টম রেগুলেশন *(Regulation)* জারি করে। পত্তনিদারদের কাছ থেকে মালগুজারি অনাদায়ে ছয়মাস পর্যন্ত সুদ জরিমানা ও তারপরে পত্তনিমহল নিলাম করার ব্যবস্থা চালু হল। এইভাবে আয়ের সুনিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কঠিন নিয়মের মধ্যেও বর্ধমানের জমিদারি অটুট থাকে।[১৭]

তেঁজচাদের পুত্র প্রতাপচাঁদ এসেই সঙ্গম রায় এর বংশধারার ইতি হয়। এরপরে শুরু হল দত্তক পুত্রদের রাজত্ব। ‘রায়’ ছেড়ে রাজপদবী হয় ‘মহতাব’, পাগড়ি বা তাজ ছেড়ে শিরোভূষণ হয় ‘টুপি’। দত্তক সূত্রে বর্ধমানের কাপুর ও নন্দে এই দুটি পরিবার রাজপরিবারের প্রায় অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

রাজা তেঁজচাদের দত্তকপুত্র মহতাবচাঁদ স্বহস্তে জমিদারি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন ১৮৪৪খ্রিঃ। তিনি তাঁর দক্ষতা বলে বাংলার মেদিনীপুর ও দার্জিলিং জেলায় এবং ওড়িশা প্রদেশেও তাঁর জমিদারিকে প্রসারিত করেন। ১৮৫৭ খ্রিঃর ২৯শে ডিসেম্বর তাঁর আমলেই বাংলার ৪২টি শহরের অন্যতম হিসেবে বর্ধমান সরকারি স্বীকৃতি *(Act. XX ; Town Police Act, 1856)* লাভ করে। শহরের পরিসীমা ৮ বর্গমাইল (২০.৭২ বর্গকিমি)। ১টি ইউনিয়ন কমিটির অধীনে ৩৫টি মহল্লা নিয়ে এই শহর গঠিত হয়। শহর হিসেবে বর্ধমানের এই স্বীকৃতি, রাজকীয় উদ্যোগে এই রাজপুরীর যে ক্রমিক উন্নতি ঘটেছে তারই স্বীকৃতি।[১৮]

বস্তুতপক্ষে, বর্ধমান শহরের উদ্ভব, অবস্থান, চরিত্র, বৈশিষ্ট এবং বিকাশের সঙ্গে বর্ধমানের রাজপরম্পরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুবিশাল গ্রামীণ পশ্চাৎভূমির কেন্দ্রে বর্ধমান শহরের ভৌগোলিক অবস্থিতি এবং তার চাতুস্পার্শিক পরিমণ্ডল ব্যবসা- বাণিজ্যের অনুকূল হওয়ায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মূলত ব্যবসা- বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই বর্ধমানের নগরায়ণ ঘটেছে। বণিক ঐতিহ্যই রাজশহর বর্ধমানকে বাণিজ্যকেন্দ্রিক নগরায়ণের পথে বিশেষভাবে পরিচালিত করেছিল। রাজবাড়ি থেকে ১টি রাস্তা এসে জি.টি. রোডে যুক্ত হওয়ায় তা শহরের মূল ধমনীতে পরিণত হয়েছিল। সড়ক ও রেল যোগাযোগের এই মেলবন্ধন একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বর্ধমানকে নূতনতর সমৃদ্ধি এনে দেয়। বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এই নগরায়ণ প্রক্রিয়ার উপর সদর্থক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের অভিঘাত সৃষ্টি করে। অতীতের বর্ধমান দুর্গকে কেন্দ্র করে স্বভাবতই যে ব্যবসা- বাণিজ্য ও সম্ভ্রান্ত জনবসতি গড়ে উঠেছিল, তা ত্রিলোকচাঁদের আমলে পরিত্যক্ত দুর্গ এলাকায় রাজকীয়ভাবে বসবাসের শুরু হয় ও অবশেষে ১৮৫১খ্রিঃ বর্তমান রাজবাড়ি নির্মাণের পর আরও সমৃদ্ধি লাভ করে। ইংরেজ আমলে জেলা সদর হিসেবে প্রশাসনিক গুরুত্ব বর্ধমানের নগরায়ণকে একটা নতুন মাত্রা এনে দেয়। ইংরেজ জনবসতি ও ইংরেজ মৈত্রীর বাতাবরণও নগরায়ণ ও নাগরিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।[১৯]

১৮৬৪ খ্রিঃ, ১৫ই এপ্রিল থেকে কার্যকর হয় *Act. III (The District Municipal Improvement Act)*, এই আইনে ২৬টি শহরকে চিহ্নিত করা হয় যেখানে ডিভিশনাল কমিশনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও পি. ডব্লিউ. ডি. *(Public Works Department)* এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং শহরের অন্যূন ৭ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে একটি করে পৌরসংস্থা গঠিত হয়। এই আইন অনুসারে জেলা শহর বর্ধমানে A.B.C.D. এই চারটি ওয়ার্ড নিয়ে জেলার প্রথম পুরসভা গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় ১৮৬৫খ্রিঃর ৩রা এপ্রিল। ১৮৬৫খ্রিঃ, ১লা মে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুরসভা গঠিত হয়। তবে পুরসভা গঠনের পরেও বর্ধমানের অনেক নির্মাণ কৃতি ও নাগরিক সংস্থানই রাজনামের সাক্ষ্য বহন করছে।[২০]

১৮৭৯ খ্রিঃ মহাতাবচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র আফতাবচাঁদ বয়ঃপ্রাপ্তির অপেক্ষায় দু- বছর দেওয়ান বনবিহারী কাপুরের অভিভাবকত্বে থাকার পর ১৮৮১ খ্রিঃ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি অনেকগুলি জনহিতকর কার্য করেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিঃ অপুত্রক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী বিনোদেয়ী দেবী মাত্র ছয় বছর বয়সের বিজন বিহারীকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। রাজপদে তাঁরই অভিষেক ঘটে বিজয়চাঁদ মহতাব নামে, কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর তত্ত্বাবধানে। সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর ১৯০২ খ্রিঃ বিজয়চাঁদ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তার পরে পরেই বঙ্গভঙ্গ নিয়ে সারা বাংলা তোলপাড় হয়ে ওঠে। তাঁর রাজত্বকালেই ঘটে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বঙ্গভঙ্গের ঢেউ বর্ধমানেও লাগে। কিন্তু বর্ধমান রাজের ইংরেজ ভক্তির প্রদর্শনী চলতে থাকে।[২১] প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগ নিয়ে কার্জন- বিরোধী মনোভাব যখন তুঙ্গে, তখন তারই মধ্যে ১৯০৪খ্রিঃর জানুয়ারি মাসে বিজয়চাঁদ জননিন্দিত সেই 'লর্ড কার্জন' কেই বর্ধমানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এবং তার প্রতি সম্মান ও আনুগত্যের স্মারক হিসেবে তৈরি করিয়েছেন কার্জন গেট (অধুনা বিজয় তোরন) নামে পরিচিত 'স্টার অব ইন্ডিয়া' গেটটি। লর্ড কার্জনের একটি মূর্তিও তিনি স্থাপন করেন। বস্তুতপক্ষে, বর্ধমানের ইতিহাসের দু- একটি সংক্ষিপ্ত পর্যায় ছাড়া বর্ধমানরাজের ব্রিটিশ ভক্তিতে ছেদ পড়েনি।[২২]

বর্ধমানরাজ ও বর্ধমান শহরবাসীর মধ্যে সুসম্পর্কের কারণে, বর্ধমান শহর- ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর তার যে একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এতৎসত্ত্বেও বর্ধমান রাজের দুর্মর ইংরেজ অনুরাগের ধারাবাহিক প্রদর্শনীর পাশাপাশি বর্ধমানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারাটিও কমবেশি বহমান ছিল। বঙ্গভঙ্গের বিশেষ কোনো অভিঘাত অবশ্য বর্ধমান শহরের উপর পড়েনি। কিন্তু কালনা- মেমারী- কাটোয়া সহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ব্যাপকভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। বর্ধমান রাজ ও বর্ধমানের দ্বিমুখী রাজনৈতিক অবস্থান সত্ত্বেও কিন্তু বর্ধমানের মহারাজা প্রজাদের অনুরাগ থেকে বঞ্চিত হননি। তার অন্যতম কারণ বোধ হয় এই যে, প্রজানুরঞ্জক রাজার একটি ভূমিকাও একই সঙ্গে তাঁরা বজায় রেখে যেতে পেরেছেন, অন্তত শহরের ক্ষেত্রে বর্ধমানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, যার মধ্যে রাজ ঐতিহ্যও অবশ্যই আছে। সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতার মতো সংকীর্ণতাকে কখনোই প্রশ্রয় দেননি। হিন্দু- মুসলমান বিভাজনের যে গূঢ়

ব্রিটিশ অভিসন্ধিটি *(Divide and Rule)* বঙ্গভঙ্গের অন্তর্নিহিত ছিল, তা কিন্তু বর্ধমানে একেবারেই কার্যকর হয়নি। হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী কিছু শক্তি বর্ধমানে ছিল না তা নয়, কিন্তু তাঁরা জনসমর্থন পায়নি। এক্ষেত্রে বর্ধমানের কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও একটি বিরাট ভূমিকা ছিল।[২৩]

বিজয়চাঁদের সময়কাল(১৯০২ খ্রিঃ) বর্ধমানের নগরায়ণের; বিশেষকরে নাগরিক সংস্কৃতি বিকাশেরও একটি উল্লেখযোগ্য কাল- পর্যায়। তাঁর শিক্ষা,সাহিত্য,সংগীত, ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত সাহিত্যানুশীলন বর্ধমানের নাগরিক সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। ১৯৪২খ্রিঃর ২৯শে আগস্ট ৬০ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রথম বঙ্গভঙ্গ ও তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল পরিস্থিতি পেরিয়ে বিশ শতকের পুরসভাও এগোতে থাকে নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে।[২৪]

বিজয়চাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়চাঁদ পিতার মৃত্যুর পর বর্ধমানের জমিদারি প্রাপ্ত হন। তেজচন্দ্রের পরবর্তী জমিদারগণের মধ্যে ইনি উত্তরাধিকারসূত্রে পৈত্রিক জমিদারির মালিক হয়েছিলেন কিন্তু উদয়চাঁদই এই বংশের তথা শেষ জমিদার। ১৯৩৮খ্রিঃ ভূমিরাজস্ব কমিশন সুপারিশ করে যে, জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করা উচিত। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ সুপারিশ কার্যকরী করা হয়নি। অবশেষে 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন,১৯৫৩', আইন দ্বারা বর্ধমান সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর বর্ধমানের বিপুল সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দান করে উদয়চাঁদ তাঁর পিতার নির্মিত কলকাতার 'বিজয় মঞ্জিল' এ বসবাস করতেন। উদয়চাঁদের তিনপুত্র ও তিনকন্যা বর্তমান এবং তার উইল অনুসারে কনিষ্ঠ পুত্র ডঃ প্রণয়চাঁদ মহতাব দেবসেবা ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে কলকাতাস্থ 'বিজয় মঞ্জিল' এ বসবাস করছেন। বঙ্গের অন্যান্য জমিদার বংশের ন্যায় আবুরায়ের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরাম ও কীর্তিচাঁদের দ্বারা পালিত জমিদারির বিলোপ সাধন হলেও এখনও বর্ধমানবাসীর মনে ঐ অবাঙালি জমিদারবংশের প্রতি একটি শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুকম্পার ছাপ আছে।[২৫]

অবশেষে এটাই বলা যায় যে, বর্ধমানের ইতিহাস একটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র ইতিহাস নয়, গোটা বাংলার ইতিহাসের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিপূরক মাত্র। আজ স্বাধীন ভারতে বর্ধমানের সর্বাঙ্গীন প্রগতি অচিরেই লক্ষ করা যায়। বর্ধমানের শষ্য শ্যামলা পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবাংলার অগণিত মুখে অন্ন তুলে দেয়। পশ্চিমাঞ্চল খনিজ সম্পদে অপরিমেয় সম্ভাবনাময় অঞ্চল। এই অঞ্চলকে ও বিহারের পূর্বাঞ্চলকে শিল্প নগরীর সুদূর প্রসারী লৌহবলয় বেঁধে রেখেছে। আসানসোল, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর প্রভৃতি অঞ্চল পূর্ব ভূখন্ডের রূঢ় *(Rurh)* নাম ধারণ করেছে। তাছাড়া এ শহরে বিশ্ববিদ্যালয়, বহুকাল অবহেলিত রাঢ় অঞ্চলের তরুণ- তরুণীদের কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সফল করতে চাই তার সুদীর্ঘ ইতিহাসের সু- সন্ধান- জ্ঞান। অতীতকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বর্তমান, বর্তমান অজ্ঞাতসারে নির্মাণ করে চলে ভবিষ্যতের বুনিয়াদ।[২৬]

॥ তথ্যঋণ ॥

১. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.. ৮৫, ১৫৫।

২. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; প্রকাশ ভবন; চৈত্র ১৪১৬,পৃ. ৮৬।

৩. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮,পৃ. ১৫।

৪. Niyogi (Miss) Pushpa, ***Buddhism in Ancient Bengal;*** Calcutta; 1960, Pg. 39.

৫. দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২, পৃ.. ৪৭-৫০, ৫২-৫৪।

৬. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ১১৪, ১১৫।

৭. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; প্রকাশ ভবন; চৈত্র ১৪১৬, পৃ.. ১০৩, ১০৭, ১০৮।

৮. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৭৯।

৯. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; প্রকাশ ভবন; চৈত্র ১৪১৬, পৃ.. ১০৪, ১০৫।

১০. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮, পৃ.. ৬৪-৬৬।

১১. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৯৮।

১২. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮,পৃ. ৫০।
১৩. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.. ৭৯, ৮০।
১৪. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮, পৃ.. ৫৪, ৫৫, ৫৭।
১৫. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ১১৯, ১২০।
১৬. তদেব, পৃ. ১২১।
১৭. তদেব, পৃ. ১২১।
১৮. তদেব, পৃ.. ১২৭-১২৯।
১৯. তদেব, পৃ.. ১২৯, ১৩০।
২০. তদেব, পৃ. ১৩০।
২১. তদেব, পৃ.. ১২৯, ১৩৬, ১৩৮।
২২. তদেব, পৃ.. ১৩১, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯।
২৩. তদেব, পৃ. ১৩৯।
২৪. তদেব, পৃ.. ১৩৯, ১৪০।
২৫. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১৮৩।
২৬. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ১৬৪।

****

তৃতীয় অধ্যায়

॥ বর্ধমান জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ ॥

খ্রিস্টপূর্ব হাজার বছর আগে আর্যক্ষত্রিয়গণ জীবিকার ও আর্য সভ্যতার বিকাশের ইচ্ছায় গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল ধরে বর্ধমানে প্রবেশ করেন ও সেখান থেকে দামোদর- অজয়, ভাগীরথী উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েন। এই সময় বর্ধমানের আদিবাসী বোড়ো, ডোম, শবর, কিরাত, নিষাদ প্রভৃতি অনার্যগণের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আদিবাসীরা আর্যগণের উন্নত সভ্যতা, জীবন- যাপন প্রণালী ও সহিষ্ণুতা দেখে আশ্বস্ত হয়। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে আর্য ও অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান- প্রদানে গড়ে ওঠে নতুন সমাজ ব্যবস্থা। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ঘটে যায় ধর্ম বিপ্লব। কিন্তু আর্যগণের সহিষ্ণুতার ফলে অনার্য ধর্মের বহু আচার- আচরণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অক্ষত ও অপরিবর্তিত থেকে যায়।[১]

অধ্যাপক হেনরী ব্লকম্যান, জারেট ও বেভারীজ কর্তৃক আইন- ই- আকবরী ও আকবরনামা ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হলে মোঘল আমলে বর্ধমান (সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ, মান্দারন ও সাতগাঁও) সুবা বাংলার রাজস্ব ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাবলী জানা যায়। *Dr. P. J. Marshall* তাঁর *'East Indian Fortune'* এ অষ্টাদশ শতকের বর্ধমান সম্পর্কিত কিছু তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন। প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ হরশঙ্কর ভট্টাচার্যের *'Zamindars and Patnidars'* নামক গবেষণামূলক গ্রন্থটির দ্বিতীয় খন্ডে, বর্ধমানের জনজীবনের ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরেছেন। অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা হল প্রথম ও প্রধান উপাদান। অতীতের কথা বাদ দিলেও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হতে প্রায় ছ'দশক ধরে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শুধু বর্ধমান নয়, সমগ্র বঙ্গদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা যে ব্যাহত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। অর্থনৈতিক উন্নতির সোপানগুলি সুদৃঢ় হলে তবেই সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিকাশের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির অবদান ন্যূন নয়। আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে না উঠলে সংস্কৃতির কোন ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যাবেনা।[২]

অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী গোষ্ঠীই যে বৃহত্তর রাঢ়ের আদি বাসিন্দা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের নিজস্ব আচার- আচরণ ও বিধি অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং কর্মকুশলতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবিকার উপায় ও বাসস্থান নির্মাণ করে গ্রাম পত্তন করেছিল। বর্ধমান জেলার প্রত্ন- ইতিহাসের সাক্ষ্য হতে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে বীরভানপুরে ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ ব্যবহারকারী শিকারজীবী এক মানবগোষ্ঠীর সন্ধান মেলে। সম্ভবতঃ তারাই হল রাঢ়ের আদি গোষ্ঠীবদ্ধ বাসিন্দা। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রাঢ়ের মূল অর্থাৎ আদি মানবগোষ্ঠীর সকলেই ছিল বহিরাগত। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মিলন- মিশ্রণে বাঙালি জাতির সৃষ্টি এবং সেকারণে আচার- ব্যবহার, ধর্মীয় ধ্যানধারণা বা চেতনা ও সামাজিক জীবন মিলন মিশ্রণের বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে। কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে সংমিশ্রণ এত বেশি হয়েছিল এবং তার উপর ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রলেপ এত অধিক পরিমাণে পড়েছিল যে, এই সকল বর্ণের মধ্যে নিজস্ব উপজাতীয় গোষ্ঠীচেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যাদের নিম্নশ্রেণি বা তপসিলভুক্ত জাতি ও আদিবাসী বলা হয় তারা ধর্মীয় ও সামাজিক আচার- আচরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব উপ- জাতীয় গোষ্ঠীচেতনা বজায় রেখে চলেছে। সমাজ বিন্যাসের ক্ষেত্রেও নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরা শাসকশ্রেণির সহযোগী ছিল। বহিরাগত সেন রাজশক্তির বাংলায় আবির্ভাবের পর বর্ণ বা শ্রেণিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণি গঠনের ফলে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে স্মৃতি শাসিত উচ্চ-নীচ বর্ণের ভেদাভেদ গড়ে ওঠে।[৩]

রাঢ় ও রাঢ়ের মানুষ সম্পর্কে সর্ব প্রাচীন যে সাহিত্যিক তথ্যগুলি জানা যায়, তা জৈনদের প্রথম গ্রন্থ 'আচারঙ্গ সূত্র' থেকে। এই গ্রন্থটির উপধানশ্রুত নামক নবম অধ্যায়ে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের কঠিন তপস্যার বিবরণে রাঢ়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

জৈনধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মও বর্ধমানের সামাজিক বিপ্লব ও বিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের পর কয়েক শতাব্দী ধরে এবং তা বিশ্বধর্মে পরিণত হয় সম্রাট অশোকের আমলে। বুদ্ধাবির্ভাবের কতদিন পর রাঢ়ে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বলা যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন হাজার বছরের ঊর্ধ্বে এর বয়ঃক্রম। জনসাধারণ কিন্তু খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিজধর্ম ত্যাগ করে অনায়াসে এই

জৈনধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেননি। পুষ্পা নিয়োগী তাঁর ***"Buddhism in Ancient Bengal"*** গ্রন্থে লিখেছেন- ***"H.P Sastri gives an account of the survival of Buddhism in Bengal and its neighbourhood even after the muslim conquest."*** [৪]

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর অনুশাসন, ব্রাহ্মণদের প্রতাপ ও আধিপত্য, সর্বনাশা জাতিভেদ প্রথায় মানুষ ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং বৌদ্ধধর্মের উদারতার দিকে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছিল। খ্রিস্টীয় দশম শতকের দিক থেকে রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা এতদঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। এই ধর্মপূজা আদিবাসী অধ্যুষিত এইসব অঞ্চলে সম্ভবতঃ বৌদ্ধত্বের অবশেষ রূপে বিদ্যমান। বর্ধমানে কি প্রকার বৌদ্ধপ্রসার ঘটেছিল তার প্রমাণ 'শূণ্যপুরাণ' নামক সুপ্রাচীন বৌদ্ধকাব্য। এর অন্যনাম 'ধর্মপূজা বিধান'। এই গ্রন্থের লেখক রামাই পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল বর্ধমানের বল্লুকা নদীর তীরে। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর বৌদ্ধধর্মাচরণ নানা শাখায় ও বিভিন্ন প্রকরণে বিভক্ত হয়েছিল, ধর্মপূজা তারই একটি শাখা। বৌদ্ধধর্ম প্রবাহের অন্যতম লক্ষণ হল- বৌদ্ধবিহার, স্তূপ, দেউল ইত্যাদি। ভরতপুরের স্তূপটিই বাংলায় প্রথম আবিস্কৃত প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ। বর্ধমান জেলায় বেশ কয়েকটি দেউল বৌদ্ধধর্মানুরক্তির স্মৃতি চিহ্ন হয়ে রয়েছে। আজও বর্ধমানের যত্রতত্র বৌদ্ধ দেবদেবী জনসাধারণের মধ্যে পূজিত হচ্ছেন। বহু ধর্মাচার বৌদ্ধধর্মাচারের রূপান্তর। কাঁকড়াবিছা, দিদিঠাকরুণ, ওলাইচণ্ডী, ধর্মরাজ, নেকড়াইচণ্ডী, শীতলাষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবী বৌদ্ধধর্মাচারেরই স্মৃতিচিহ্ন। বৈদিক পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম মিলনের ফলেই এঁদের উদ্ভব। বর্ধমানে বহু স্তূপ আছে যেগুলি পীরতলা বা পীরের দরগা বলে অভিহিত করা হয়, যেগুলি মূলতঃ বৌদ্ধস্তূপ। যেমন- উচালনের শাহ্‌মীর পীর, একলক্ষী গ্রামের শাহ্- চাঁদ পীর, পলেমপুরের পীর পালাম প্রভৃতি।

মধ্যযুগীয় বর্বরতা বঙ্গের সমাজ জীবনে উপহার দিয়েছিল ব্যভিচার, কলুষতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অত্যাচার, নিপীড়ন। দুর্বলের প্রতি সবলের পাশবিক অত্যাচার, নারীত্বের অবমাননা ও সতীত্বের লাঞ্ছনা, ভোগ ও লালসা সর্বস্ব প্রবৃত্তি ও তামসিক ক্রিয়াকান্ড- মধ্যযুগের মানুষের স্বাভাবিক জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। চৈতন্যর (মহাপ্রভু) আবির্ভাবে বাংলার নারকীয় জীবনের প্রতীক জগাই- মাধাই এর মানবত্ব লাভ এবং কাপুরুষ ও অধঃপতিত জাতির আত্মমুক্তি ঘটেছিল।[৫]

অর্থাৎ বলা যায়, বর্ধমানকে বিভিন্ন সময়ে প্রধানত- জৈন, বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবমতালম্বীগণ তাঁদের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করেছিলেন এবং এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজও নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে ভবিষ্যতের পথে।

জনগোষ্ঠী -

সমাজ ও সভ্যতা মানুষের সৃষ্টি। তাই সমাজ ও সভ্যতার বুনিয়াদ এবং অগ্রগতিকে উপলব্ধি করতে হলে তার পশ্চাৎবর্তী পটভূমিকাকেও জানতে হবে- এই হল ইতিহাসের শিক্ষা। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের উন্নতি বা অবনতি ঘটে সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে। কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সমাজ গঠিত হয় না বা একদল ছন্নছাড়া জন- সমষ্টিকেও সমাজ বলা যায় না। সমাজ হল মানুষের সংহত জীবনযাত্রার একটা গতিশীল স্তর এবং এই স্তরগুলি ঐতিহ্য পরম্পরায় জনগোষ্ঠীর আয়ত্তাধীন থাকে।[৬]

বর্ধমানের বহমান মানবধারায় প্রাচীনতম সদস্য এবং সেই সুদূর ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে আজও যাঁরা প্রধানতম জাতি হিসাবে এই অঞ্চলে টিকে আছে, তাঁরা হল বাগদী সম্প্রদায়। পেশাগতভাবে আজ তাঁদের পরিচিতি দারিদ্র- সীমারেখার নীচের বাসিন্দা, ক্ষেত- মজুর, রাখাল, বর্গাদার ও কদাচিৎ প্রান্তিক চাষী। সেই সঙ্গে সুদূর অতীত থেকে আজও 'মৎসশিকার' তাঁদের উপজীবিকা। বর্ধমান জেলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাগদীজাতির পরেই সদগোপদের স্থান। পশ্চিমবাংলার জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে জাতি হিসাবে সদগোপদের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও পৃথকভাবে বর্ধমান জেলার জনবিন্যাসে সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে শত- শত বছরের ঐতিহ্যবাহিত তাঁদের বিরাট ভূমিকা। বর্ধমান জেলার জাতিগত বিন্যাসেও তাঁদের গুরুত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭] এছাড়া, বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠী হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে গঠিত। বৌদ্ধ- ধর্মাবলম্বীদের প্রত্যক্ষভাবে কোন সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও তান্ত্রিকদের মধ্যে তারা হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। সামগ্রিকভাবে বর্ধমানের জনগোষ্ঠী হল বাঙালির নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ বর্ধমানের মানুষ হল মিশ্র জনগোষ্ঠীর।[৮] অতীতে বর্ধমানে যে বিভিন্ন জাতির বসবাস ছিল তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দ্বিতীয় খন্ডে বর্ণিত 'গড়বর্ণন' অংশটিতে। কবি এই অংশে বর্ধমান নগরের ছয়টি গড়ের বর্ণনা দিয়েছেন। এই গড়গুলিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের বাস রয়েছে। যেমন- কোলাপোষ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, মোগল, পাঠান, তুর্কি, আরবি, ফারসি, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, রাহুত, বোঁদেলার প্রভৃতি। এরপর কবি 'পুরবর্ণন' অংশটি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে

তৎকালীন বর্ধমানের সামাজিক চিত্রটিও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি এখানে হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ৩৬প্রকার জাতের মানুষের নাম উল্লেখ করেছেন।

"ব্রাহ্মণমন্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন। / ব্যাকরণ অলংকার স্মৃতি দরশন।।
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘন্টারব। / শিবপূজা চন্ডীপাঠ যত মহোৎসব।।
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ। / চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ।।
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি। / বেনে মনি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি।।
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার। / নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার।।
আগরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক। / যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক।।
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জলে গুঁড়ী। / চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুড়ী।।
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র। / কোল কল ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর।।
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক। / ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক।।"[৯]

এইসব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস ছিল বর্ধমান শহরে। মধ্যযুগীয় নগরের মতো এক একটি অঞ্চলের মধ্যে তাঁদের প্রাধান্য গন্ডিবদ্ধ ছিল।

বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি আলোচনা ও সামাজিক তথা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বর্ণ বা উপগোষ্ঠীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এই জেলায় প্রধান প্রধান উচ্চবর্ণভুক্ত গোষ্ঠীগুলি হল- ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয়, সদগোপ, বৈদ্য প্রভৃতি; আবার বৃত্তিধারী বা কৌলিকবৃত্তি অবলম্বনকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ভাস্কর, কামার, কুমোর, সুত্রধর, কলু, তাঁতী, গোয়ালা, মোদক, মালি, তাম্বুলি, স্বর্ণকার, কাংসকার, শঙ্খকার প্রভৃতি। তপসিলভুক্ত উপগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- বাগদী, বাউরী, ডোম, শুঁড়ী, মুচি, চামার, জেলেকৈবর্ত, ধোপা, নমশূদ্র, হাড়ী, ভুঁইয়া, কোটাল, লোহার, পাশী, দোশধ, খয়রা, মাল, নুনিয়া, কেউট ইত্যাদি এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল, কোড়া, মুন্ডা, ওঁরাও, ভূমিজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিধ্বস্ত সমাজ ব্যবস্থার পুণর্গঠনের জন্য একদিকে যেমন সঙ্কর বর্ণের সামাজিক স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল, অপরপক্ষে আদিশূর ও বল্লালসেনের নামে প্রচলিত কৌলিন্যপ্রথার কাহিনি গড়ে উঠল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনে সঙ্করবর্ণকে শ্রেণি বিভাগ করে স্ব- স্ব বিভাগের কার্য নির্দিষ্ট করা হল। তিনটি উপবিভাগে মোট ৩৬টি উপজাতিতে সঙ্করবর্ণের বিভাগ নির্দিষ্ট করা হল। উপবিভাগের ফলে বংশ পরম্পরায় কৌলিকবৃত্তি ও কৌলিক আচার- অনুষ্ঠান, ধর্ম, বিবাহ ইত্যাদির প্রচলন নির্দিষ্ট করা হল।[১০]

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, পশ্চিমবাংলার জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও জনসংখ্যার বিন্যাস শীর্ষক পটভূমিতে বর্ধমান জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। আগামী দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এই জেলার জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের উপর হয়তো নতুনতর আলোকপাত করবে।

বাসস্থান বা বাসগৃহ -

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেদিন থেকে জনগোষ্ঠী যাযাবর ও পশুচারণ বৃত্তি ত্যাগ করে বসতি স্থাপন করল, সেদিন থেকেই বাসগৃহ নির্মাণের সূচনা। মধ্যযুগে নগর- সভ্যতার চরম বিকাশ না ঘটলেও আমীর- ওমরাহ এবং সামন্ত- জমিদারদের জীবন- যাপনের পদ্ধতি ছিল অতি জাঁকজমকপূর্ণ। তাদের বাসস্থান নির্মিত হতো অতি মূল্যবান ইঁট- পাথরে। হীরা- চুনী- পান্না, নীলা- কাঁসা, আকিক- প্রবাল খচিত ছিল অনেকের রাজপ্রাসাদ। তবে সাধারণ মানুষের ঘর তৈরি হত কাঠ, বাঁশ, কাদামাটি, তালপাতা আর খড়ের ছাউনিতে। বাসোপযোগী একটি বাঁশ- খড়ের ঘর তৈরি করতে সময় লাগত দু'দিন মাত্র। সেকালে টিন ছিল না। অনেক সময় মাটির দেওয়ালের ওপর খড়ের চালা দিয়ে দেওয়ালে চুনকাম করা হতো। কোন কোন ঘরের, খড়ের চালার নীচে কাঠের ছাদ দেওয়া হতো। গরীবদের ছিল কুঁড়েঘর, তাতে না থাকত ভালো ছাউনি, না থাকত ভালো বেড়া। রোদ- বৃষ্টি- ঝড়- তুফানের সময় তাঁদের আশ্রয়ের স্থান হতো প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণে, নীলাকাশের নীচে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গরীবদের এইরূপ ঘরের পরিচয়ও মেলে। মধ্যবিত্ত শৌখিন পরিবারের লোকেরা চৌচালা, আটচালা ঘর তৈরি করাতো। 'বাংলা ঘর' ছিল সর্বত্র। দোচালা ঘরকে বলা হতো 'বাংলা ঘর'। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় বাংলা ঘর বলতে চৌচালা ঘরই বোঝায়। এইসব ঘরের ছাউনি হতো উলুছনে, এবং বেড়া নির্মিত হতো শীতলপাটি, সুন্দিবেত, নলখাগড়া ও পাটকাঠি দিয়ে।[১১]

বর্তমানে বর্ধমান জেলার পল্লীগ্রামের অধিকাংশ ঘরই মাটির তৈরি। এখানকার বসবাসকারী পরিবারের অধিকাংশেরই ঘর এককক্ষ বিশিষ্ট বা দুইকক্ষ বিশিষ্ট। এগুলো সাধারণত দরিদ্র বা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের, যেমন- শ্রমিক, ভিক্ষুক, সাঁওতাল, ডোম, বাগদী প্রভৃতি। হতদরিদ্রদের বাড়িগুলি এককক্ষ বিশিষ্ট এবং মাটির তৈরি। কঞ্চি দিয়ে দেওয়ালের কাঠামো তৈরি করে, তার উপর কাদামাটির আস্তরণ দিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির চাল গুলি খড়কুটো বা তালপাতা দিয়ে ছাওয়ানো হয়। নদীর ধারে যাদের বাড়ি, তারা ছাউনির জন্য কেশে ঘাসও

ব্যবহার করে। নিম্নশ্রেণির ও দরিদ্রদের বাড়ি একচাল বিশিষ্ট বা দুইচাল বিশিষ্ট; অন্যান্য বাড়ি সবই চারচালের হয়। আবার যাদের বাড়ির সঙ্গে দেবালয় আছে, তাদের দেবালয়ের সামনে আটচালা করা হয়। শহরের অধিকাংশ বাড়িই ইঁটের দালানকোঠা একতলা, দুইতলা বা তিনতলা। আবার সেখানে বহুতল ইমারত গড়ে উঠেছে, যেখানে একটা বাড়ি বা ইমারতেই শতশত পরিবারের বাস। শহরের ধনী ও ব্যবসাদারদের বাড়ির অধিকাংশই মোজায়েক টালি বসানো, বাড়ির সামনে বারান্দা ও গ্যারেজ রয়েছে। জাতি অনুযায়ী এক- একটি পাড়া গড়ে উঠেছে, ঠিকানাও সেইমত লেখা হয়। যেমন- ব্রাহ্মণ পাড়া, কায়স্থ পাড়া, বাউড়ী পাড়া, বাগদী পাড়া, মুসলমান পাড়া ইত্যাদি। তবে বিশেষ করে মুসলমান ও নিম্ন শ্রেণির লোকেদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং শিক্ষা বিস্তারের ও শহরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতাও শিথিল হচ্ছে।

১৯৪৫খ্রিঃর ভারত সরকার দ্বারা নিয়োজিত ডঃ এস. আর দেশপান্ডে, কস্ট অব্ লিভিং ইন্ডেক্স'র ডায়রেক্টর, কয়লাখনি অঞ্চলের কুলীদের অবস্থা সম্পর্কিত এনকোয়ারি রিপোর্টে কুলী ধাওড়া'র যে বিবরণ দিয়েছিলেন, সেটা খুবই দুর্দশাগ্রস্ত। পিঠে পিঠ লাগানো ধাওড়া, মেঝে সাধারণত কাঁচা। কামরা প্রতি লোকসংখ্যা ৪ থেকে ১০ জন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা ইঁদারা বা পুকুর। স্যানিটারি নেই বললেই হয়। পরে অবশ্য আসানসোল মাইনস্ বোর্ড অব্ হেলথের নির্দেশিকা মতে এইরকম ধাওড়ার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।[১২]

পোশাক -

বর্ধমান জেলার অধিবাসীদের পোশাক সম্পর্কে নানা ছড়া ও প্রবাদ প্রচলিত আছে। যেমন- "কোঁচালম্বা ক্যাঁচা টান / তবে জানবে বর্ধমান।" অথবা মতান্তরে," কাছা লম্বা কোঁচায় টান / জানবে তবে বর্ধমান।"[১৩]

পোশাকের প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলা যায় যে, মধ্যযুগে মানুষের পোশাকের তেমন কোন বৈচিত্র্য ছিল না। তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন উচ্চবিত্তের মানুষের সঙ্গে সমাজের সাধারণ মানুষের দুস্তর ব্যবধান ছিল, তেমনি পোশাকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অধিকাংশ মানুষের পরিধেয় ছিল একখানি মাত্র বস্ত্র। এই বস্ত্র ছিল লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত মাত্র। পুরুষেরা নাভি থেকে জানু পর্যন্ত একখানি ধুতি এবং স্ত্রীলোকেরা নিজেকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একখানি শাড়িতে আবৃত করতো। উল্লেখ্য যে, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের মানুষের দৈনন্দিন পোশাকে তেমন পার্থক্য ছিল না, পার্থক্য ছিল দরবারি পোশাকে। সেকালের সাধারণ হিন্দু- মুসলমানের পোশাকে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- হিন্দুর পোশাক ছিল ধুতি বা উত্তরীয় আর মুসলমানদের তহবন, কুর্তা বা পাগড়ি। এছাড়া মুসলমানেরা মাথার চুল ছোট ও মুখে দাড়ি রাখতো। কেউ কেউ সর্বদা মাথায় টুপি পরতো। মোগল আমলে এদেশে রুমী ও শামী টুপির ব্যাপক প্রচলন ছিল। দরবারি পোশাক হিসেবে তৎকালে পরিধেয় ছিল কাবাই, শেরোয়ানি, জোব্বা, ইজার, চাপকান, পাজামা ও নিমা। এছাড়া পাগড়িও ছিল হিন্দু- মুসলমান উভয় সমাজের দরবারি পোশাক। সামন্ত জমিদার- সুবাদারদের পাগড়ি মনি- মুক্তা ও কারুকার্য খচিত হতো।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পুরুষের পোশাকে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মহিলাদের পোশাকে তা ছিল না। বাঙালি হিন্দু- মুসলমান উভয় সমাজের মহিলাদেরই প্রধান পরিধেয় ছিল শাড়ি। অনেক নারীই তখন বক্ষ- বন্ধনীর জন্য কাঁচুলী পরিধান করতো। এছাড়া বহিরাবরণ হিসেবে শাড়ির উপর বোরখা পরিধানের রীতি ছিল মুসলমান সমাজে। তবে সমাজের অধিকাংশ মেয়েদের জন্য একখণ্ড শাড়িই ছিল একমাত্র পরিধেয়। শীতের সময়ে মেয়েরা শাড়ির সঙ্গে আরেকখণ্ড কাপড় ব্যবহার করতো। মেয়েরা শাড়ি পরতো যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন নামের। বিশেষকরে সেকালে উল্লেখযোগ্য শাড়ি হিসেবে পরিচিত ছিল- গঙ্গাজলী, নীলাম্বরী, পীতরি, আসমানতারা, হীরামন, অগ্নিপাট, গুয়াশালী, পীতাম্বর, ঝিকমিকি প্রভৃতি। পুরুষদের শৌখিন বস্ত্র হিসেবে সামলি গামছা এবং রুমালের প্রচলন ছিল। শীতকালে পুরুষেরা চাদর, শাল, কম্বল ইত্যাদি পরিধান করতো।[১৪] রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে 'লাউসেনের জন্ম পালা'য় দেখা যায় রঞ্জাবতী বিবাহের পর কর্ণসেনের বাসরঘরে রেশমের দামি শাড়ি শুয়াঁঠুটি পরে প্রবেশ করেছিলেন।

" বাছিয়া বসন পরে নাম শুয়াঁঠুটি।
বাইশ গজ বসন বাঁ হাতে হয় মুঠি।। "

সপ্তদশ শতাব্দীতে দেশিয় ও বিদেশি বাজারে তসরের কাপড়ের বিপুল চাহিদা ছিল। ঢাকা ছাড়া তখন হুগলির তন্তুবায়শ্রেণি সুতি ও তসরের নানা প্রকার বস্ত্র তৈরি করতেন। রূপরাম তাঁর কাব্যে হুগলির তসর কাপড়ের কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন।

" শঙ্খ সোনা পরাইব তসরের শাড়ি।
কত আর উধার করিব বাড়ি বাড়ি।। "[১৫]

পোশাক- পরিচ্ছদের পর আসা যাক পায়ের আভরণের কথায়। জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণির পুরুষদের মধ্যে পাদুকা পরিধানের প্রচলন থাকলেও মেয়েদের মধ্যে এই রীতি ছিল না। ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ পদভূষণ হিসেবে চটী জুতোর পরিবর্তে খড়ম ব্যবহার করতেন।[১৬]

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাজ পোশাকেরও বিবর্তন ঘটেছে। মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাঙালিদের চিরাচরিত পোশাক ধুতি ও চাদর। তবে পল্লী ও গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই ধুতি, ফতুয়া বা গেঞ্জি ব্যবহার করেন এখনও। গ্রামের বাইরে যাওয়ার সময় ধুতি, ধুতির নীচে অন্তর্বাস, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী ও পায়ে চটি ব্যবহার করেন। যুবক ও প্রৌঢ়রা প্যান্ট, *English Style Shirt*, বুট, জুতো, স্যান্ডেল এইসব ব্যবহার করে। অধিকাংশ যুবক ও বয়স্কদের বাড়িতে লুঙ্গি বা ছোট ধুতি আর গায়ে গেঞ্জি বা ফতুয়া পরার রেওয়াজ রয়েছে। পায়ে সাধারণত হাওয়াই চটির খুব চলন হয়েছে। আর শহরের ছেলেদের হাঁটু পর্যন্ত হাফ পাতলুন যার চলতি নাম 'বারমুডা' পরিধানের চল রয়েছে। শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পুরুষ সবার পোশাকের পরিবর্তন হতে থাকে। যতদিন যাচ্ছে ইংরেজদের কালচারের অনুকরণে পোশাকেও ইংরেজি কালচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

নিম্নবর্গের পুরুষদের পরনে ছোট ধুতি, হাফ শার্ট ও কাঁধে গামছা, পায়ে হাওয়াই চপ্পল থাকে। মেয়েরা রঙ্গিন তাঁতের শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ এবং বয়স্ক বিধবা মহিলারা এখনও সাদা শাড়িই পড়েন। সাঁওতালদের ছেলেদের মধ্যে প্যান্ট, হাওয়াই চটি, স্যান্ডেল এখন চল হয়ে গেছে। বয়স্করা ছোট কাপড় নেংটির মতো কোমরে জড়ান, গায়ে গামছা, খালি পা তাদেরএখনও পছন্দ। মেয়েরা রঙ্গিন শাড়ি, ব্লাউজ, মাথায় রূপোর গহনা পড়তে পছন্দ করে। বয়স্ক সাঁওতাল মেয়েদের ছোট ইঞ্চিপাড় কাপড় কোমরে জড়ানো ও বুকের ওপর এক টুকরো পিঠ পর্যন্ত জড়ানো থাকে।[১৭]

অলংকার ও প্রসাধনী -

বাঙালি মেয়েরা চিরদিনই অলংকারপ্রিয়। এই কারণে কবিগণ তাঁদের কাব্যে বাঙালি সমাজের নারী সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে অসংখ্য প্রকার অলংকারের নাম উল্লেখ করেছেন। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' থেকে নারী ও পুরুষ উভয়েরই প্রসাধন ও অলংকার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় ইন্দ্রসভার নটী অম্ববতী শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে রঞ্জাবতী রূপে পরিচিত হওয়ার আগে স্বর্গে নৃত্য করার জন্য বিভিন্ন অলংকার পরে নিজেকে প্রসাধিত করেছেন-

"কানে পরে কুন্ডল কনক পরাজয়। / উপরে উলিকি টিকা বস্যা কথা কয়।।
নাকে নাকমাছি পরে নাপান করিয়া। / চাঁদের কলঙ্ক হৈল কিসের লাগিয়া।।
পরিল কুলুপ শঙ্খ সুবর্ণ কঙ্কণে। / করে বাজুবন্ধ ঝাঁপা মাদুলির সনে।।
হাথের উপরে বাজুবন্ধ ছড়া ছড়া। / নাচিবার বেলা চায় দিতে হাতনাড়া।।
শশি বিম্ব অঙ্গুলে অঙ্গুরী ছাবময়। / রবি শশী মিশাল দুজনে হয়।।
গলা ভর্‌্যা পলা পরে শতেশ্বরী হার। / দোসতি তেসতি রসকাঁট অবিচার।।
চরণে নূপুর দিয়া পরিল পাশলী। / বুকের উপরে ধনী পরিল কাচলি।।"

অর্থাৎ নিজেকে মনোরম সাজে সজ্জিত করে বিভিন্ন ধরনের গয়না পড়তেন তৎকালীন নারীগণ। নারীদের মতো অতটা না হলেও রাঢ়ের ধনী পুরুষেরা কিছু গয়না পড়তেন, যেমন- হাতের আঙুলে সোনার আংটী, গলায় মুক্তোখচিত সোনার হার ও কানে সোনার দুল ইত্যাদি। ধনী বাড়ির শিশুরাও হাতে সোনার বালা ও পায়ে মগর খাড়ু পরতো। দরিদ্র রমণীরা পিতলের ও গিল্টির গহনা পরে শখ মেটাতেন। আর বারবনিতাদের সেটাও জুটতো না। তাঁরা শোলার গহনা পরে নিজেদের মনোময় করে তুলতে চেষ্টা করতেন।[১৮] সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বর্ণালঙ্কারের চেয়ে রূপোর অলংকারের অধিক প্রচলন ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অলংকারের গঠন বৈচিত্র্যের সংখ্যাসীমা ছিল না। ভাগ্যবতী ললনাদের প্রতিটি অঙ্গেই কোন না কোন প্রকারের অলংকার থাকতোই। অনেক সময় নারীগণ পুষ্পালঙ্কারেও দেহ সজ্জিত করতো। পদাবলি সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের বেশ- বর্ণনায় যে সব পুষ্পালঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হলো- মস্তকে 'কিরীট', ললাটে 'ললাটিকে', বাহুতে 'অংগদ', 'তাড়', কটিদেশে 'কাঞ্চী', পদভাগে 'কটক', 'হংসক' ও হস্তে 'মণি-বন্ধনী' প্রভৃতি।

অঙ্গসজ্জায় মস্তক থেকে পদনখ পর্যন্ত কোন না কোন প্রসাধনী দ্রব্য সংযোজিত হতই। রাধিকার অঙ্গসজ্জা প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকেও তৎকালীন বাঙালি রমণীদের সৌন্দর্যের উপকরণের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের রমণীগণ মস্তকের কেশকে নারীসৌন্দর্যের অমূল্য ভূষণ হিসেবে মনে করতো। আর এজন্যে যত্ন নিত কেশবর্ধনের ও কেশবিন্যাসের। তারা অভ্রের চিরুনী দিয়ে কেশকে সুবিন্যস্ত ও পরিপাটি করে চূড়া ছাদে কিংবা কানড়ী ছাদে খোপা বাঁধত। আর খোপায় গুঁজে দিত সোনার কাঁটা, যুথী, জাতি, চম্পক, চামেলী, মালতী, বকুল হরেক প্রকার পুষ্প কিংবা পুষ্পমালা। হিন্দুর সধবা মেয়েরা কপালে সিঁদুর ও তিলক পরতো। চোখে কাজল পরতো

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরা। দেহকে সুবাসিত করার জন্য মেয়েদের মধ্যে আগর, চন্দন, কস্তুরী ও আতর ব্যবহারের রীতি ছিল। তৎকালীন সমাজে যে সুগন্ধ ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তার প্রমাণ মেলে সুগন্ধ বণিক সম্প্রদায়ের পেশার মধ্যে। এই সম্প্রদায়ের জীবিকার বাহনই ছিল সুগন্ধিদ্রব্য বিক্রয় করা। পা রাঙ্গা করার জন্য হিন্দু নারীরা আলতা পরতো অনেকেই। এই উদ্দেশ্যে মুসলিম সমাজের মেয়েদের মধ্যে মেহেদী ব্যবহারের প্রচলন ছিল।[১৯]

তবে বর্তমানে এই সমস্ত গহনার চল আর নেই বললেই চলে। গয়নার নকশা পরিবর্তন হয়েছে। ভারী গয়নার তুলনায় হালকা গয়নার চলই বেশি। কেবলমাত্র কোনো বড় উৎসব অনুষ্ঠানেই ভারী ভারী গয়না লক্ষ করা যায়। সব সময় এখন আর কেউই গয়না দিয়ে দেহকে আবৃত করে রাখে না। গয়নার মতো চুল বাঁধার নকশারও পরিবর্তন হয়েছে। এখনকার নারীরা কেউই বিভিন্ন ধরনের খোঁপা করে চুল বাঁধে না। তাদের সকলেরই কেশবিন্যাসের পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। আর সুগন্ধি ব্যবহারের দিক থেকেও পরিবর্তন এসেছে। সুগন্ধির জন্য কেউ আর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না কারণ, বাজারে হরেক রকম সুগন্ধি বিক্রয় হয়। অর্থাৎ সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাজ-সজ্জারও বিবর্তন লক্ষ করার মতো।

খাদ্যাভাস -

ভাত,মাছ, দুধ, ফলমূল এবং বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন হল সাধারণ বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্য। মধ্যযুগে বাঙালিরা গম ও রুটি খেত না। নদ-নদী, খাল-বিল-হাওড়ের দেশ বাংলার মানুষের প্রিয় খাদ্য মাছ। সে মাছের আকার-প্রকারে, স্বাদে-আস্বাদেও ছিল রকমফের। বাংলার অসংখ্য মাছের ভিতর রুই, কই, কাতলা, চিতল, মাগুর, ইলিশ, শোল, বোয়াল, রিঠা, পুঁটি, পাবদা, পোনা, ইচা, ভেকুট, ফলুই, মায়া, সোনাখড়কী প্রভৃতি ছিল বাঙালির নিত্যদিনের খাবার মাছ।[২০] নানা জাতির মাছের বর্ণনা পাওয়া যায় কবি ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথম খন্ডের 'অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ' অংশটিতে।

"চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল। / বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল।।
পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা। / গুতিয়া ভাঙন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।।
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই। / কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই।।
শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা। / চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।।
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা। / খরশুল্লা তপসিয়া গাঙ্গাস ইলিশা।।"[২১]

এছাড়া শুটকি মাছ নিম্নবঙ্গের দরিদ্র অধিবাসীদের খুব প্রিয় খাদ্য ছিল। নিরামিষান্ন ছিল বাঙালিদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য। বিশেষত বৈষ্ণবেরা ছিলেন নিরামিষভোজী। এই কারণে নিরামিষান্ন রান্নায় বাঙালি গৃহবধূরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত।[২২] চৈতন্যদেবকে (মহাপ্রভু) তাঁর একজন ভক্ত শিষ্য খাওয়ানোর জন্য যে কয়েকপ্রকার নিরামিষান্ন তৈরি করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' জীবনীগ্রন্থে।

"বত্রিশা আঁঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে। / দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে।।
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ। / চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদ্গসূপ।।
সার্দ্রক বাস্তুক শাক বিবিধ প্রকার। / পটোল কুষ্মান্ড বড়ি মানচাকি আর।।
চই মরীচ সূক্ত দিয়ে সব ফল-মূলে। / অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।।
কোমল নিম্বপত্র সব ভাজা বার্ত্তাকী। / পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মান্ড মানচাকি।।
নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর। / মোচাঘন্ট দুগ্ধ কুষ্মান্ড সকল প্রচুর।।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়। / সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।।
মুদগবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট। / ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট।।"[২৩]

কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলার উত্তর সীমানায় ভাগীরথীর দক্ষিণতীরের অনতিদূরে কামটপুর গ্রামে, তাই তাঁর রচিত চৈতন্য জীবনীগ্রন্থে সেই সকল নিরামিষ খাদ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা সেই সময়ে বর্ধমানের মানুষজনের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অঙ্গ ছিল।

শাক ছিল বাঙালির সর্ব-সাধারণের খাদ্য। তাই শাকান্ন-ভোজন নৈতিক অনুশাসনের সহায়ক হিসেবে বর্ণিত হয়েছে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' জীবনীগ্রন্থে। চৈতন্য (মহাপ্রভু) অনেকদিন শ্রীবাসের গৃহে থাকার পর পানিহাটিতে রাঘবমন্দিরে গেলেন। সেখানে রাঘব পণ্ডিত প্রভুর জন্য এবং তাঁর শিষ্যদের জন্য রান্না করেছিলেন। সেই রান্না ভোজন করে মহাপ্রভুর উক্তি-

"প্রভু বোলে "রাঘবের কি সুন্দর পাক। / এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক"।।
রাখবো প্রভুর প্রীতি শাকেতে জানিঞা। / রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা।।"[২৪]

অম্বল ছিল বাঙালির আরেকটি প্রিয় খাদ্য। অম্বল রান্না হতো পাকা কলা, আদা, লেবু, মুলা, চালতা, তেঁতুল, কুল, আমড়া প্রভৃতি দিয়ে।

নদ-নদী, খাল-বিল বিধৌত উর্বরা শস্য-শ্যামলা বাংলার প্রকৃতি থেকে আবহমানকাল ধরে বাঙালিরা বিভিন্ন প্রকার ডাল উৎপাদন করে তার স্বাদ ভোগ করে আসছে। বাঙালির রসনা তৃপ্ত করেছে মাস, মুসুরি, ছোলা, অড়হর, মটর প্রভৃতি ডাল।[২৫] কবি ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তৃতীয় খন্ডের 'দিল্লিতে উৎপাত' অংশে বিভিন্ন ডালের পরিচয় পাওয়া যায়।[২৬]

হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের উৎকৃষ্ট খাদ্য তালিকায় মাংসের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নস্তরের অর্থাৎ ব্যাধ শ্রেণির লোকেরা ভক্ষণ করতো ইঁদুর, গোসাপ, শূকর প্রভৃতির মাংস। বিত্তবান ও অভিজাত পরিবারের উৎসবাদির খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হতো কালিয়া, কোর্মা, কাবাব, মাংস, রুটি, বিরিয়ানী, খিচুড়ি, পোলাও, কোপ্তা প্রভৃতি। সম্মানিত অতিথিদের বিশিষ্ট খাদ্য হিসেবে পরিবেশন করা হতো দুধ, দধি, চিড়া, মুড়ি, লাড্ডু, খৈ, পাটালী গুড়, চিটা গুড় ইত্যাদি। পান্তাভাত ছিল গরীবদের নিত্যদিনের খাবার। এছাড়া দূরপথযাত্রী প্রিয়জনদের জন্য শুকনো এবং দীর্ঘস্থায়ী খাবার হিসেবে তৈরি করা হতো- আমতা, আমসত্ত্ব, নারিকেল নাড়ু, চিড়া, মুড়ি, খৈ প্রভৃতি। এই সমস্ত খাদ্যের পাকপ্রণালীও ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। তাছাড়া, চালের গুড়োর সঙ্গে দুধ, চিনি, নারিকেল মিশিয়ে তৈরি হতো হরেক প্রকার পিঠাপুলি। তৎকালীন সময়ে যে সকল পিঠাপুলি তৈরি হতো, এখনও সেইসকল পিঠাপুলি বর্ধমানের পল্লীগ্রামে তৈরি হয়। যেমন- তালপিঠা, তিলপিঠা, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরপুলি, নারিকেল পুলি, পাতা পিঠা, চিতড়াপিঠা, পোঁয়াচই, কাঁচবড়া, দুগ্ধাচিড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের খাদ্যাখাদ্যের ভেদাভেদ যেমন এখন আছে, তেমন আগেও ছিল। বৈষ্ণবগণ নিরামিষভোগী ছিলেন, তাঁরা এখনও তাই আছেন। অনুরূপভাবে শাক্তরা ছিলেন আমিষভোগী। তবে বৈষ্ণব ব্যতীত সকল প্রকার জাতির মানুষই আমিষভোজী বলা যায়।[২৭]

অবশেষে বর্ধমানের মানুষের খাদ্যাভাস প্রসঙ্গে এটুকুই বলা যায় যে, অতীতে বর্ধমানের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের বর্ণনা বিভিন্ন কবিদের কাব্যে উঠে এসেছে। যার মাধ্যমে আমরা তৎকালীন মানুষের খাদ্যাভাসের একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি। বর্ধমানের মানুষের খাদ্যাভাস খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করা যায়। বর্ধমানের পল্লীগ্রাম গুলিতে এখনও বিভিন্ন প্রকার শাক, ডাল, মাছ প্রিয় খাদ্য হিসেবে গণ্য হয়। এখানকার পোস্ত হল দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার একটি প্রধান অঙ্গ। পোস্ত দিয়ে বিভিন্ন ব্যঞ্জন রন্ধনে বর্ধমানের মানুষের জুড়ি মেলা ভার। শহরাঞ্চলে বিভিন্ন খাদ্যের চাহিদা থাকার সত্ত্বেও পূর্বোক্ত ব্যঞ্জনগুলি হারিয়ে যায় নি। এখনো ঘরে ঘরে আমসত্ত্ব, বড়ি, নারিকেল নাড়ু, চিড়া, মুড়ি, খৈ প্রভৃতি বানানো হয়। বাঙালিরা যে চিরদিনই খাদ্যভোজনে বৈচিত্র্য প্রয়াসী, বর্ধমানের মানুষজনের খাদ্যাভাস তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ভাষা -

আঞ্চলিক ভাষার সংস্পর্শ প্রভাব যে কতদূর ক্রিয়াশীল তা যে কোন একটি জেলার ভাষা নিয়ে সমীক্ষা করলে সহজেই বোঝা যায়। একটি জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলি যে পার্শ্ববর্তী জেলার প্রভাব বহন করে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে বর্ধমান জেলার ভাষায়। বর্ধমানের ভাষায় হুগলি, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যাঁরা আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য সন্ধানে বা আঞ্চলিক ভাষার চরিত্র বিশ্লেষণে আগ্রহী তাঁদের কাছে বর্ধমানের ভাষা একটি কৌতূহলাদ্দীপক বিষয়। এই ভাষায় রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু বর্ধমান জেলার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য তার ধ্বনিতত্ত্বে নয়, এই ভাষার বৈশিষ্ট্য তার শব্দভান্ডারে, রূপতত্ত্বে, বাক্যরীতিতে। বর্ধমান জেলার শব্দগত বৈশিষ্ট্য ও বাক্যপ্রকরণগত বৈশিষ্ট্য আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। কেন না এতে এমন একটা স্বকীয়তা আছে যাকে এক আঁচড়েই বর্ধমান জেলার ভাষার লক্ষণ বলে অভ্রান্তভাবে সনাক্ত করা যায়। বর্ধমানের ভাষার শব্দভাণ্ডার একটি অত্যন্ত কৌতূহলাদ্দীপক বিষয়। এই জেলার ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে যেগুলি মূল আঞ্চলিক শব্দ হিসেবেই চিহ্নিত। সেইসব শব্দ অবশ্য পার্শ্ববর্তী অন্য কোন কোন জেলায়ও ব্যবহৃত হয়। এমন বহু শব্দও আছে যেগুলি নিতান্তই বর্ধমানের নিজস্ব শব্দ- অন্যত্র সেই শব্দের প্রয়োগ হয় বটে, তবে ধরে নিতে হবে যে সেগুলি বর্ধমান থেকেই অন্যত্র গেছে। আবার এমন শব্দও আছে যেগুলি মান্য ভাষারই অনুরূপ।[২৮]

রাঢ়ের মধ্যমণি বর্ধমান জেলার অধিবাসীদের প্রধান ভাষা বাংলা। এই জেলার ভৌগোলিক পরিবেশ জীবিকার সন্ধানে ও বিভিন্ন অঞ্চলে সঞ্চিত নানা প্রকার সম্পদের আকর্ষণে এইসব অঞ্চলে নানান জাতির, নানান গোষ্ঠীর জন সমাবেশ ঘটে। এরফলে জেলার বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া মহকুমায় প্রধানত বাংলা ভাষাভাষীর প্রাধান্য হলেও, এই জেলার সর্বত্র সাঁওতাল, কোঁরা, উর্দুভাষী, হিন্দিভাষী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কয়লাখনি আবিষ্কারের পর থেকেই বিহার, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যভারত, উড়িষ্যা থেকে নানা জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটতে থাকে। শিল্পায়নের

অগ্রগতির ফলে এই অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী ছাড়া অন্য ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। জেলার ভৌগোলিক পরিবেশ, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংঘাত ও গ্রাম্যজীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি বিচার করলে জেলার অধিবাসীদের ভাষায় বৈচিত্র্যের সূত্র মিলবে।

G.A. Grerson এর মতে সদর, কালনা, কাটোয়ার বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে গ্রাম শহরের শিক্ষিত ও উচ্চবর্ণের মানুষ বিধিসম্মত প্রামাণিক বাংলায় কথা বলে। প্রাকৃত অপভ্রংশ অর্থাৎ বাংলার কেন্দ্রীয় শাখা থেকে এই ভাষার উদ্ভব। আসানসোল, দুর্গাপুর মহকুমার ল্যাটেরাইট অঞ্চলের উপরিউক্ত শ্রেণির ভাষা মাগধী অপভ্রংশ; পাশ্চাত্যশাখা থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ কিছুটা বিহারী টান লক্ষ করা যায়। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, নারী ও নিম্নশ্রেণির মানুষ বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে নানা আঞ্চলিক ভাষা গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত আঞ্চলিক ও দেশি ভাষার অধিকাংশ অষ্ট্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত।[২৯]

আঞ্চলিক ভাষার প্রতি ভাষা-গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন জেলার ভাষার আলোচনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ভাষা সম্প্রদায়ের নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে হীনমন্যতা দূরীভূত হয়েছে এবং নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে কৌতূহলও বেড়েছে।[৩০]

জীবিকা -

মানুষ যে কাজের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে জীবনের নানা চাহিদা পূরণ করে, সাধারণত তাকেই আমরা জীবিকা বলে থাকি। বর্ধমান জেলার মানুষের জীবিকা প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে মধ্যযুগে বর্ধমানে বসবাসকারী কবিগণ তাঁদের লেখনীর মধ্যে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবিকার বর্ণনা দিয়েছেন, তার দুএকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পুরাণ বর্ণিত শূদ্রজাতীয় উত্তম, মধ্যম ও অধম বর্ণের মানুষের পেশা ও স্বভাবের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- গোপেরা চাষ করতো মুগ, তিল, গম, সরিষা, কার্পাস প্রভৃতি ফসল। তেলীদের কেউ কেউ চাষাবাদ করতো, কেউ কেউ আবার তিল, তিসি, সরিষা ভেঙ্গে তেল তৈরি করে বিক্রি করতো। ফাল, শেল, কোদাল, কুড়াল প্রভৃতি কৃষি উপকরণ প্রস্তুত করতো কর্মকারেরা। পান সুপারি বিক্রয় করতো তাম্বুলীরা। হাড়ি কুড়ি প্রস্তুত করট কুম্ভকারেরা। তাঁতীরা ভুনী, খুনী, ধুতি প্রভৃতি মোটা সরু কাপড় বুনতো। মালীরা রাজবাটিতে পুষ্প সরবরাহ করতো। বারুইরা বরজে পান উৎপাদন করতো। কেশ কর্তন করতো নাপিত, ক্ষত্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ যুদ্ধ করে জীবিকা নির্বাহ করতো আগুরিয়ারা। মোদকেরা আখ থেকে কারখানায় গুড় ও চিনি প্রস্তুত করতো এবং তা দিয়ে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন তৈরি করে পসরা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতো। গন্ধবেনেরা গন্ধ বিক্রি করতো, শাঁখা কেটে শঙ্খ এবং কাঁসা দিয়ে থালা-বাটি প্রস্তুত করতো শঙ্খবেনে ও কংসবেনে। সুবর্ণ বণিকেরা সোনা-রূপার কেনা-বেচা করতো এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করে বিক্রয় করতো। কৃষি ও মৎস্যজীবি ছিল দাসেরা। বাদ্য বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো বাইতিরা। মাছুয়ারা জাল বুনে মাছ ধরতো। কোচেরা খালুই বুনতো, দর্জিরা কাপড় সেলাই করতো। পাটনীরা খেয়া পারাপার করতো। এছাড়াও কবি চৌদুলি, চুনারী, চন্ডাল, মারহাটা, কিরাত, কোল, হাঁড়ি, ডোম, বিয়নী প্রভৃতি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন-জীবিকার নানা দিকের পরিচয় দিয়েছেন।[৩১] কবি ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দ্বিতীয় খন্ডে 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশটিতে নারীগণ তাদের পতিদের জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বভাবেরও বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন-

'রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে', 'রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণ পন্ডিত', 'অভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার', 'পাতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি'।

এছাড়া- মুনশী, বকশী, উকীল, আরজবেগী, খাজাঞ্চি, পোদ্দার, মুহুরী, দপ্তরী, কোটাল, কবি ইত্যাদি বিভিন্ন জীবিকার বৃত্তির উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২] রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য থেকে জানা যায়- তখন সমাজের বিভিন্ন মানুষ পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। কারণ কর্মহীন হয়ে ঘরে বসে থাকাকে সেকালের সমাজ খুব একটা ভালো চোখে দেখতো না।

" ঘরে বস্যা থাকিলে সম্পদ নাঞি পাই।
এই দন্ডে দুভাই গৌড়ে চল যাই।। "

শুধু তাই নয়, যারা পরের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে দিনযাপন করত- সমাজ সেই পরজীবী মানুষদেরও ঘৃণা করতো।

" পরবাসী যেজন পরের অন্নে থাকে।
জীবন্ত থাকিতে বাপ মরা বলি তাকে।।"[৩৩]

উপরোক্ত উদাহরণ গুলির দ্বারা মধ্যযুগীয় সময়ে বর্ধমান জেলার মানুষের জীবিকা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল। কারণ এই সমস্ত লেখকগণ বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রাম বা প্রান্তে বসেই তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এরপর ধীরে ধীরে সময় ও যুগবিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রাও পরিবর্তিত হয়েছে, পরিবর্তন এসেছে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রেও।

বর্ধমান জেলা সম্পদে পরিপূর্ণ একটি জেলা। জল-মাটি-খনিজ সম্পদে এই জেলা সম্পন্ন। খনি, অরণ্য উর্ব্বরা কৃষিজমি, নদ-নদী, জলাশয় সমস্তই এখানে প্রচুর। এমনকি রাজ্যের সব থেকে বড় শিল্পগুলিও এই জেলাতেই রয়েছে। একই সঙ্গে মানব সম্পদেরও প্রাচুর্য এবং তার ঠিক মতো উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থা সুগঠিত। মানুষ যাতে নিজেকে উন্নত করে, শিল্প-প্রযুক্তি করায়ত্ত করে খুশিমতো জীবিকা গ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা; স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলি, ডাক্তারের যোগান এই জেলায় উল্লেখযোগ্য রকমের ভালো। বর্ধমান জেলা অন্য জেলার অনেক মানুষকে প্রতি বছর ধারণ করে, তাদের জীবিকা যোগায় কৃষিতে-শিল্পে এবং ক্রমবর্ধমান অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতেও। প্রয়োজনীয় সময়ে বেশ কিছু কষ্টের মধ্যেও জেলায় ভারী শিল্পের ভিত্তিটা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। যার উপর নির্ভর করে আরো অনেক ছোট শিল্প, ছোট কারখানা গড়তে পারা গেছে এবং সেই আয় বৃদ্ধি কুটির শিল্পকে চাপের মধ্যে হলেও টিকে থাকতে; বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে এবং এখনো করছে।[৩৪]

এই জেলার মানুষের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নদ-নদী গুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বলা যায়। ভাগীরথী বাহিত পলিতে কাদার ভাগ বেশি থাকায় এই শ্রেণির মৃত্তিকায় জলধারণের ক্ষমতাও অনেক। ফলে অল্প শ্রম ও ব্যয়ে এতদঞ্চলে পাট, ধান, ইক্ষু ও তরিতরকারীর উৎপাদনের হারও অধিক। ভাগীরথী অববাহিকায় আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল উৎপাদনকারী বাগানগুলি থেকে বহু লোক জীবিকা সংস্থান করে থাকে। অপরপক্ষে জেলার মধ্যভাগ দামোদর ও তার শাখা-প্রশাখার পলিতে গঠিত হওয়ায়, মৃত্তিকাতে কাদার ভাগ অল্প এবং ঐ ধরনের মৃত্তিকাতে অল্প খরচে আলু, গম, সরিষা প্রভৃতি দ্রব্য বর্ধমান, মেমারী, রায়না, জামালপুর, কাটোয়া, ভাতাড়, মন্তেশ্বর থানা এলাকায় প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। অজয় অববাহিকায় মৃত্তিকায় সুক্ষ পলির ভাগ অল্প হলেও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সংমিশ্রণে গঠিত মাটিতে প্রচুর ধান, গম, সরিষা, ইক্ষু প্রভৃতি চাশের দ্বারা লোকে জীবনধারণ করে থাকে।[৩৫]

এছাড়া সীমিত কয়েকটি অঞ্চলে অবসর সময়ে মানুষ মৎস্য শিকারীতে পরিণত হয়ে জীবিকার সংস্থান করে থাকে। খড়্গেশ্বরী ও অজয়ের নিম্নাংশে এবং ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলে মৎস্যশিকারজীবী বহু লোক বসবাস করে এবং ছোট ছোট খাল ও কাঁদড়গুলিতে এরাই অবসর সময়ে মৎস্য শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আবার নদীকূলেই অনুকূল জলবায়ুর পরিবেশে দেশিয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয় প্রচুর তাঁতবস্ত্র। এই তাঁতবস্ত্র তৈরি করেও বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বর্ধমান জেলার নদীতীরবর্তী কয়েকটি স্থান এক সময়ে অন্তর্দেশীয় বন্দর রূপে চিহ্নিত হয়েছিল, যথা- বর্ধমান, কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা, নাদনঘাট ও নতুনহাট। আজ নদীখাত শুষ্ক এবং স্থলপথে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে জলপথের অবনতি ঘটেছে। বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য ফেরীঘাটে দেশি নৌকায় খেয়া পারাপারের দ্বারা আজও বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে কাটোয়া ও কালনায় যন্ত্রচালিত নৌকার প্রচলন দেখা দিয়েছে। কিন্তু শতজীর্ণ নৌকা ও কর্দমাক্ত ফেরী ঘাটগুলিতে যাত্রীদের যে অসুবিধা ভোগ করতে হয় তার প্রতিবিধানের কোনো ব্যবস্থা নেই।[৩৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রানিগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর অজয় ও দামোদরের জলপথে কলকাতায় কয়লা আমদানি করা হতো। জেলার পশ্চিম অঞ্চলে বনভূমি থেকে সংগৃহীত বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দামোদরের বুকে ভাসিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসা হতো। নদীতে এখন নাব্যতা না থাকায় বর্তমানে জালবোনা ও কাঠের কাজ করে যারা কর্মসংস্থান ও জীবিকা নির্বাহ করতো, তারা কৃষিকার্য বা চাকরি করতে বাধ্য হয়েছে।[৩৭]

ক্রীড়া -

মধ্যযুগীয় কাব্য সাহিত্যে তৎকালীন সমাজে যে সকল খেলা বা ক্রীড়ার পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাশা খেলা। নারী পুরুষ উভয়েই সে যুগে পাশা খেলতো। বিশেষ করে বিয়ের প্রথম রজনীতে বর-বধূর পাশা খেলা ছিল বৈবাহিক আনন্দের অন্যতম বিষয়। মাঝি-মাল্লারা পর্যন্ত অবসর সময়ে নৌকায় বসে পাশা খেলতো। জুয়া খেলার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য গুলিতে। বাংলায় পোর্তুগিজদের আগমনের পর থেকে তাস খেলার প্রচলন হয়। 'আইন-ই-আকবরী' এবং বিভিন্ন গীতিকায় তাস খেলার পরিচয় আছে। এছাড়া মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে শকট, পারাবত প্রভৃতি ক্রীড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া মোগল আমলে বর্তমান পোলো খেলার ন্যায় 'চৌগান' খেলার প্রচলন ছিল। অশ্বচালনা ছিল উচ্চশ্রেণির খেলার মধ্যে অগ্রগণ্য। গ্রাম্য লোকে ঢাল, সড়কী, বল্লম নিয়ে ঢালী খেলতো। দেশে কুস্তী খেলা, মল্লযুদ্ধ, হাডুডু খেলারও প্রচলন ছিল। নৌকা বাইচ বিশেষ করে কোশা নৌকার বাইচ এবং ষাঁড়ের লড়াই সেকালের জনগণের হৃদয়ে বিপুল আনন্দের সঞ্চার করতো। সাধারণ শ্রেণির মানুষ এবং নারীদের

মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানা প্রকার খেলা, যথা- গুঁটি বা ঘুন্টি খেলা, বাঘবন্দি, ষোলঘর, দশ পঁচিশ, আড়াই ঘর প্রভৃতি প্রচলন ছিল। ছোট মেয়েরা খেলতো কড়াকড়ি, আঁটুল- বাটুল এবং বর- কনে দান।[৩৮]

কবি রামেশ্বর রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে 'ক্রীড়াচ্ছলে গৌরীর শিব- সেবা' অংশটিতে গৌরীর ক্রীড়া বর্ণনা প্রসঙ্গে রামেশ্বর এ ধরনের ক্রীড়ার পরিচয় দিয়েছেন-

" খেলে লুকলুকানি আপনি হইয়া বুড়ী। / এক চোরে সভাকারে করে তাড়াতাড়ি।।
লুকাইলে খেদ্যা খেদ্যা ধরে সব ঠাঞি। / বুড়িকে না ছুঁলে কার পরিত্রাণ নাঞি।। "

এরপর-

" খেলে দশ পঁচিশ ছ কড়া লইয়া কড়ি। / দান ধর্ম্ম বুঝ্যা দান ফেলে বুড়ি বুড়ি।।
সাতঘরি সুন্দরী সুন্দর খেলা করে। / বুড়ি বুড়ি কড়ি গণ্যা কড়া দিয়া হরে।।
ফুল ঘুসিঙ্গ খেলে পঙ্ক দেয় গায়। / বেনা গাছে ঝুটি বান্ধা গড়াগড়ি যায়।।
আঁটুল বাঁটুল খেলে পশারিয়া পা। / আর লীলা খেলে যত কত কব তা।।"[৩৯]

বালিকাদের অনুরূপ বালকেরাও খেলতো কড়ি, ডাঙ্গ, মটিকা, ভেটা, পাশা, নেত্রবন্ধ, নাটিম, গাছঝোলা, মাঝ খেলা প্রভৃতি।[৪০]

পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে কীধরনের ক্রীড়ার প্রচলন ছিল তার একটি আভাস পাওয়া গেল। অতঃপর আসা যাক বর্তমানে বর্ধমান জেলায় কীকী ধরনের ক্রীড়ার প্রচলন আছে সেই সম্পর্কিত আলোচনায়।

বর্ধমানের খেলাধুলার প্রাণকেন্দ্র ছিল বর্ধমান রেল স্টেশন সংলগ্ন ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। এখানেই বেশিরভাগ খেলাধুলা হতো। সেই সঙ্গে বর্ধমান মেডিকেল স্কুল মাঠেও ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়েছে। পুলিশ লাইনের মাঠেও অনেক খেলা অনুষ্ঠিত হতো। আগে ম্যাজিস্ট্রেট গ্রাউন্ডে খেলা হতো। ১৯৬০ সাল থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনবাগান মাঠে খেলার আয়োজন হয়ে আসছে। ১৮৮৫ খ্রিঃ বর্ধমানবাসীরা সমষ্টিগতভাবে রাজার কাছে দরবার করে খেলার মাঠের ব্যবস্থা করে দিতে। মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাব প্রস্তাব দেন, তাঁর পিতার নামে জেলা অ্যাসোসিয়েশন গঠন করতে। ১৯০০খ্রিঃ বর্ধমানের ক্রীড়া সংগঠকরা সেই মোতাবেক আই.এফ.এ- র কাছে নথিভুক্ত করান 'বনবিহারী জেলা অ্যাসোসিয়েশন' নামে। অবিভক্ত বাংলার প্রথম জেলা দল হিসেবে বর্ধমান আই.এফ.এ- তে নথিভুক্ত হয়। তখন ফুটবল ছাড়াও সাঁতার, ভলিবল, কুস্তি, লাঠিখেলার চল ছিল।[৪১]

ফুটবল একসময় জনপ্রিয় খেলা ছিল বর্ধমানে। রাজার অনুদানে টুর্নামেন্ট চলত। এখনও এই টুর্নামেন্ট চলে। বর্ধমান জেলার পাঁচটি সাবডিভিশন। তার মধ্যে আসানসোলে খেলার চল ছিল। মার্টিন বার্ণ কোম্পানির খেলোয়াড়রা আসানসোলের হয়ে ফুটবল, ক্রিকেট, এ্যাথেলেটিক্সে অংশগ্রহণ করতো। ১৯৫৫খ্রিঃ বর্ধমান জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন ও হকি যুক্ত হয়। ১৯৫৭-৫৮ খ্রিঃ বি.ডি.এস- এর তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংঘ সাঁতার প্রতিযোগীতা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এর আগে থেকেই স্কুল সাঁতার প্রতিযোগীতা চলত টাউন স্কুলের পদ্মপুকুরে। সত্তর দশকে কাবাডি ও টেবিল টেনিস খেলা শুরু হয়। এই দশকের শেষের দিকে টেবিল টেনিস, কাবাডি ও ব্যাডমিন্টনের আলাদা জেলা অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। এই সাল থেকেই লিগের খেলা শুরু হয়ে যায় স্টেডিয়ামে। ছয়ের দশকে প্রথম বাস্কেটবল চালু হয় বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল মাঠে। স্কুল ছাড়াও যে সব ক্লাব খেলা শেখানোর চেষ্টা করেছিল তাদের মধ্যে জাতীয় সংঘের নাম করতে হয়। এছাড়া কল্যাণ স্মৃতি সংঘ, অসীম মেমোরিয়াল ক্লাব, শিবাজি সংঘ প্রভৃতি ক্লাব গুলি খেলা শেখানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।[৪২] বহু আগে থেকেই বর্ধমানের খেলাধুলার দু'টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। প্রথমত এক একটা পরিবারের প্রায় সবাই কোন না কোন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতো। দ্বিতীয়ত একই ব্যক্তি অনেক খেলায় অংশগ্রহণ করতো। যেমন- ক্রিকেট, ফুটবল, এ্যাথেলেটিক্সে সামন্তবাড়ি ছিল পথিকৃৎ। ফুটবল ক্রিকেট এর পর সাঁতার বর্ধমানে বিশেষ স্থান পায়। এ্যাথেলেটিক্সে চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে কয়েকজন পশ্চিমবঙ্গের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করলেও মাঝে বর্ধমানে এ্যাথেলেটিক্স চর্চা তেমন ছিল না। পঞ্চাশের দশকে আসানসোল ও দুর্গাপুরে এ্যাথেলেটিক্স প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। টেবিল টেনিসে প্রধানত দুর্গাপুর, আসানসোল ও বার্ণপুর এইসব শিল্পাঞ্চল থেকে বর্ধমানের বহু নামী খেলোয়াড় রাজ্য ও দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৭৭খ্রিঃ বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে তৎকালীন টেবিল টেনিস খেলোয়াড়েরা প্রথম বর্ধমান টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে। চল্লিশের দশক থেকেই হকি খেলার প্রচলন ছিল বর্ধমানে। তখন পুলিশ লাইনের মাঠে খেলা হতো। পাঁচের দশকের শেষের দিকে ও ছ'য়ের দশকের প্রথম দিকে বর্ধমান জেলা দল পর পর তিন বছর পশ্চিমবঙ্গের সেরা দল ছিল। সত্তর দশকে বর্ধমান দল বহুবার আন্তঃজেলা হকি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই সকল খেলা ছাড়াও লন টেনিস, যোগব্যায়াম, হ্যান্ডবল, ভলিবল, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলারও প্রচলন রয়েছে বর্ধমানে। বর্তমানে বর্ধমান শহরের উত্তর- পূর্ব প্রান্তে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া বা সাই (SAI) এর একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। নাতিবিস্তৃত ভাবে এই হলো বর্ধমানের খেলাধুলার চিত্র।[৪৩]

শিক্ষা -

বঙ্গের মানুষ চিরদিনই বিদ্যানুরাগী ও জ্ঞানান্বেষী। বিদ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে বর্ধমানে মধ্যযুগে যে বিদ্যা শিক্ষার প্রসার হয়েছিল সে বিষয়ে যদি আলোচনা না করা হয় তাহলে এই বিদ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই প্রথমেই মধ্যযুগে বর্ধমানের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টির উপর আলোকপাত করা যাক।

মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী কাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি সাহিত্যের কোন ক্ষেত্রে সিংহভাগ রচয়িতা, কোন ক্ষেত্রে অর্ধেক রচয়িতা বর্ধমান জেলায় জন্মেছিলেন। এই সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকরা শিক্ষিত ছিলেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিতও ছিলেন।[৪৪] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তৎকালীন বাংলা হিন্দু- মুসলমান শিক্ষা ও জ্ঞানান্বেষার ব্যাপক পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

সেকালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত পাঠশালা, মকতব, টোল, মাদ্রাসা, চতুষ্পাঠী, মসজিদ এবং ইমামবাড়া নামে পরিচিত ছিল। মুসলিম শিক্ষার্থীরা পড়তো মকতব, পাঠশালা, মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ইমামবাড়াতে এবং হিন্দু শিক্ষার্থীরা পড়তো পাঠশালা, টোল এবং চতুষ্পাঠীতে। তৎকালীন বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন প্রধানত স্থানীয় শাসক, জমিদার এবং বণিকেরা। তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া, শান্তিপুর, বর্ধমান, বিক্রমপুর এবং চট্টগ্রাম জ্ঞানচর্চার উন্নত কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিশেষকরে নদীয়া, শান্তিপুর ছিল তৎকালে বাঙালি হিন্দুর নব্যন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের তীর্থক্ষেত্র।[৪৫]

এই পর্যায়ে কবি সাহিত্যিকদের আলোচনায় প্রথমেই আমরা ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁ- র নাম করতে পারি। তিনি যে সংস্কৃত জানতেন তার প্রমাণ তিনি ভাগবত অনুবাদ করেছিলেন। কুলীনগ্রামে মাধবানন্দ পুরীর যাওয়া আসা ছিল, সেই সূত্রে এই অঞ্চলে বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা এবং সংস্কৃত- শাস্ত্র শিক্ষার প্রসার ছিল বলা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বর্ধমানের কুলীনগ্রামে এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শিক্ষার বাতাবরণ ছিল নিঃসন্দেহে। পঞ্চদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে শ্রীখণ্ড অঞ্চলে সংস্কৃত টোল ছিল। নরহরি সরকারের পুত্র রঘুনন্দন এবং শ্রীখন্ডের দামোদর সেনের দুই নাতি রামদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদাস কবিরাজ বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ভাষায় কিছু কিছু গ্রন্থ রচনাও করে গেছেন। শ্রীখণ্ডকে কেন্দ্র করে কাটোয়া মহকুমায় অগ্রদ্বীপ, দাঁইহাটে গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ প্রভৃতি কবিগণ বৈষ্ণব পদাবলি ও বৈষ্ণব শাস্ত্র- গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই অঞ্চলের সঙ্গে নবদ্বীপ ও মিথিলার যোগ ঘটে বিদ্যাচর্চা সূত্রে।[৪৬]

শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে নদীয়ায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির, বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের যে জোয়ার এসেছিল, তাঁর তিরোধানের পর তাতে ভাটা পড়ে। এই ভাটার পশ্চাতে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান ছাড়া বঙ্গের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের গুরুত্বও কম ছিলনা। এরফলে সংস্কৃত বিদ্যা ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে গঙ্গাতীর ধরে প্রসারিত হতে থাকে।[৪৭] রূপরামের ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্য থেকে রাঢ়ের বিদ্যাচর্চার ধরন- ধারণ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। রূপরাম তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন- তিনি কবিচন্দ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে ‘জুমর’ ও ‘অমর’ গ্রন্থের টীকা, মাঘের ‘শিশুপালবধ’, কালিদাসের ‘রঘুবংশ’ ও শ্রীহট্টের ‘নৈষধচরিত’, ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’ ইত্যাদি পাঠ করেছেন।[৪৮] রূপরামকে তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কোন কোন স্থানে যেতে বলেছেন তা উল্লেখ করেছেন-

> “বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে আছে, / ভারতী পড়িতে বেটা চল তাঁর কাছে।
> নহে জউগ্রাম চল কলানিধির ঠাঞি, / তাঁর সম ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরে নাঞি।”[৪৯]

রাঢ়ে তখন বিদ্যারম্ভ হতো সরস্বতী পূজায় হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। রঞ্জাবতী কর্পূর ও লাউসেনকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগে বাড়িতে পুরোহিত ডেকে সরস্বতী পূজা করে হাতেখড়ি দেন।

> “দুই ভাই স্নান করে তোলা গঙ্গাজলে। / সরস্বতী পূজিল আনন্দ কুতূহলে।।
> পরিপাটি নানা দ্রব্য আনিল তখন। / সমুখে রাখিল যথা কুলের ব্রাহ্মণ।।
> জয় দিল কল্যানী মানিকী দুই চেড়ী। / শুভক্ষণে লাউসেনের হাতে দিল খড়ি।।”[৫০]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বর্ধমানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়; বর্ধমান বাঙালির শিক্ষা- সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী, ত্রিহোত থেকে আসা দেশ- বিদেশের শিক্ষার্থীর সমাগম হতে থাকে। কাশী- বারাণসী থেকে শিক্ষার্থীদের বর্ধমানে আগমনের প্রমাণ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ধমানের অগ্রগামিতার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সারা বাংলায় অসংখ্য শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।[৫১]

কবিকঙ্কন মুকুন্দের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে লেখাপড়ার উল্লেখ পাই। সেলিমাবাদ পরগনায় অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলটিতে লেখাপড়ার প্রসার এবং টোল চতুষ্পাঠীর অস্তিত্ব যথেষ্ট ছিল। শ্রীপতির শিক্ষার যে বর্ণনা কবিকঙ্কন মুকুন্দ দিয়েছেন তার থেকে সমকালের সংস্কৃত শিক্ষার পাঠক্রম বিষয়ে একটি ধারণা অনায়াসে

গঠন করা যায়। তৎকালীন শিক্ষা ছিল একান্তই গুরুমুখী। ষোড়শ শতকের আর এক কবি বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' এ বর্ধমান জেলার নবদ্বীপের কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে টোল ও চতুষ্পাঠীর উল্লেখ আছে। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে যে চিত্র এঁকেছেন তা তাঁর পরিচিত চিত্র। সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ কাশীরাম বর্ধমান জেলার সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সিঙ্গি, পূর্বস্থলী, অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার প্রভূত বিস্তার ছিল।[৫২]

হিন্দু- মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়াকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ কোরানের ভাষা আরবি, হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বেদের ভাষা সংস্কৃত। সকল শ্রেণির হিন্দুর বেদ- অধ্যয়নের অধিকার থাক বা না থাক, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা লাভে হয়তো বাধা ছিল না। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ তনয়দের ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব পূজা- পার্বণ এবং দৈনন্দিন আচার- অনুষ্ঠানের বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য সংস্কৃত ভাষা শেখা ছিল অপরিহার্য। মুসলমান ছেলেমেয়েদের নামাজ, রোজা এবং ইসলাম ধর্মের আনুষঙ্গিক অন্যান্য নিয়ম- কানুন অনুসরণের জন্য আরবি শিক্ষা লাভ করাও ছিল আবশ্যক।

বাংলার হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। তবে মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার অতিরিক্ত উচ্চশিক্ষা পেতো না। এর কারণ, অধিকাংশ মেয়ের বাল্যকালে বিয়ে হয়ে যেত। এছাড়া পারিবারিক অবরোধ প্রথাতো ছিলই। ছেলেদের অনুরূপ হিন্দু- সম্প্রদায়ের মেয়েদেরও পাঁচ বছর বয়স থেকে শিক্ষা আরম্ভ হতো। বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন তার প্রমাণ মেলে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর'এ, যেখানে নায়িকা 'বিদ্যা' বিদ্যাবুদ্ধিতে অতুলনীয়া ছিল।[৫৩] 'মালিনীর সঙ্গে সুন্দরের কথোপকথন' অংশে মালিনীর বিদ্যা প্রসঙ্গে উক্তি-

> "এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার। / তার রূপ গুন কহা বড় চমৎকার।।
> লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়। / দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয়।।"[৫৪]

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের নারী চরিত্রের মধ্যে খুল্লনা, লীলাবতী ব্রাহ্মণী, দুর্বলা দাসী লেখাপড়া জানতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কাব্যে বিধৃত এসব চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে এ ধারণাই পাওয়া যায় যে সেকালে বাংলার নারী সমাজও শিক্ষায় একেবারে পশ্চাৎপদ ছিলনা। বাংলার বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলেও নারী সমাজে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বৈষ্ণব সমাজের নেত্রী জাহ্নবা দেবী এবং সীতা দেবী শিক্ষিতা ছিলেন বলেই বৈষ্ণব সমাজে নেত্রীস্থানীয়া হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। চন্দ্রাবতী ছিলেন আলোচ্যকালের একমাত্র মহিলা কবি।[৫৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সমস্ত গ্রামগুলিতে চতুষ্পাঠী, টোল কিংবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রচলিত প্রথাগত ব্যবস্থা ছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহরগুলি হল বর্ধমানের কাছে রায়ান গ্রামের নিকটবর্তী আমাইপুরা, মেমারীর নিকটবর্তী আমাদপুর, কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত উদ্ধারণপুর এবং কেতুগ্রাম, বর্ধমানের সংশ্লিষ্ট কাঞ্চননগর, কাটোয়া-হাওড়া রেলপথের মধ্যবর্তী স্টেশন গঙ্গাটিকুরি, মসাগ্রাম থেকে তারকেশ্বরের পথে চকদিঘি, গুসকরার নিকটবর্তী মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত চানকগ্রাম, জারগ্রাম, জৌগ্রাম, দেনুড়গ্রাম, কালনা, ধাত্রীগ্রাম, নবদ্বীপ সংলগ্ন বিদ্যানগর (বাসুদেব সার্বভৌম এবং গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাসস্থান), কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত নৈহাটি ইত্যাদি। নৈহাটিতে প্রথিতযশা পণ্ডিত সর্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতির টোল ছিল।[৫৬]

বিদ্যাচর্চার বিষয়ে বর্ধমান রাজপরিবারের দান অনস্বীকার্য। তুর্ক- আফগান আমল থেকে উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা, কোচবিহার এবং দক্ষিন- পশ্চিমবঙ্গে রাজা ও সামন্তপ্রভুদের পৃষ্ঠপোষণে বাংলা সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যলাভ ঘটে, সেই ধারায় রাঢ়ের প্রাচীনতম রাজপরিবার বর্ধমানরাজের দান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শিরোধার্য।[৫৭]

রাজা, রাজমন্ত্রী, সামন্ত, ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে পুরানো বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পোষকতার ফলেই আমরা বিদ্যাপতির পদাবলি, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল, পরাগলী মহাভারত, শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিক মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'শাক্তগীতিকা', ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থের রসাস্বাদনের সুযোগ পেয়েছি।[৫৮]

বর্ধমান রাজবংশের উদ্ভব মধ্য- সপ্তদশ শতকে, মোগল সম্রাট শাহজাহানের আমলে। আর রাজদরবারের বিলুপ্তি ১৯৫৫খ্রিঃ জমিদারি প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে। এই তিনশ বছরের সময়সীমায় বর্ধমানের রাজন্যবর্গ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কবিপণ্ডিতদের পোষণ করে এসেছেন।[৫৯]

পদাবলি সাহিত্য ও ধর্মনিরপেক্ষ গীতিসাহিত্যের বিকাশক্ষেত্রে বর্ধমানরাজের দান ভূরিপরিমাণ। শাক্ত পদাবলি সাহিত্যে বর্ধমান রাজপরিবারের শ্রেষ্ঠ উপহার সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের পদসমুচ্চয়। তেজচাঁদ বাহাদুর রাজবাটীর পশ্চিমে কোটালহাটে এই সাধক কবির বসবাসের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন এবং তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। 'কমলাকান্ত কালীবাড়ি' বর্ধমান শহরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান।[৬০]

উনিশ শতকের অধ্যাত্মসঙ্গীত ও প্রণয়সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে মহতাবচাঁদ বাহাদুরকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। সেকালের উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত পদসংকলন গ্রন্থে তাঁর পদস্থান প্রাপ্ত। উনিশ শতকে বর্ধমান রাজসভার পোষকতায় অধ্যাত্মবিষয়ক ও অধ্যাত্মনিরপেক্ষ পদ ও গীতরচয়িতাদের মধ্যে যে-দুজন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, তাঁরা হলেন প্যারীমোহন কবিরত্ন (১৮৩৪-১৮৭৪খ্রিঃ) ও ধীরাজ। কারও কারও ধারণা এঁরা একই ব্যক্তি। প্যারীমোহনই 'ধীরাজ' ছদ্মনামে কোন গীত রচনা করেন। কিন্তু এ ধারণা ভুল। এঁরা যে পৃথক দুই কবি, তার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে ধৃত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একাধিক উক্তিতে।[৬১]

বর্ধমান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য প্রাণবল্লভের 'জাহ্নবীমঙ্গল'। বর্ধমানের রানি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা ব্রজকিশোরী দেবীর আদেশে কাব্যখানি রচিত হয়। তবে 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্যের কবি রামকৃষ্ণ বর্ধমানরাজের অনুগ্রহ লাভের বদলে নিগ্রহ লাভ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৮৫খ্রিঃ তাঁর বংশধরকে কৃষ্ণরাম রাধাবল্লভের নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও সেবাপূজার জন্য ৮৫বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছিলেন। 'শ্রীধর্মমঙ্গল' রচয়িতা ঘনরাম চক্রবর্তী ছিলেন বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ রায়ের (১৭০২-৪০খ্রিঃ) বৃত্তিভোগী। কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজার কল্যাণ কামনা করেছেন বারে বারে। যেমন-

"অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্রপ্রধান।
চিন্তি তাঁর জয়োন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।। "

'শ্রীধর্মমঙ্গল' ছাড়া ঘনরামের অপর একটি ক্ষুদ্রায়তন রচনা সত্যনারায়ণের পাঁচালি, যার নাম 'সত্যনারায়ণসিন্ধু'। এটিতেও কীর্তিচাঁদের উল্লেখ আছে।[৬২] তেজচাঁদ বাহাদুরের আমলে বর্ধমান রাজসভায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে 'হরিহরমঙ্গল' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী বর্ধমানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি মহারাজ তেজচাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[৬৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে সংস্কৃত শিক্ষায়তনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে কালনা থানায় ৩৭টি, পূর্বস্থলী থানায় ১৮টি, গাঙ্গুরিয়া থানার যা বর্তমানে বারাবনী, আসানসোল, সীতারামপুর প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত, অঞ্চলটিতে মাত্র ৭টি সংস্কৃত শিক্ষায়তন ছিল। অন্যদিকে রায়নায় ১৪টি, সেলিমাবাঁধ বা খণ্ডঘোষ থানায় ৮টি, কাটোয়ায় ১৩টি, বর্ধমান থানায় মাত্র ২টি, পোতনায় ১২টি, মন্তেশ্বরে ৬টি, ভাতাড় থানায় ২৫টি সংস্কৃত শিক্ষায়তনের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৪] ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার যে সমস্ত স্থানে সংস্কৃত বিদ্যায়তন ছিল কিংবা টোল চতুষ্পাঠী শিক্ষায়তনের গর্বিত চর্চা ছিল, সেই সমস্ত গ্রাম বা নগরে এই শতাব্দীতেও সিংহভাগ স্থানে তিনশ বছরের চলমান ধারা আজও অব্যাহত। একবিংশ শতাব্দীর সূচনাবর্ষটিতে বর্ধমান জেলায় মোট ৬৪টি চতুষ্পাঠী ছিল।[৬৫] তবে চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনার জন্য মহিলাদের প্রায় কোনো ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হতো না। উচ্চবর্ণের মহিলারা শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতেন। পণ্ডিত পরিবারের রক্ষণশীলতাই নারীদের শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসতে চায়নি। বিংশ শতাব্দী এবং একবিংশ শতাব্দীর চতুষ্পাঠীগুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে মহিলাদের প্রাধান্য না থাকলেও বিশাল সংখ্যক মহিলা, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চতুষ্পাঠীতে কাব্য, ন্যায়, দর্শন, বেদান্ত শিক্ষা দিয়ে চলেছেন।[৬৬] আরবি ও উর্দু শিক্ষা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। আরবি ও পার্সি বিদ্যালয় বলতে বেশিরভাগটাই ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সম্ভবত সব বিদ্যালয়গুলিই প্রায় মসজিদ কেন্দ্রিক ছিল। মক্তব শিক্ষার একটি চিত্র পাওয়া 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। দামিন্যার কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা তাঁর চোখে দেখা চিত্র এবং নিঃসন্দেহে তা বর্ধমান জেলার চিত্র- " যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তবস্থান
মখদম পড়ায় পাঠনা। "[৬৭]

শিক্ষা সম্পর্কে প্রবলভাবে অনুরাগী বর্ধমান মহারাজ যেমন ইংরাজি বিদ্যালয় খুলেছিলেন, দুটি চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করতেন, ঠিক তেমন ভাবেই দুটি পার্সি স্কুলেরও ব্যয়ভার বহন করতেন। ১৮৫৫-৫৬খ্রিঃ সারা বাংলার কলেজ এবং বিদ্যালয় স্তরে পড়ুয়াদের তুলনামূলক আঙ্গিক চিত্র- ডি. পি. আই রিপোর্টে পাওয়া যায়।[৬৮] সংক্ষিপ্ত পরিসরের আলোচনাটির মাধ্যমে আমরা মধ্যযুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাঢ়বঙ্গের তথা বর্ধমান জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার একটি রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করলাম।

উৎসব ও অনুষ্ঠান -

সুদূর অতীতকাল থেকে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান পালন হয়ে আসছে। বিষয়ের দিক থেকে এগুলোকে প্রধান দুই-শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা- **(ক) সামাজিক অনুষ্ঠান** এবং **(খ) পার্বণিক উৎসব**

অনুষ্ঠান। প্রকৃতপক্ষে এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে বাংলার সমাজ মানসের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-সংস্কার এবং ধর্মকর্মের বিচিত্র পরিচয় প্রতিফলিত হয়।

(ক) সামাজিক অনুষ্ঠান –

বাঙালি সমাজে শাস্ত্রীয় ধর্মের চেয়ে আচরিক ধর্মের প্রাধান্যই বেশি। আচারও বহু ক্ষেত্রে উৎসব কেন্দ্রিক। জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আচারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎসবে পরিণত হয়।

গর্ভবতী রমণীকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোন কূলবধূ প্রথম গর্ভবতী হওয়ার পর তার অনাগত সন্তানের কল্যাণার্থে তাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু পারিবারিক অনুষ্ঠান পালনের রীতি রয়েছে। এই অনুষ্ঠান উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে এইসব উৎসব-অনুষ্ঠান মূলত বাঙালি সমাজের মধ্যেই সীমিত ছিল, কালক্রমে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে অবাঙালি সমাজেও এইসব পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠান পালনের রীতি গড়ে ওঠে। শিশু কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পুত্র-সন্তানের জন্মোৎসবে পরিবারের সকলে আনন্দিত হয় এবং আনন্দের নিদর্শনস্বরূপ বিত্তবান পরিবারের লোকেরা গরীব দুঃখীদের মধ্যে অর্থ-বস্ত্র দান করে। এই প্রথা বহু পূর্বকাল থেকে চলে আসছে। পুত্র সন্তানের জন্মোৎসব এইরূপ অর্থ-বস্ত্র দানের রীতি মুসলিম সমাজেও প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। হিন্দু সমাজে শিশুকেন্দ্রিক আরও যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান পালিত হয় সেগুলি হল- 'জাতকর্ম', 'নামকরণ', 'অন্নপ্রাশন', 'চূড়াকরণ', 'কর্ণবেধ', 'বিদ্যারম্ভ', 'উপনয়ন' প্রভৃতি। মধ্যযুগে উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে 'জাতকর্ম' অনুষ্ঠানটি বেশ ধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো।[৬৯] বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে চৈতন্যের নামকরণ অনুষ্ঠানটিও যথেষ্ট ধুমধামের সঙ্গে পালিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়-

"এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক। / নামকরণের কাল হৈল সম্মুখ।।
নিলাম্ব চক্রবর্তী আদি বিদ্যবান। / সর্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান।।
মিথিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ। / লক্ষ্মী প্রায় দীপ্ত সভে সিন্দুরভূষণ।।
নাম থুইবার সভে করেন বিচার। / স্ত্রীগণ বোলয়ে এক অন্যে বলে আর।।
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্যা নাঞি। / শেষে যে জন্ময়ে তার নাম যে 'নিমাঞি'।।"[৭০]

(শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, তৃতীয় অধ্যায়, আদিখণ্ড)

এই নামকরণ অনুষ্ঠানের প্রচলন মুসলিম সমাজেও আছে। নামকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত মুসলিম সমাজের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হল 'আকিকা'। 'আকিকা' শব্দের অর্থ নবজাতকের কেশ। কিন্তু এটা সাধারণভাবে ক্ষৌরকর্ম অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর নামকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'খাতনা' হচ্ছে মুসলিম সমাজের আর একটি উৎসব মুখর অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান 'সুন্নত' নামেও পরিচিত। শিশুর বয়স সাত বছরকালে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার প্রথা প্রচলিত।[৭১]

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে আনন্দের উপকরণ ছিল সীমিত। সে কারণে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু সমাজের সর্বস্তরের লোকেরাই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে বৈবাহিক অনুষ্ঠানকে দীর্ঘায়িত এবং আনন্দমুখর করে তোলার চেষ্টা করতো। বাঙালি সমাজে বিয়ের অধিকাংশ অনুষ্ঠানই আচারপ্রধান। এই আচারগুলি উৎসবকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। বৈবাহিক আচার পালন শুরু হয় বিয়ের ক'দিন পূর্ব থেকে এবং বিয়ের পরেও তা চলতে থাকে। এই সব আচার অনুষ্ঠানের পশ্চাতে নবদম্পতির জীবনের মাঙ্গলিক দিকের চেয়ে বৈবাহিক অনুষ্ঠানকে উৎসব মুখর করে তোলাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য।[৭২]

(খ) পার্বণ কেন্দ্রিক উৎসব অনুষ্ঠান-

বাঙালি হিন্দু সমাজে 'বারো মাসে, তেরো পার্বণ' পালনের কথা প্রবাদ বাক্যের মতো শোনালেও এটিই বাস্তব ঘটনা, যা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে যেমন ছিল বর্তমান সমাজেও তাইই আছে। বৈশাখে প্রাতঃস্নান, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে চাতুর্মাস্যি ব্রত, শ্রাবণে মনসাপূজা, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে প্রাতঃস্নান ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অগ্রহায়ণে নবান্ন, মাঘে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুনে শিবরাত্রি ব্রত, চৈত্রে শীতলা পূজা ও বারুনী স্নান প্রভৃতি ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজের সাংবাৎসরিক ব্রতানুষ্ঠান যা আজও চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া শিব, ষষ্ঠী, কালিকা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজাতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে আনন্দ উপভোগ করে। তবে বাঙালি সমাজে সবচেয়ে বেশি উৎসব হতো এবং এখনও হয় দুর্গাপূজায়। বাঙালি হিন্দু সমাজে দুর্গাপূজা হল অনেকটা জাতীয় অনুষ্ঠান। সমাজের সকল সম্প্রদায়ের লোক এই উৎসবে যোগ দেয়। এই পূজানুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার বাদ্য বাজনা হয়, সঙ্গীত পরিবেশিত হয় এবং নর্তকীরা নৃত্য পরিবেশন করে। দেবীপূজায় মহিষ, ছাগল, মেষ

এবং রাজহাঁস বলি দেওয়া হয়। দোল উৎসব পালিত হয় বিশেষ ঘটা করে। এছাড়া গাজন ও চড়ক পূজা নিম্নবর্ণের ও সাধারণ জনজীবনে ব্যাপক উৎসবের সাড়া জাগিয়ে তোলে।[৭৩]

বাংলার মুসলিম সমাজেও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উৎসবাদি সম্পন্ন হয়। বিশেষ করে ঈদ, শবে-ই-বরাত, মহরম, বেরা ও হোলি উৎসব সাধারণ এবং উচ্চবিত্ত সমাজে মহা-ধুমধামের সাথে পালিত হয়। মুসলিম সমাজের অধিকাংশ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে চান্দ্রমাসের তারিখ অনুসারে। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে নমাজ বা এবাদতের থেকে লোকবিশ্বাসজাত অনুষ্ঠান পালনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার হিন্দু সমাজের দেখাদেখি মুসলিম সমাজেও 'হোলি' উৎসব পালন হয়। বাংলার হিন্দু-মুসলিম সমাজের এইসব উৎসব অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় উৎসব না বলে বাঙালির জাতীয় উৎসব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[৭৪]

পূর্বোক্ত এই সম্পূর্ণ আলোচনাটির মাধ্যমে বর্ধমান জেলার সর্বস্তরের মানুষের সামাজিক জীবনের একটি রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই জেলার মানুষের সমাজ জীবনের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়ের প্রভাব যেমন পড়েছে, তেমনই সর্বধর্ম সমন্বয় ঘটেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে সমাজেরই উপর। মানুষ হোল সমাজের অঙ্গ তাই কখনো জটিল আবার কখনো সরল রৈখিক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে মানুষের জীবন সামাজিক টানাপোড়েনের হাত ধরে। অর্থাৎ সমাজকে আশ্রয় করেই মানুষ যুগ যুগান্ত ধরে নিজের জীবনকে চালিত করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এর অন্যথা হবে না তা বলাই বাহুল্য। এরপর আসা যাক বর্ধমান জেলার অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনায়।

অর্থনীতি -

কোন জেলা বা অঞ্চলের ইতিহাসের কাঠামো ও সংস্কৃতি লোকায়তধারাকে উন্নততর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিশেষভাবে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠন ও জনসমষ্টির আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি বিধানের প্রয়োজন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্পকলা, সমাজ-জীবন, লোকশিল্প ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ে উন্নততর সোপানে উন্নীত হতে হলে আঞ্চলিক অর্থনীতি ও তার বিকাশের ধারা সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচারে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান ও উৎপাদনের উপায় নির্ভর করে সেই অঞ্চলের আর্থসামাজিক কাঠামোর উপর। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সঞ্চয়, কৃষি শিল্পের সমন্বয় ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই সামাজিক কাঠামোকে স্থিতিশীল অথবা দুর্বল করে দিতে পারে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিকীকরণের মাধ্যমে যেরূপ রাজ্যগুলির মধ্যে তুলনামূলক উন্নতি বা অবনতির মূল্যায়ন নিরূপণ করা সম্ভবপর, সেরূপ কোন রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে কৃষি, শিল্প, যানবাহন, জীবনযাত্রার মান ও সঞ্চয়ের হার ইত্যাদির উপর সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ধারণ করা যায়।[৭৫] কয়লাখনি বা কলকারখানা গড়ে ওঠার বহু আগে থেকেই বর্ধমান কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। একথা অনস্বীকার্য যে খনিযুগের আগে থেকেই বর্ধমান যদি ধনে ঐশ্বর্য্যে অগ্রগামী হয়ে থাকে তা কৃষিকার্যের জন্যই।[৭৬]

মধ্যযুগে বর্ধমান তথা সমগ্র বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। কারণ কৃষিই ছিল জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জীবিকা এবং উদ্বৃত্ত সামাজিক শ্রমের বিপুল সম্পদ কৃষি থেকে সংগৃহীত হতো। শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি। বর্ধমানে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল ধান। কারণ ভাত ছিল বাঙালির প্রধান খাদ্য। মোটা, সরু এবং অন্যান্য গুণের তারতম্যে ধানের জাত ছিল অসংখ্য প্রকারের।[৭৭] কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'শিব-সংকীর্তণ বা শিবায়ন' কাব্যের 'ধান্যের নাম' অংশে বিভিন্ন প্রকার ধানের উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

"হরিশঙ্কর হৈল্যা ধান্য হাথি পাঞ্জর হুড়া। / হরিকুলি হাতিনাদ হিঙ্গি হলুদগুঁড়া।।
কাল্যা কানু কাল্য জীরা কাল্যায়া কার্ত্তিকা। / কয়া কুট্টা কাশী ফুল কপোত কর্নিকা।।
কালিন্দী কটকী কুসুম শালী কনকচুর। / দুধরাজ দুর্গাভোগ পর্দ্দেশী ধুস্তুর।।"[৭৮]

পূর্বোক্ত ধানগুলি ছাড়াও প্রচুর ধানের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া ভারতচন্দ্র বিরচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তৃতীয় খন্ডে রন্ধন প্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে সেরা জাতের ষাট প্রকার ধানের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন-

"দলকচু ওলকচু ঘিকলা পাতরা। / মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা।।
কালিন্দী কনকচুর ছায়াচুর পুদি। / গুয়াশালি হরিলেবু গুয়াথুরি সুঁদী।।"[৭৯]

(অন্নদামঙ্গল কাব্য, তৃতীয় খণ্ড, রন্ধন অংশ)

ধান ছাড়া উৎপন্ন হতো পাট, শন, তিল, সরিষা প্রভৃতি। বাংলার কৃষকেরা অতি অল্প পরিশ্রমে তাদের জীবন-জীবিকার সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করতে পারতো। এর প্রধান কারণ হলো বাংলার মাটি ছিল ভীষণ উর্বর। কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলার শাসকদের মধ্যে একমাত্র নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সেচ ব্যবস্থার উপযোগী করে খাল খনন করান এবং কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করেন। ফলে তাঁর সময় দেশে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি

পায়।[৮০] চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন পরিব্রাজকের লেখা থেকে বর্ধমানের সমৃদ্ধির খবর পাওয়া যায়। প্রথমে কাঁকসা এবং পরে দামোদরের পথ ধরে বর্ধমান সম্পূর্ণভাবে ১৫৭০খ্রিঃ এরপর মুঘলদের হাতে চলে যায়। ১৫৮৩খ্রিঃ টোডরমল জমি জরীপ এবং জমির গুরুত্ব অনুযায়ী খাজনা নিরুপণ করেন। এই খাজনা ব্যবস্থা থেকে সেই স্থানের জমির উর্বরতা, সুযোগ সুবিধা বা অর্থনৈতিক অবস্থার কথা কিছুটা অনুমান করা যায়।[৮১]

মধ্যযুগীয় বাংলার অর্থনীতির চাবিকাঠি ছিলো কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য। প্রধান এই তিনটি দিকসহ তৎকালীন মুদ্রাব্যবস্থা, মুদ্রাসঙ্কট এবং সাধারণ মানুষের সকরুণ আর্থিক জীবনের অনুদ্ঘাটিত বিষয়ের ইঙ্গিত মেলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে।

মুঘল আমলে দেশে সুষ্ঠু মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ভারতে সুষ্ঠু মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন শেরশাহ্। মুঘল সম্রাট আকবর, সম্রাট শেরশাহ্ প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থাকেই সাম্রাজ্যের সর্বত্র কার্যকর করেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মোটামুটি একই মুদ্রা ব্যবস্থা চালু ছিল। অতঃপর মুঘল সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে মুদ্রা ব্যবস্থাতেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বাংলাতেও তার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। মুঘল সম্রাটের সময় স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র এই তিনপ্রকার ধাতু দিয়েই মুদ্রা তৈরি হতো। স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল 'মোহর' বা 'আসরফী', রৌপ্য মুদ্রাকে বলা হতো 'রূপেয়া' বা 'টঙ্ক'। 'টঙ্ক' থেকে বাংলায় 'তঙ্কা' বা 'টাকা'। 'টাকা' ছিল খাঁটি রূপোর তৈরি। তাম্র মুদ্রার নাম ছিল 'দাম'। 'দাম' প্রথমে পয়সা নামেও অভিহিত হতো। এতদসঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে সাধারণের ক্রয়- বিক্রয়ের মাধ্যমে হিসেবে 'কড়ি' ব্যবহৃত হতো।

এদেশে মুদ্রার নিম্নতম মান হিসেবে কড়ির ব্যবহার সুপ্রাচীন কাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এ কারণে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন কবির কাব্যে সাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে টাকার চেয়ে কড়ির যত্রতত্র ব্যবহারের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।[৮২] কবি ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকামঙ্গল' খন্ডে 'সুন্দরের মালিনী বাটী প্রবেশ' অংশে কড়িকে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হীরা মালিনীর কথার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে কড়ির গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে কড়ি দিলে সব কিছু পাওয়া যায়। হীরা মালিনীর উক্তি-

"কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই   বন্ধু নাই কড়ি কই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ায় বিয়া   কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে।।"[৮৩]

সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতাব্দীতে খাঁটি মুদ্রার সঙ্গে 'মেকী' মুদ্রাও চালু ছিল। এছাড়া বাজারে পুরাতন এবং নতুন উভয় প্রকার 'সিক্কা' টাকার প্রচলন ছিল। পুরাতন সিক্কাকে নতুন সিক্কায় বদলিয়ে নিতে জনগণকে বাট্টা দিতে হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিক্কা টাকার পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের টাকশালে মুদ্রিত নানা মানের টাকাও বাংলায় চালু ছিল। বিশেষ করে বাংলায় 'আড়কট' মুদ্রার যথেষ্ট প্রভাব ছিল।[৮৪]

অতীতে বর্ধমান কৃষির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমেও ধনলাভ করেছিল। ধনসম্পদে বর্ধমান যে চিরকালই রমরমা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কবি ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথমখন্ডে 'শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্‌যোগ' অংশে বলা হয়েছে-

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস   তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত্ত খচমচ।"[৮৫]

ইংরেজরা ১৬৪২খ্রিঃ বাংলায় শুল্কহীন যে কোনও রকম বাণিজ্যের অধিকার পায়। ১৬৯০খ্রিঃ পায় কলকাতা। ১৭৯৩খ্রিঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন জারী করার আগে জমিদার বা ইজারাদারদের জমিতে কোনও স্বত্ত্ব ছিল না, শুধু রাজস্ব আদায় করতো তারা। জমির মালিক ছিল রায়ত কৃষকেরা। বর্ধমান রাজের অধীনে এই সময় ছোট ছোট তালুক পত্তন হতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে ১৭৭০ এবং ১৭৮৭তে দামোদর এবং অজয়ের কোপে বন্যা কবলিত হয় বর্ধমান। বহু চাষি, এমনকি বর্ধমান রাজাও তাদের দেয় খাজনা বা কর বাকী রাখতে বাধ্য হয়। ক্রমে ১৭৯৯ থেকে ১৮২৫ এর মধ্যে পত্তনি তালুকের মাধ্যমে বর্ধমানরাজ রক্ষা পায়। ১৮২৫ এবং ১৮৫৫খ্রিঃ আবার দুটি বড় বন্যা হয়। বাঁকা, বেহুলা, ভাগীরথী, কানা, দামোদরে পলি জমে জলধারণের ক্ষমতা কমে আসে। ফলে প্রায়শই বন্যা দেখা দিতে শুরু করে। ১৮৬৫ এবং ১৮৭৪খ্রিঃ খরা অন্যান্য জেলার মতো বর্ধমানের মানুষকেও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ বর্ধমানেও ভূমিহীন কৃষক সৃষ্টি হয়।[৮৬]

১৭৭৪খ্রিঃ বর্ধমানে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেলেও, ১৮৫৩ পর্যন্ত তার ব্যবসায়িক উত্তোলন শুরু হয়নি। রানিগঞ্জ থেকে কলকাতা রেল যোগাযোগের সুবাদেই এই অঞ্চল শিল্প সমৃদ্ধ হতে থাকে। সিল্ক উইভিং শিল্পেরও

ব্যাপকতা ছিল (১৯০৮-১৯০৯খ্রিঃ)। কাটোয়া, মেমারী, জগদাবাদ এবং সদরেই সাধারণত এগুলি তৈরি হতো। তসরের কাপড় মেমারীতে এত সুন্দর হতো যে বোম্বাই, মাদ্রাজে পর্যন্ত এর ব্যাপক চাহিদা ছিল। সে সময়, বাইরে চালান দেওয়া থেকে স্থানীয় ভাবেই বিক্রি হতো বেশি। কাটোয়া, কালনার মাল অবশ্য কলকাতাতেই বেশি যেত। অনেক সময় চাষে যারাই রেশম উৎপাদন করতো, তারাই আবার কাপড় বুনত, ফলে সারা বছরই কিছু না কিছু কাজ তারা পেত। কালনা-কাটোয়ার দিকেই এ ধরনের শিল্পের বেশি সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁত শিল্পও বর্ধমানের বেশ কিছু জায়গায় পাওয়া যায়। পূর্বস্থলী, কালনা এবং মন্তেশ্বরেই এর ব্যাপকতা বেশি। তাঁতশিল্প সেই সময় খুবই লাভজনক ছিল। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বর্ধমানে সারা বছর চাষ হতো না। গরীব চাষিরা যারা লাঙল ধরত, অবসর সময়ে তারাই আবার হাতের কাজ করতো। যাঁরা শিক্ষার আলো পেলেন; তারা শহরে মহানগরীতে কাজের সন্ধানে যেতে লাগলেন। স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে আসছিল বর্ধমানে। দেশব্যাপী বহু বিদ্রোহ হয়ে যায় এই সময়ে। তবে কোনও বিদ্রোহই বর্ধমানের গায়ে আঁচড় কাটেনি। এর একটা কারণ বর্ধমানরাজ। অন্যান্য বড় জমিদারদের মতো এঁরা শুধুই কর আদায়কারী বা কোন ক্ষেত্রেই প্রজা উৎপীড়ক ছিলেন না, বরঞ্চ প্রজাদের পাশে থেকে সমস্ত সমস্যা সমাধান করেছেন।[৮৭]

স্বাধীনতার পরবর্তী ক্ষেত্রে রাস্তাঘাটের আসতে আসতে উন্নতি হয়। বিশেষত ৭০দশক থেকে প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে পর্যন্ত রাস্তাঘাট পৌঁছে গেছে। বহু নদীতে আগে পারাপারের অসুবিধা ছিল, স্থায়ী সেতু সেই সমস্যার সমাধান করেছে। গ্রামের মানুষ এখন আর সদর শহর বা মূল ব্যবসাকেন্দ্রে পৌঁছতে অসুবিধা বোধ করেন না। রেল, নদীপথ, সড়ক যোগাযোগ ভালো থাকায় আসানসোল, রানিগঞ্জ, বর্ধমান ব্যবসা-বাণিজ্যের ভালো কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় প্রথম থেকেই। মেমারী, কাটোয়া, কালনা, পানাগড়, গুসকরা গুরুত্বপূর্ণ বিতরণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। কাঠের ব্যবসাতেও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় এই সব কেন্দ্রগুলি। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর বর্ধিষ্ণু চাষিদের অনেকেই শহরে দোকান করা, এজেন্সী নেওয়া, হোটেল, ধানকল বা রাইস মিল প্রভৃতি ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে। মোটের উপর কলকাতা, শিলিগুড়ির পরই বর্ধমান এখন বড় ব্যবসাকেন্দ্র। বিশেষতঃ শহর বর্ধমান হুগলির কিছু অংশের, বাঁকুড়ার কিছু অংশের এবং বীরভূমের অনেকখানির ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি ডাক্তারি ব্যবসারও প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্ধমান।[৮৮]

ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিবর্তিত গতিপ্রবাহের ন্যায় আঞ্চলিক অর্থনীতির ধারাও পরিবর্তনশীল। সামাজিক যোগান ও চাহিদা অর্থনীতি বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করলেও মূলধন বিনিয়োগকারীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর এটি একান্তই নির্ভরশীল। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও মূলধন বিনিয়োগের ফলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ কৃষির উপর ততটা কার্যকরী নয়। অতীতে স্থানীয় উপশাসক, বণিক শ্রেণি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর আঞ্চলিক অর্থনীতির উন্মেষ ঘটত। কৃষি ও কৃষিজদ্রব্য উৎপাদনে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও বর্ধমানের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিক উন্নতি বিকাশ সকল সময়ে দেখা যায় নি। অষ্টাদশ শতকে বর্ধমান জেলার অর্থনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ মন্তব্য করেছেন- *"Throughout the eighteenth century burdwan was one of the most prosperous commercial districts of Bengal."* কিন্তু এই শতকের মধ্যভাগ হতে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পর শাসক শ্রেণির প্রভৃতি শ্রেণি চরিত্র বদল হলে উৎপাদনের ধারায় পরিবর্তন আসে। ফলে দেশিয় ও মহাজনদের সঙ্গে বৈদেশিক ব্যবসায়ীক মূলধনের বিরোধ দানা বেধে ওঠে।[৮৯] বর্ধমানের কৃষির উন্নতির প্রধানতম কারণ হল, ১৯৫৪খ্রিঃ পর বিভিন্ন সময়ে ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন ও সংশোধন। এছাড়া দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে একটা বিরাট অঞ্চলের কৃষক লাভবান হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করায় সারা বছর ধরে কৃষিকার্য সম্ভবপর হচ্ছে। এছাড়া গ্রামীণ বিদ্যুৎ, গভীর ও অগভীর নলকূপ, উন্নতমানের বীজ ও সার সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সমবায় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও সরকার কর্তৃক ঋণ ও অনুদানের ভিত্তিতে মূলধন যোগান ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করতে পেরে বর্ধমান আজ 'পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার' রূপে চিহ্নিত। ঊনবিংশ শতকে বর্ধমানে খনি, বৃহৎ ও ভারী শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা হলেও এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি ছিল না। কিন্তু বহু পূর্বকাল থেকে থেকে বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প, কুটিরশিল্প ও কারুশিল্পের দ্বারা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় ছিল। গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে শিল্প ও শিল্পীরা টিকে ছিল প্রধানতঃ নির্দিষ্ট পরিমাণে উপার্জনের ভিত্তিতে। সম্পদ সংগ্রহ ও তাকে মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করতে না পারলে আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর নয়। বর্ধমানের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে যথেষ্ট উন্নতির কথা প্রচার করা হলেও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এ চিত্র যথেষ্ট আশাপ্রদ নয়। রানিগঞ্জ, আসানসোল, বার্ণপুর, কুলটি ও খনি অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র শিল্প-শ্রমিক নিযুক্তির সম্ভাবনাও কম।[৯০]

বর্ধমান জেলার অর্থনীতি বিকাশের ধারার সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে স্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজবিন্যাসের পথ অনুসরণ করে আধুনিক শিল্প-

নির্ভরশীল অর্থনীতি ব্যবস্থায় উন্নীত হওয়ার প্রচেষ্টা হলেও আজ এ জেলার আর্থিক বুনিয়াদের মূল কৃষির উপর নির্ভরশীল। একই কারণেই, অতীতে রাষ্ট্রশক্তি কৃষিজ উৎপাদনের ভিত্তি করে ভূমি-রাজস্ব ও ভূমি-সংস্কার নীতি প্রয়োগ করেছিল যা আজও বলবৎ আছে। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সামগ্রিকভাবে এ জেলার অর্থনীতির পরিবেশের বিবর্তন ঘটায় ক্রমশঃ খনি ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠতে শুরু হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তনজনিত কারণে অর্থনীতিতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। কলকাতা শিল্পবলয় ও ধানবাদ খনি অঞ্চলের মধ্যস্থ বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলের অবস্থিতি এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সহায়ক পরিবহন ব্যবস্থা জেলার শিল্পাঞ্চলকে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করে চলেছে। নিবিড় চাষের মাধ্যমে সার, উন্নতমানের বীজ ও জলসেচের দ্বারা কৃষির উন্নতি বিধান করা হচ্ছে; কিন্তু এমন একটা সময় আসতে পারে যখন অত্যাধিক পরিমাণে খাদ্যোৎপাদনের ফলে জমির উর্বরতাশক্তি হ্রাস পেতে পারে। এ বিচারে সমগ্র অর্থনীতি একমুখী করে তোলার পরিবর্তে কৃষিভিত্তিক শিল্পের *(Agro-Industries)* বিকাশ ঘটানো উচিৎ ; কারণ পাটশিল্পে নৈরাশ্যজনক অবস্থার জন্য পাটচাষীরা বিপর্যয়ের মুখে। কৃষিজাত দ্রব্যের অসংগঠিত বিক্রির বাজার মূলধন ও পরিচালন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য তুলনামূলকভাবে কৃষিজাত পণ্য অপেক্ষা শিল্পজাত পণ্যের মূল্য অধিক এবং এরূপ অসামঞ্জস্য মূল্যমানের জন্য কৃষিনির্ভর অর্থনীতি কালক্রমে পরমুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হবে। ভারী ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের ফলে পরিবহন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হওয়া উচিত ছিল বাস্তবে, কিন্তু উন্নতমানের পথঘাটের অভাবে তা ঘটেনি। বর্ধমান জেলায় মোট ব্যাঙ্কঋণ অপেক্ষা আমানতের পরিমাণ অধিক এবং এই আমানতের একটা বিরাট অংশ বর্ধমানে ব্যবহৃত না হয়ে কলকাতা শিল্পবলয়ে চলে যাচ্ছে। শহরের জীবনযাত্রার মান নগরোন্নয়নের সুবন্দোবস্তের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বর্ধমানের উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে শহরগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না; সে কারণে শহরগুলির জন্য উন্নতমানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে শ্রমের মান, শ্রমিকের সংখ্যা, আবাসন প্রকল্প ও কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্প্রসারণের আশু প্রয়োজন। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য তথা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করতে হলে সর্বাগ্রে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা ও ব্যবহারিক কর্মশিক্ষার প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়।[৯১]

ধর্মীয় বাতাবরণ এবং সংস্কৃতি -

ধর্মীয় বাতাবরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গেলে সর্বাধিক প্রয়োজন হয় ক্ষেত্রসমীক্ষা। সেই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব। প্রত্নতাত্ত্বিক- সমীক্ষার দ্বারা জানা যেতে পারে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ধর্মস্থান সম্পর্কে, যেমন- মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বারা ইত্যাদি। আবার নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার দ্বারা জানা যায় বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। যেমন- সদ্গোপ, উগ্রক্ষত্রিয়, বাউরি, ডোম প্রভৃতি বিভিন্নবর্গের গোষ্ঠীগুলির ধর্মাচরণের প্রভৃতি জানতে হলে নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পেলেই চলবে না, সেই নিদর্শনের মধ্যে প্রতিফলিত ধর্মীয় জীবন ও সংস্কৃতির বাহক যারা, তাদের সম্বন্ধেও অনুসন্ধান আবশ্যিক।[৯২]

মধ্যযুগের বাঙালির ধর্ম-কর্মের এবং চরিত্রের সঠিক চিত্র অঙ্কন করা দুরূহ। কারণ বাঙালির সমাজ তখন ছিল নানা ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার, চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে ছিল স্বাতন্ত্র্য। এমনকি একই ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষের মধ্যেও আর্থ-সামাজিক কারণে ব্যবধান ছিল দুস্তর। এতদসত্ত্বেও সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কারে আবদ্ধ। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও ছিল যথেষ্ট ঐক্য। মধ্যযুগের সাহিত্যে বাঙালির ধর্ম-কর্ম ও চরিত্রের এই ঐক্য এবং অনৈক্য উভয় দিকের চিত্রই প্রতিভাত হয়েছে। আজ আমরা যাকে হিন্দুধর্ম বলি, প্রাচীন কালে এরূপ বলা হতো না। তখন এদেশিয় সমাজ ধর্ম-কর্মের দিক থেকে জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধ, বৈদিক, পৌরাণিক প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। ভারতে তুর্ক-আফগানদের বিজয়ের পর এই সব উপাসক সম্প্রদায় 'হিন্দু' এই বিশেষ নামে চিহ্নিত হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন "মুসলমানেরা ভারত অধিকার করার পর বিজিত ভারতবাসীকে এই নামে অভিহিত করে এবং এদেশের অধিবাসীদের সকলেরই ধর্মকে 'হিন্দু', এই সাধারণ সংজ্ঞা দেয়"। মধ্যযুগের বাঙালির হিন্দুধর্ম প্রাচীনকালের ধর্মেরই বিবর্তিত রূপ। প্রাচীনকালে অনার্য অধ্যুষিত বাংলায় প্রথমে অবৈদিক জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ, অতঃপর বৈদিক পৌরাণিক ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। গুপ্ত, পাল ও সেন আমলে এইসব ধর্মের সঙ্গে আর্যেতর ধর্মের মিশ্রণ এবং নানারূপ আবর্তন-বিবর্তনের ফলে শেষ পর্যন্ত সেন আমলে লোকজীবনের উচ্চতর পর্যায়ে পৌরাণিক ধর্ম আর নিম্নতর পর্যায়ে অনার্য প্রভাবিত লৌকিক ধর্মের চর্চা অব্যাহত থাকে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গে তুর্ক-আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসারের মুখে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্য রক্ষণশীল এবং পরিবর্তনশীল হিন্দু মতবাদীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে, তাদের সাধনা ও

প্রচেষ্টায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অস্তিত্ব টিকে যায়। তবে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে তাকে নানারূপ আবর্তন-বিবর্তনের অনিবার্যতা স্বীকার করে নিতে হয়। মধ্যযুগের স্মৃতি-নিবন্ধে এবং সাহিত্যে এই পরিবর্তনশীল পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিচয়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বঙ্গে তুর্ক-আফগানদের শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালি হিন্দুদের জীবনে যে অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয় তার কিছু প্রমাণ মেলে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যে। বাঙালির ধর্ম-কর্মের পরিচয় কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যেও পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়ের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, তৎকালে লোকজীবনে লৌকিকদেবী মনসা, চণ্ডী, বাশুলি প্রভৃতির প্রভাব ছিল অধিক। আর ছিল তান্ত্রিক প্রভাব। কৃষ্ণের নামে আরাধনা হলেও বৈষ্ণবের ভক্তি-ধর্মের প্রভাব তখনো সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। অর্থাৎ বাংলার সাধারণ জনজীবনে তখনো অনার্য সমাজ প্রভাবিত ধর্ম-কর্মের অনুসৃতি ও অনুশীলন হতো। মধ্যযুগের বাংলার লোক-জীবনে এইসব লৌকিক দেবদেবীদের প্রাধান্য ছিল। তুর্কি বিজয়ের ফলে হিন্দু সমাজের বর্গ সংযোগ ঘটে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত উচ্চবর্গের মানুষ, যারা সেন আমলে সাধারণ জনজীবন থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করতেন, তাঁরা এই সময় নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে হিন্দুসমাজ রক্ষার তাগিদ অনুভব করেন। এরফলে উচ্চবর্গের মানুষেরা নিম্নবর্গের আরাধ্য মনসা, চণ্ডী, শিব, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য স্বীকার করে নেন। ধীরে ধীরে এই সব অনার্য দেবদেবী পৌরাণিকত্ব লাভ করতে থাকে। উচ্চবর্গের লোকেরাই মনসা, চণ্ডী, শিব, শীতলা, ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, শীতলামঙ্গল এবং ষষ্ঠীমঙ্গল বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। এইভাবে মঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের লোক-জীবনে লৌকিক দেবদেবীর জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়।[৯৩]

বর্ধমান, প্রাচীন বাংলার একটি অন্যতম জনপদ হিসেবে পরিচিত ছিল। কিংবদন্তি অনুসারে 'বর্ধমান' নামকরণ হয়েছিল মহাবীর বর্ধমানের নামানুসারে। মধ্যযুগে জৈনদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। খুব সম্ভবত এঁরা পশ্চিম ভারত থেকে এসেছিলেন এবং পুরুলিয়া জেলার মধ্য দিয়ে বাংলার জনপদগুলিতে ছড়িয়ে পড়েন। জৈনদের অস্তিত্ব বর্ধমান জেলায় দুভাবে খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রথমত, আসানসোলের কাছে দোহোমনী নামক একটি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জৈন তীর্থঙ্কর ও দেবদেবীর মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রাচুর্য এত বেশি যে, তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আবার দোহোমনীতেই সরাক নামে একটি জাতির বসবাস ছিল। এই সরাক বা শ্রাবক নামে জাতির পূর্বপুরুষ ছিলেন জৈন। এঁদের ধর্মে কোন কোন হিন্দু দেবদেবীর পূজা দেখা যায়। যেমন- গণপতি ও লক্ষ্মী এঁদের দ্বারা পূজিত হন। সরাক নামে জাতিটির উল্লেখ বাংলার বর্ণ ও জাতি বিন্যাসে স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জৈনদের একটি শাখা সম্ভবত অবধূত পন্থীদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন।[৯৪]

বৌদ্ধধর্ম বর্ধমানে ঠিক কোন সময়ে প্রচার বা প্রসার লাভ করেছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। বর্ধমানে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে পানাগড় রেলস্টেশনের দক্ষিণে অবস্থিত ভরতপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের দ্বারা। সেখানে অষ্টম-নবম শতাব্দীর একটি বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই স্তূপ খনন করে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বর্ধমানে হীনযানী বা মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেনি। মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম যেমন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো বর্ধমানেও স্থান করে নিতে পেরেছিলো। তবে মনে রাখতে হবে যে, জৈনধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে প্রধানতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিষাদদের আপন ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি। এমনও মনে করা যেতে পারে যে পরবর্তীকালে আদিম জনজাতির ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে আপস করার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের যাঁরা প্রবক্তা সেইসব সিদ্ধাচার্যের মধ্যে অনেকেই নিম্নবর্ণোদ্ভূত হতে পারেন। তাঁদের দ্বারা রচিত চর্যাপদ গুলিতে তথাকথিত অসৎ শূদ্র বা অন্ত্যজদের উল্লেখ প্রায়শই দেখা যায়। বর্ধমানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন অবশ্য খুব বেশি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, অজয়-কুনুরের গর্ভ থেকে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। জয়দেব কেন্দু বিল্বর নিকটে প্রতাপপুরের দক্ষিণে পারুল গ্রামে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী জাঙ্গুলী তারার মূর্তি পাওয়া গেছে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী দেবীমূর্তি বৌদ্ধতান্ত্রিক কোন দেবী হতে পারেন, যদিও এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়ার ফলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্য আরও বিস্তৃতভাবে হলে হয়তো ভবিষ্যতে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবী সুনির্দিষ্ট ভাবে আবিষ্কৃত হতে পারে। অধিকাংশ পণ্ডিত এই বিষয়ে একমত যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম কৌলধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্টতর হতে হতে তার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে বৌদ্ধধর্মের আর কোন বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন- সহজিয়া, নাথ, অবধূত, বাউল প্রভৃতি। এইসব নব উদ্ভূত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বর্ধমান অঞ্চলে একেবারে

প্রচলিত ছিল না একথা বলা যায় না। কারণ বড়ুচণ্ডীদাস রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য থেকে জানা যায় যে, তিনি সহজিয়া ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত যাঁরা, তারা ছিলেন যোগ বিশ্বাসী। কালক্রমে তাঁরা ‘যুগী’ নামে পরিচিত হন। অবশ্য বর্ধমানে যুগী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। যাই হোক, বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের অবশেষ রূপে যেসব ধর্মবিশ্বাস এসেছিল তার প্রভাব বর্ধমানেও কমবেশি থাকা সম্ভব বলেই মনে করা যায়।[৯৫]

বর্ধমানে সূর্য ও গণপতির প্রভাব তেমন না থাকলেও বিষ্ণু, শিব এবং শক্তি সর্বত্র উপাসিত হতেন। অধিকাংশ শৈব, বৈষ্ণব ও শক্তি মূর্তি ও মন্দিরগুলি মধ্যযুগের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পশুপালক সমাজে পশুপতি শিবের উপাসনা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিবের সঙ্গে শক্তিও উপাসিতা হতেন।[৯৬] সৃষ্টির মধ্যে একটি সর্বজনীন শিব-শক্তির পরিকল্পনা পাওয়া যায়। অথর্ব বেদে পৃথিবীকে সন্তান বাৎসল্য মঙ্গলময়ী মাতৃদেবী রূপে বন্দনা করা হয়েছে। আবার কালিকা পুরাণে ইনিই ‘জগদ্ধাত্রী’ জগৎপালিনী, মার্কণ্ডেও পুরাণে ইনিই ‘চণ্ডী’ বা শাকম্ভরী বলে অভিহিতা হয়েছেন। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার ঐ মাতৃমূর্তির কথা ধরলে বলতে হয় শক্তিপূজা ও শাক্তধর্ম প্রাক্‌বৈদিক যুগের। শাক্তধর্ম ও শক্তিপূজার মাধ্যমে তন্ত্রসাধনা বর্ধমানে প্রাচীনতম ধর্মাচারন। খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে বর্ধমানে শক্তি পূজার চল ছিল। বহু তন্ত্রসাহিত্য এই বঙ্গেই রচিত হয়েছে। বর্ধমানকে তন্ত্রভূমিও বলা হয়। ‘কুব্জিকা তন্ত্র’এ পাওয়া যায়, এই বর্ধমানেই ৯টি ডাকার্ণব পীঠ অবস্থিত। উল্লেখ্য যে কর্ণসুবর্ণ, ক্ষীরগ্রাম, বৈদ্যনাথ, বিল্বক, কিরীট, অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট, উজানী ও অট্টহাসে এখনও সিদ্ধপীঠ আছে। এগুলি প্রাচীন সিদ্ধপীঠ। এই পীঠগুলিতে প্রস্তর নির্মিত দেবীমূর্তি রয়েছে এবং এই দেবীগুলি তন্ত্রোক্ত। উজানীর বর্তমান নাম কোগ্রাম, দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী। অট্টহাসের মহাসিদ্ধপীঠ আজ তান্ত্রিকদের কাছে তীর্থ স্বরূপ। আর ক্ষীরগ্রামে রয়েছেন দেবী যোগাদ্যা- বর্ধমানে এই তিনটি সিদ্ধপীঠেই মেলা ও পূজা হয়। বর্ধমানে আজ বহু গ্রামে কালী-করাল মূর্তি পূজিতা। বহু মূর্তি প্রাচীন, শত শত বৎসরের কালপ্রবাহে এই তন্ত্রসাধনাকে আধুনিক করেছে, কিন্তু প্রাচীন পূজা-আর্চ্চা ও অনুষ্ঠানকে সাগ্রহে বেঁধে রেখেছে। এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে শক্তিপূজা খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছরের প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান।[৯৭]

শৈবধর্ম থেকেই শাক্তধর্মের উদ্ভব। শৈব ও শাক্ত একটি অপরটির পরিপূরক। পৌরাণিক কাহিনি অনুসরণ করলে দেখা যাবে সকল দেবীমূর্তিই শিবের সঙ্গে যুক্ত এবং শিবেরই বিভিন্ন রূপিনী শক্তি। তাই বলা যায় শৈবধর্মের সঙ্গে শাক্তধর্মের একটা নিগূঢ় যোগ রয়েছে। শৈবধর্মেরই চূড়ান্ত পরিণতি হল শাক্তধর্ম। গুপ্ত পরবর্তী যুগে শৈবধর্মের ব্যাপক প্রসার শিব আরাধনার মধ্য দিয়ে ঘটে যায়। পাল বংশের একমুখী লিঙ্গ শিব বাংলার নানা স্থান থেকে পাওয়া যায়। পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে শিবঠাকুর বঙ্গের প্রায় প্রতিটি গ্রামে এখন বিভিন্ন নামে পূজিত হন। বর্ধমানে শ্রীধর্মদেবতার পূজা রামাই পণ্ডিতের বিধান। খ্রিস্টীয় দশম শতকের দিক থেকে রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা এতদঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। এই ধর্মপূজা আদিবাসী অধ্যুষিত এইসব অঞ্চলে সম্ভবতঃ বৌদ্ধত্বের অবশেষ রূপে বিদ্যমান। এই ধর্মপূজা এখনও নিম্নশ্রেণির মধ্যে চল রয়েছে। ধর্মঠাকুর বর্ধমানে এখনও হাড়ি, ডোম, পণ্ডিত (নমঃশূদ্র বা চাঁড়াল) দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। গ্রাম বর্ধমানে বর্তুলাকার ধর্মঠাকুর শালগ্রাম শিলা বা প্রস্তর শিলা কোথাও কোথাও নারায়ণ, বিষ্ণু নামে পূজিতা হচ্ছেন।[৯৮] এই ধর্মঠাকুর ‘শিবঠাকুর’ নামেও পূজিত হচ্ছেন। অনেক মূর্তি আবার শিবলিঙ্গ নয়- বর্তুলাকার, ডিম্বাকার প্রস্তর মূর্তি। এগুলি সবই সম্ভবতঃ বৌদ্ধাচারের প্রশাখা। অনার্যদের স্মৃতিচিহ্ন।[৯৯]

প্রাচীনকালের তুলনায় বাংলার মধ্যযুগে বর্ধমান অঞ্চলে ধর্মীয় বাতাবরণে বিশেষ রূপান্তর দেখা গিয়েছিল। সেই রূপান্তরের আরেকটি বিশেষ কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব। চৈতন্য প্রবর্তিত এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাঁরই সহচর নিত্যানন্দ এবং নিত্যানন্দের দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত শিষ্যরা। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের বণিকদের ঘরে ঘরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। সপ্তগ্রামী বণিক সমাজ শুধু সপ্তগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তাদের প্রতিপত্তি বর্ধমান জেলাতেও ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে। যাই হোক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নবদ্বীপে, কিন্তু তার প্রধান কর্মকান্ড ছিল কাটোয়া, কালনা, বাঘনাপাড়া ও শ্রীখন্ডে। শ্রীখন্ডের বৈদ্যরা বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বর্ধমানের কায়স্থরাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কুলিনগ্রামের মালাধর বসু। কেবলমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভু দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম নয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে আর একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এঁরা হলেন নিম্বার্কপন্থী। বর্ধমান শহরের নিকটবর্তী মোহন্তস্থলে এবং অন্ডাল থানার অন্তর্গত রানিগঞ্জের কাছে উখরা গ্রামে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। সুকুমার সেনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, বর্ধমান অঞ্চলে রামায়েত নামে একটি সম্প্রদায় ছিল। আসানসোলের নিকটে হনুমানের মন্দির ও মূর্তি আজও দেখা যায়। সম্ভবত মহাবীর হনুমানের উপাসকেরা রামায়েতপন্থী হতে পারেন। এ প্রঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলার

বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল একটি সামাজিক সংকট কালে। অধিকাংশ বাঙালি তখন স্মৃতি শাস্ত্রের কঠোরতা এবং তান্ত্রিকধর্মের গ্লানিকর পরিবেশ থেকে মুক্তিলাভের পথ খুঁজছিলেন। সেই পথের সন্ধান দিয়েছিল ভক্তিবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলন। মুক্তিকামী বাঙালির সামনে শুধু চৈতন্য নন, সুফি সম্প্রদায়ের পীর ফকির, এঁরাও নতুন ধর্মমত ও পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।[১০০]

মধ্যযুগে বর্ধমানে ধর্মীয় বাতাবরণে রূপান্তর উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা দিয়েছিল। বঙ্গদেশে পীর ফকিরদের উদার সুফী ধর্মমতের প্রভাবে অনেক বাঙালি হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায়, কুনুর ও অজয়ের অববাহিকায় মঙ্গলকোট মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। সুফিরাই বর্ধমানের প্রধান ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বর্ধমান শহরের মধ্যে আছে সুফি পীর বহরামের সমাধি। বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক চৈতন্য ও নিত্যানন্দের ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শের যথেষ্ট মিল ছিল। তাঁরা সকলেই মনে করতেন যে, ঈশ্বর বা আল্লার প্রকৃত ভক্তদের মতে কোন ভেদাভেদ নেই এবং সেই আদর্শ অনুসারে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ও সম্প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উপলক্ষ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিন্দু মুসলমান ধর্ম সংস্কৃতির মিশ্রদেবতা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পূজা লাভ করেন। সপ্তদশ থকে ঊনবিংশ- বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু কবি সত্যনারায়ণের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঁচালি রচনা করেছিলেন। এছাড়াও বর্ধমান জেলায় বহু কবি পাঁচালিকার ছিলেন। শোনা যায় শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরুনানক ১৫১০খ্রিঃ বর্ধমানে আসেন। বলা বাহুল্য, নানকও ছিলেন ধর্ম সমন্বয়ের প্রবক্তা। তাঁর প্রচারিত শিখধর্মের নিদর্শন রয়েছে বর্ধমান শহরে দুটি গুরুদ্বারাতে- একটি শ্যামবাজারে, অন্যটি জি. টি. রোডের ধারে।[১০১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বর্ধমানে খ্রিষ্টধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। ১৮১৬খ্রিঃ বাংলাসহ বর্ধমান শহরে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য চার্চ মিশনারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৫খ্রিঃ কালনায় একটি গির্জা নির্মিত হয়। ১৮৩১খ্রিঃ অ্যাংলিকান চার্চ নামে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের একটি গির্জা বর্ধমানে নির্মিত হয়। তাছাড়া বর্ধমান জেলাতে অনেক নীলকুঠীও ছিল। নীলপুর, বীরহাট্টা, কাছারি রোড, সাধনপুর এলাকায় খ্রিস্টান সাহেবরা থাকতেন। তাঁদের প্রয়োজনেই গির্জাগুলি নির্মিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে বর্ধমানে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। তবে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব বর্ধমানে স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। বর্ধমানের ধর্মজীবনের স্বরূপটির সন্ধান পাওয়া যাবে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির যোগাযোগ, আদান- প্রদান ও সমন্বয় দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে যারা অন্ত্যজ নামে বর্ধমান তথা বাংলার সমাজে অবস্থিত তাঁদের মাধ্যমে আদিবাসী ধর্মের সর্বপ্রাণবাদ *(Animism)* এবং পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা এবং তার সঙ্গে যুক্ত আচার- অনুষ্ঠানাদি পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেবতার পূজার জন্য সর্বদা মূর্তির প্রয়োজন হয় না, পূজা হয় অনেক সময় ঘটে ও পটে। গ্রামদেবতার পূজার আয়োজনের জন্য সর্বদা মন্দিরের প্রয়োজন হয় না। গ্রামাঞ্চলে গাছতলার 'মায়ের থান' খুবই পরিচিত ধর্মস্থান। তাছাড়া পুকুরপাড়ে, মাঠের মধ্যে, শ্মশানে যখন যেখানে সুবিধাজনক সেখানেই এইসব দেবতার পূজা হয়ে থাকে। লক্ষণীয় এই যে, আর্থ- সামাজিক বিবর্তনের আদিমতম স্তর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ যে সব বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে এসেছে তার প্রতিফলন গ্রামদেবতার পূজা ও প্রার্থনার মধ্যে প্রতিফলিত। যে উদ্দেশ্য নিয়েই পূজার সূত্রপাত হোক না কেন, পরবর্তীকালে এইসব পূজা 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'এর চেহারা নিয়েছিল। এইসব পূজাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয়েছে উৎসব ও মেলা। মানুষ ধর্মবিশ্বাসের স্তর থেকে ক্রমশ উত্তীর্ন হয়েছে একটি সামাজিক উৎসব আনন্দের স্তরে এবং সেই সব উৎসবের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে মানুষের মিলনক্ষেত্র। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়নবি বলেছিলেন, 'ধর্মের দ্বারা সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়'। বর্ধমানের ধর্মীয় বাতাবরণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক কথিত সেই সত্যকেই অনুধাবন করা যায়।[১০২]

ধর্মীয় বাতাবরণকে এক অর্থে সাংস্কৃতিক বাতাবরণও বলা যায়। কারণ ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ধর্মতত্ত্ব' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, *'The substance of religion is culture'*. উক্তিটি সীলীর *(Seeley)*, ভারতের ক্ষেত্রে এই উক্তিটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। ধর্ম আচরণে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি দেশের সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে।[১০৩] সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি, যা স্থায়ী ও পুরাতন এবং যার মধ্যে আমাদের জাতির, ধর্মের লোকাচার বা স্থানের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সংস্কৃতি বলতেই আমরা বুঝতে পারি পুরাতন যা চলে আসছে, যার মধ্যে আছে শালীনতা, সভ্যতা এবং ভব্যতার লক্ষণ এবং তারই সঙ্গে আমাদের গৌরব।

বর্ধমানের সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি রাঢ় অধ্যুষিত বঙ্গের সংস্কৃতি, কারণ বর্ধমান রাঢ় অধ্যুষিত বঙ্গের কেন্দ্রস্বরূপ। রাঢ়ের রাঙামাটির সঙ্গে অধুনা পশ্চিমবঙ্গের শুধু নয় সমগ্র বাংলার উত্থান পতনের ইতিহাস বিজড়িত।

আমাদের ইতিহাস আমাদের সভ্যতা, আমাদের শিক্ষা, কৃষ্টি সবই আমরা বুঝতে পারি এই সংস্কৃতির মাধ্যমে, তাই রাঢ়ের সংস্কৃতি আমাদের গৌরব।[১০৪]

আচার্য সুনীতিকুমার *'Culture'* বা সংস্কৃতি শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, *'Civilization'* বা সভ্যতা বলতে ব্যাপকভাবে উৎকর্ষ প্রাপ্ত বা উন্নত মানব সমাজের বহিরঙ্গ- তার উন্নত জীবন যাত্রার পদ্ধতি, তার সামাজিক রীতিনীতি, তার রাষ্ট্রনীতি, তার রূপ শিল্প, বস্তুশিল্প, পূর্ত, সাহিত্য ও ধর্ম এ সকলকে বোঝায়, এবং *Culture* বা সংস্কৃতি অর্থে উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি যথা, তার অধিমানবিক, তার আধ্যাত্মিক জীবন, তার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশভঙ্গি, তার সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধ- তার বাহ্য সভ্যতার আভ্যন্তরীণ প্রাণবস্তু, মুখ্যতঃ তাই বোঝা যায়। এককথায় সভ্যতা তরুর পুষ্প এই সংস্কৃতি।[১০৫]

রাঢ়ে আর্যসংস্কৃতির বিস্তার খ্রিষ্টপূর্ব যুগে হয়েছিল। সুপ্রাচীন আর্য সাহিত্যে পুন্ড্র ও বঙ্গের মতন সুক্ষ রাঢ়ের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। শিলালিপি যা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দের লিপি। তাতে মনে হয়, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত আর্যীকরণ আরম্ভ হয়েছে। চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের জৈন 'আচারঙ্গ সূত্র'এ সর্বপ্রথম সুক্ষ্ম ও রাঢ়ের নাম পাওয়া যায়। তার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে বন্যবর্বর সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। কেবল আর্য ধর্মসংস্কৃতির নয়, বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতিরও প্রসার বাংলায় এই ধারায় হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, প্রথমে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে, পরে পশ্চিমবঙ্গে। প্রায় ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আর্যসংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্যসংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে পশ্চিমবঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির একটা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। তার দিগন্তরেখা আদি প্রস্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্বের নানারকমের আয়ুধ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেও পাওয়া গেছে। ছোটোনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের উচ্চভূমিসীমা পর্যন্ত প্রধানত আদি অষ্ট্রাল বা নিষাদ জাতির বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিকার, পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি নানাস্তরভুক্ত ছিল এই সংস্কৃতি।[১০৬]

বর্ধমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে বর্ধমানের সংস্কৃতিকে বঙ্গ-সংস্কৃতি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। তবে রাঢ়ের মধ্যভাগে অবস্থিতির দরুণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্ধমান জনপদের মানব সমাজকে সমন্বয়ের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হয়েছে। আবার এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েও পৃথক ভৌগোলিক পরিমন্ডলে (ক্ষুদ্রঅর্থে) অবস্থিতির জন্য কেতুগ্রাম, সালানপুর, চিত্তরঞ্জন, কুলটি প্রভৃতি থানা এলাকার সঙ্গে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া ও মানভূমের সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। আবার নবদ্বীপ ও আরামবাগের সঙ্গে বর্ধমানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নদীয়া ও হুগলি জেলা অপেক্ষা ঘনিষ্টতর। বর্ধমানের মানব সমাজ গ্রহনের পরিবর্তে বিতরণ করেছে অধিক এবং সকলকে গ্রহণ করার গুণগত উৎকর্ষই তাকে করেছে শ্রেষ্ঠ ও মহান। আবার ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জেলার পশ্চিম অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন বিহার রাজ্যের আদিবাসীদের ভাবধারাকে গ্রহণ করেছে। এমন একদিন ছিল, যেদিন এর আদিম অধিবাসীরাই সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশীদার। বিদেশাগত মুসলমানগণ প্রথমে বিজেতারূপে আবির্ভূত হলেও বর্ধমানের সরস মাটিতে তারাও জনজীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। আবার পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের সঙ্গে আধ্যাত্মবোধ, রুচিবোধ, শিল্পচেতনা, ধর্ম, সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনধারার ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হওয়ায় বর্ধমানের সংস্কৃতিকে রাঢ় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বললেও অত্যুক্তি হয় না।[১০৭] বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব প্রত্ন-নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ক্রমপরম্পরাকে ধরে রেখেছে এই জেলা। সভ্যতার বিকাশের স্পষ্ট নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে জেলা জুড়ে। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা বর্ধমানে মধ্যযুগে যে উচ্চতায় উঠে এসেছিল, সেই উচ্চতা এই যুগে আর আয়ত্ত করা যায়নি।[১০৮]

বর্ধমানের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রপাত খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে নয়। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি। তারই পাশাপাশি রচিত হয়েছে চৈতন্যজীবনী কাব্য যেমন- চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি। সেইসঙ্গে রচিত হয়েছে অনুবাদ সাহিত্য যেমন- ভাগবত, পুরাণ কে অবলম্বন করে মালাধর বসু রচনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য। এছাড়াও বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখযোগ্য। কাঞ্চননগরের গোবিন্দদাসের কড়চা সুপরিচিত।[১০৯] বর্ধমানের সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, মঙ্গলকাব্যের অনেক কবিই বর্ধমান থেকে উঠে এসেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী, দ্বিজ হরিরাম, অকিঞ্চন চক্রবর্তী; মনসামঙ্গল কাব্যের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, রসিক মিশ্র, কালিদাস, সীতারাম প্রমুখ; ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি রূপরাম, মানিকরাম গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী, যাদবরাম নাথ বা যদুনাথ, সীতারাম দাস, ময়ূরভট্ট এবং কালিকামঙ্গল কাব্যের অকিঞ্চন চক্রবর্তী, কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী প্রমুখ কবিগণ এই বর্ধমানের লাল মাটির

সন্তান। সমাজ, সংস্কার, আধ্যাত্মিক ভাবভাবনা এইসব কবির লেখায় সুপরিস্ফুট। রাষ্ট্রীয় দমন, পীড়ন যে বারে বারেই জৈবিক ও সামাজিক নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেছে, এসব লেখায় তার পরিচয় কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষে দেওয়া রয়েছে।[১১০] এছাড়াও অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বৈষ্ণব সাহিত্যের মূলধারাটিকে যেসব সংস্কৃত পণ্ডিত কবি ও পদ কর্তাগণ বাৎসল্যরসের পবিত্র ধারার মধ্যে দিয়ে ধরে রেখেছিলেন, তাঁদের বৃহত্তম অংশই ছিলেন বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার অধিবাসী।[১১১] চৈতন্য জীবনীকার বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রমুখ কবিগণ যাঁরা বাংলা সাহিত্যের এক একটি শ্রেষ্ঠ অলংকার, তাঁরা সকলেই এই জেলার মানুষ। এই সমসাময়িক কালের যাত্রাপালাকার ও অধিকারী মতিলালের জন্মস্থান ছিল বর্ধমানের ভাতছালা। পাঁচালি গানের অন্যতম স্রষ্টা দাসু রায়ের জন্মস্থান কাটোয়ার বাঁদমুড়া গ্রাম।[১১২]

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্ধমান রাজসভার আশ্রয়ে ব্যাপক সাহিত্য কর্ম হয়েছিল। যা বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণতা দিয়েছিল। এ সম্পর্কে আচার্য সুকুমার সেনের মন্তব্য, 'সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্ধমান রাজসভার আশ্রয়ে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কলকাতার সৃষ্ট সাহিত্যের সম্যক প্রতিযোগী' (বর্ধমানরাজ আশ্রিত বাংলা সাহিত্য,প্রথম খণ্ড,ডঃ আবদুস সামাদ, মুখবন্ধ)। অনুবাদ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধমান রাজপরিবার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৫৪ খ্রিঃ বর্ধমান রাজসভা থেকে বাল্মীকি রামায়ণের আদি কান্ডের পদ্যানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শুধু রামায়ণই নয়, মহাভারতের বঙ্গানুবাদে উর্দু- ফারসি ভাষার বিভিন্ন গল্প সাহিত্যের বাংলা অনুবাদও প্রকাশ হয়েছিল বর্ধমান রাজসভা থেকে। উর্দু- ফারসি থেকে বাংলায় যে সমস্ত গল্প বর্ধমান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল 'হাতেম তাই'। সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার দায়িত্ব পালন করে গেছেন বর্ধমান জেলার অধিকাংশ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ। বর্ধমান জেলার এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থাতে প্রায় দুশোটির মতো চতুষ্পাঠী ছিল। বাচস্পত্য অভিধান রচয়িতা কালনা নিবাসী তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শাকনাড়ার প্রেমচন্দ তর্কবাগীশ তাঁদের সাহিত্য সাধনা অধ্যাপনায় প্রভৃতি কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।[১১৩]

বর্ধমান জেলার সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যদি বর্ধমানের লোকায়ত সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা না করা হয় তাহলে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই এইবার আলোকপাত করা যাক বর্ধমান জেলার লোকায়ত সংস্কৃতির উপর।

লোকায়ত সংস্কৃতি -

এই যন্ত্রযুগেও 'বর্ধমানের সংস্কৃতি' বলতে লোকায়ত সংস্কৃতিকেই বোঝায়। এখনো এই একবিংশ শতাব্দীতেও এর গ্রামগুলি গ্রামই আছে আর শহরগুলি নামেই শহর। অন্তরে- বাহিরে সেই লোকায়ত সংস্কৃতির সমান পদচারণা। তথাকথিত নাগরিক কালচারের স্বদম্ভ পদক্ষেপ এইসব সমাজের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। সারা জেলা জুড়ে নিম্ন হিন্দু কিংবা সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, কোড়া প্রভৃতি আদিবাসী ও জনজাতি বসবাস করে, তাদের জীবনে সেই সুপ্রাচীন লৌকিক রূপটিই বর্তমান। শহরগুলিতে কিছু কিছু নাগরিক কালচারের ছিটেফোঁটা যে লাগছে না, তা নয়- কিন্তু সত্তর লক্ষ জেলাবাসীর সামগ্রিক সংস্কৃতিটি একেবারেই লোকায়ত। এবং তা আদৌ নাগরিক *(Urban)* বা শহুরে সংস্কৃতি নয়। এই লোকায়ত সংস্কৃতি বড় বৈচিত্র্যময়, আস্বাদময়। তার নানা শাখা, যেমন- গান, নাচ, নাটক, পূজার্চনা ও সাহিত্য। তেমনি শিল্পকলা, চিকিৎসা, তন্ত্রমন্ত্র, কথকতা এবং সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা ও আচার- বিচার।[১১৪] এছাড়া মেলা ও উৎসব হল লোকায়ত সংস্কৃতির একটি অন্যতম দিক।

প্রথমেই আসা যাক, লোকায়ত সংগীতের কথায়। প্রাচীন বর্ধমানের গতিশীল লোক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ছিল লেটোগান। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গানের বহুল প্রচার ছিল। এরপরে গতিধারায় বদল হয়ে আসে কীর্তন গান, কথকতা ও পাঁচালি গানের মধ্যে। সমগ্র দক্ষিণ দামোদর জুড়ে ঝুমুর গান, বোলান গানের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। বাউল গান সংস্কৃতির অন্য একটি অঙ্গ হিসেবে গ্রামীণ পল্লী জীবনকে জাগিয়ে রেখেছিল, একথা অনস্বীকার্য।[১১৫] পিতামহ- পিতামহীরা নিজেদের সমগ্র ভালোলাগা- মন্দলাগাকে, সুখ- দুঃখ- যন্ত্রনা- ব্যাথাকে, আনন্দ- উল্লাসকে গানে গানে মূর্ত করেছিলেন। লৌকিক দেবদেবী যেমন- মনসা, শিব, চণ্ডী, ধর্ম, সত্যপীর, বিশালাক্ষ্মী, এমনকি ঘেঁটুকে নিয়েও অসংখ্য গান হয়েছে। এমনি করে এসেছে বহিরাগত ভাদুগান, টুসুগান, ধুলোট, বাদাই গান প্রভৃতি। পরবর্তীকালে এসেছে পাঁচালি, কবিগণ, ঢপকীর্তন। এছাড়া পাই বিয়ের গান, হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক গান; লৌকিক অনুষ্ঠানের গান, আচার বিচার প্রথার গান। এছাড়া পাওয়া যায় নানা কর্মসংগীত- ছাদ পেটানোর গান, বাঁদর নাচের গান, সাপ খেলার গান, বহুরূপীদের সাজ দেখানোর গান প্রভৃতি। বর্ধমানের নানা স্থানে নানা রকমের

লোকনাটক ছিল। এ জেলায় প্রসিদ্ধ লোকনাট্যের নাম 'লেটো'। এছাড়া 'বোলান যাত্রা', 'বিষহরা যাত্রা', 'ডোমনী', 'আলকাপ', 'মেছানি' প্রভৃতি।

বর্ধমান জেলার লোকনৃত্য প্রচুর। একেক স্থানে একেক রকমের নাচ। সেগুলি হল- রণপা, রায় বেঁশে, কাঠিনাচ, ঘোড়ানাচ, বাঘনাচ, লেটোনাচ, ইঁজল পিঁজল নাচ, আগুন নাচ, ঝাঁপান নাচ প্রভৃতি। এছাড়া সাঁওতালদের আছে লাগড়ে নাচ, দংনাচ, ঝিগা নাচ, করম নাচ, ডুংগার নাচ, ডাঁসাই নাচ প্রভৃতি। উৎসবে, পার্বণে, গ্রামদেবতার পূজায়, অন্নপ্রাশনে, বিয়েতে এমনকি এয়ো নারীর মৃত্যুতেও নাচের ব্যবস্থা ছিল।[১১৬]

এরপর আসা যাক লোকসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায়। লোকসাহিত্য লোকমুখ থেকে সংগ্রহ করা হয়। রচনা প্রধানতঃ একজনের হলেও সমগ্র সমাজের মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এটিকে নিজের মতো করে নেয়। আমাদের সমাজ জীবনের উপর লোকসাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। শিশুকাল থেকে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর সমাবেশ দেখা যায় লোকসাহিত্যে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, লোকশ্রুতির সকল বিষয়ই মূলতঃ ব্যক্তি বিশেষেরই সৃষ্টি, তারপর সেখান থেকে জনসাধারণ তা গ্রহণ করে এবং ক্রমাগত কথনের ফলে নূতন করে পুনর্গঠিত হয়। এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তন ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়ে তা পরিনামে এক সামগ্রিক রূপলাভ করে। ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া, মেয়েলী ব্রতের ছড়া ইত্যাদি লোকসাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ। শিশুদের ভুলানোর ছড়াগুলিই 'ছেলে ভুলানোর ছড়া' নামে সংজ্ঞা লাভ করেছে। বর্ধমানের ছড়াগুলি আবার একেক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল, তাই সেগুলি কিছুটা আঞ্চলিক দোষে দুষ্ট। এই জেলায় প্রচলিত কিছু ছড়া রাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য জেলায় এবং বাংলার কয়েকটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে এমন প্রমাণ বিদ্যমান। মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির অধিকাংশই কৃষি ভিত্তিক অর্থাৎ কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বর্ধমান জেলায় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো মেয়েলী ব্রত পালনের প্রচলন আছে। মেয়েলী ব্রত অধিকাংশ অশাস্ত্রীয় পর্যায়ভুক্ত এবং এটিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা- কুমারী ব্রত, সধবা ব্রত ও বিধবা ব্রত। মেয়েদের যতগুলি ব্রত আছে তার মধ্যে সাঁজপূজনী ব্রতের যোগাড়ের আধিক্য ও সমারোহ অধিক। প্রচলিত ব্রতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- পুণ্যিপুকুর, পদ্মপাতা, দশপুতুল, হরিচরণ, যমপুকুর, সাঁজপূজনী, তোষলী, ইতু প্রভৃতি। মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট হল ব্রতের ব্যবহারিক বিষয়গুলি লুপ্ত হলেও ছড়াগুলি কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্ধমানে প্রাপ্ত ও প্রচলিত ব্রতের ছড়াগুলির ভাষা প্রাচীন নয়; কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ভাবগুলি প্রাচীনত্বকে ধরে রেখেছে।[১১৭]

লোকসংস্কৃতির একটি অংশ জুড়ে আছে মন্ত্র। তবে তা বৈদিক পৌরাণিক মন্ত্র নয়। প্রধানত সাপের বিষ থেকে রক্ষা পেতে গুনীনেরা তা ব্যবহার করতেন। মধ্যযুগীয় কবি রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লাউসেনকে সাপে কামড়ালে কর্পূর লাউসেনকে হাতে তাগা বেঁধে মন্ত্র পড়ে বিষ ঝেড়ে দিয়েছে দেখা যাচ্ছে।

"শীঘ্রগতি লাউসেনে কর্পূর কোলে নিল। / লল্লাট নিঃসলে তাগা বান্ধিতে লাগিল।।
তাগা বান্ধি কপালে আপনি বিষ ঝাড়ে। / ঘুমে সকাতর বীর অঙ্গ নাই নাড়ে।।
মন্ত্র পড়ি ডাক্যা বলে কর্পূর পাতর। / যেখানে উড়িল বিষ সেইখান মর।।
লল্লাট নিকট বাড়ে খনে খন। / নিদ্রা ভাঙ্গি লাউসেন উঠিল তখন।।"[১১৮]

বাংলার সমাজ চিরদিনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অলৌকিক যাদুমন্ত্র, মন্ত্রেতন্ত্রে বিশ্বাসী। এই মন্ত্রগুলোর কোন সাহিত্যমূল্য নেই। সাধারণত দীর্ঘদিন রোগভোগ, নজরলাগা, কাউকে বশীভূত করা কিংবা কল্যাণসাধন, ঘর বা ভিটে বাঁধা প্রভৃতিতে লৌকিক মন্ত্রের প্রচুর ব্যবহার ছিল। নিতান্ত সাধারণ মানুষের সৃষ্টি এই মন্ত্রগুলি জনজীবনকে হাজার হাজার বছর ধরে প্রভাবিত করেছিল তা অনস্বীকার্য।[১১৯]

বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে, শিল্পের উদ্দেশ্য হল স্রষ্টার সৃজনমূলক মানসিকতা ও সৌন্দর্যবোধকে ব্যবহারের উপযোগী করে ফুটিয়ে তোলা। সমাজ জীবনের রীতিনীতি, আচার- আচরণ, ব্যবহার, ধর্ম, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতির বিধিবদ্ধ ও সংমিশ্রণ হল সংস্কৃতি। বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে গ্রামীণ সমাজের সমষ্টিগত প্রয়োজনে, ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে লোকশিল্পের। ডঃ নিহাররঞ্জন রায় লোকশিল্পকে লোকায়ত শিল্প বলেছেন।[১২০]

বর্ধমান শিল্পের দেশ। বিচিত্র লোকশিল্পে এই জেলা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তারমধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য- কাটোয়ার শোলাশিল্প, নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল শিল্প, দরিয়াপুর ও একলক্ষ্মীর ডোকরা শিল্প, আউসগ্রামের বাঁশ- বেত শিল্প, পানুহাট- দাঁইহাট- একহাটের তাঁতশিল্প, বর্ধমান- শক্তিগড়- মানকরের মিষ্টান্ন শিল্প ও কাঞ্চননগরের ছুড়ি- কাঁচি শিল্প। পট শিল্পেও বর্ধমান পিছিয়ে নেই। কালনা, বাঁধমুড়া, ভুলকুরি, তরাল, সেনপাড়া প্রভৃতি গ্রামে এখনও নানা রকমের পট নির্মিত হচ্ছে। মিষ্টির অভিনবত্বকে যদি শিল্প বলি, তাহলে বর্ধমানের সীতাভোগ- মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, মানকরের কদমা, আসানসোল অঞ্চলের অমৃতির কথা স্মরণ করতে হয়। বর্ধমানের মেলায় গেলেই মাটি,

বেত, কাঠ, পেতল, বাঁশ, পাথর ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত বিচিত্র শ্রেণির শিল্পধারা যে কোন শিল্পরসিককে এখনও আকর্ষণ করে।[১২১]

অবশেষে আসা যাক, বর্ধমানের মেলা ও উৎসব সম্পর্কিত আলোচনায়। মহামিলনের সাগরতীরের ক্ষুদ্রসংস্করণ 'মেলা' হল একটা সামাজিক মিলনক্ষেত্র। কৃষিজ অর্থনীতির লেনদেন, সামাজিক বন্ধন ও ধর্মীয় চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মেলাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। মেলা ও উৎসবের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার কোন মৌলিকত্ব না থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যদি সমগ্র জেলার সামাজিক ও ধর্মীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহলে দেখা যাবে যে, প্রাচীন সভ্যতা, আদিবাসী ও উপজাতীয় বিশ্বাস, মধ্যযুগের কৃষি ও সভ্যতা, গ্রামীণ মূল্যবোধ, নগরজীবনের প্রভাব, পরিবহণের দ্রুততা ও শিল্প-অর্থনীতির বিকাশ বিভিন্ন স্থানের উৎসব, পূজাপার্বণ ও মেলার পুরাতন রূপকে বেশ কিছুটা পরিমাণে প্রভাবিত করতে পেরেছে। জেলার মেলাগুলি এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। জেলাটির মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অঞ্চলে বিবিধ ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার বিশেষ ধর্ম ইত্যাদি উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে। বর্ধমানের মেলাগুলি কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের হলেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অবদান যথেষ্ট এবং এর প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা যায়। স্থানীয় কামার, কুমোর, ছুতোর, পটুয়া, ডোম, জেলে প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে কারুশিল্পের উদ্ভাবনী কৌশল আয়ত্ত করে একদিকে যেমন বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন কৌশল প্রদর্শন করে থাকে, অপরদিকে বিক্রয়জাত দ্রব্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত মূল্য তাদের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সাবলীল করে তুলতে সাহায্য করে। কতকগুলি দোকান পসারী চালা বেঁধে এক জায়গায় বসলেই মেলা হয় না। গঞ্জ, হাট ও মেলার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগতভাবে বিশেষ পার্থক্য আছে। মেলার প্রাণকেন্দ্র হল উৎসব। শাক্ত, ব্রাহ্মণ্য, শৈব, বৈষ্ণব, মুসলমান ও আদিবাসী গোষ্ঠীর বিভিন্ন সময়ে পূজা-উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' কথাটির বিশ্লেষণ করলে মেলার উৎস ও প্রচলনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।[১২২]

এই জেলায় মেলা যে কত আছে, তার হিসেব দেওয়া কঠিন কাজ। শুধু শিবকে নিয়েই মেলা আছে দুশো, এছাড়া মনসা, ধর্মঠাকুর, কালী, চণ্ডী বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীদের নিয়ে অগণিত মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমানে অসংখ্য স্থানে পীরের মেলা হয়। সালানপুর, কুমিরকোলা, তাহেরপুর, ধাত্রীগ্রাম, মাধাইপুর, জালুইডাঙ্গা, কুমিরডাঙ্গা প্রভৃতি নদীতীরবর্তী স্থানগুলিতে প্রধানত ধর্মবিশ্বাসী নরনারীরাই পুণ্যস্নান করে স্নানকে ঘিরেই মেলা বসায়। মেলা বলতে আমরা সাধারণত এমন লৌকিক মেলাগুলিকেই বুঝি, যেগুলির মূলে আছে নিতান্ত সাধারণ মানুষের নাড়ী ও হৃদয়ের যোগ। তবে বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভাসিত মেলাগুলিও জনসাধারণকে কম টানে না- যেমন, বর্ধমান শহরের শ্রাবণী মেলা, কৃষ্ণসায়রের পরিবেশকানন মেলা, মেমারী-মানকর-আসানসোল প্রভৃতি স্থানের রামকৃষ্ণ, সুভাষ, নজরুল প্রমুখের নামাঙ্কিত মেলা।

লোকসংস্কৃতিতে ভীষণ সমৃদ্ধশালী জেলা বর্ধমান। তার মন্দির-ভাস্কর্য যেমন বিচিত্র সম্পদে বর্ণময়, তেমনি তার লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ধারাগুলি বিলুপ্তির পথে এসেও এখনও মানুষকে ভীষণভাবে টানে। বর্ধমানের জনজীবনের শেকড়ের সন্ধান করতে হলে লিখিত সাহিত্য পাঠের আগেই এই লোকসংস্কৃতির আস্বাদন করতে হবে। কারণ লোকসংস্কৃতিই প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।[১২৩]

বর্ধমানের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই তথ্যই উঠে আসে যে, বঙ্গদেশের সংস্কৃতির মূলভিত্তি নিহিত আছে বাংলার গ্রামসমূহে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে গ্রাম-বাংলার রূপ পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। বর্ধমানের মানুষের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ব্যবহার, ধর্ম, সাহিত্য, সংগীত, কীর্তন, শিল্পকলা প্রভৃতির বিধিবদ্ধ ও যৌগিক সংমিশ্রণ, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে সংস্কৃতির প্রভাব। নানা রকম লৌকিক উপকরণে গঠিত এই সংস্কৃতিকে ধরে রাখা প্রয়োজন।[১২৪]

পূর্বের এই সমগ্র নাতি বিস্তৃত আলোচনাটির মাধ্যমে সমগ্র বর্ধমান জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এই প্রতিটি বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনার দ্বারা এর বিভিন্ন দিকগুলি নানা তথ্য সমেত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই সম্পূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কিত তথ্যের কোন অভাব নেই, আরও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই আলোচনাটিকে সুবিস্তৃত করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, কিন্তু এই আলোচনাটিকে সুবিস্তৃত করতে গেলে আমরা আমাদের গবেষণার মূল বিষয়টি থেকে পৃথক হয়ে যাবো, তাই আশা রাখছি ভবিষ্যতে এই বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা করার সুযোগ পেলে, আরও তথ্য অনুসন্ধান করে আলোচনাটিকে দীর্ঘায়িত ও সম্পূর্ণ একটি রূপ দেওয়ার প্রয়াস করবো।

॥ তথ্যঋণ ॥

১. দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২, পৃ. ৪২।
২. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৩।
৩. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ. ৮।
৪. Niyogi (Miss) Pushpa, ***Buddhism in Ancient Bengal;*** Calcutta; 1960, Pg. 40.
৫. দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২, পৃ.. ২১ - ২৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২।
৬. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ. ১।
৭. কুন্ডু শ্যামাপ্রসাদ সম্পাদিত, বর্ধমান চর্চা; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ.. ৩৯, ৪১।
৮. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ.. ৬, ১৬।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ.. ২১৩, ২১৫, ২১৬।
১০. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯৪,পৃ.. ১৬ – ১৮।
১১. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ.. ৬৬, ৬৭।
১২. চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন; অক্টোবর ২০০১, পৃ.. ৭৩ - ৭৬।
১৩. চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন; অক্টোবর ২০০১, পৃ. ৭৭।
১৪. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ.. ৪৯, ৫০।
১৫. লালা আদিত্য কুমার সম্পাদিত, বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান; মালদহ; কল্যানী পাবলিকেশন; ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১৪২।
১৬. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৫০।
১৭. চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন; অক্টোবর ২০০১, পৃ.. ৭৭ - ৭৯।
১৮. লালা আদিত্য কুমার সম্পাদিত, বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান; মালদহ; কল্যানী পাবলিকেশন; ডিসেম্বর ২০১১, পৃ.. ১৪৩, ১৪৪।
১৯. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ.. ৫০ – ৫৩।
২০. তদেব, পৃ. ৪৪।
২১. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ. ১০২।
২২. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৪৫।
২৩. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত লঘু সংস্করণ; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬৩, পৃ. ৪৮।
২৪. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ৩৩৮।
২৫. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৪৬।
২৬. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ. ৩৯২।
২৭. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ.. ৪৬ – ৪৮।
২৮. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৫৫।
২৯. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ৬৫।

৩০. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৫৫।
৩১. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৩৫।
৩২. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ.. ৩২০ - ৩২৪।
৩৩. লালা আদিত্য কুমার সম্পাদিত, বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান; মালদহ; কল্যানী পাবলিকেশন; ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১৫০।
৩৪. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ.. ৩১৫, ৩১৮।
৩৫. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯০ পৃ. ৬৬।
৩৬. তদেব, পৃ. ৬৭।
৩৭. তদেব, পৃ.. ৬৭, ৬৮।
৩৮. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ.. ৬৫, ৬৬।
৩৯. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ. ৩৭৬।
৪০. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৬৬।
৪১. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ৩৪৯।
৪২. তদেব, পৃ.. ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৫৪।
৪৩. তদেব, পৃ.. ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৬৮।
৪৪. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ২৪৮।
৪৫. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৯৫।
৪৬. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ২৪৮, ২৮৫।
৪৭. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৯৫।
৪৮. লালা আদিত্য কুমার সম্পাদিত, বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান; মালদহ; কল্যানী পাবলিকেশন; ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১৪৪।
৪৯. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৯৬।
৫০. লালা আদিত্য কুমার সম্পাদিত, বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান; মালদহ; কল্যানী পাবলিকেশন; ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১৪৫।
৫১. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৯৬।
৫২. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ২৮৫, ২৮৬।
৫৩. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ.. ৯৭, ১০৮।
৫৪. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ.. ২২৮, ২২৯।
৫৫. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ.. ১০৭, ১০৮।
৫৬. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ২৮৮।
৫৭. তদেব, পৃ. ২১৮।
৫৮. তদেব, পৃ. ২১৮।

৫৯. তদেব, পৃ. ২১৮।
৬০. তদেব, পৃ.. ২১৮, ২১৯।
৬১. তদেব, পৃ.. ২২০, ২২১।
৬২. তদেব, পৃ. ২২২।
৬৩. তদেব, পৃ.. ২২৩, ২২৪।
৬৪. তদেব, পৃ. ২৯১।
৬৫. তদেব, পৃ. ২৯৩।
৬৬. তদেব, পৃ. ২৯৮।
৬৭. তদেব, পৃ. ২৯৮।
৬৮. তদেব, পৃ. ২৯৭।
৬৯. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৫৪, ৫৫।
৭০. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ২০।
৭১. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ৫৬।
৭২. তদেব, পৃ.. ৫৬, ৫৮, ৬০।
৭৩. তদেব, পৃ. ৬১।
৭৪. তদেব, পৃ.. ৬১, ৬২।
৭৫. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১৯২।
৭৬. কুন্ডু শ্যামাপ্রসাদ সম্পাদিত, বর্ধমান চর্চা; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ.. ৮৬, ৮৭।
৭৭. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ১৬২।
৭৮. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ. ৫০৪।
৭৯. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ. ৪৩১।
৮০. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ.. ১৬৪, ১৬৬।
৮১. কুন্ডু শ্যামাপ্রসাদ সম্পাদিত, বর্ধমান চর্চা; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৮৭।
৮২. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ. ১৬০।
৮৩. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ. ২২৪।
৮৪. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ.. ৬১, ৬২।
৮৫. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ. ৮৫।
৮৬. কুন্ডু শ্যামাপ্রসাদ সম্পাদিত, বর্ধমান চর্চা; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ.. ৮৭, ৮৮।
৮৭. তদেব, পৃ.. ৮৮, ৮৯।
৮৮. তদেব, পৃ. ৯০।
৮৯. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ.. ১৯৪, ২০১।
৯০. তদেব, পৃ.. ২০৬, ২০৭, ২১০, ২১৩।
৯১. তদেব, পৃ.. ২১৭, ২১৮।
৯২. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ৬৪।
৯৩. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা-সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২, পৃ.. ১৩১, ১৩২।

৯৪. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ৬৫, ৬৬, ৬৯।

৯৫. তদেব, পৃ.. ৬৬, ৬৭।

৯৬. তদেব, পৃ.. ৬৭, ৬৮।

৯৭. দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২, পৃ.. ২৭, ২৮।

৯৮. তদেব, পৃ. ৩২।

৯৯. তদেব, পৃ. ২৩।

১০০. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ৬৯, ৭০।

১০১. তদেব, পৃ.. ৭০,৭১।

১০২. তদেব, পৃ. ৭১।

১০৩. তদেব, পৃ. ৬৪।

১০৪. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ১০ই নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৬১।

১০৫. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ২৫২।

১০৬. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; প্রকাশ ভবন; চৈত্র ১৪১৬, পৃ.. ৬১, ৬২।

১০৭. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ.. ২৫৩, ২৫৪।

১০৮. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৫৫।

১০৯. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ৬৫।

১১০. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; শ্রাবণ ১৪০৯, পৃ. ৫৫।

১১১. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ১০ই নভেম্বর ২০০০, পৃ. ১৯।

১১২. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ৮০।

১১৩. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ১০ই নভেম্বর ২০০০, পৃ.. ২০, ২১।

১১৪. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ৭৫।

১১৫. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ১০ই নভেম্বর ২০০০, পৃ. ২৩।

১১৬. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ৭৫, ৭৭।

১১৭. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ.. ২৯২, ২৯৪, ২৯৫।

১১৮. লালা আদিত্য কুমার সম্পাদিত, বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান; মালদহ; কল্যানী পাবলিকেশন; ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১৬৫।

১১৯. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ৮৫।

১২০. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৩১৫।

১২১. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ৮২-৮৪।

১২২. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ.. ২৮৬, ২৮৭।

১২৩. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ৮০, ৮৫।

১২৪. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর **১৯৯৯**, পৃ.. ৩১৪, ৩১৫।

****

চতুর্থ অধ্যায়

॥ বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস ও রাজবাটি বৃত্তের সংস্কৃতি ॥

বর্ধমানের রাজবাটি বৃত্তের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস বা রাজবংশানুচরিত নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস অনেকটাই প্রাচীন ও বিস্তৃত। তবে বর্ধমান জেলার মন্দির বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বর্ধমান রাজবংশের কথা উল্লেখ না করলে, সম্পূর্ণ গবেষণাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তাই বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অগ্রসর হলাম।

ভারতবর্ষের মোগল সাম্রাজ্যের বীজ বপন করেন জাহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে। আর সেই সাম্রাজ্য সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথমে (১৫৫৬-১৬০৫খ্রিঃ), সম্রাট জালালউদ্দিন আকবরের সময়ে।[১] সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের মধ্যভাগে ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চল মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয় এবং সুবাদার মানসিংহের আমলে সমগ্র অঞ্চলটির উপর অবিসংবাদীরূপে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইসময় সুবার শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সুবাদারের ওপর ন্যস্ত হলেও, স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে জায়গীরদার ও রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ও তাঁর আস্থাভাজন হয়ে সামান্য নগর কোতোয়াল ও রাজস্ব আদায়কারী চৌধুরীর পদ হতে অল্পকালের মধ্যেই সুবা বাংলার অন্যতম প্রধান জমিদার রূপে 'বর্ধমান রাজবংশ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২] এই জমিদার বংশের আদিপর্বের কাহিনি সবিশেষ জানা যায় না। তবে প্রবাদ আছে যে, পাঞ্জাবের লাহোরের অন্তর্গত কোটলি মহল্লার প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সঙ্গম রায়, শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব দর্শন করে পুরী থেকে সপরিবারে প্রত্যাবর্তনের পথে বর্ধমানের নিকট বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে তাঁর ব্যবসা ও তেজারতি কারবারের সুযোগ-সুবিধা থাকায় উক্তগ্রামে আবাসস্থল নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। *Bengal District Gazetteer-* এ উল্লেখ রয়েছে: *According to tradition, the original founder of the house was one Sangam Rai, a khattri kapoor of kotli in Lahore, who on his way back from a pilgrimage to Puri, being much taken with the advantages of Baikunthapur, a village near the town, settled there and devoted himself to commerce and money lending. (J.C.K. Peterson, Page.26)*

সঙ্গম রায়ের পর তাঁর পুত্র বঙ্কুবিহারী রায় পিতৃ ব্যবসায় লিপ্ত হন সপ্তদশ শতকের একদম গোড়ার দিকে; তখন দিল্লির বাদশাহ, সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭খ্রিঃ)। ১৬৫৭খ্রিঃ তৃতীয় পুরুষ আবু রায় পৈতৃক ব্যবসায় নিযুক্ত হন। সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-৫৯খ্রিঃ) তখন দিল্লির মসনদে আসীন। আবু রায় জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি পান সম্রাট শাহজাহানের নিকট হতে। প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের এই ক্ষত্রিয় পরিবার 'রাজবংশ' হিসেবে হিসেবে পরিগণিত হয় এই সময় থেকেই। আবু রায়ের পুত্র বাবু রায় পিতার জায়গীর লাভ করেন। তিনি বর্ধমান ছাড়া আরও তিনটি পরগনার অধিকারী হন। বাবু রায়ের পরলোক গমনের পর তাঁর পুত্র ঘনশ্যাম রায় বর্ধমান পরগনার অধিকারী হন এবং তৎকালীন দিল্লির বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নিকট হতে প্রথম সনদ পান। ঔরংজেবের শাসন সময়ে বর্ধমান পরগনার জমিদার ও চৌধুরী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাবু রায়ের অধস্তন তিন পুরুষ। ঘনশ্যাম রায়ের পুত্র কৃষ্ণরাম রায় ১৬৭৫ খ্রিঃ থেকে ১৬৯৬ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সেই সময় কৃষ্ণরাম রায়ই ছিলেন সুবা বাংলার সবথেকে বড় জমিদার। তাঁর অধীনে ৫০টি পরগনার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল। মূলত কৃষ্ণরাম রায়ের লক্ষ্য ছিল তাঁর জমিদারির বিস্তার ঘটানো। তিনি সম্রাটের সনদ বলে নিজ অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে এক বিশাল অঞ্চলের জমিদার রূপে গণ্য হয়েছিলেন। ১৬৯৫ খ্রিঃ মাঝামাঝি সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ, চন্দ্রকোণার তালুকদার রঘুনাথ সিংহ এবং বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত অঞ্চল চেতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহ, উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ-র সঙ্গে একত্রিত হয়ে সসৈন্য বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করেন। খবর পাওয়া মাত্র কৃষ্ণরাম অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হন এবং কয়েকটি ছোট সংঘর্ষের পর চন্দ্রকোণার যুদ্ধে তিনি নিহত হন।[৩] কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র জগৎরাম ঢাকায় পালিয়ে গিয়ে নবাবের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬৯৯ খ্রিঃ জগৎরাম রায় পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পান এবং ঔরংজেবের কাছ থেকে পঞ্চাশটি মহল বা পরগনার রাজস্ব আদায়কারী জমিদার ও চৌধুরী উপাধিসহ ফরমান লাভ করেন।[৪] তিনি ১১০৮ খ্রিঃর ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পিতৃ প্রতিষ্ঠিত

কৃষ্ণসায়রে স্নান করার সময় গুপ্তঘাতকের ছুরির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭০২ খ্রিঃ,৩রা মার্চ)। সেই থেকে রাজপরিবারের কোন সদস্য সেখানে স্নান করেন না, জল ব্যবহার করেন না, এমনকি সেখানকার মাছ পর্যন্ত খান না।

১৭০২খ্রিঃ জগৎরামের মৃত্যুতে বর্ধমান পরগনার জমিদারি লাভ করেন কীর্তিচাঁদ রায়। কীর্তিচাঁদ ১৭৪০খ্রিঃ পর্যন্ত বহু কীর্তির স্বাক্ষর রেখে যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ ও তাঁর জননি ব্রজকিশোরীর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁরা বহু চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কীর্তিচাঁদের সভাকবি ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী, তিনি কীর্তিচাঁদের আশ্রিতও ছিলেন। কীর্তিচাঁদ ১৭০২খ্রিঃ থেকে ১৭৪০খ্রিঃ পর্যন্ত, ৩৮বছর রাজত্ব করেছিলেন। নবদ্বীপ বিদ্বৎসমাজের খ্যাতির শীর্ষে ওঠার পূর্বে দক্ষিণরাঢ়ই ছিল বাংলার সারস্বত কেন্দ্র। বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ চিতুয়া- বরদা, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি ভূস্বামীদের পরাস্ত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সারস্বত কেন্দ্রগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে সযত্নে প্রতিপালন করে গেছেন।[৫] তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত না হলেও রাজা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। শোভা সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজয়ের স্মারক হিসেবে কীর্তিচাঁদ কাঞ্চননগরে উদয়পল্লীতে বারোদুয়ারী নির্মাণ করান। কাঞ্চননগরকে সুচারু কারুকার্যের কারিগরদের আবাসভূমি হিসেবে গড়ে তোলেন। কীর্তিচাঁদের বহু অতুলনীয় কীর্তি আজও বহু স্থানে তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছে। কীর্তিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র চিত্রসেন রায় ১৭৪০খ্রিঃ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন এবং তিনি দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে প্রথম রাজা উপাধি লাভ করেন। রাজা চিত্রসেন রায়ের রাজত্বকাল ছিল স্বল্প সময়ের, কিন্তু ঘটনাবহুল। তাঁর সময়ে বর্গি আক্রমণ হয় এবং বর্ধমানের মানুষ অসীম দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে।[৬] প্রকৃতপক্ষে বর্গিদের অত্যাচারের কথা অবর্ণনীয়। রাজা চিত্রসেন যতদূর সম্ভব বিশাল সৈন্যদল রেখে সচিবদের উপর বর্ধমান নগর রক্ষার ভার দিয়ে বহু দুস্থ শরণাগত আর্ত দরিদ্রদের নিয়ে 'বিশালনগরী'তে উপস্থিত হন। এই বিশালনগরী তাঁর নিজ অধিকারস্থিত দক্ষিণ প্রয়াগ এবং গঙ্গাসাগর তীর্থদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান। বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী বর্গিদের প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন এবং প্রজাবর্গকে যতদূর সম্ভব রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালেও বর্গিদের হাঙ্গামা চলেছিল।[৭]

রাজা চিত্রসেনের মৃত্যুর পর ১৭৪৪খ্রিঃ জগৎরামের কনিষ্ঠপুত্র ও কীর্তিচাঁদের কনিষ্ঠভ্রাতা মিত্রসেন রায়ের একমাত্র পুত্র তিলকচাঁদ রায় বর্ধমানের রাজা হন। তদানীন্তন ভারত সম্রাট আহম্মদ শাহ্‌র নিকট হতে তিলকচাঁদ 'বংশানুক্রমিক' খেতাবযুক্ত সনদ প্রাপ্ত হন ১৭৫৩খ্রিঃ। তিনি ১৭৭০খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধমানের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল রাজনৈতিকভাবে খুবই অস্থির ছিল; সংঘর্ষ, সংঘাত এবং আপসের মধ্যে দিয়ে তিনি রাজ্য পরিচালনা করেছেন। তিলকচাঁদের আমলে বর্ধমান জেলায় বহু মন্দির ও দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি তাঁর অনুগত আশ্রিত অনেকেই মন্দির, দেব বিগ্রহ স্থাপন করে তিলকচাঁদের ধর্মানুরাগের প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর সময়কালে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ, বর্ধমানের মানুষের উপর এক বিপর্যয় এনে দেয়। কিন্তু তাঁর সময়ে বর্ধমান ও কালনায় বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর আমলেই বর্তমান রাজবাড়ির একাংশের নির্মাণকার্য শুরু হয়। কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেন এবং রাজা তিলকচাঁদ বেশ কয়েকটি টোল প্রতিষ্ঠা ও বেশ কিছু জনহিতকর কাজ করেন।[৮] রাজা তিলকচাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাঁর রাজত্বের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি আন্তঃবাণিজ্য ও বহিঃবাণিজ্য নদীপথে চলাচলের জন্য গঙ্গার তীরবর্তী অম্বিকা- কালনাকে প্রধান নদীবন্দর হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তখন কালনাই ছিল বর্ধমানরাজার দ্বিতীয় রাজধানী। কালনা শহরের গঙ্গার তীরে ছিল বর্ধমান মহারাজাদের অবসর বিনোদনের বা গঙ্গাবাসের স্থান। বর্ধমান মহারাজারা অম্বিকা কালনায় রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করান। বর্ধমান মহারাজাদের আনুকূল্য ছাড়া কালনায় এতগুলি মন্দির স্থাপন করা সম্ভব ছিলনা।[৯]

১৭৭০খ্রিঃ মহারাজা তিলকচাঁদের মৃত্যুর পর জমিদারির মালিক হন তাঁর ছ'বছরের পুত্র তেজচাঁদ। ১৭৭১খ্রিঃ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম এলাহাবাদের দরবার থেকে তেজচাঁদকে মহারাজা উপাধি দেন। প্রথম জীবনে মহারাজ তেজচাঁদ ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল। তিনি আটবার বিবাহ করেন। আট মহিষীর মধ্যে একমাত্র নানকী দেবীর গর্ভে তাঁর একমাত্র সন্তান প্রতাপচাঁদের জন্ম হয় ১৭৯১খ্রিঃ। তেজচাঁদ বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জক জমিদার ছিলেন। তাঁর অর্থানুকুল্যে এবং উদ্যমে বর্ধমানে বহু পাঠশালা, টোল ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০] মহারাজ তেজচাঁদের দূরদর্শিতা, উদার সংস্কারমুক্ত মন এবং শিক্ষানুরাগ তাঁকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্তি দিয়েছে। পাশ্চাত্য

শিক্ষার ব্যাপারে এই রাজপরিবার যেমন উদ্যমী ছিলেন, তেমনই নারী শিক্ষার বিষয়েও এঁদের অবদান কিছুমাত্র কম ছিল না। মহারাজ তেজচাঁদের আমল থেকেই বর্ধমান রাজপরিবার বুঝেছিলেন ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এবং নারী শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে জনগণের মধ্যে থেকে কুসংস্কার দূর হবে না। তাই স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে তেজচাঁদ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বর্ধমানে মিশনারিদের স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার প্রসঙ্গে রাজপরিবারের অর্থসাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিশনারিদের চেষ্টায় বর্ধমানে বালিকাদের জন্য যে কটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে 'বিবি ডিয়ার' নামক এক ইংরেজ মহিলা পরিচালিত বিদ্যালয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ তেজচাঁদের নিজের শিক্ষাদীক্ষা খুব বেশি ছিলনা ঠিকই, কিন্তু তাঁর ষষ্ঠ মহিষী মহারানি কমলকুমারী ও প্যারীকুমারী তখনকার পরিবেশের তুলনায় যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও 'জাল প্রতাপচাঁদ বাঙালির সারস্বত অবদান', ২৯৬-২৯৭পৃষ্ঠায় বলেছেন, "তেজচাঁদ বুঝেছিলেন শিক্ষা ছাড়া বাঙালীর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার নান্যঃ পন্থাঃ। শিক্ষা বিস্তার কার্যে তাঁর অকৃপণ অর্থব্যয়ও অশ্রান্ত উদ্যম সেই কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। ইন্দ্রিয়পারবশ্য বিষয়ে এই বুড়ো রাজার কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু বাংলার শিক্ষা জগতে যে অবদান তিনি রেখে গেছেন, তাতে শুধু বর্ধমান রাজন্যবর্গ নয়, গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে নিখিল বঙ্গদেশের সমগ্র ভূস্বামী সমাজের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারেন।"[১১]

তেজচাঁদের একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদ কুস্তীগির, তিরন্দাজ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। পিতার জীবিতকালেই ১৮১৬খ্রিঃ তিনি রাজকার্যের ভার পেয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে পত্তনি প্রথা আইন সিদ্ধ হয়। সম্ভবত পারিবারিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলেই ১৮২০খ্রিঃ প্রতাপচাঁদ নিরুদ্দিষ্ট হন। ১৮৩২খ্রিঃ তেজচাঁদের মৃত্যুর পর চুনিলাল মহতাবচাঁদ বর্ধমানের জমিদারির মালিক হন। ১৮৩৩খ্রিঃ লর্ড বেন্টিংক কমলকুমারীর অভিভাবকত্বে মহতাবচাঁদকে বর্ধমানের জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দেন। মহতাবচাঁদ থেকে পরান কাপুরের বংশ জমিদারির মালিক হন। ১৮৪৪খ্রিঃ মহতাবচাঁদের সিংহাসনে অভিষেক হয়। প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধানের চোদ্দ বছর পর এক ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ পরিচয়ে বর্ধমানের জমিদারির মালিকানা দাবি করে মোকদ্দমা করেন। কিন্তু তাঁর দাবি প্রমাণিত হয় নি। ইতিহাসে তিনি জাল প্রতাপচাঁদ নামে পরিচিত।

মহারাজ তেজচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠাপত্নী বসন্তকুমারী নাবালিকা থাকায় মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত স্থাবর অস্থাবর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি পরানচাঁদ ও কমলকুমারী ভোগ দখল করতে থাকেন এবং বসন্তকুমারীকে নজরবন্দি করে রাখে। একুশ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি নিজ সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগ দখল করবার জন্য মোকদ্দমা করে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তেজচাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গম রায়ের বংশের বিলোপ ঘটে। মহতাবচাঁদের সময়ে বর্ধমানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বহুগুণ বর্ধিত হয়। উড়িষ্যার কুজঙ্গ এবং মেদিনীপুরের সুজসুখা জমিদারি তিনি ক্রয় করেছিলেন। তাঁর আমলে সাধারণ প্রজার সঙ্গে বর্ধমানরাজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। পত্তনিদার, দরপত্তনিদার ইত্যাদিদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা তিনি করেননি। মহতাবচাঁদ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে কালনায় ও বর্ধমানে দুটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁকে *'First man of Bengal'* বলে সম্মানিত করেছিলেন। ১৮৪৮খ্রিঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আনুকূল্যে বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১২] তিনি বর্ধমানে 'আর্টস্কুল' ও 'জিমনেশিয়াম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারেও তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন। মহারাজ মহতাবচাঁদ বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী ছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও গীতিকার ও পদকর্তা ছিলেন। প্রণয়সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, বৈষ্ণব পদাবলি প্রভৃতি বহু সংগীত, এছাড়া কয়েকটি শাক্ত সংগীতও রচনা করেছিলেন। কী সংখ্যাগত, কী গুণগত উভয়দিক থেকেই উনিশ শতকের আধ্যাত্মসঙ্গীত ও প্রণয়সঙ্গীত রচয়িতাদের তালিকায় মহতাবচাঁদ মহতাব একটি বিশিষ্ট নাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রিত প্রায় সমস্ত সংগীত-সংকলন গ্রন্থে মহতাবচাঁদের পদ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে। হিন্দি ও উর্দু ভাষাতেও তাঁর কয়েকটি চমৎকার সংগীত প্রচলিত আছে।[১৩] মহারাজা মহতাবচাঁদের রাজত্বকালেও মহারানিদের অনুচরীগণ কর্তৃক কয়েকটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু দেবমন্দির কালনাতে আছে যেগুলিতে শিলালিপি খোদিত নেই। তাই তাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম ও সময় পাওয়া যায় না। মন্দিরগুলির মধ্যে অনুমান

করা যায়, বেশিরভাগ মন্দিরই মহারাজা তিলকচাঁদের আমলে নির্মিত। মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুরের জননি বিষ্ণুকুমারী বর্ধমান ও কালনায় বহু দেবমন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৪]

পাঞ্জাব থেকে আগত বর্ধমানবাসী কেদারনাথ নন্দের কন্যা নারায়ণকুমারীর সঙ্গে মহতাবচাঁদের বিবাহ হয়। তাঁদের কোন সন্তান না থাকায়, নারায়ণকুমারীর ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দকে তাঁরা দত্তক গ্রহণ করেন ১৮৬৬খ্রিঃ। তিনিই পরবর্তীকালে আফতাবচাঁদ মহতাব নামে পরিচিত হন। এখন থেকে বর্ধমানের রাজার মহতাব উপাধি ব্যবহার করতে থাকেন। আফতাবচাঁদ মাত্র উনিশ বছর বয়সে, ১৮৮১খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫খ্রিঃ ২৫শে মার্চ, মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।[১৫] এত অল্প সময়ের মধ্যে জনহিতকর কার্য করার সময় তিনি পাননি। কিন্তু তার মধ্যেও তিনি মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় পানীয় জলের উপযোগী পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন। তাঁর দেবদেউল প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা, জনস্বাস্থ্যের দিকে বেশি নজর ছিল। জনসাধারণ যাতে পরিশুদ্ধ জল পায়, তিনি তার জন্য বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিকে (প্রতিষ্ঠা ১৮৬৫খ্রিঃ) নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং দার্জিলিং'এ দাতব্য চিকিৎসালয়ে নগদ দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। বর্ধমানস্থ সরকারি দাতব্য হাসপাতালে চক্ষুপীড়া সংক্রান্ত রোগীদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ *(Eye Ward)* নির্মাণ করিয়ে দেন। তাঁর পরোপকারের আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেওয়ানি জেলে যারা বন্দি থাকত, অর্থের জন্য যাদের কারাবাস হয়েছে, তিনি নিজ অর্থ দিয়ে সেইসব বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করতেন। মহারাজা আফতাবচাঁদ মহতাবের শিক্ষানুরাগেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জনসাধারণের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার *(Public Library)* স্থাপনের মধ্য দিয়ে, যা পূর্ববর্তী মহারাজা অথবা গভর্নমেন্টও চিন্তা করে নি। ১৮৮১খ্রিঃ নয় হাজার টাকা ব্যয় করে বর্ধমান শহরে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার কয়েকজন কৃতবিদ্য লোকের হাতে সেটির তত্ত্বাবধানের ভার দেন এবং রাজসরকার থেকে যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হয়ে পরিবর্তিত নামে বর্তমানে 'উদয়চাঁদ গ্রন্থাগার' নামে পরিচিত। এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর আরও অনেক দান রয়েছে। সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট দুটি ছাত্রকে বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা করে একশত টাকা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করেন এবং পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর জন্য বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে পাঁচ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

মহারাজাধিরাজ আফতাবচাঁদ মহতাব পরলোক গমনের দু'বছর পর তাঁর বিধবা মহিষী বেনদেয়ী দেবী, রাজা বনবিহারী কাপুরের ছ'বছরের একমাত্র পুত্র, বিজনবিহারীকে ১৮৮৭খ্রিঃ দত্তক গ্রহণ করেন; তখন তাঁর নাম হয় বিজয়চাঁদ মহতাব। ১৮৮৮খ্রিঃ ১৩ই মে, তাঁর চূড়াকরণের পরেই মহারানি বেনদেয়ী দেবী পরলোকগমন করেন।[১৬] ১৯০২খ্রিঃ সাবালক হওয়ার পর তিনি 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস' এর কাছ থেকে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৩খ্রিঃ তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। এই বছরেই তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। ১৮৯৮খ্রিঃ লাহোর নিবাসী ঋন্ডামল মেহেরার কন্যা রাধারানি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৯০৪খ্রিঃ বিজয়চাঁদের আমন্ত্রণে তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন বর্ধমানে আসেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বর্ধমান শহরে প্রবেশপথে 'স্টার অফ্ ইন্ডিয়া' নামে একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করান। এই তোরণ 'কার্জন গেট' নামে প্রসিদ্ধ। স্বাধীনতার পরে এর নাম হয় 'বিজয় তোরণ'। বিজয়চাঁদ ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত যুবক। বর্ধমান রাজবংশের তিনিই প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬খ্রিঃ তিনি ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ১৯০৮খ্রিঃ লেফটন্যান্ট গভর্নর স্যার এন্ড্রু ফ্রেজারকে কলকাতায় ওভারটুন হলে বিপ্লবীর গুলি থেকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে K.C.I.E এবং *Indian Order of Merit (Class III)* উপাধিতে ভূষিত করেন। বিজয়চাঁদ ইংরেজদের অনুগত হওয়া সত্ত্বেও, জাতীয় কংগ্রেস এবং বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।[১৭]

১৯০৮খ্রিঃ নভেম্বর মাসে গভর্নর এন্ড্রু ফ্রেজার মহারাজা বিজয়চাঁদকে এক্জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সভ্য মনোনীত করেন। ১৯০৯খ্রিঃ মিন্টোর্ল রিফর্ম অনুযায়ী এই বছর ভারতে প্রথম নির্বাচন হয়। অন্যান্য জমিদাররা নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচিত হন। মহারাজা বিজয়চাঁদও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে নির্বাচিত হন। ১৯১৪খ্রিঃ তিনি কাউন্সিলে কলকাতার উন্নয়নের জন্য *'Calcutta Improvement Trust'* বিলের উপস্থাপন করেন। মহারাজ বিজয়চাঁদ কাউন্সিলের

সদস্য থাকাকালীন দেশের ও দশের মঙ্গলজনক কাজের কথা চিন্তা করতেন। তিনি কখনোই সাম্প্রদায়িকতার ভাব মনে পোষণ করতেন না। প্রতিবার কোরবানি উৎসবে মুসলিম প্রজাদের উট উপহার দিতেন।

বাংলায় নারী শিক্ষা প্রসারে, বিশেষ করে বর্ধমানে নারী শিক্ষা প্রসারে বিজয়চাঁদের অবদান কম নয়। বর্ধমানে মহারানি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দরাজহস্তে অর্থ দান করেছেন। বিজয়চাঁদ যে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন, একথা জানতে পারা যায় তাঁর, *'Defect of Modern Education of Bengal'* প্রবন্ধে। তাই বলতে দ্বিধা নেই, বর্ধমান রাজপরিবার শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে, যে অবদান রেখে গেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি নিজে বহু নাটক, প্রবন্ধ গ্রন্থ, ভ্রমণ কাহিনি লিখেও স্মরণীয় হয়ে আছেন। ২০০বছর আগে বর্ধমান রাজপরিবার পর্দানশীন মেয়েদের জন্য পর্দায় ঢাকা বলদে টানা গাড়ির ব্যবস্থা করে যে মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসতেন, আজকের বর্ধমানে নারীশিক্ষার রমরমা শুরু হয়েছিল সেইদিনই। কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারেও বর্ধমান রাজপরিবারের অবদান কম ছিল না। বর্তমানে 'মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলোজি' সেই বার্তাই বহন করে নিয়ে আসে। ডাক্তারি শিক্ষার বিষয়েও বর্ধমানের রাজারা সজাগ ছিলেন। বিজয়চাঁদ মহতাব বর্ধমানে প্রতিষ্ঠা করলেন 'রোনাল্ডসে মেডিকেল স্কুল', তখন এখানে পড়ানো হত *'Lower Medical Faculty'* (L.M.F), ব্রিটিশ চিকিৎসক ও স্থপতির নির্মিত ও পরিকল্পিত। বর্তমানে এটি *'Rural Training Centre'*, এখানে ছিল উন্নতমানের পরীক্ষাগার, গ্যালারী সমন্বিত লেকচার রুম, ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিরাট ছাত্রাবাস। পড়াতেন বহু নামী সাহেব ও বাঙালি ডাক্তাররা। তখন এই মেডিকেল সেন্টারটি পশ্চিমবঙ্গের শিরোনামে চলে আসে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহু নামকরা ডাক্তার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

বিজয়চাঁদ মহতাব ১৯৪১খ্রিঃ পরলোক গমন করেন। তাঁর পুত্র উদয়চাঁদ মহতাব রাজপদে আসীন হন। ১৯৩০খ্রিঃ, ১৬ই জানুয়ারি 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস' মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহতাবকে সমগ্র এস্টেটের অবৈতনিক প্রধান ম্যানেজার এবং একজন ডেপুটি কালেক্টর মনোরঞ্জন মৈত্রকে মাসিক বেতনে সহকারী নিয়োগ করেছিলেন। তিনি একজন উপযুক্ত ও সুদক্ষ কর্মী ছিলেন।[18] সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলন প্রায় চরম পর্যায়ে উপনীত। ১৯৫৩খ্রিঃ পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথার বিলোপ হয়। ফলে মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাবের বিশাল জমিদারি সরকারের হাতে চলে যায়। উদয়চাঁদ কলকাতার বিজয়মঞ্জিলে বসবাস করতে থাকেন। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তির ফলে অন্যান্য জমিদারদের মতোই বর্ধমানে রাজাদের প্রতাপ ও জৌলুষ ম্লান হতে থাকে। ভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের এই রাজবংশ আজও বর্ধমান জেলায় শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় এই রাজবংশের ধারা প্রবাহিত হলেও, রাজারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও বহু কীর্তি রেখে গেছেন। বর্ধমান রাজবংশের কীর্তির একটি তালিকা অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে। জমিদারি বিলোপের পর এই সকল কীর্তি অধিকাংশই পরহস্তগত অথবা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণদশা প্রাপ্ত।[19] অথচ অনেক মন্দির এখনও আছে, যেখানে অনেক ঐতিহাসিক এবং প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন মেলে, যা আজ অবলুপ্তির পথে।

জমিদারি প্রথা বিলোপের পর বর্ধমানের বিপুল সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দান করে উদয়চাঁদ তাঁর পিতার নির্মিত কলকাতার 'বিজয়মঞ্জিল'এ বসবাস করতেন। উদয়চাঁদ যে সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্পত্তিদান করেছেন, তার সিংহভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে গেছে। ১৯৬০খ্রিঃ 'মহতাব মঞ্জিল'এ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪খ্রিঃ ১০ই অক্টোবর, বর্ধমান রাজবংশের সর্বশেষ জমিদার মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর ৭৯বছর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। উদয়চাঁদের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর সহধর্মিনী রাধারানি দেবীর মৃত্যু হয়েছিল। উদয়চাঁদের তিনপুত্র ও তিনকন্যা বর্তমান এবং তাঁর উইল অনুসারে কনিষ্ঠপুত্র ডঃ প্রণয়চাঁদ মহতাব দেবসেবা ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে কলকাতার 'বিজয়মঞ্জিল'এ বসবাস করছেন। বঙ্গের অন্যান্য জমিদার বংশের ন্যায় আবু রায়ের প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষ্ণরাম, কীর্তিচাঁদ দ্বারা পালিত জমিদারির বিলোপ সাধন হলেও, এখনও বর্ধমানবাসীর মনে ঐ অবাঙালি জমিদার বংশের প্রতি একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুকম্পার ছাপ রয়েছে।[20] সেই আবু রায় থেকে কৃষ্ণরাম রায়, কীর্তিচাঁদ থেকে তেজচাঁদ রায়ের রায় বংশের মূল স্রোতধারার সঙ্গে মহতাবচাঁদ, আফতাবচাঁদ, বিজয়চাঁদ ও উদয়চাঁদ এবং মহতাব বংশের স্রোতধারা মিলিত হয়ে বর্ধমান জেলার ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করেছে।

সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় বর্ধমান রাজবংশের অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[২১]

॥ বর্ধমান রাজবংশের বংশতালিকা ॥

সঙ্গম রায় (১৬শ / ১৭শ শতক)
↓
বঙ্কুবিহারী রায় (১৭শ শতক)
↓
আবু রায় (১৬৫৭খ্রিঃ)
↓
বাবু রায় (১৭শ শতকের ৬ষ্ঠ দশক)
↓
ঘনশ্যাম রায় (ঐ)
↓
কৃষ্ণরাম রায় (১৬৭৫- ৯৬খ্রিঃ) [জিতু দেবী সহ ছয়জন স্ত্রী]
↓
জগৎরাম রায়(১৬৯৯- ১৭০২খ্রিঃ) [ব্রজকিশোরী দেবী]

↓ কীতচাঁদ রায়(১৭০২- ৪০খ্রিঃ)
[রাজরাজেশ্বরী দেবী]
↓ চিত্রসেন রায় (১৭৪০- ৪৪খ্রিঃ)
[ছঙ্গকুমারী দেবী ও ইন্দ্রকুমারী দেবী]
নিঃসন্তান

↓ মিত্রসেন রায়
[লক্ষ্মী দেবী]
↓ তিলকচাঁদ রায় (১৭৪৪- ৭০খ্রিঃ)
[রূপকুমারী দেবী ও বিষণকুমারী দেবী]

তিলকচাঁদ রায় উত্তরাধিকারী মনোনীত

↓ তোতাকুমারীদেবী

↓ তেজচাঁদ রায়
(১৭৭০- ১৮৩২খ্রিঃ)
[কমলকুমারী প্রমুখ আটজন]
নিঃসন্তান, দত্তক পুত্র গ্রহণ

↓ চিত্রকুমারী দেবী

↓ প্রতাপচাঁদ
(জন্ম- ১৭৯১খ্রিঃ ও তিরোধান- ১৮২১খ্রিঃ)
জাল প্রতাপচাঁদ মামলা, ১৮৩৫- ৩৯খ্রিঃ
[প্যারীকুমারী দেবী ও আনন্দকুমারী দেবী]

↓ মহতাবচাঁদ
(১৮৩২- ৭৯খ্রিঃ)
[নারায়ণী দেবী]
নিঃসন্তান, দত্তকপুত্র গ্রহণ
↓
আফতাবচাঁদ মহতাব (১৮৭৯- ৮৫খ্রিঃ)
[বেনদেয়ী দেবী] নিঃসন্তান, দত্তকপুত্র গ্রহণ
↓
বিজয়চাদ মহতাব (১৮৮৭- ১৯৪২খ্রিঃ)
[রাধারানি দেবী]

↓ সুধারানি দেবী

↓ উদয়চাঁদ মহতাব (১৯৪১- ৫৫খ্রিঃ)
[রাধারানি দেবী]

↓ ললিতরানি

↓ অভয়চাদ

উদয়চাঁদ মহতাবের সন্তান: বরুণাদেবী, সদয়চাদ, জ্যোৎস্নাদেবী, মলয়চাঁদ, প্রণয়চাঁদ, করুণাদেবী

উপরোক্ত এই তালিকাটিতে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে, কীর্তিচাঁদ রায়'এর সময় থেকে পদবীর সঙ্গে 'চাঁদ' শব্দটি যুক্ত হয়। আবার মহারাজাধিরাজ তিলকচাঁদ বাহাদুরের সময় থেকে 'বাহাদুর' শব্দটি পদবীর সঙ্গে যুক্ত হয়। হিন্দু 'চাঁদ' শব্দের ফার্সী রূপ 'মহতাব' , এই উভয় শব্দ হিন্দু- মুসলিম সংস্কৃতির মিলন চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। পদবীর ধারাবাহিক বিন্যাসটি এভাবে দেখানো যেতে পারে-

রায় রায় সাহেব রায় বাহাদুর	} সঙ্গম রায় থেকে শুরু করে কীর্তিচাঁদ রায় পর্যন্ত।
রাজা	→ চিত্রসেন রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।
রাজা বাহাদুর মহারাজা মহারাজ বাহাদুর মহারাজ অধিরাজ বাহাদুর	} ১৭৬৮খ্রিস্টাব্দে দিল্লিশ্বরের আজ্ঞানুসারে তিলকচাঁদ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

॥ বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও অন্যান্য কীর্তির তালিকা ॥

প্রতিষ্ঠাতা	দেবালয়	নির্মাণকাল	অন্যান্য কীর্তি	নির্মাণকাল
ঘনশ্যাম রায়	--	--	বর্ধমানে শ্যামসায়র নামক বিশাল সরোবর	সম্ভবতঃ ১৬৭৪খ্রিস্টাব্দ
কৃষ্ণরাম রায়	--	--	বর্ধমানে কৃষ্ণসায়র নামক বিশাল সরোবর	সম্ভবতঃ ইং. ১৬৯৬খ্রিস্টাব্দের পূর্বে (সন ১১০৩)
ব্রজকিশোরী দেবী	কালনার লালজী মন্দির, কালনার বৈকুণ্ঠ নাথ শিব, কালনার গিরিধারী	১৭৪০খ্রিঃ ১৭৫৪খ্রিঃ ১৭৫৮খ্রিঃ	বর্ধমানের রানিসায়র, দাঁইহাটে বারোদুয়ারী ঘাট	১৭০৮খ্রিঃ --
কীর্তিচাঁদ	ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মন্দির, বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে গোপেশ্বর শিব, বর্ধমানের সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির, বর্ধমানের মহন্তঅস্থল	১৭৩০খ্রিঃ পূর্বে ১৭৩২খ্রিঃ -- --	কাটোয়ার সন্নিকটে যোগেশ্বরডি নামক বিশাল সরোবর, কাঞ্চননগর নামক ক্ষুদ্র নগর, বারোদুয়ারী, হাট কীর্তিনগর	-- -- -- --
চিত্রসেন রায়	কালনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির	১৭৪১খ্রিঃ	--	--
রামদেব নাগ	কালনার শিব মন্দির	১৭৪৬খ্রিঃ	--	--
রাজরাজেশ্বরী দেবী	ভরতপুরে গোপীনাথ মন্দির, বর্ধমানের রানিসায়রের পশ্চিমপাশে রাজরাজেশ্বর শিব মন্দির	১৭৪৭খ্রিঃ --	--	--
লক্ষ্মীকুমারী দেবী	কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও মন্দির	১৭৫১খ্রিঃ ১৭৬৩খ্রিঃ ১৭৬৪খ্রিঃ	--	--
ছঙ্গকুমারী দেবী	কালনার রামেশ্বর মন্দির, বর্ধমানের চন্দ্রেশ্বর মন্দির, কালনার জগন্নাথ মন্দির ও বিগ্রহ	১৭৫৫খ্রিঃ -- --	--	--
ইন্দ্রকুমারী দেবী	বর্ধমানের মিত্রেশ্বর মন্দির	--	--	--
তিলকচাঁদ	বর্ধমানের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, কালনার অনন্ত বাসুদেব মন্দির, দাঁইহাটে কিশোর কিশোরী মন্দির, খাস হাভেলীতে তিলোকেশ্বর মন্দির,	-- ১৭৫৪খ্রিঃ -- -- -- --	--	--

	দাঁইহাটে বর্ধমানেশ্বর শিব ও কর্পূরেশ্বর শিব			
রূপকুমারী দেবী	কালনার রূপেশ্বর শিব	১৭৬১খ্রিঃ	--	--
বিষণকুমারী দেবী	দাঁইহাটে গঙ্গাধর শিব, কালনায় শিব মন্দির, বর্ধমানের নবাবহাটের ১০৯ শিব মন্দির	-- ১৭৬৩খ্রিঃ ১৭৮৯খ্রিঃ	--	--
তেজচাঁদ বাহাদুর	কালনার ১০৮ শিব মন্দির, বর্ধমানের রামেশ্বর মন্দির, তেজগঞ্জ ও বোরহাটের কালীমন্দির, শ্রী রাধাবল্লভ জীউ, অন্নপূর্ণা ও শ্যামসুন্দর জীউ মন্দির	১৮১০খ্রিঃ ১৮১২খ্রিঃ -- --	বর্ধমানে বহু পাঠশালা, টোল; বর্ধমানের বাঁকা নদীর উপর সেতু সংস্কার, বর্ধমানের কমলসায়র, মগরায় সরস্বতী নদীর উপর সেতু নির্মাণ, চুঁচুড়ায় ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন, বর্ধমান ও অম্বিকা কালনায় ২টি সদাব্রত স্থাপন, নগর মধ্যে ২৩টি প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত ইত্যাদি। অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপন, দামোদরের উভয়কূলে বাঁধ প্রস্তুত ইত্যাদি।	-- -- -- -- -- ১৮১৭খ্রিঃ
তেজচাঁদের পত্নী	বর্ধমানের সুন্দরবাগে শিবমন্দির, সুন্দরবাগে শিবমন্দির, আনন্দবাগে শিবমন্দির,	১৮০০খ্রিঃ -- ১৮০১খ্রিঃ	--	--
গঙ্গাদাসী দেবী	কালনায় শিব মন্দির	১৮৪২খ্রিঃ	--	--
দেবকী দেবী	কালনার কাশীনাথ শিব	১৮৪৫খ্রিঃ	--	--
প্যারীকুমারী দেবী	কালনার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির, কালনার বৈকুণ্ঠনাথ শিবমন্দির, শাঁকটি গড়ের রাধাবল্লভ মন্দির	১৮৪৯খ্রিঃ ১৮৫০খ্রিঃ ১৮৬০খ্রিঃ	--	--
মহতাবচাঁদ বাহাদুর	--	--	দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন, যেটি বর্তমানে মেডিকেল কলেজে পরিণত হয়েছে। তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠিত স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আনুকূল্যে বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল স্থাপন করেন, যেটি বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল স্কুল নামে পরিচিত। শাক্ত সংগীত রচনা করেছেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ, সিকন্দরনামা, চাহার দরবেশ প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে বিতরন করেছিলেন। মহাভারত ও রামায়ণের মূল ও বঙ্গানুবাদ মুদ্রাঙ্কণ করান।	-- ১৮৫৪খ্রিঃ ১৮৪৮খ্রিঃ -- ১২৯১ খ্রিঃর, জ্যৈষ্ঠ মাসে
নারায়ণকুমারী দেবী	বর্ধমানের ভুবনেশ্বর মন্দির, নারায়ণেশ্বর মন্দির	১৮৯৯খ্রিঃ ১৮৯৯খ্রিঃ	--	--
আফতাবচাঁদ মহতাব	--	--	তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিকে ৮০,০০০টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় শ্রেনির কলেজে উন্নীত করেন। ৫০,০০০টাকা ব্যয়ে লাকুর্ডিতে জলের কল প্রতিষ্ঠা করেন। পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এবং আরও অনেক জনহিতকর কার্য করেছেন।	-- -- ১৮৮১খ্রিঃ --

বিজয়চাঁদ মহতাব	--	--	ইনি সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগী। Impression, Meditation, The Indian Horizon, Studies ইত্যাদি ২০টি গ্রন্থ লিখেছেন। বিজয় গীতিকা, ত্রয়োদশী কাব্য, রণজিৎ (নাটক), মানসলীলা (বিজ্ঞান বিষয়ক নাটক) লিখেছেন। বর্ধমানে স্টার অফ ইন্ডিয়া (বর্তমানে কার্জন গেট) নামক একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করান। বর্ধমান কলেজকে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করেন। বর্ধমান শহরে ফ্রেজার হাসপাতাল, টেকনিক্যাল স্কুল, বিজয় চতুষ্পাঠী, টাওয়ার ক্লক, কলকাতার আলিপুরে 'বিজয়মঞ্জিল' নামক প্রাসাদ, ঢাকা শহরে কালীবাড়ি ও বর্ধমান হাউস, বোরহাটে বিজয় থিয়েটার, পীর বাহরামে অবস্থিত শের আফ্গান, হরিসভা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কুতুবউদ্দিন ও পীর বাহারামের সমাধির সংস্কার সাধন, লাহোরে নূরজাহানের সমাধির সংস্কার, বর্ধমান মেডিকেল স্কুল ও ছাত্রাবাস, সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি তাঁর স্মরণীয় কীর্তি।	-- -- -- ১৯০৪খ্রিঃ -- --

বি. দ্র. বর্ধমান রাজবংশের বংশতালিকা ও রাজবংশ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যের জন্য বর্ধমানের শেষ মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাবের পুত্র ড. প্রণয়চাঁদ মহতাব মহাশয়ের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। (অক্টোবর, ২০১৬)

॥ তথ্যঋণ ॥

১. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ১৯৯।

২. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯,পৃ. ১৩৯।

৩. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ১৯৯, ২০০।

৪. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ফেব্রুয়ারী ২০১১পৃ. ৮৩।

৫. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯,পৃ. ২০৪।

৬. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ফেব্রুয়ারী ২০১১ পৃ. ৮৪।

৭. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ২০৫।

৮. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ. ৮৪।

৯. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ১০ই নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৪১৮।

১০. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮, পৃ. ৫৭।

১১. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ২০৭, ২০৮।

১২. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮, পৃ.. ৫৯, ৬০।

১৩. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ২১১, ২১২।

১৪. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ১০ই নভেম্বর ২০০০, পৃ.. ৪২৪, ৪২৫।

১৫. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮, পৃ. ৬১।

১৬. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ২১১, ২১২।

১৭. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮, পৃ. ৬২।
১৮. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ.. ২১২-২১৪।
১৯. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮, পৃ. ৩৬৬।
২০. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১৮৬।
২১. চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন; অক্টোবর ২০০১, পৃ. ৩৬৬।

বর্ধমান রাজবংশের তালিকা

১. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ. ১৮৪।
২. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ.. ১৯০, ১৯১।
৩. কোঙার গোপীকান্ত, ঠাকুর দেবেশ সম্পাদিত, রাখালদাস মুখোপাধ্যায়- এর বর্দ্ধমান রাজবংশানুচরিত ও জালপ্রতাপচাঁদ মামলা; বর্ধমান; ইন্দু পাবলিকেশনস্; ২০০৫, পৃ. ১৬।

****

পঞ্চম অধ্যায়

॥ মধ্যযুগে বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ॥

বাংলা একসময় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল। এখনও তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি এবং সম্ভবও নয়। কিন্তু এক বিশেষ পরিবেশ পরিমণ্ডল, জলবায়ু, মাটি, নদনদী এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল স্বতন্ত্র সত্তার। সেই সত্তাকে বিকশিত করে তুলতে তার নিজস্ব ভাষার জন্ম হয়েছে এবং অবিরত মননের মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টি করেছে তার সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন। এই স্বতন্ত্র সত্তার বিকাশ ঘটেছে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের মধ্যেই।[১]

আর্য সংস্কৃতির প্রভাবে আসার আগে বাংলায় ধর্মীয় স্থাপত্যের রূপ যে কি ছিল সেই কথা জানবার আজ আর কোন উপায় নেই। আর্য ভাবধারা প্রকাশের সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলায় এসে সমগ্র প্রদেশটিকে প্লাবিত করেছিল। ভাবের দিক থেকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য স্থানীয় ধর্মচিন্তার সঙ্গে আপস করে নিয়ে যে বিস্তৃত ও উদার পরিবেশ রচনা করেছিল তার প্রভাব প্রাথমিক অবস্থায় কীভাবে এবং কতটা বাংলার মন্দির রচনা রীতিকে প্রভাবিত করেছিল সে কথাও আজ অজ্ঞাত।[২]

এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করলাম। কারণ প্রাচীন যুগে নির্মিত মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে একটি আলোচনা ব্যতীত যদি সরাসরি মূল বিষয়ে প্রবেশ করা হয় তাহলে মধ্যযুগের মন্দিরগুলির স্থাপত্যশৈলী ও ভাস্কর্যের উপর প্রাচীন যুগের কতটা প্রভাব পড়েছিল, কতটাই বা সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য রয়েছে অথবা পূর্বের কোনও মন্দির নির্মাণ রীতি পরবর্তীকালে সামান্য কোনও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে অন্যকোনও শৈলী হয়ে উঠেছে কিনা সেই সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম।

বাংলায় সাধারণত তিন ধরনের মন্দির নির্মাণ কৌশল লক্ষ করা যায়। প্রথমটি হল পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যাতে যে কৌশলে মন্দির তৈরি করা হতো অনেকটা সেই রকম; যেমন মন্দিরের চারপাশে তৈরি করা পুরু মোটা দেওয়ালের উপর পরস্পর শুকনো ভারী পাথর সাজিয়ে একটু আগুপিছু স্তর তৈরি করে ক্রমশ ভিতর দিকে বাঁকানো করে রেখদেউলের আকৃতি দেওয়া। এই ধরনের কিছু মন্দির বাংলার দক্ষিণ- পশ্চিম অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ধরনটি হলো, মন্দিরের চারপাশের পুরু দেওয়ালটি ইঁটের তৈরি কিন্তু ইঁট পরস্পর জোড়া দেওয়ার জন্য কাদামাটি অথবা চুন সুড়কি জলে মিশিয়ে বাঁধন দেওয়া হতো। এই ধরনের নির্মাণ কৌশল বেশ প্রাচীন। গুপ্তযুগ থেকে বা বৌদ্ধস্থাপত্যে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাংলায় গুপ্ত ও পাল যুগেও এই ধরনের নির্মাণ শৈলীর প্রচলন ছিল। এই ধরনের নির্মাণ কৌশলে মন্দিরের ছাদ তৈরি করা হতো ধাপে ধাপে চারধার দিয়ে ইঁট বা পাথরের স্তরকে কমিয়ে এনে যাকে *Corbelling* বলা হয়। তৃতীয় ধরনটি হলো নবাবি আমলে নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগ। এক্ষেত্রে গ্রামবাংলার কুঁড়েঘরকে পারসিক- আরবীয় রীতির অনুকরণে গম্বুজ, খিলান, স্থূল স্তম্ভ ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে একেবারে নতুন রূপ দেওয়া হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহটির ছাদ গম্বুজের আকারে নির্মিত এবং মন্দিরের প্রবেশ পথটি খিলানযুক্ত ধনুকাকার ছাদ দিয়ে ঢাকা। এগুলি মন্দির স্থাপত্যের মূল কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক রচনা করেছে যা একান্ত এক বিশেষ সময়ের সৃষ্টি।[৩]

প্রণব রায় মহাশয়, 'বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' গ্রন্থে বাংলায় প্রাক- তুর্ক আফগান যুগে প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যকে চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। এই চার প্রকার শৈলীর মন্দির আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত কম বেশি নির্মিত হতে থাকে। প্রথমটি হল ইন্দো- আর্য বা উত্তর ভারতীয় 'নাগর' শৈলীর মন্দির। 'নাগর' শৈলী মন্দিরের বিশুদ্ধ রূপটি ভুবনেশ্বরের আদি মন্দিরগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ধারাটি হল পাল- সেন শাসনাধিকারে বিহার ও বাংলায় 'নাগর' শিখর শৈলীর একটি স্বতন্ত্র রূপ। এই রীতির মন্দিরে চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপরিভাগে যে 'শিখর' নির্মিত হয়েছিল তার গাত্রদেশে 'রিলিফে' খোদিত ভাস্কর্যের মধ্যে হরতনের আকারে 'চৈত্য' বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। পাল- সেন আমলের তৈরি কিছু কিছু উচ্চ 'শিখর' দেউল মন্দির হুগলি ও বর্ধমান জেলায় ছিল বলে জানা যায়। তৃতীয় ধারাটি হল, হিন্দু বৌদ্ধ, যেগুলির নিদর্শন প্রাচীন বিহারগুলির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিহিত। এই মন্দিরগুলির স্থাপত্য শৈলী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। বাংলার মন্দিরশিল্প ধারার চতুর্থ বিভাগটি হল, তার নিজস্ব ধারা 'চালা রীতি'। এর উদ্ভব বহু প্রাচীনকালে হলেও শেষ মধ্যযুগের বাংলায় এই 'চালা' নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে। দক্ষিণ- পশ্চিম বাংলার বহু স্থানে যেমন, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলিতে, 'চালা' শৈলীর অজস্র মন্দির আছে। এই 'চালা' রীতির মন্দিরের ঢালু চাল, বাঁকানো কার্নিশ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এসেছে সুদীর্ঘ

কালের কাঠ, বাঁশ ও খড়ের চালা থেকে। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের নয়, বাংলার সর্বাংশেই 'চালা' কুটির সাধারণ মানুষের বাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। দক্ষিণ বাংলায় এই 'চালা' ঘর বড়ো সুঠাম, সাবলীল ও প্রাণবন্ত, কার্নিশের বা ছাঁচার বক্র আকার নয়নাভিরাম- এরূপ আর অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় না।[৪]

প্রাচীন বাংলায় বহুল প্রচলিত 'শিখর' দেউলে নিদর্শন গুলি থেকে ঐ রীতির স্থাপত্য সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা করতে পারি, সেরূপ 'চালা' শৈলী সম্পর্কে করা যায় না। কারণ এই স্থাপত্যশৈলী বেশ প্রাচীন হলেও বাংলায় প্রাক্-মুসলিম যুগের এর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীনকালে এই শৈলীর মন্দির ভারতে অপরিচিত ছিল না। সুলতানি আমলে নব- উদ্ভাসিত 'চালা'র মতো প্রাচীন বাংলায় 'ভদ্র' রীতির মন্দির যে জনপ্রিয় ছিল, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য মূর্তি ভাস্কর্যে। এই সব মূর্তিকে অনেকক্ষেত্রে প্রতিকৃতি 'পিঢ়' বা 'ভদ্র' রীতির দেউলে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা গেছে। 'পিঢ়'এর সর্বপ্রাচীন রূপটি ঢাকার আশরফপুরে ব্রোঞ্জ চৈত্য রয়েছে। এটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের। 'পিঢ়ায়' দেউলগুলির ভূমি নকশায় চতুষ্কোণ গর্ভগৃহটির প্রতিদিকের দেওয়ালে এক বা দুই 'রথ' বিন্যাস লক্ষ করা যায়। প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের মন্দির 'রথপগ' বিন্যাস যুক্ত হয়েই নির্মিত হত। মাথার সঙ্গে ওপরে খড়ের চালকে বাঁশ ও দড়ি দিয়ে বহু ক্ষেত্রে বাঁধা হতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে চালকে রক্ষা করার জন্য। 'পিঢ়া'য় 'রথ' বিন্যাস গুলির সৃষ্টি সম্ভবত এই কারণেই হয়েছিল।[৫]

প্রাচীন বাংলায় 'ভদ্র' ও 'শিখর' পরস্পর যুক্ত করে নির্মাণ করা হত 'শিখর- ভদ্র' রীতির মন্দির। এই রীতির মন্দির প্রাচীন বাংলায় যে ছিল, তা নলিনীকান্ত ভট্টশালী কোন কোন মূর্তি ভাস্কর্য থেকে আবিষ্কার করেন। একটি ভদ্র রীতির মন্দিরের ওপরে একটি 'রেখ' বা 'শিখর' রীতির মন্দিরকে চূড়া রূপে মূর্তি ভাস্কর্যে দেখানো হয়েছে। ফুসার *(Foucher)* তাঁর *'Icongraphic Bouddhique'* গ্রন্থে লেখ যুক্ত যে প্রতিকৃতি মন্দিরের চিত্র দিয়েছেন, তাতে আছে, পুন্ড্রবর্ধনের ত্রিশরণ বুদ্ধ ভট্টালক এরূপ একটি মন্দিরে অধিষ্ঠিত। এটিও প্রাক্- মুসলিম বাংলার মন্দিরের অন্যতম একটি নিদর্শন। কিন্তু এই রীতির মন্দিরের কোন নিদর্শন আজ আর নেই। সরসীকুমার সরস্বতী এই রীতিকে ' শিখর শীর্ষ ভদ্র' বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও তাঁর মতে চার শ্রেণির মন্দির বাংলায় প্রচলিত ছিল- (১) ভদ্র বা পিঢ় দেউল, (২) রেখ বা শিখর দেউল, (৩) স্তূপ শীর্ষ পিঢ় বা ভদ্র দেউল এবং (৪) শিখর শীর্ষ 'পিঢ়' বা 'ভদ্র' দেউল। এর মধ্যে প্রথম দুটি শ্রেণির অল্প কয়েকটি নিদর্শন এখনও বর্তমান। পরবর্তী শ্রেণির স্থাপত্য সম্ভবত তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু 'শিখর শীর্ষ ভদ্র' দেউলকে আমরা শেষ মধ্যযুগে উদ্ভাবিত 'রত্ন' মন্দিরের মূল আদর্শ বা আদি রূপ *(Archetype)* বলে মনে করা যেতে পারে।[৬] প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্যশৈলী সম্পর্কে প্রাচীন বাংলার মূর্তিগুলি ছাড়াও পাণ্ডুলিপিতে চিত্রিত কোন কোন মন্দিরের প্রতিকৃতি থেকে আমরা সেকালের স্থাপত্যশৈলী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি।[৭]

বাংলা জল মাটির দেশ। তাই বাংলায় স্থায়ী স্থাপত্যচর্চার প্রধান উপকরণ ইঁট, স্থাপত্যের অলংকার রচিত হয়েছে মাটি ও চুনবালিতে (স্টাকো / Stucco) তৈরি পঙ্খ দিয়ে। স্থায়িত্বের জন্য উৎকীর্ণ মাটির ফলকগুলি আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর সাজানো হয় সৌধের দেওয়ালে। সূক্ষ কাজের জন্য মিহি পরিস্কার বালি ও শামুক চুনের মশলা তৈরি করা হয় বিশেষ যত্নের সঙ্গে, তার সাথে মেশানো হয় গুড় ও খয়ের। পঙ্খের লেপ দিয়ে দেওয়াল ঢেকে তার ওপর নক্শি কাজ করা হয়েছে। অথবা কাটা ইঁট বা মাকড়া পাথরের ফলকের ওপরে পঙ্কের লেপ দিয়ে মূর্তির আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পোড়ামাটির ও পঙ্খে শিল্প কর্মের ঐতিহ্য ভারতে অত্যন্ত প্রাচীন।[৮] মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব টেরাকোটা ফলক পাওয়া গেছে, সেগুলি বৃহদায়তন এবং এগুলির কারুকার্যে স্বাচ্ছন্দ্য, পরিচ্ছন্নতা ও সজীবতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যুগের সামাজিক চিত্র ও এখনকার অনেক টেরাকোটা ফলকে প্রতিফলিত প্রস্তর মূর্তি গুলির মধ্যে গুপ্তযুগের মতো দেহ সৌষ্ঠব ও ভাব প্রকাশের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তবে, একাদশ দ্বাদশ শতকে সেন আমলে মূর্তির মতো অলংকরণ ও অলংকারের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায় না।[৯]

'মন্দির গাত্রস্থ ভাস্কর্য' কে টেরাকোটা ভাস্কর্য, টেরাকোটা অলংকরণ বা টেরাকোটা সজ্জা নামে অভিহিত করা হয়। মূলে ইতালীয় 'টেরাকোটা' শব্দটি আমরা ইংরেজি শব্দভাণ্ডার মারফৎ পেয়েছি, যার অর্থ আগুনে সেঁকা বা পোড়ামাটি সেঁকা। পোড়ামাটির উপাদানে ইঁটপাটকেল, হাড়ি পাতিল থেকে শুরু করে অসংখ্য খেলনা পুতুল, পশুপক্ষী, নরনারী, যক্ষযক্ষী, গন্ধর্ব কিন্নর, দেবদেবী বা অন্যবিধ মূর্তি 'ইন দ্য রাউন্ড' বা আস্ত আকারে নির্মিত হয়ে এসেছে সভ্যতার একেবারে আদিযুগ থেকে কিন্তু ধর্মীয় ইমারতে একই উপকরণের ব্যবহার কিছু পরবর্তীকালেই হয়েছিল। যেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মাত্র কয়েকটি কেন্দ্রে।[১০]

পোড়ামাটির শিল্প কর্মের ঐতিহ্য বাংলায় অত্যন্ত প্রাচীন। সভ্যতার আদিযুগ থেকে নির্মিত হয়ে এসেছে পোড়ামাটির অসংখ্য রকম খেলনা পুতুল সহ পাতলা ধরনের ছাঁচে ফেলা ফলকে উৎকীর্ণ পশুপাখি, নরনারী, দেবদেবী বা বহুবিধ মূর্তি ভাস্কর্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পশ্চিমবাংলার(অধুনা) তমলুক, বেড়াচাঁপা, হরিনারায়ণপুর,

আটঘরা, পোখন্না, পান্না প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এবং অনুসন্ধান চালিয়ে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও পাল সেন আমলের বেশ কিছু পোড়ামাটির ক্ষুদ্রাকার মূর্তিকা ও ভাস্কর্য ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্ষুদ্রাকার মূর্তিকা ও ফলকগুলি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে পোড়ামাটির অর্থাৎ 'টেরাকোটা' ভাস্কর্য ফলকের ব্যবহার আমরা দেখি মন্দির ও মসজিদের গাত্রালঙ্কার হিসেবে। পাল সেন আমলে খ্রিস্টীয় নয় থেকে বারো শতকে নির্মিত পশ্চিমবাংলার(অধুনা) সাত দেউলিয়া (জেলাঃ বর্ধমান); বহুলাড়া, সোনাতপল (জেলাঃ পুরুলিয়া) ও জটা (জেলাঃ দক্ষিণ ২৪পরগনা) প্রভৃতি স্থানে ইঁটের তৈরি মন্দিরের গায়েও টেরাকোটা ফলকে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের উদাহরণ দেখা যায়। ঐ সময়ে সৃষ্ট মন্দিরগুলিতে শুধু পোড়ামাটির ফলকের উপর পঙ্খের প্রলেপ দিয়ে এমনভাবে অলংকার গড়া হয়েছিল, যা সেকালের প্রাচীন সৌধ অলংকরণের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।[১১]

পল্লী রমণীরা বিভিন্ন উৎসব পার্বণে যে স্নিগ্ধরেখার সুনিপুণ আলপনা দিয়ে থাকেন এবং সে বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে পদ্মকলি, ধান্যছড়া, কলমিলতা, শঙ্খলতা, খুন্তিলতা প্রভৃতি মাঙ্গলিক অলঙ্কৃত রূপক তার রূপ গ্রহণ করে, সেগুলির অধিকাংশই হল নানান ধরনের লতাপাতা, পশু- পাখি- মাছ- গবাদী পশু, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ঘর গৃহস্থালীর উপকরণ। আবহমানকাল ধরে প্রচলিত গ্রাম্যজীবনের এইসব চিত্র শিল্প জনমানসে এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, প্রাচীন স্থাপত্য ভাস্কর্যে এরই অনুরূপ প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। স্থাপত্য অলংকরণে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় অনুপ্রাণিত হয়েছে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত পাল- সেন আমলের অলঙ্কৃতি সজ্জা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ঝোলান ঘন্টা, কল্পলতা, পদ্মদল বা চৈত্য গবাক্ষ বা পারসিক শিল্পরীতি অনুসারে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে গৃহীত। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যায়, প্রচলিত প্রতীকী নিদর্শনের যেগুলি সাধারণ্যে আদৃত হয় বেশি পরিমাণে, সেগুলিই পরবর্তীকালে ধর্মীয় স্থাপত্যের অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে।[১২]

বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তন খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এরমধ্যে পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব এক যুগান্তকারী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভাববন্যা বাংলার সংস্কৃতি জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং সাহিত্য ও শিল্প বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যার ফলে বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এক নব্যযুগের সূচনা হল।[১৩]

আচ্ছাদনের আকৃতি ও বৈশিষ্ট অনুসারে বাংলার মন্দিরগুলি চারটি সুনির্দিষ্ট রীতির মধ্যে বিভক্ত। **(১)**শিখর রীতি, **(২)** ভদ্র বা পিড়া রীতি, **(৩)** চালা রীতি, **(৪)** রত্ন রীতি। প্রথম রীতি দুটি বাংলার বাইরে উদ্ভূত হয়েছিল এবং সর্বভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে বাংলায় গৃহীত হয়েছিল। বাংলার নিজস্ব রীতি হল চালা রীতি এবং চালা ও শিখরের মিশ্রণে উদ্ভূত রত্ন রীতি। এদের নিয়েই বাংলার নিজস্ব মন্দির স্থাপত্য।[১৪]

বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যশৈলীর মূল ধারাটি বাংলার সনাতন মাটির কুঁড়েঘর প্রতিরূপ। পোড়ামাটির ইঁটের ব্যবহারে নির্মিত মন্দিরগুলি মাটির বাড়ির সর্বাপেক্ষা সরলীকৃত রূপ। এই শ্রেণির মন্দিরগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো একটি বর্গাকৃতি ভূমিমাপের চারদিকে চারটি দেওয়াল নির্মাণ করে তার ছাদটি বাঁশ বা খড় দিয়ে নির্মিত মাটির বাড়ির চালের মতো চাল দিয়ে তৈরি করা হতো। সামনে পিছনে চালা নামলে দোচালা, আর চারদিকে চালা নামলে চারচালা। আবার চারচালার ওপর একটি ছোট চারচালা তৈরি করে আটচালা মন্দির নির্মাণ করা হতো। দোচালার উপরিভাগের প্রান্তরেখাটি ধনুকের মতো বাঁকানো এবং চালাগুলির প্রান্তদেশটিও বাঁকানো থাকত। এটাই বাংলার কুঁড়েঘরের আদিরূপ। এই ছাদের বৈশিষ্ট্য হল অধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে বিনাবাধায় ছাদের জল সহজে নিষ্কাশিত হয়ে যায়। মাটি, বাঁশ, খড় দিয়ে নির্মিত বাংলার স্থানীয় কুঁড়েঘর তৈরির প্রয়োগ কৌশল ইঁট বা স্থানীয় পাথরে তৈরি মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে অভিনবভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ও ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করে। চালা মন্দিরের একটি বিশেষ শ্রেণি হল জোড়বাংলা। এটি হলো দুটি পরস্পর সন্নিবিষ্ট দোচালা মন্দিরের সমন্বয়। মূলত এই মন্দিরের উদ্ভব হয়েছিল একটি দোচালা গর্ভগৃহ হিসেবে ও অপরটি ভোগমন্ডপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু এই তত্ত্ব সর্বত্র সমান ভাবে প্রযোজ্য হয়নি। একটি উল্লেখযোগ্য জোড়বাংলা মন্দির হলো, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির।[১৫]

স্বাধীন সুলতানদের আমলের গোড়ার দিকে মন্দির স্থাপত্যে কোন উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনার অবকাশ ছিল না। অতি সাধারণ 'চালা'তেই বাঙালির স্থাপত্য চিন্তা সীমাবদ্ধ রাখতে হতো। তাই দোচালা, চারচালার মধ্যেই এই সময়ের হিন্দু স্থাপত্যচর্চা সীমিত থেকে যায়। এই 'চালা' মন্দির ছিল সংখ্যায় নগণ্য।[১৬] ইসলামী স্থাপত্যে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল চালা মন্দিরের গঠন পরিকল্পনা সেইটাকে নিয়েই গড়ে উঠেছে। ইসলামী স্থাপত্যে যেমন থাকে, মন্দিরেও দেখি ঠিক তেমনি নীচু বাঁকানো দেওয়াল, প্রকৃত খিলান শীর্ষ, সারিবদ্ধ দ্বারপথ ও বাঁকানো ছাজা। চালা মন্দিরের অন্দরটিও মুসলমান স্থাপত্য থেকে নেওয়া গম্বুজ ও ভল্ট প্রয়োগে গড়া হত। ইসলামী স্থাপত্যে আচ্ছাদন তৈরি হত প্রধানত গম্বুজ বসিয়ে। কিন্তু চালা মন্দিরের আচ্ছাদন পুরোই চালাঘরের প্রত্যক্ষ অনুকরণে গড়া হত।[১৭]

শ্রীচৈতন্যর ভক্তি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা, পৌরাণিক দেবদেবী লীলার কথকতা, রামায়ণের গান, মহাভারত কথা, মঙ্গলকাব্যের পালাগানের জনপ্রিয়তা বাঙালি মানসে আনে এক ধর্মোদ্দীপনা। তুর্কি শাসনের শেষ পর্যায়ে, মোগল রাজশক্তির অভ্যুদয় বাঙালির স্বাধীন চিন্তায় স্থাপত্য চর্চার এক উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনার সৃষ্টি করল। এঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেশজ সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণা করেছেন। তাই মোগল স্থাপত্য ভাবনা একান্তভাবে ভারতীয় হয়ে উঠতে পেরেছিল সন্দেহাতীত ভাবে। এখন আর 'চালা' মন্দিরেই তার স্থাপত্যচর্চা সীমাবদ্ধ রইল না। এল উচ্চশ্রেণির 'রত্ন' মন্দিরের পরিকল্পনা, দোচালা- চারচালার পর উচ্চ 'আটচালা'র অভ্যুদয় ঘটল। প্রাক্ মুসলিম যুগের বাংলার নিজস্ব শৈলীর দুই 'থাক' বিশিষ্ট 'পিঢ়' দেউলের রূপান্তর ঘটল 'আটচালা' রীতির মন্দিরে। সরসী কুমার সরস্বতী প্রাচীন পিঢ় দেউল থেকে 'আটচালা'র উদ্ভব হয় বলে মনে করেন। প্রাচীন বাংলার পিঢ় মন্দির গুলির একটি পিঢ়া থেকে অন্যটির ব্যবধান সুস্পষ্ট থাকায় এই ব্যবধান একটি তলের ইঙ্গিত দেয়। তাই এইরূপ দুটি পিঢ়া যুক্ত দেউল পরবর্তীকালে 'আটচালা'য় এবং তিনটি পিঢ়ায় 'বারোচালা' রীতির উদ্ভব বলে মনে করা হয়। আটচালার সামনে ঢাকা বারান্দা ছাড়া অপর দুই বা তিন দিকের কোন বারান্দা সাধারণত লক্ষ করা যায় না। ওপরের 'চারচালা' গুলি শুধুমাত্র উচ্চতা ও কিছুটা অলংকরণের জন্য তৈরি করা হয়। এই রীতিটি দারুন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল খ্রিঃ সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত। এমনকি বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও এই রীতির মন্দির অনেক তৈরি হয়েছে।[১৮]

A.H. Dani (Muslim Architecture in Bengal Dacca, 1916, Page.14) 'এক বাংলা' আর 'দোচালা' সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে জানিয়েছেন, *"The patterning of the walls too derivers from the bamboo frame. Even the bamboo rafters on which the thatch rests may be reproduced on the inner vault and the supporting poles the inner walls. This design is referred to as ekbânglâ or do-châlâ."* ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন 'জোড়বাংলা' রীতি নিয়ে বক্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, *"Two such huts, one as porch in front of the other shrine, constitute the jor-bânglâ- bengal's most distinctive contribution to the temple architecture."*[১৯]

জনপ্রিয়তার প্রশ্নে চালার পরেই রত্নের স্থান। রত্ন মন্দিরের আর সব কিছুই চালা মন্দিরের মতো। পার্থক্য শুধু আচ্ছাদনের বাইরের আকারে। উপরের চালা আকারের পরিবর্তে হ্রস্বাকৃতি নাগর মন্দির বসিয়ে 'রত্ন' মন্দির গড়া হয়।[২০] রত্ন কথাটি মন্দির নির্মাণ শাস্ত্রে সংস্কৃত শব্দ রথ থেকে নেওয়া। মন্দিরকে শাস্ত্রে অনেক সময় রথ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মন্দিরের উপর একাধিক চূড়াকে রথ বলা হতো। এক রত্ন মন্দির মানে একটি চূড়া বিশিষ্ট মন্দির।[২১]

শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে বাংলায় 'রত্ন' মন্দিরের উদ্ভব এক যুগান্তকারী ঘটনা। রত্ন রীতি সম্পর্কে ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'Late Mediaeval Temples of Bengal'* এ বলেছেন, *"The pinnacled or râtnâ design has the same lower structure as the châlâ series- a rectangular box with curved carnice- but the roof is more or less flat (following the curvature of the carnice) and is surmounted by one more tower or pinnacles called râtnâ (jewel)"* এছাড়া তিনি 'একরত্ন' কে 'রত্ন'রীতির সহজতম গঠন বলে মনে করেছেন, যা একটাই শীর্ষচূড়া সম্বলিত। এছাড়াও চারটি কোণে আর চারটি শীর্ষচূড়া নিয়ে মন্দির হলে তাকে পঞ্চরত্ন বলে। এইভাবে রত্নের সংখ্যা গুণিতকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নয়, তেরো, সতেরো, একুশ এবং শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পঁচিশটি হতে পারতো।[২২]

বাংলার সনাতন চালা শৈলী ও ভারতীয় নগর স্থাপত্যের পীঢ়দেউল, এই দুই এর সংমিশ্রণে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় এই অভিনব স্থাপত্যশৈলী জন্মলাভ করে। এই শৈলীটির বৈশিষ্ট্য হল মূলত একটি চারচালার মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে একটি পীঢ়দেউল বা রত্ন স্থাপন করা। এই রত্নটি চতুষ্কোণ, গোলাকৃতি বা অষ্টকোণাকৃতি যে কোন আকার নিতে পারত। তবে বাংলার মন্দিরের ক্ষেত্রে অধিকাংশ চূড়াই হয় চতুষ্কোণ অথবা অষ্টকোণাকৃতি। রত্ন মন্দির মূলত হিন্দু ও ইসলাম স্থাপত্যের নিদর্শনের একটি আশ্চর্য সংমিশ্রণ।[২৩] এই সময় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি সমন্বয় ঘটেছিল, তার ফলে হিন্দুদের বক্র কার্নিশযুক্ত 'দালান' যেমন একদিকে ইসলামী স্থাপত্যে গৃহীত হয়, অন্যদিকে দালানের ছাদে গোলাকার গম্বুজ; হিন্দু স্থাপত্যে 'রত্নে'র আদর্শরূপে গৃহীত হয়। এই রীতির প্রয়োগে 'দালান'এর ছাদে ঐতিহ্যগত 'শিখর' দেউলের রূপান্তরিত সরলীকৃত ক্ষুদ্রাকার দেউল স্থাপন করার রীতি প্রচলিত হয়। শুধুমাত্র এই ধরনের সরলীকৃত দেউল বাংলায় সতেরো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত অসংখ্য নির্মিত হয়েছিল।[২৪] কালক্রমে চূড়া অথবা রত্নের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মন্দিরকে উচ্চতা প্রদান করার চেষ্টা করা হয় যা একেবারে বাংলার নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির প্রতিফলন। একটি প্রধান চূড়া ও চারকোণে চারটি অনুচ্চ চূড়া নির্মাণ করে পাঁচচূড়া বিশিষ্ট পঞ্চরত্ন মন্দির তৈরি করা হতো। মূলত বাংলার একই দেবালয়ে একাধিক প্রধান দেবতা যেমন বিষ্ণু, শিব, পার্বতী, গণেশ ও সূর্য কে স্থান দেওয়ার বাসনায় প্রত্যেক দেবদেবীর উদ্দেশ্যে একক প্রকোষ্ঠের উপর একক চূড়া নির্মাণ করা হতো। কালক্রমে একাধিক রত্ন নির্মাণ করা একটি শৈলী হিসেবে গণ্য হয়। কারণ আজ বহু পঞ্চরত্ন মন্দির দেখতে পাওয়া যায় যা প্রধানত একটি দেবতা বা দেবীর উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। বাংলায় রত্ন মন্দিরের

শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরেই দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চরত্ন মন্দিরের উদাহরণ বাংলায় বিশেষত রাঢ় অধ্যুষিত বাংলায় ব্যাপক ভাবে দেখা যায়। এই মূল শ্রেণি বিন্যাস ছাড়াও ঊনবিংশ শতকে আরও অনেক ধরনের চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরের উদাহরণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এর কারণ, প্রথমত মন্দির নির্মাতাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা, দ্বিতীয়ত আঞ্চলিক বাড়িতে ইউরোপীয় নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগ এবং তৃতীয়ত আশেপাশের নানাধরনের বাড়ি তৈরির ঐতিহ্য মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। সেই কারণে বৌদ্ধ প্যাগোডা, খ্রিস্টান গির্জা, ইউরোপের বসতবাড়ি ধরনের দালান মন্দিরও পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া যায়।

মল্লরাজাদের আধিপত্য কমে যাওয়ার পরে বাংলার ভূস্বামী মহলে বর্ধমান রাজাদের আধিপত্য বেড়ে ওঠে। তার নিদর্শন স্বরূপ হুগলি ও বর্ধমানের কালনাতে একাধিক বহুচূড়া রত্নমন্দির গড়ে ওঠে। এই মন্দিরগুলিতে সাধারণত দ্বিতল বা ত্রিতল চারচালার উপর প্রতি কোণে একটি করে চূড়া বা রত্ন স্থাপন করার রীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে যে মন্দিরগুলি তৈরি হয়েছিল সেগুলি নবরত্ন, ত্রয়োদশ রত্ন থেকে পঞ্চবিংশতি রত্ন পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। রত্ন মন্দিরের ক্ষেত্রে এই বহু রত্ন মন্দিরগুলি অপেক্ষাকৃত নতুন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলির আনুমানিক বয়স আড়াইশত থেকে দেড়শত বছর। এই মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে আকার ও বিশালত্বই প্রাধান্য পেয়েছিল- স্থাপত্য বা ভাস্কর্য ততটা প্রাধান্য পায়নি।[২৫]

'রত্ন' মন্দিরের অভাবনীয় বিকাশ চৈতন্যোত্তর যুগের বাংলার মন্দির শিল্পের গৌরবোজ্জ্বল চিত্রটি উপস্থাপিত করে। 'চালা', 'দেউল' ও 'রত্ন' শৈলীর মন্দির সতেরো শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে অজস্র তৈরি হয়। এগুলি ছাড়া 'দালান' বা 'চাঁদনি' শৈলীর মন্দিরও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। সমতল ছাদ এবং সরল বা কার্নিশ যুক্ত মন্দির 'দালান' ও 'চাঁদনি' দুটি নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। 'চাঁদনি' শৈলীটির সঙ্গে গুপ্তযুগের সমতল ছাদ যুক্ত মন্দিরের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কাজেই বাংলায় এই 'চাঁদনি' মন্দির যে সুপ্রাচীন একটি মন্দির শৈলীর বিবর্তিত রূপ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চাঁদনির থেকে দালানের পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায় আয়তনের দিক থেকে। আকার এক হলেও আয়তন হয়েছে বিশাল ও অনেকগুলি প্রবেশপথ। উল্লেখ করা যেতে পারে, চালা, চাঁদনি ও দালানের মধ্যে সরল সাদামাটা স্থাপত্য চিন্তাই বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ছিল বাংলার একান্ত নিজস্ব স্থাপত্য; সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই রীতির বাসগৃহ তৈরি হয়ে এসেছে। চৈতন্যাবির্ভাবের বেশ কিছুকাল আগে থেকেই মন্দিরে এই রীতির প্রয়োগ দেখা দিল, যা একান্তই হয়ে উঠল এক নতুন স্থাপত্য চিন্তার ফসল।

আলোচ্য এই স্থাপত্য শৈলীর অঞ্চল বিশেষে একই কালে কিছু রূপান্তর লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 'চারচালা' রীতির মন্দির অঞ্চল বিশেষে প্রশস্ত ঢালু চালের পরিবর্তে খাড়া ঢালের সৃষ্টি করেছে, মাথাটা হয়ে গেছে অনেকটা সরু। হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়ায় যেমন ঢালু চাল ও বক্র কার্নিশ চারচালা বা আটচালা লক্ষ করা যায়, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ায় তেমনি পাওয়া যায় না; পরিবর্তে খাড়া ঢালই বেশি চোখে পড়ে। দেউলের ক্ষেত্রে 'শিখর' প্রকৃত শিখরের মতো না হয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় গম্বুজাকৃতি হয়ে গেছে, বহিঃপ্রাচীরে অনেক সময় উদ্গাত করা হয়েছে অনুভূমিক খাঁজ। নানা স্থানে এই ধরনেরও বহু মন্দির লক্ষ করা গেছে। দেউলের শিখর আবার অনেক সময় 'চালা'র রূপ নিয়েছে। নির্দিষ্ট রূপগুলির কোন যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পশ্চাতে যেমন অনেক সময় সূক্ষ্ম কারিগরি দক্ষতার অভাব ছিল, তেমনই মন্দির দাতার ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট শৈলীর কোন কোনটির কিছুটা রূপান্তর ঘটেছিল। বস্তুতপক্ষে চালা, রত্ন, দেউল, দালান, চাঁদনি- এই পাঁচটি নির্দিষ্ট শৈলীর মন্দির অসংখ্য নির্মিত হলেও আরও অনেক শ্রেণিভেদ অঞ্চল ও কালভেদ উদ্ভূত হয়।[২৬]

অন্ত্যমধ্যযুগের বেশ কিছু মন্দিরের সীমানার মধ্যে মুক্ত প্রাঙ্গণে দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, তুলসীমঞ্চ ইত্যাদি স্থাপন করা হত। এই বিষয়ে শিবব্রত হালদার ও মঞ্জু হালদার তাঁদের রচিত 'Temple Architecture of Bengal' গ্রন্থটিতে জানিয়েছেন, *" In late mediaeval Bengal generally the temples were conceived to a scale of large residential huts with no other attendant structures, like the front pavilions etc. Unlike the ancient Nagara temples- in many temples they had their own distinctive 'temple furniture' like Ras Mancha, Dol Mancha, Tulsi Mancha etc. The Ras-Mancha and Dol-Mancha are places where deities are kept during the annual 'Rasa-lila' (held in the month of November) or 'Dol' (the festival of colours, held in the month of March) respectively. And they formed the standard elements in Radha- Krishna temples. A 'Tulsi- mancha' was usually kept in the front of all Vaishnava temples for steady supply of its leaves, an essential feature for krishna worship. The Radha-Krishna temples particularly had front 'mandapas' either in permanent or temporary structure, for holding various attendant functions of the temples. However separate Dol and Ras manchas are very rare and normally they were combined in one-considering the timings of holding such celebration. Vishnupur Town has a unique example of a very large Ras Mancha, made of bricks and laterite, in a stepped pyramid like multi pillared structure and stone built chariot. Some times the superstructures of these attendant temple furniture followed the original form of main temples."* [২৭]

মন্দির স্থাপত্যরীতি নিয়ে আলোচনার পর আসা যাক মন্দির তৈরির সামগ্রী সংক্রান্ত আলোচনায়। বাংলার মন্দির তৈরির শিল্পটি সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক বস্তু, এটি গাঙ্গেয় পলিমাটির ওপরই নির্ভর করে প্রসার লাভ করেছিল।

বাংলায় স্থাপত্য ব্যবহার করার যোগ্য পাথরের অপ্রতুলতা এখানকার কারিগরদের মাটিকে নানা ভাবে ব্যবহার করার দক্ষতা প্রদান করেছিল। বাংলার কারিগরদের উদ্ভাবনী সত্ত্বার প্রকাশ ঘটিয়েছিল মন্দির শিল্পে অলংকরণের প্রয়োগের মধ্যে।[২৮]

সুলতানি আমলে কারিগরেরা বিভিন্ন সৌধ নির্মাণে চুন-সুরকি মশলার ব্যবহার শুরু করেন। তার পূর্বে গাঁথনির এইরূপ মশলার ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। কিন্তু চুন সুরকির এবং চুনের মিহি প্রলেপের বহুল ব্যবহার আমাদের দেশে প্রাচীনকালেও ছিল। বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের আমলে বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় সৌধ নির্মাণে খিলান, ভল্ট এবং গাঁথনির মশলার নতুন করে ব্যবহার হতে থাকে। সহজ সাধ্য ও সুদীর্ঘ ফলদায়ী হওয়ায় তা গৃহীত হয় এবং পরবর্তীকালে নির্মিত অসংখ্য মন্দিরে কারিগরেরা এগুলির প্রয়োগ করতে থাকেন।[২৯]

স্থাপত্য নির্মাণের জন্য যত ধরনের পাললিক সামগ্রী প্রকৃতিতে পাওয়া যায় তার মধ্যে মাটিই অন্যতম। মাটি পুড়িয়ে ইঁট তৈরি করে ব্যবহার করা খুব প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। প্রাক-বৈদিক যুগের স্থাপত্যের মধ্যে ইঁটের ব্যবহার বারবার দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া বিগত তিন হাজার বছরে মনুষ্য নির্মিত স্থাপত্যেও ইঁটের ব্যবহার বারবার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধু সভ্যতায়, পাকিস্তানের মেহেড়গড়ে প্রভৃতি জায়গায়। মাটি পুড়িয়ে যে ইঁট তৈরি হয় তার কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। প্রথমত মাটির ঘনত্ব যে কোন ধরনের পাথরের থেকে কম, তাই খুব সহজেই বহন করা যায়। দ্বিতীয়ত এগুলি আকৃতিতে ছোট বলে খালি হাতে এগুলিকে নিয়ে কাজ করা সহজ। আর তৃতীয়ত মাটির তৈরি ইঁট সাবধানে সমান তাপমাত্রায় পোড়ানো হলে তার বহন ক্ষমতা বেড়ে যায়, এটি পরীক্ষিত সত্য। এছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো মাটির মধ্যে লোহার অক্সাইড মিশ্রিত থাকার ফলে পোড়ানোর পরে ইঁটের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের উজ্জ্বল লাল রঙের আভার সৃষ্টি করে যার স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য বাংলার মৃৎশিল্পীদের কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপিত করেছিল যার প্রকাশ ঘটেছিল বাংলার মন্দির স্থাপত্যে। নবাবদের সময় বা তার পরবর্তী সময় থেকে বিদেশি শাসকদের সময় পর্যন্ত নানা আকারের ইঁট তৈরি হয়েছে স্থাপত্যের প্রয়োজনানুসারে। মাটির নমনীয়তা গুণের জন্য বাংলায় নানা আকারের, আয়তনের এবং বৈচিত্র্যময় ইঁটের ব্যবহার দেখতে পাওয়া গেছে। মাটিকে পুড়িয়ে টালির মতো করে নিলে তার মধ্যে দিয়ে জল প্রবেশ করার ক্ষমতা লুপ্ত হয়। মাটির টালির এই বিশেষ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলার মৃৎশিল্পীরা মন্দিরের বাইরের আবরণকে অলংকরণ করার পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। মাটিকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করার কাজটি শিল্পীরা নিজেরাই করতেন, কারণ মাটির সঙ্গে আরও অনেক উপকরণ মিশ্রিত করা হতো; যেমন ধানের তুষ, গোবর, চূর্ণ করা পোড়ামাটি ইত্যাদি। টালিগুলি নির্মাণ করার জন্য বিশেষ ধরনের ছাঁচ ব্যবহার করা হতো। কাঁচামাটির উপর বিচিত্র সব বস্তু দ্বারা ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি দিয়ে এই অলংকরণের কার্য সম্পন্ন করা হতো। যেমন সূত্রধরেরা কাঠের সূক্ষ্ম কাজের জন্য এইসব যন্ত্র ব্যবহার করত, তারপর অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এমন বিশেষভাবে এগুলিকে পোড়ানো বা সেঁকা হতো যাতে অতিরিক্ত উত্তাপে এগুলির আকারের পরিবর্তন না হয়ে যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলার ভূ-প্রকৃতিতে উপযুক্ত পাথরের অভাব বাংলার কারিগরদের কম শক্তিশালী পাললিক শ্রেণির পাথর- যা নিকটবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যেত, তার ওপরে নির্ভর করতে হয়েছিল। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কিছু মন্দিরে আঞ্চলিক মাকড়া বা বেলে পাথরের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া জেলার প্রান্তে ছোটনাগপুর অঞ্চলের মাকড়া পাথর মন্দিরে ব্যবহার করার একমাত্র অসুবিধা হলো, এই ধরনের পাথর যখন মাটি থেকে তোলা হয় তখন এগুলি নরম থাকে; কিন্তু এগুলিতে সূক্ষ্ম কাজ করার পরে, বাতাসের সংস্পর্শে এসে এদের মধ্যে ছোট ছোট ক্ষত তৈরি হয়, যা সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে। বিষ্ণুপুরের বহু মন্দির মাকড়া পাথরে তৈরি হয়েছে। তবে বেশিরভাগ জায়গাতে এই পাথর মূল কাঠামো অর্থাৎ দেওয়ালের ভেতরের অংশে ব্যবহার করা হতো।

উৎকৃষ্ট শ্রেণির সূক্ষ্ম চুনা পাথরের চূর্ণর সঙ্গে আর কিছু জিনিস মিশিয়ে তাতে জল দিয়ে উপযুক্ত লেই প্রস্তুত করে মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে সূক্ষ্ম অলংকরণের কাজকে পঙ্খের কাজ বলা হয়। নবাবি আমলে মুসলমান কারিগরেরা স্থাপত্যকে নানাভাবে কারুকার্য খচিত করার উদ্দেশ্যে পঙ্খের কাজকে প্রচলিত করে। আপাতভাবে শ্বেতপাথরের নির্মাণের বিকল্প হিসেবে এগুলির নির্মাণের চেষ্টা বলে মনে করা হয়।[৩০] মন্দির তৈরির সামগ্রী সংক্রান্ত আলোচনার পর মন্দির গাত্রের ভাস্কর্য ও অলংকরণ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা যাক।

গাত্রালঙ্কারই হল বাংলার মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অলংকরণ পোড়ামাটির ফলক ও কখনো পঙ্খ প্রলেপ দ্বারা নির্মিত হয়। মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটি ও পঙ্খসজ্জার ঐতিহ্য ভারতে বহু প্রাচীন। খ্রিস্টীয় সাত-আট শতকে নির্মিত পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার ও দেবালয়ের ভিত্তিগাত্রের উপরিভাগের দেওয়ালের বিভিন্ন স্থানে, প্রস্তর অলংকরণের পাশাপাশি পোড়ামাটির ভাস্কর্য ফলক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই দেবালয়গুলি যে প্রথাগত খাঁটি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে গঠিত হয়েছিল, এমনও অনুমান করা হয়। তবে এই সমস্ত মার্গ

স্থাপত্যরীতির মন্দির সজ্জায় যেসব পোড়ামাটির ভাস্কর্য ফলক নিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলির ভাস্কর্যশৈলী একান্তই লোকশিল্প অনুসারী। কেননা পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ভাস্কর্য ফলকগুলির বিষয়বস্তু সমাজজীবনকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছিল। এই লৌকিকশৈলী অনুসারী পোড়ামাটির ভাস্কর্য ফলকের বেশ কিছু নিদর্শন বাংলাদেশের (অধুনা) বগুড়া জেলার পলাশবাড়িতে আবিষ্কৃত হয়েছে। যেখানে জনসাধারণের বোঝার সুবিধার জন্য ফলকের নীচে সংক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদাই করে দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, ফলকে উৎকীর্ণ উপাখ্যানগুলির বিষয়বস্তু জনসাধারণের যাতে বোধগম্য হয়। তবে খ্রিস্টীয় সাত থেকে নয় শতকের মধ্যে নির্মিত ধর্মীয় স্থাপত্যে মার্গশৈলীর ভাবাদর্শ রক্ষিত হলেও অঙ্গসজ্জায় পোড়ামাটির ভাস্কর্যে লোকায়ত শিল্পধারারই অনুশীলন হয়েছিল। পাল রাজাদের সময়ে মার্গ ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার এই আঞ্চলিক সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল। খ্রিস্টীয় তেরো থেকে পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুলতানি আমলে নির্মিত ধর্মীয় স্থাপত্য অলংকরণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা গেল মার্গ ও লৌকিক সংস্কৃতির দুটি ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৃতীয় একটি শিল্পধারা, যা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আনীত ইসলামি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। এই কারণেই ওই সময়ে বাংলায় ধর্মীয় স্থাপত্যে উৎকীর্ণ হয়েছে পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্য অলংকার ও ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যের অলংকার থেকে আহরিত উপাদানের মিলন মিশ্রণে রচিত অলংকার সজ্জা। বাংলায় তেরো শতক থেকে মন্দির নির্মাণচর্চায় ছেদ পড়েছিল, আবার পনেরো শতকের মধ্যভাগ থেকে নতুন করে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। সুতরাং এই সময় থেকেই বহু মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির দ্বারা ফলকসজ্জা হতে শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের কলাকৌশলগুলি চর্চা করে এসেছিলেন, তার ধারা ক্ষীয়মান হলেও উক্ত পর্যায়ে নতুন করে মন্দির অলংকরণের সুযোগ হওয়ায় তাঁরা তাঁদের সাবেকি কলাকৌশল ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা মিলিয়ে মিশিয়ে কাজটি করতে শুরু করলেন।[৩১]

প্রথাগত শিল্প- ভাস্কর্যের ধারাটি যে বহু পূর্ব সময় থেকে চলে আসছিল, তার কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- বহু পূর্বে নির্মিত কোন মন্দিরগাত্রে যে ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে নির্মিত কোন মন্দিরগাত্রে পূর্বে নির্মিত মন্দির ভাস্কর্যের কিছু কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার বিভিন্ন সময়ে নির্মিত মন্দিরের ভাস্কর্যের ফলকগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কখনো কখনো নির্দিষ্ট কোন একটি ফলক ভিন্ন মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়। অর্থাৎ একই ফলকের অনুকরণ করা হয়েছে বারংবার। বাংলার রাঢ়ের সূত্রধরেরা বহু বছর ধরে কাঠ খোদাইয়ের কাজ করে আসছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মন্দির নির্মাণের কাজও করতেন। ফলে মন্দির নির্মাণ শিল্প ও কাষ্ঠশিল্প একে অপরকে প্রভাবিত করেছিল। আবার রাঢ়ের শিল্পী সূত্রধর, রাঢ় বহির্ভূত স্থানের সূত্রধর ও শিল্পীদের থেকে অন্য ধরনের শিল্প রচনা করেছিলেন। ফলত রাঢ় এবং রাঢ়- বহির্ভূত স্থানের মন্দির সমূহের অলংকরণের একটি পার্থক্য সহজেই বোধগম্য হয়।

বাংলার নবপর্যায়ে নির্মিত প্রথম দিকের ভাস্কর্য ফলকগুলিতে জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশাই প্রাধান্য পেয়েছিল, মূর্তি ভাস্কর্যের বিশেষ কোন উপস্থিতি ছিল না। বাংলায় তখন সুলতানী রাজত্ব থাকায়, শাসকের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী ভাস্কর্যে মানুষ বা পশুমূর্তির স্থান হয় নি বলা যায়। খ্রিস্টীয় সতেরো শতক থেকে মন্দির সজ্জায় ফুল- লতাপাতার নকশা সজ্জার পাশাপাশি খোদিত হয়েছে পশুপাখি, মানুষ ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিফলক। এই সময়ের খোদিত মূর্তিগুলি উন্নত এবং বেশ গভীর করে কাটা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুপুষ্ট বর্তুলাকার এবং মুখাবয়বগুলি সাধারণত পাশ থেকে দেখানো হয়েছে। আঠারো শতকের মন্দির অলংকরণগুলিতে গ্রামীণ শিল্পীদের স্পর্শে নিজস্ব এক শৈলীর উদ্ভব হয়। এই সময়ের মূর্তিগুলিও গভীরভাবে খোদাই করা এবং এদের দেহ- ভঙ্গিমা ও অঙ্গ- সঞ্চালনেও বেশ বৈচিত্র্য প্রকাশিত হলেও বলিষ্ঠটা ক্রমশ শিথিল হয়ে যায়। এরপর উনিশ শতকে ভাস্কর্যচর্চার অবনয়ন ঘটে। টেরাকোটার ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি হয়ে পড়ে পুতুলের মতো গোলগাল, বলিষ্ঠতাও তেমন নেই। তবে যাই হোক এই ফলকগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পীগণ পেয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা, কোন মন্দির বা দেবালয়ের পৃষ্ঠপোষক শৈলীগতভাবে শিল্পীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। যদি করতেন, তাহলে বৈষ্ণব মন্দির বা শৈব মন্দিরে শাক্ত মূর্তির প্রভাব দেখা যেত না; আবার শৈব মন্দিরে বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত মূর্তি, যেমন চৈতন্যমূর্তি, কৃষ্ণলীলার ভিন্ন বিষয়গুলি চিত্রায়িত হতো না।

মূর্তি রচনায় শিল্পীরা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন কিন্তু তাদের মূর্তি সজ্জায় পড়েছিল লোকশিল্পের ছাপ। সেখানে উৎকীর্ণ ফলকগুলির মধ্যে কৌতুকবহ ও ছন্দোময় বিকৃতি বা ভঙ্গি এবং মূর্তির বলিষ্ঠ রেখার সরলীকরণ, যা কিনা লোকশিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, শিল্পীরা ছিলেন গ্রামের মানুষ এবং স্থানীয় জীবনযাত্রার মধ্যে আবদ্ধ। সেই সময় গ্রাম্য সমাজে কৃষ্ণকথা, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে কথকতা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ইত্যাদি মূল্যবোধের যে আদর্শ সাধারণ মানুষের মনে প্রভাব ফেলত,

শিল্পীরাও মন্দিরগাত্রে ফলক অলংকরণের মধ্যে সেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং সমাজজীবনের ভিন্ন ঘটনাসমূহকেই একটি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। সেইজন্য তাদের ফলকসজ্জায় এই বিষয়গুলি এমনভাবেই রূপায়িত হয়েছে যাতে তাদের এই শিল্পকৃতি জনসাধারণের বোধগম্য হয় এবং দৃশ্যমান বিষয়গুলি যেন দর্শকদের আকর্ষণ করে এবং একান্ত আনন্দ ও প্রেরণা লাভের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

বাংলার মন্দিরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সৃষ্টিতে একদা বাঙালি সূত্রধর শিল্পীরা যে সৌন্দর্য- সুষমার অবদান রেখে গেছেন, তা আজ বঙ্গ- সংস্কৃতির এক মহামূল্যবান সম্পদ। বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ক্রম বিকাশের সঙ্গে মন্দির সজ্জায় যে প্রথাগত পোড়ামাটির ভাস্কর্য সৃষ্টি করা হতো, তা বাঙালি শিল্পীদের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। শিল্পীরা আধ শুকনো মাটির ফলকের ওপরে স্বল্প গভীরে এইসব মূর্তি খোদাই করতেন; তারপর তা ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে ভাঁটিতে পোড়াবার ব্যবস্থা করতেন। ফলে এই পোড়ামাটির অলংকরণ এক সার্থক শিল্পের সৃষ্টি করত, যা একান্তই মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো।[৩২]

বাংলাতে ধর্মীয় স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের এই লুপ্ত ধারাটি আবার ফিরে আসে- সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দির স্থাপত্যগুলির মধ্যে। এই সময় বাংলায় যে মন্দিরগুলি তৈরি হয়, সেগুলি কিন্তু পাথরের নয়, তার চেয়ে অনেক নরম মাটি অথবা পোড়ামাটির। শিল্পীরা অনেক যত্নে নিষ্ঠা সহকারে নিজেদের উজার করে কাজগুলি করেছিলেন, যা খুব সহজে লোকশিক্ষার প্রকাশ হিসেবে কালের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মন্দির ভাস্কর্যে পোড়ামাটির অলংকরণের মধ্যে সাধারণত তিন শ্রেণির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়- (১) কোন দেবদেবীর মূর্তি বা কৃষ্ণলীলা জাতীয় ধর্মীয় চিত্রকলা, যেগুলি ফুল, লতা, পাতা জাতীয় বা জ্যামিতিক বন্ধনীর দ্বারা বেষ্টিত থাকত। (২) বিভিন্ন ফুলকারি নকশার কাজ যা স্তম্ভ খিলান বা মূল কাঠামোর অন্যান্য অংশে ব্যবহৃত হতো এবং (৩) জীবজন্তু যথা, হাতি, ঘোড়া, হরিণ, ময়ূর, হাঁস প্রভৃতির অলংকরণ যা মন্দির গাত্রের নিম্নভাগে ব্যবহৃত হতো।

অলংকরণের বিষয়- পোড়ামাটির মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এই বিষয়গুলি অধিক প্রাধান্য পেয়ে থাকে- (১) দেবদেবী; (২) মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা; (৩) মহাকাব্য- রামায়ণ ও মহাভারত; (৪) কৃষ্ণকাহিনি; (৫) পৌরাণিক কাহিনি; (৬) সমাজচিত্র; (৭) নক্সা, ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি।

বাংলায় অবস্থিত পোড়ামাটির অলংকরণের মন্দিরগুলি সবই চৈতন্য- পরবর্তী কালের শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের উপাস্য দেবতা রাধাকৃষ্ণ। অতএব দেবালয় গাত্রের অলংকরণে কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ভাস্কর্যে অগ্রাধিকার পায়। পোড়ামাটিতে বিষ্ণুপুরাণের মূর্তিগুলি যেমন আধিক্য পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক চিত্র কাহিনি। সাধারণত বাংলার বিভিন্ন মন্দিরে কৃষ্ণ বিষয়ক অলংকরণ প্রাধান্য পেলেও, শিব ও শক্তির বিভিন্ন মন্দিরে অন্যান্য ধরনের ভাস্কর্য দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত কাহিনি, পুরাণের গল্পকথা ও রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি পোড়ামাটির অলংকরণের মধ্যে চিত্রায়িত হয়েছে। মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারের বাইরের দেওয়ালের অলংকরণের মধ্যে সর্বোত্তম অলংকরণের প্রকাশ ঘটে।[৩৩]

মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির অলংকরণের বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় হল, যে কোন ভক্তিভাবেরই মন্দির হোক না কেন, মন্দির সজ্জায় বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সবরকম ভক্তিভাবই ভাস্কর্যে রূপায়িত করেছেন বাংলার মন্দির স্থপতিরা। এক্ষেত্রে বৈষ্ণব মন্দিরে যেমন কৃষ্ণলীলার উপাখ্যান স্থান পেয়েছে, তেমনি তারই সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে শাক্ত বা শৈব উপাসনার নানাবিধ কাহিনি, অন্যদিকে শাক্ত বা শৈব মন্দিরেও কৃষ্ণলীলার ভাস্কর্য স্থান পেয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, বাংলার মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ভাস্কর্য অলংকরণে শুধু শিল্পীর কারিগরি নৈপুণ্যেরই পরিচয় প্রকাশ পায়নি, সেই সঙ্গে মন্দির সজ্জায় অবাধ স্বাধীনতাও এই সৃষ্টিমূলক কাজে সহায়তা করেছে, যা ভক্তিজগতে পরম সহিষ্ণুতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভক্তিবাদের ঐতিহ্য বাঙালির জীবনে যে নবজাগরণের ঢেউ এনেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেখা যাচ্ছে, এ সময়ে বাংলায় সংস্কৃতি চর্চার বেশ প্রসার ঘটেছে, যার মূলে ছিল ভক্তিবাদের প্রেরণা ও পোষকতা, সে সময়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মচেতনার অঙ্গই ছিল এই সংস্কৃতিচর্চা। যার ফলে, শুধুমাত্র ভাষা, সাহিত্য ও সংগীতের সমৃদ্ধিই ঘটেনি, সেই সঙ্গে বিকশিত হয়েছে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নানাবিধ বিষয়। খ্রিস্টীয় ষোল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত দেখা যায় পোড়ামাটির ফলকের ভাস্কর্যযুক্ত আঞ্চলিক স্থাপত্যের বহু মন্দির নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব বিগ্রহকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত। দেশিয় মন্দির স্থাপত্যের সঙ্গে, হাতে লেখা বৈষ্ণবপুথির পাতায় কৃষ্ণ ও চৈতন্য লীলা সংক্রান্ত চিত্রাবলি অঙ্কণের যে রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে তাও এই গৌড়ীয়- বৈষ্ণব ধর্মের প্রেরণায়। সুতরাং চৈতন্য আবির্ভাবে ভক্তিধর্ম প্রভাবিত শিল্প সাহিত্য ও সংগীতের এই সমৃদ্ধি বাঙালির সার্বজনীন সম্পদ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

চৈতন্যলীলার একটি সর্বপ্রধান অঙ্গ হল সংকীর্তন। মৃদঙ্গ, করতাল ও শিঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অনুষ্ঠিত সংকীর্তন বাংলায় সম্ভবত চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন থেকেই প্রচলিত হয়েছে। এই সংকীর্তনে একদা নবদ্বীপের কাজি অসন্তুষ্ট হয়ে নগরিয়াদের উপরে যথেচ্ছ উৎপীড়ন চালান এবং কীর্তন বন্ধের আদেশ দেন। চৈতন্য মহাপ্রভু কাজির আদেশ অমান্য করে সকল ভক্তদের নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে যে সংকীর্তন মিছিল করেছিলেন, ইতিহাসে তা এক যুগান্তকারী ঘটনা বলেই চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বলতে গেলে, বৈষ্ণব প্রচারকগণ এই কীর্তন গেয়েই বাঙালির হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং বাংলার মন্দির সজ্জায় পোড়ামাটির ফলকেও স্বাভাবিকভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে এই সংকীর্তনলীলা।

বাংলার মন্দির সজ্জায় ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত ভাস্কর্যে ধর্ম ও সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিফলন ঘটলেও অন্য আরেকটি বিষয়ের প্রতি আগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। বিষয়টি হল, শেষ মধ্যযুগের নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, সংগীত ও নৃত্যচর্চা সম্পর্কিত বিবরণ, যা মন্দির গাত্রে নিবদ্ধ বিভিন্ন ফলকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। টেরাকোটায় রূপায়িত এইসব বাদ্যযন্ত্রগুলি তুলনীয় হতে পারে সেকালের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে যার গুরুত্ব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

ষোড়শ শতকের পরবর্তী মন্দিরেরই এখানে আধিক্য লক্ষ করা যায়। হুসেন শাহের রাজত্বকাল (১৪৯৩ - ১৫১৯খ্রিঃ) থেকে যে হিন্দু পুণরুভ্যুদয় দেখা দেওয়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক ভাবে মন্দির নির্মাণকার্য শুরু হয়ে গেল। এই পুণরুভ্যুদয়ে বিপুল বেগ সঞ্চার করল রাধাকৃষ্ণবাদের চরম পরিণতি শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুগামীদের নব্য বৈষ্ণবধর্ম। এই রাধাকৃষ্ণবাদ জয়দেবের আমল থেকে দৃঢ়ভাবে বঙ্গসংস্কৃতির অন্তরলোকে প্রবেশ লাভ করে আসছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলির অধিকাংশই রাধা অনুষঙ্গ যুক্ত কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। অষ্টাদশ শতকের অলঙ্কৃত মন্দির সমূহও প্রধানত কৃষ্ণের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, যেমন- গোপীনাথ, দামোদর, রাধাবল্লভ, গোপাল, লালজী, নন্দদুলাল, রাধাগোবিন্দ ইত্যাদি। সাদাসিধে এবং অনুচ্চ এই মন্দিরগুলির প্রসারিত পুরোভাগ জুড়ে পোড়ামাটির অতি ক্ষুদ্র খোদিত মূর্তির যে প্রাচুর্য দেখা যায়, তারই মাধ্যমে উচ্ছাস প্রবণ বৈষ্ণবধর্মের আনন্দঘন ভাবরূপটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।[৩৪]

প্রাক তুর্ক-আফগান যুগে মন্দিরে যে অলংকরণ রীতি প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে মন্দিরের স্থাপত্যশৈলীর বিবর্তনের সঙ্গে তারও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটল। মন্দিরগাত্রে 'টেরাকোটা' ও প্রস্তর ফলকের অলংকরণ উভয়ক্ষেত্রেই মন্দিরের অঙ্গসজ্জায় এই পরিবর্তন এল। খ্রিস্টীয় পনেরো শতক থেকে মন্দির স্থাপত্যশিল্পের পুণরুজ্জীবনের সঙ্গে এই শিল্পের পুনরুভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু অলংকরণের জন্য টেরাকোটা ও প্রস্তর ফলকে দেবলীলা বিষয়ক বা অন্য কোন মূর্তি বিন্যাস আরও অনেক পরে চালিত হয়। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ আন্দোলনের ফলে রাধাকৃষ্ণ উপাসনা জনগণের ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং আচন্ডাল দরিদ্র এই সরল সহজ ধর্মকে আদরে গ্রহণ করলেও মন্দির ভাস্কর্যে পৌরাণিক কাহিনি বা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কোন দৃশ্য চিত্র এই শতকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত কোন মন্দিরে লক্ষ করা যায়নি। সতেরো-আঠারো শতকের মধ্যে মন্দিরগুলির অঙ্গসজ্জায় টেরাকোটা বা প্রস্তরমূর্তি ফলক প্রচুর পরিমাণে স্থান পেতে থাকে।[৩৫]

পোড়ামাটির অলংকরণের প্রধান উপজীব্য বিষয় কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ থেকে সংগৃহীত। চারণ কবিদের যুগ-যুগান্তরের ঐতিহ্য মারফৎ মঙ্গল গায়কদের কথকতা ইত্যাদি সূত্রে এইসব পৌরাণিক গাঁথা চিরদিন জনপ্রিয় ছিল, তাছাড়া উত্তরকালে মোগল শাসকবর্গের উৎসাহে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত রচনার অনুবাদকর্মের ফলে সেই সনাতন জনপ্রিয়তায় এক নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল। তখন মন্দিরের পুরোভাগের বহিঃগাত্রে যা প্রত্যাশিত সেই কৃষ্ণলীলার রূপায়ণ সবচেয়ে বেশি খুঁটিয়ে ও যত্ন দিয়ে করা হয়েছে। কিন্তু রামায়ণও এখানে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে শিব মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলেও, তার অনেকগুলিই অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে গড়ন এবং প্রায়ই যুথবদ্ধ। যেসব ক্ষেত্রে অলঙ্কৃত করা হয়েছে সেখানে ঊনবিংশ শতকের আগে তাঁদের অলংকরণে নতুন শৈব উপাদান সংযোজনের কোন চেষ্টা করা হয়নি।[৩৬]

সতেরো ও আঠারো শতকের বহু মন্দিরে ছাঁচ তৈরি টেরাকোটা ফলকই বেশি করে তৈরি হত। এর দুটি শ্রেণি লক্ষ করা যায়, প্রথমটি হল- ছোট ছোট আকারের এক শ্রেণির ফলক, যেগুলিতে মূর্তি বা নকশা অগভীরভাবে খোদাই করা হলেও- সূক্ষ্ম কলা কৌশল, অঙ্গসৌষ্ঠব, পার্শ্বচিত্রের মধ্যে শিল্পরূপের উৎকর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণি হল- ছাঁচ ছাড়া অপেক্ষাকৃত একটু বড়ো ফলকে বড়ো বড়ো মূর্তি তৈরি করে সেগুলি হাত ও যন্ত্রের সাহায্যে ফলকে গভীরভাবে খোদাই করে রূপ দেওয়া হত। প্রথমোক্ত শ্রেণির ফলকগুলি সতেরো শতকে তৈরি মন্দিরগুলিতে বেশি লক্ষ করা যায়। অবশ্য অঞ্চলভেদে এর কিছুটা রূপান্তকরণও যে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মোটামুটিভাবে প্রায় সব টেরাকোটা মূর্তিফলক সন্নিবেশের একটি নিয়ম বা প্রথা রয়েছে। বেশিরভাগ মন্দিরের সামনের অংশ মূর্তি বা

নকশা ফলকে সজ্জিত করা হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই দিকে অলঙ্কৃত হত দু- একটি মূর্তি এবং ফুল ও ফুলকারি নকশায় চারিদিকের বাইরের দেওয়ালে মূর্তি সমাবেশ খুবই বিরল। টেরাকোটা ফলকগুলিকে বসানোর জন্য কার্নিশের নীচে সমান্তরাল এক বা দুই সারিতে কতকগুলি ছোট ছোট কুলুঙ্গি তৈরি করা হতো এবং দেওয়ালের বাম ও ডান দিকে দুপাশে প্রলম্বিত ঐ একই কুলুঙ্গি থাকত। বহু মন্দিরে কুলুঙ্গিতে আবার কোন ফলকই বসানো হয়নি, সেগুলি শূণ্যই থেকে গেছে। আঠারো শতকের বহু মন্দিরে সাহেবদের কিছু কিছু দৃশ্যপট লক্ষ করার মতো। এদের মধ্যে গোরা সৈন্য এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা স্থানীয় শাসনকর্তার চিত্রও উপস্থিত। সতেরো শতকে নির্মিত অনেক মন্দিরে মোগল বা পাঠান সেনার মূর্তি টেরাকোটা ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে, আর রয়েছে বিচিত্র নৌযানে হার্মাদ জলদস্যুরা, নিরীহ বন্দিকে যারা ওপর থেকে হিংস্র জলজন্তুর মুখে নিক্ষেপ করত তাদের সেই নিষ্ঠুর কর্মের দৃশ্য। টেরাকোটা ফলকে তা খুবই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সমাজ জীবনের বিচিত্র ছবি অসংখ্য টেরাকোটা ফলকে ধরা পড়েছে।

টেরাকোটা বিষয়বস্তু বা তার সন্নিবেশ রীতি এক হলেও স্থানিক ও কালিক পর্যায়ে রচনা শৈলীর ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র লক্ষ করা যায়। কালিক পর্যায়ে একথা বলা যায় যে, ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের মূর্তিফলক গুলির কারুকার্য, গঠন ও ভঙ্গিমায় আঠারো ও উনিশ শতক অপেক্ষা সূক্ষ্মতার মধ্যে দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস বিস্ময়করভাবে উপস্থিত। আঠারো শতক থেকে মূর্তির গঠনে কিছুটা স্থূলতার আভাস পাওয়া যেতে থাকে বলে শ্রী প্রণব রায় তাঁর 'বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন অঞ্চলে টেরাকোটা শৈলীর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। একই শিল্পী গোষ্ঠীর তৈরি টেরাকোটা মূর্তিগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়।[৩৭]

মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য ও অলংকরণ সম্পর্কিত আলোচনার পর আমরা আলোচনা করব মন্দিরের নির্মাণ কৌশল এবং মন্দির নির্মাণে কৌশলগত দুর্বলতা বা বলা যায় মন্দিরের নির্মাণগত ত্রুটি বিষয়টি নিয়ে। এছাড়া আরও কিছু কারণ আছে যেগুলি আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কেন এখনকার স্থাপত্য খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়না। বাংলায় সাধারণভাবে তিন ধরনের মন্দির নির্মাণ কৌশল লক্ষ করা যায়। প্রথম ধরনটি হল- মন্দিরের চারপাশে তৈরি করা পুরু মোটা দেওয়ালের উপর পরপর শুকনো ভারী পাথর সাজিয়ে একটু আগুপিছু স্তর তৈরি করে ক্রমশ ভিতর দিকে বাঁকানো করে রেখ দেউলের আকৃতি দেওয়া। বাংলার দক্ষিণ- পশ্চিম অঞ্চলে এই ধরনের কিছু মন্দির লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় ধরনটি হল- মন্দিরের চারপাশে পুরু দেওয়ালটি ইঁটের তৈরি, কিন্তু ইঁট জোড়া দেওয়ার জন্য কাদামাটি অথবা চুন সুরকি জলে জলে মিশিয়ে বাঁধন দেওয়া হতো। বাংলায় গুপ্ত ও পাল যুগেও এই ধরনের নির্মাণ শৈলীর প্রচলন ছিল। এই ধরনের নির্মাণ কৌশলে মন্দিরের ছাদ তৈরি হত ধাপে ধাপে চারধার দিয়ে ইঁট বা পাথরের স্তরকে কমিয়ে এনে, যাকে *Corbelling* বলা হয়। তৃতীয় ধরনটি হল নবাবি আমলের নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগ অর্থাৎ গ্রামবাংলার কুঁড়েঘরকে পারসিক- আরবীয় রীতির অনুকরণে গম্বুজ, খিলান, স্থুল স্তম্ভ ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে একেবারে নতুন রূপ দেওয়া এবং মন্দিরের অলংকরণের ধরনে পোড়ামাটির সূক্ষ্মকারুকার্য দ্বারা ধর্মীয় চিত্র রচনা করা, যা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও পূর্বে লক্ষ করা যায়নি। মন্দিরের গর্ভগৃহটির ছাদ গম্বুজের আকারে নির্মিত এবং মন্দিরের সম্মুখে প্রবেশপথটি খিলানযুক্ত ধনুকাকার ছাদ দিয়ে ঢাকা। এগুলি মন্দির স্থাপত্যের মূল কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক রচনা করেছে।

মন্দির স্থাপত্য স্থায়ী না হওয়ার অনেকগুলি কারণের মধ্যে এগুলির নির্মাণ কৌশলের দুর্বলতা অন্যতম কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। নির্মাণগত ত্রুটি মন্দিরগুলির স্থায়ীত্বের পক্ষে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্থাপত্যগুলি তাই নষ্ট হয়ে যায়। বাংলায় মন্দিরগুলি নির্মাণ করা হতো পুরু দেওয়ালের মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেওয়ালগুলি ইঁট, পাথর ও মাটি ইত্যাদি মিশিয়ে ভারী দেওয়ালের কাঠামো নির্মাণ করে তারপর অলংকরণের জন্য পোড়ামাটির কারুকার্যখচিত টালি বসিয়ে তাকে দৃশ্যত সুন্দর করা হতো। এরফলে মন্দিরটি খুব ভারী হয়ে যায় এবং ভেতরে শক্তি না থাকার ফলে খুব সহজেই অনেক মন্দির ভেঙে পড়ে গেছে।

আজকের বাংলায় পুরানো হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শন খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। আর মজার বিষয় যে, গত এক শতকে ইঁটের মন্দির তৈরি হয়নি। তার অন্তরালে রয়েছে নানাবিধ কারণ।

ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি আবহাওয়া জনিত বিভিন্ন কারণগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক স্থাপত্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার মূলে যে সমস্ত কারণগুলি উল্লেখ করা হল, সেগুলি ছাড়াও যে কারণটি সবচেয়ে ক্ষতিকারক সেটি হল মানুষের দৌরাত্ম্য। যেমন- অশিক্ষিত বা অপটু লোক দিয়ে পোড়ামাটির মন্দিরকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হলে তার কাঠামোতে স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আজকের বাংলার মন্দিরে এই ধরনের বহু কাজ হয়েছে বা হচ্ছে, যেখানে ঐতিহাসিক স্থাপত্যের ইতিহাস হারিয়ে গেছে। এছাড়াও আর এক ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ দেখা যায়, কিছু মানুষ অজ্ঞতার বশে এই মন্দিরগুলির গায়ে হিজিবিজি আঁকিবুঁকি করে বা খোদাই করে। যুগযুগ ধরে সারা দেশে বহু স্থাপত্য এই অজ্ঞতার শিকার হয়েছে। একই সঙ্গে স্থাপত্যগুলি নষ্ট হয়েছে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের

অভাবে। বাংলার স্থাপত্য মূলত ইঁটের স্থাপত্য, পাথরের তুলনায় ইঁট খুলে নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ এবং তাকে ভেঙে বা সোজাসুজিভাবে পুনরায় ব্যবহার করাও সহজ। তাই আজও এই ধারা অব্যাহত। কালের বিচারে এইসব স্থাপত্য তাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বা হচ্ছে না।[৩৮]

'মধ্যযুগের মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা মধ্যযুগের মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিষয়ক নানা তথ্য সম্পর্কে অবগত হলাম। আমাদের গবেষণাকার্যের পরবর্তীস্তর হল ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক নানা তথ্য অনুসন্ধান করে সেগুলি বিশ্লেষণ করা। ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক অধ্যায়গুলিতে আমরা মধ্যযুগের মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কিত নানা তথ্য অনুসন্ধান করে সেগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের ধারণাকে আরও স্বচ্ছ করে তুলতে চেষ্টা করব।

॥ তথ্যঋণ ॥

১. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ. ৯।
২. সান্যাল হিতেশরঞ্জন, বাংলার মন্দির; কলকাতা; কারিগর; জানুয়ারী ২০১২, পৃ. ২৩।
৩. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩, পৃ. ৫৭।
৪. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ.. ১৫-২১।
৫. তদেব, পৃ.. ২১-২৩।
৬. তদেব, পৃ.. ২৪,২৫।
৭. তদেব, পৃ. ২৩।
৮. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ২০।
৯. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ. ১২।
১০. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ২৮।
১১. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ৪২।
১২. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ৫২।
১৩. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ. ৩১।
১৪. সান্যাল হিতেশরঞ্জন, বাংলার মন্দির; কলকাতা; কারিগর; জানুয়ারী ২০১২, পৃ.. ৩৭,৩৮।
১৫. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩, পৃ. ৪৮।
১৬. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ. ৫১।
১৭. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ২৩।
১৮. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ.. ৩৩,৩৪।
১৯. *Mccutchion David J, Late Mediaeval Temples of Bengal; Kolkata; The Asiatic Society; December 2004, Pg. 5.*
২০. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ২৩।
২১. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩, পৃ. ৪১।
২২. *Mccutchion David J, Late Mediaeval Temples of Bengal; Kolkata; The Asiatic Society; December 2004, Pg. 8.*
২৩. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩, পৃ. ৪৯।
২৪. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ. ৩৪।
২৫. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩, পৃ.. ৪১, ৪৯, ৫০।
২৬. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ.. ৩৮, ৪২, ৬৩।
২৭. *Halder Sibabrata & Halder Manju, Temple Architecture of Bengal; Kolkata; Urbee Prakashan; September 2011, Pg. 196, 197.*
২৮. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩, পৃ. ৫৪।
২৯. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ. ৩০।
৩০. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩, পৃ.. ৫৪-৫৬।
৩১. সাঁতরা তারাপদ, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ; কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী; জানুয়ারি ২০১৪, পৃ.. ৫৩ - ৫৫।
৩২. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ৬৬।
৩৩. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩, পৃ.. ৫১, ৫৪।
৩৪. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫, পৃ.. ৫৯, ৬৬, ৭৪, ৭৬, ৮০।
৩৫. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ.. ৪৮, ৫১, ৫২।

৩৬. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ৫৯।
৩৭. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪, পৃ.. ৫৩, ৫৬।
৩৮. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩, পৃ.. ৫৭, ৫৮।

****

দ্বিতীয় বিভাগ

ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক বর্ধমান জেলার মন্দির সমূহ

প্রথম অধ্যায়

॥ বর্ধমানের মন্দির সমূহের তালিকা প্রণয়ন ॥

বর্ধমান জেলা ৬টি মহকুমায় ভাগ করা হয়েছে এবং এই ৬টি মহকুমায় ৩১টি ব্লক রয়েছে। এই মহকুমা গুলি হল, যথাক্রমে-

(১) বর্ধমান সদর (উত্তর)
(২) বর্ধমান সদর (দক্ষিণ)
(৩) কালনা
(৪) কাটোয়া
(৫) দুর্গাপুর
(৬) আসানসোল

এই ৬টি মহকুমায় ব্লক অনুযায়ী বর্ধমান জেলার মন্দিরগুলি তালিকাভুক্ত করা হল-

(১) বর্ধমান সদর (উত্তর) মহকুমা

ক্রমিক সংখ্যা	মন্দিরের নাম	গ্রাম / শহর	ব্লক	ডাকঘর	থানা	পিন
১	লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ মন্দির	শ্যামবাজার, সোনাপট্টি	বর্ধমান সদর- ১	রাজবাটি	বর্ধমান	৭১৩১০৪
২	রাধাবল্লভ জীউ, শ্যামসুন্দর জীউ, অন্নপূর্ণা মন্দির	নতুনগঞ্জ	বর্ধমান সদর- ১	নতুনগঞ্জ	বর্ধমান	৭১৩১০২
৩	সর্বমঙ্গলা মন্দির	মঙ্গলাপাড়া	বর্ধমান সদর- ১	রাজবাটি	বর্ধমান	৭১৩১০৪
৪	বিদ্যাসুন্দর মন্দির	তেজগঞ্জ	বর্ধমান সদর- ১	নতুনগঞ্জ	বর্ধমান	৭১৩১০২
৫	নবাবহাটের ১০৮শিব মন্দির	নবাবহাট	বর্ধমান সদর- ১	বর্ধমান,১	বর্ধমান	৭১৩১০১
৬	রাজা তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠিত ৩টি শিবমন্দির	উদয়পল্লী, ৩৫৫পাড়া	বর্ধমান সদর- ১	কাঞ্চননগর	বর্ধমান	৭১৩১০২
৭	দেবী ত্রৈলক্যতারিনী মন্দির	কয়রাপুর	আউসগ্রাম- ১	মোহনপুর	আউসগ্রাম	৭১৩১২৭
৮	সরকার পরিবারের শিবমন্দির	তকীপুর, বাগ্‌দীপাড়া	আউসগ্রাম- ১	রথতলা	আউসগ্রাম	৭১৩১৪১
৯	বারোয়ারি শিবমন্দির	মাধপুর, পূর্বপাড়া	ভাতাড়	নাসিগ্রাম	ভাতাড়	৭১৩১২৫
১০	পরিত্যক্ত জোড়া শিবমন্দির	মাধপুর, পূর্বপাড়া	ভাতাড়	নাসিগ্রাম	ভাতাড়	৭১৩১২৫
১১	কালিবটতলার শিবমন্দির	মাধপুর, পূর্বপাড়া	ভাতাড়	নাসিগ্রাম	ভাতাড়	৭১৩১২৫
১২	পরিত্যক্ত মন্দির	মাধপুর, পশ্চিমপাড়া	ভাতাড়	নাসিগ্রাম	ভাতাড়	৭১৩১২৫
১৩	দেউলেশ্বর মন্দির	বনপাস, কামারপাড়া	বর্ধমান সদর- ১	বনপাস	ভাতাড়	৭১৩১২৭
১৪	রায়'দের ৪টি শিবমন্দির	বনপাস, রায়পাড়া	বর্ধমান সদর- ১	বনপাস	ভাতাড়	৭১৩১২৭

(২) বর্ধমান সদর (দক্ষিণ) মহকুমা

ক্রমিক সংখ্যা	মন্দিরের নাম	গ্রাম / শহর	ব্লক	ডাকঘর	থানা	পিন
১	প্রাণেশ্বর মন্দির	মশাগ্রাম, বামুনপাড়া	জামালপুর	মশাগ্রাম	জামালপুর	৭১৩৪০১
২	গোপাল মন্দির	কুলীনগ্রাম, অধিকারী পাড়া	জামালপুর	কুলীনগ্রাম	জামালপুর	৭১৩১৬৬
৩	শিবমন্দির	কুলীনগ্রাম, অধিকারী পাড়া	জামালপুর	কুলীনগ্রাম	জামালপুর	৭১৩১৬৬
৪	সিংহবাহিনী মন্দির	শাঁকাড়ি, উত্তরপাড়া	খন্ডঘোষ	শাঁকাড়ি	খন্ডঘোষ	৭১৩৪২৪
৫	মজুমদার'দের রাধাগোবিন্দ মন্দির	শাঁকাড়ি, উত্তরপাড়া	খন্ডঘোষ	শাঁকাড়ি	খন্ডঘোষ	৭১৩৪২৪
৬	মুন্সীবাড়ীর জোড়া শিবমন্দির	রায়না, মধ্যপাড়া	রায়না	রায়না	রায়না	৭১৩৪২১
৭	শ্রীধর মন্দির	রায়না, মধ্যপাড়া	রায়না	রায়না	রায়না	৭১৩৪২১

৮	বোস পরিবারের জোড়া শিবমন্দির	রায়না, মধ্যপাড়া	রায়না	রায়না	রায়না	৭১৩৪২১
৯	দত্ত পরিবারের পরিত্যক্ত মন্দির	রায়না, মধ্যপাড়া	রায়না	রায়না	রায়না	৭১৩৪২১
১০	৪টি শিবমন্দির	বোকড়া, দক্ষিণপাড়া	রায়না	রায়না	রায়না	৭১৩৪২১
১১	লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দির	গ্রাম দেবীপুর	মেমারী- ১	দেবীপুর	মেমারী	৭১৩১৪৬
১২	শিখর দেউল	সাতদেউল	মেমারী- ১	আঝাপুর	মেমারী	৭১৩৪০১
১৩	রায়পাড়ার ৩টি শিবমন্দির	বিজুর	মেমারী- ২	বিজুর	মেমারী	৭১৩৪২২
১৪	রায়পাড়ার হেলা শিবমন্দির	বিজুর	মেমারী- ২	বিজুর	মেমারী	৭১৩৪২২
১৫	হরগৌরী মন্দির	জাবুই	মেমারী- ২	জাবুই	মেমারী	৭১৩১৪৬
১৬	দে'পরিবারের নারায়ণ মন্দির	জাবুই, কামারপাড়া	মেমারী- ২	জাবুই	মেমারী	৭১৩১৪৬
১৭	চ্যাটার্জী পরিবারের পরিত্যক্ত মন্দির	জাবুই, মুখার্জীপাড়া	মেমারী- ২	জাবুই	মেমারী	৭১৩১৪৬
১৮	গুপ্ত পরিবারের কালীমন্দির ও শিব মন্দির	মেলনা	মেমারী- ২	বনগ্রাম	মেমারী	৭১৩৪০৭
১৯	রায়পাড়ার রায় ও চৌধুরী পরিবারের শিবমন্দির	মেলনা	মেমারী- ২	বনগ্রাম	মেমারী	৭১৩৪০৭
২০	শ্রীধর জীউ মন্দির	সাতগাছিয়া	মেমারী- ২	সুলতানপুর	মেমারী	৭১৩১৪৬
২১	রায় পরিবারের সাদা সোমেশ্বর মন্দির	শিবপুর	মেমারী- ২	কুচুট	মেমারী	৭১৩৪০৭
২২	গোস্বামী পরিবারের গোপাল মন্দির	পূর্বপাড়া	মেমারী- ২	কুচুট	মেমারী	৭১৩৪০৭
২৩	শ্রী রঘুনাথ জীউ মন্দির	মাঝেরপাড়া	মেমারী- ২	কুচুট	মেমারী	৭১৩৪০৭
২৪	দাস পরিবারের শিব সীতারাম মন্দির	চন্ডীপুর	মেমারী- ২	খাড়গ্রাম	মেমারী	৭১৩১৪৯
২৫	সর পরিবারের নারায়ণ মন্দির	চন্ডীপুর	মেমারী- ২	খাড়গ্রাম	মেমারী	৭১৩১৪৯
২৬	গোস্বামী পরিবারের ২টি শিবমন্দির	করন্দা	মেমারী- ২	করন্দা	মেমারী	৭১৩৪২২
২৭	শিব মন্দির	হাট শ্রীধরপুর	মেমারী- ২	হাট শ্রীধরপুর	মেমারী	৭১৩১৪৬
২৮	পরিত্যক্ত শিব মন্দির	হাট শ্রীধরপুর	মেমারী- ২	হাট শ্রীধরপুর	মেমারী	৭১৩১৪৬
২৯	জোড়া শিবমন্দির	হাট শ্রীধরপুর	মেমারী- ২	হাট শ্রীধরপুর	মেমারী	৭১৩১৪৬
৩০	চক্রবর্তী বাড়ীর পরিত্যক্ত শিবমন্দির	হাট শ্রীধরপুর	মেমারী- ২	হাট শ্রীধরপুর	মেমারী	৭১৩১৪৬
৩১	শিব মন্দির	হাট শ্রীধরপুর	মেমারী- ২	হাট শ্রীধরপুর	মেমারী	৭১৩১৪৬
৩২	শিব মন্দির	বড় পলাসন, দক্ষিণপাড়া	মেমারী- ২	বড় পলাসন	মেমারী	৭১৩৪২৯
৩৩	দ্বাদশ শিব মন্দির	বড় পলাসন, দত্তপাড়া	মেমারী- ২	বড় পলাসন	মেমারী	৭১৩৪২৯
৩৪	দে'পরিবারের সিংহবাহিনী মন্দির	সাতগাছিয়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৩৫	বলাইচাঁদের মন্দির	সাতগাছিয়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৩৬	ঘোষাল পরিবারের জোড়া শিবমন্দির	সাতগাছিয়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৩৭	ঘোষাল পরিবারের গোপাল মন্দির	সাতগাছিয়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৩৮	সিদ্ধেশ্বরী মন্দির	সাতগাছিয়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৩৯	কৃষ্ণরাই জীউ মন্দির	সাতগাছিয়া, চৌধুরীপাড়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৪০	মুখার্জী পরিবারের শিবমন্দির	সাতগাছিয়া, চৌধুরীপাড়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৪১	গন্ধবণিক'দের শিবমন্দির	সাতগাছিয়া, চৌধুরীপাড়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৪২	গন্ধবণিক'দের পরিত্যক্ত শিবমন্দির	সাতগাছিয়া, শাঁকাড়িপাড়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৪৩	গন্ধবণিক'দের পরিত্যক্ত শিবমন্দির	সাতগাছিয়া, শাঁকাড়িপাড়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২

৪৪	জগন্নাথ মন্দির	সাতগাছিয়া, পশ্চিমপাড়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৪৫	প্রবঞ্চকুমার মুখোপাধ্যায়ের ষষ্ঠীতলার রাধাকৃষ্ণ মন্দির	সাতগাছিয়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৪৬	গৌরাঙ্গ মন্দির	সাতগাছিয়া, পশ্চিমপাড়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৪৭	বুড়ো শিবমন্দির	সাতগাছিয়া, পশ্চিমপাড়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৪৮	ব্যানার্জী'দের শিবমন্দির	সাতগাছিয়া, পালপাড়া	মেমারী- ২	সাতগাছিয়া	মেমারী	৭১৩৪২২
৪৯	বাগদীপাড়ার জোড়া শিবমন্দির	হরকালী, বাগদীপাড়া	মেমারী- ২	বরোয়ামহেশ	মেমারী	৭১৩৪২২
৫০	মনসাতলার জীর্ন মন্দির	হরকালী	মেমারী- ২	বরোয়ামহেশ	মেমারী	৭১৩৪২২
৫১	শিবমন্দির	বোহার, মহিষডাঙা	মেমারী- ২	বোহার	মেমারী	৭১৩৪২২
৫২	শিবমন্দির	বোহার, বিষ্ণুপুর	মেমারী- ২	বোহার	মেমারী	৭১৩৪২২

(৩) কালনা মহকুমা

ক্রমিক সংখ্যা	মন্দিরের নাম	গ্রাম / শহর	ব্লক	ডাকঘর	থানা	পিন
১	প্রতাপেশ্বর মন্দির, বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দির, লালজী মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্রজী মন্দির, রূপেশ্বর মন্দির, ১০৮শিবমন্দির, রামেশ্বর মন্দির	কালনা, রাজবাটী চত্বর	কালনা- ১, টাউন	কালনা	কালনা	৭১৩৪০৯
২	গোপাল জীউ মন্দির	কালনা,গোপালপাড়া	কালনা- ১, টাউন	কালনা	কালনা	৭১৩৪০৯
৩	অনন্ত বাসুদেব মন্দির	কালনা,শ্যামরায় পাড়া	কালনা- ১, টাউন	কালনা	কালনা	৭১৩৪০৯
৪	দেবী অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী মন্দির	কালনা, সিদ্ধেশ্বরী মোড়	কালনা- ১, টাউন	কালনা	কালনা	৭১৩৪০৯
৫	জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দির	কালনা, জগন্নাথ তলা	কালনা- ১, টাউন	কালনা	কালনা	৭১৩৪০৯
৬	জগন্নাথ মন্দির	কালনা, জগন্নাথ তলা	কালনা- ১, টাউন	কালনা	কালনা	৭১৩৪০৯
৭	শ্যামরাই মন্দির	কালনা, শ্যামরাই পাড়া	কালনা- ১, টাউন	কালনা	কালনা	৭১৩৪০৯
৮	কৃষ্ণ বলরাম, জগন্নাথ, গোপীশ্বর ও রাধারানী মন্দির	বাঘনাপাড়া	কালনা- ১	বাঘনাপাড়া	কালনা	৭১৩৫০১
৯	নন্দীবাড়ীর শিবমন্দির	গ্রাম কুলটি	কালনা- ২	কুলটি	কালনা	৭১২১৪৬
১০	দত্তবাড়ীর শিবমন্দির	গ্রাম কুলটি	কালনা- ২	কুলটি	কালনা	৭১২১৪৬
১১	জোড়া শিবমন্দির	গ্রাম কুলটি	কালনা- ২	কুলটি	কালনা	৭১২১৪৬
১২	জোড়া দেউল	বৈদ্যপুর	কালনা- ২	বৈদ্যপুর	কালনা	৭১৩১২২
১৩	নন্দী পরিবারের ৫টি শিবমন্দির	বৈদ্যপুর	কালনা- ২	বৈদ্যপুর	কালনা	৭১৩১২২
১৪	ঘোষ'দের শিবমন্দির	পাঁচরখী	কালনা- ২	বৈদ্যপুর	কালনা	৭১৩১২২
১৫	দে'পরিবারের শিবমন্দির	পাঁচরখী	কালনা- ২	বৈদ্যপুর	কালনা	৭১৩১২২
১৬	কুন্ডু পরিবারের শিবমন্দির	পাঁচরখী	কালনা- ২	বৈদ্যপুর	কালনা	৭১৩১২২
১৭	দক্ষিণাচণ্ডী মাতার মন্দির	কুসুমগ্রাম	মন্তেশ্বর	কুসুমগ্রাম	মন্তেশ্বর	৭১৩৪২২
১৮	তারা মায়ের মন্দির	শুশুনা	মন্তেশ্বর	শুশুনা	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫

১৯	মুখার্জী পরিবারের শিবমন্দির	শুশুনা	মন্তেশ্বর	শুশুনা	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
২০	দূর্গা মন্দির	হোসেনপুর	মন্তেশ্বর	হোসেনপুর	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
২১	জোড়া শিবমন্দির	পুটশুড়ী	মন্তেশ্বর	পুটশুড়ী	মন্তেশ্বর	৭১৩৫১৪
২২	গণ পরিবারের শিবমন্দির	পুটশুড়ী	মন্তেশ্বর	পুটশুড়ী	মন্তেশ্বর	৭১৩৫১৪
২৩	মিশ্র পরিবারের শিবমন্দির	পুটশুড়ী	মন্তেশ্বর	পুটশুড়ী	মন্তেশ্বর	৭১৩৫১৪
২৪	বাবা পঞ্চাননের মন্দির	পুটশুড়ী	মন্তেশ্বর	পুটশুড়ী	মন্তেশ্বর	৭১৩৫১৪
২৫	দীনেশ্বর শিবমন্দির	দেনুড়	মন্তেশ্বর	দেনুড়	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
২৬	ভোলানাথ মন্দির	দেনুড়	মন্তেশ্বর	দেনুড়	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
২৭	শ্রীধর মন্দির	দেনুড়	মন্তেশ্বর	দেনুড়	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
২৮	পাত্রেশ্বর শিবমন্দির	পাতুন	মন্তেশ্বর	দেনুড়	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
২৯	বরাহ বিষ্ণুদেবের মন্দির	কাইগ্রাম	মন্তেশ্বর	কাইগ্রাম	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
৩০	ভোলানাথ মন্দির	কাইগ্রাম	মন্তেশ্বর	কাইগ্রাম	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
৩১	বসু'পরিবারের শ্রীরাধাবিনোদ জীউ'র মন্দির	কাইগ্রাম	মন্তেশ্বর	কাইগ্রাম	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
৩২	শিবমন্দির	মূলগ্রাম	মন্তেশ্বর	মালম্বা	মন্তেশ্বর	৭১৩৪২৬
৩৩	লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির	মূলগ্রাম	মন্তেশ্বর	মালম্বা	মন্তেশ্বর	৭১৩৪২৬
৩৪	রায়'পরিবারের শিবমন্দির	ভোজপুর	মন্তেশ্বর	ভোজপুর	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
৩৫	দত্ত'পরিবারের শিবমন্দির	ভোজপুর	মন্তেশ্বর	ভোজপুর	মন্তেশ্বর	৭১৩১৪৫
৩৬	মুখার্জী'দের শিবমন্দির	পিপলন	মন্তেশ্বর	পিপলন	মন্তেশ্বর	৭১৩৪২২

(৪) কাটোয়া মহকুমা

ক্রমিক সংখ্যা	মন্দিরের নাম	গ্রাম / শহর	ব্লক	ডাকঘর	থানা	পিন
১	মুখার্জী পরিবারের শিব মন্দির	সিঙ্গিগ্রাম	কাটোয়া- ২	সিঙ্গিগ্রাম	কাটোয়া	৭১৩৫১৪
২	বুড়ো শিবমন্দির	সিঙ্গিগ্রাম	কাটোয়া- ২	সিঙ্গিগ্রাম	কাটোয়া	৭১৩৫১৪
৩	চন্দ্র পরিবারের তিনটি শিবমন্দির	শ্রীবাটী	কাটোয়া- ২	শ্রীবাটী	কাটোয়া	৭১৩৫১৪
৪	অট্টহাস মন্দির	দক্ষিণডিহি	কেতুগ্রাম- ২	রাউদি- শ্রীরামপুর	কেতুগ্রাম	৭১৩১৪০
৫	ভট্টাচার্য পরিবারের শিবমন্দির	সীতাহাটি	কেতুগ্রাম- ২	সীতাহাটি	কেতুগ্রাম	৭১৩১৩০

(৫) দুর্গাপুর মহকুমা

ক্রমিক সংখ্যা	মন্দিরের নাম	গ্রাম / শহর	ব্লক	ডাকঘর	থানা	পিন
১	চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির	চম্পাই, কসবা	গলসি- ১	কসবা	বুদবুদ	৭১৩৪০৩
২	দেউলেশ্বর শিবমন্দির	মানকর, দক্ষিণ রায়পুর	গলসি- ১	মানকর	বুদবুদ	৭১৩১৪৪
৩	লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দির	মানকর, দক্ষিণ রায়পুর	গলসি- ১	মানকর	বুদবুদ	৭১৩১৪৪
৪	মহাদেব মন্দির	মানকর, দক্ষিণ রায়পুর	গলসি- ১	মানকর	বুদবুদ	৭১৩১৪৪
৫	চ্যাটার্জী পরিবারের শিবমন্দির	সারুল	গলসি- ১	গলসি	গলসি	৭১৩৪০৬
৬	বারোয়ারি শিবমন্দির	সারুল, পূর্বপাড়া	গলসি- ১	গলসি	গলসি	৭১৩৪০৬
৭	চৌধুরীবাড়ীর শিবমন্দির	সারুল, পূর্বপাড়া	গলসি- ১	গলসি	গলসি	৭১৩৪০৬
৮	ভরতপুরের বৌদ্ধস্তূপ	ভরতপুর	গলসি- ১	ভরতপুর	বুদবুদ	৭১৩১৪৮
৯	চট্টরাজ পরিবারের তিনটি শিবমন্দির	রক্ষিতপুর	কাঁকসা	রক্ষিতপুর	কাঁকসা	দুর্গাপুর-১২
১০	রায় পরিবারের মন্দির	বনকাটি	কাঁকসা	বনকাটি	কাঁকসা	৭১৩১৪৮
১১	গোপালেশ্বর শিবমন্দির	বনকাটি, মুখার্জীপাড়া	কাঁকসা	বনকাটি	কাঁকসা	৭১৩১৪৮
১২	কর্মকার'দের চারটি শিবমন্দির	অযোধ্যা গ্রাম	কাঁকসা	বনকাটি	কাঁকসা	৭১৩১৪৮
১৩	বড়কালীতলার শিবমন্দির	গোপালপুর, পূর্বপাড়া	কাঁকসা	গোপালপুর	কাঁকসা	দুর্গাপুর-১২
১৪	রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির	আড়রা গ্রাম	কাঁকসা	আড়রা	কাঁকসা	দুর্গাপুর-১২
১৫	গড়জঙ্গলের শ্যামরূপা মায়ের মন্দির	ঢেকুড়গড় / শ্যামরূপা গড়	কাঁকসা	বনকাটি	কাঁকসা	৭১৩১৪৮
১৬	ইছাই ঘোষের দেউল	গৌরাঙ্গপুর	কাঁকসা	বনকাটি	কাঁকসা	৭১৩১৪৮
১৭	রায়পাড়ার নারায়ণ মন্দির	বীরভানপুর, রায়পাড়া	দুর্গাপুর পৌরসভা	দুর্গাপুর	দুর্গাপুর কোকওভেন	দুর্গাপুর-০২
১৮	আচার্য'দের তিনটি মন্দির	বীরভানপুর, রায়পাড়া	দুর্গাপুর পৌরসভা	দুর্গাপুর	দুর্গাপুর কোকওভেন	দুর্গাপুর-০২

(৬) আসানসোল মহকুমা

ক্রমিক সংখ্যা	মন্দিরের নাম	গ্রাম / শহর	ব্লক	ডাকঘর	থানা	পিন
১	বেগুনিয়ার চারটি দেউল	বেগুনিয়া	আসানসোল পৌরসভা	বেগুনিয়া বাজার	কুলটি	৭১৩৩২৪
২	বিষ্ণু মন্দির	গারুই গ্রাম	আসানসোল পৌরসভা	কন্যাপুর	আসানসোল উত্তর	৭১৩৩৪১

****

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ নির্বাচিত মন্দিরের পৃথকভাবে তথ্য সমূহের আলোচনা ॥

॥ বর্ধমান জেলার বৈষ্ণব মন্দির ॥

[১] গারুই গ্রামের বিষ্ণুদেবের মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

আসানসোল মহকুমার গারুই গ্রামের এটি একমাত্র প্রস্তর নির্মিত মন্দির, যা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষন, কলকাতা মণ্ডল প্রদত্ত স্মারকলিপি অনুযায়ী, এবং গ্রামবাসী শ্রী ষষ্ঠীপদ চ্যাটার্জী দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মন্দিরটি আনুমানিক চতুর্দশ শতকে (১৩০০-১৩৯৯ খ্রিঃ) নির্মিত। কিন্তু ঐতিহাসিক ও মন্দির বিশেষজ্ঞরা এই মন্দিরকে আরও অনেক প্রাচীন বলেছেন। ডেভিড ম্যাক্কাচন এই মন্দিরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মত প্রকাশ করেছেন, তা হল- "An early type of an-chala favoured by the Bishoupur Kings has an upper tower with so short a wall as to be hardly distinguishable from a char-chala. These continued to be build in the Bankura-Burdwan-North Midnapore area well into the 19th century. The temple at Garui (PS Asansol), repaired by the Archeological Survey as a Char-Chala, probably belonged to this type….."

মন্দিরের গঠনশৈলী :

বেলে পাথরের তৈরি এই দক্ষিণমুখী মন্দিরটি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। উপরের ছাদের অংশ ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে চারচালার আকার আকৃতি নিয়েছে। গর্ভগৃহের সম্মুখাংশ ত্রিখিলান বিশিষ্ট। এত সুন্দর প্রস্তর নির্মিত চালার সুনিপুণ গঠনাকৃতি এবং রূপারোপ বিষ্ণুপুরের নিজস্ব মৌলিক শৈলীর একরত্ন চালার প্রস্তর মন্দিরকে স্মরণ করায়। যেহেতু বীর হাম্বীরের সময় একদা এই শেরগড় অঞ্চলসহ পঞ্চকোট রাজ্যের অনেকটাই বিষ্ণুপুর রাজ্যের অধীনে ছিল, তাই তখন এখানে বিষ্ণুপুর শৈলীর মন্দির নির্মাণ অসম্ভব নয়।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

উচ্চতা- ৩৬′ তলপত্তন- ১$\frac{১}{২}$′ আয়তন- ১০′ × ১০′

দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫$\frac{১}{২}$′ দ্বারের প্রস্থ- ২′

বিগ্রহ :

স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিকট প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বহুযুগ আগে নাগছত্রধারী দ্বাদশবাহু লোকেশ্বর মূর্তি পূজিত হত। বর্তমানে পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম শিলা গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

এই মন্দিরে পূজিত বিষ্ণুদেব শিলা নির্মিত। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকায় চিত্র এবং পরিমাপ পাওয়া সম্ভব হয়নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরটি বারোয়ারি মন্দির। কোন ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যে মন্দিরটি পড়ে না। মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষন, কলকাতা মণ্ডল দ্বারা সংরক্ষিত।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – দুটি মন্দিরের দ্বার সকাল ১০.৩০টায় উন্মুক্ত হয়। সন্ধ্যে ৭টার সময় সন্ধ্যারতী হওয়ার পর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের ব্যক্তিগত দেবোত্তর কোন সম্পত্তি নেই। তাই কোন আয়- ব্যয় নেই।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে জন্মাষ্টমী, রাস, দোল প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পূজা হয় বিষ্ণু মন্দিরটিতে। বৈশাখ মাসে নাম সংকীর্তন হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কোন সাংস্কৃতিক উৎসব হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব ও অনুষ্ঠানে ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারা কিছু অর্থ আয় হয়, সেই অর্থই মন্দিরের সেবায় ব্যয় করা হয়।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে প্রতিদিন অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। গ্রামবাসীদের ঘর থেকে ভোগ রান্না করে দিয়ে যায় মন্দিরে। অন্নভোগের সাথে পরমান্ন ভোগও নিবেদন করা হয়। বৈশাখ মাসে শীতল হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – বর্তমানে মন্দিরটিতে ৬০-৬৫ জন সেবাইত আছেন। প্রত্যেকের একদিন করে পালা থাকে পূজা করার। পুরোহিতের নির্দিষ্ট কোন বেতন নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – উৎসব ও অনুষ্ঠান ব্যতীত তেমন ভক্ত সমাগম হয় না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরটিতে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২।

[২] **David J. Mccutchion, Late Mediaval Temples of Bengal, Asiatic Society, Kolkata, 2004.**

[৩] মন্দিরের সেবাইত।

[৪] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[২] সিঙ্গারকোণ গ্রামের শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউ মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

সিঙ্গারকোণ গ্রাম একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু জনপদ। এখানে রয়েছে শ্রীমোহনানন্দ আচার্যের শ্রীপাট। ইনি শ্রীঅদ্বৈত শিষ্য শ্রীশ্যামদাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁরই বংশধর কমললোচন ভট্টাচার্য দ্বারা রাধাকান্তদেবের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সিঙ্গারকোণের এই শ্রীরাধাকান্তদেব ব্যতিক্রমী দেব বিগ্রহ। বৃন্দাবন থেকে আগত। কীভাবে তিনি এই গ্রামে অধিষ্ঠিত হলেন তার ইতিহাস ও কিংবদন্তি রয়েছে। এখানকার গোস্বামী বংশের আদি পুরুষ কমললোচন ভট্টাচার্য শাক্ত ব্রাহ্মণ ও কালীসাধক ছিলেন। ইনি বাড়িতে মা কালীর মূর্তি পূজা করতেন। কিংবদন্তি আছে, একদিন মা কালী কমললোচনের কন্যা কালীদাসীর ছদ্মবেশে তাঁর সেবা করেছিলেন। বিষয়টা অবগত হলে কমললোচন নিজেকে দোষী বিবেচনা করেন এবং কালীমূর্তিকে কংস নদীতে বিসর্জন দেন। তারপর থেকে ঐখানেই কংস নদীর তীরে কালীপূজার সূত্রপাত ঘটে। যা আজও গ্রামদেবী ও সর্বজনীন বারোয়ারি রক্ষাকালী পূজা হিসেবে চালু রয়েছে। প্রতিবছর ধুমধাম সহকারে আষাঢ় মাসের অমাবস্যা তিথিতে পূজা হয়। কমললোচন কালীমূর্তি নদীতে বিসর্জন করে দিয়ে বিবাগি হন। বৈরাগ্যবশত আপন দুই সন্তান শ্যামদাস ও মোহনানন্দকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য রেখে আসেন এবং পাকাপাকি দেশান্তরী হন।

দুই পুত্র বড় হয়ে মোহনানন্দ সিঙ্গারকোণে এবং শ্যামদাস মাতীশ্বর গ্রামে বাস করতে থাকেন। মোহনানন্দই প্রকৃতপক্ষে সিঙ্গারকোণের গোস্বামী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে বৃন্দাবনবাসী হন। সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মোহনানন্দ বৃন্দাবনে থাকাকালীন সুনিপুণ ভাস্কর্যময় অপূর্বদর্শন শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শনে, বিগলিত হয়ে বাসনা করেন তাঁকে নিজ গ্রামে নিয়ে আসার। কিন্তু বিগ্রহ সংগ্রহের কাঞ্চন মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। বিফল মনোরথ হয়ে নিজ গ্রামে ফিরে এসে স্বপ্নাদিষ্ট হন। –'তুই আমাকে চেয়েছিলি, আমি তোর সঙ্গেই এসেছি রে, কংস নদীর ধারে কেয়া বনে অবস্থান করছি। তুই আমাকে নিয়ে যা।'

ঘটনাচক্রে পরদিন সত্যই মোহনানন্দ নদীর ধারের কেয়া বনে তাঁর আরাধ্যদেব শ্রীরাধাকান্তকে পান পিঠে দু-চারটে কেয়াপাতার দাগসহ, যা আজও দেখা যায়। মোহনানন্দ মহানন্দে বুকে করে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন সে দেববিগ্রহ পর্ণকুটিরে। তারপর আসতে আসতে নির্মিত হয় মন্দির, নাটমঞ্চ, মালকিন ঘর, ব্রজবুলীকুঞ্জ, দোলমঞ্চ, রসুইঘর ইত্যাদি তাঁদের বংশ পরম্পরায়। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সঠিক জানা না থাকলেও অনুমান করা যায়, ১৫২৫খ্রিঃ থেকে ১৫৪০খ্রিঃ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সিঙ্গারকোণের শ্রীপাটক্ষেত্র, শ্রীরাধাকান্তদেব ও তাঁর মন্দির ৫০০বছরের প্রাচীন বলেই মনে করা যেতে পারে। হয়তো শহর কালনার গৌরীদাস ও সূর্যদাস মিশ্র কৃত সবচেয়ে প্রাচীন শ্রীপাটক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালনা শহরের অন্যান্য শ্রীপাটক্ষেত্র- ২৫চূড়া বিশিষ্ট লালজী, কৃষ্ণচন্দ্রজীউ, গোপালজীউ মন্দির পরবর্তীকালে স্থাপিত। লালজী (১৭৪১খ্রিঃ), শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীউ (১৭৫২খ্রিঃ) বর্ধমানরাজের নির্মাণ এবং গোপালজীউ (১৭৬৬খ্রিঃ) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। এবং ১৬১৫খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎধন্য প্রখ্যাত বৈষ্ণব ও পদকর্তা বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় গোস্বামীর পৌত্র, মা জাহ্নবার পালিত পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঘনাপাড়ার শ্রীকৃষ্ণবলরাম শ্রীপাটক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই সিঙ্গারকোণের শ্রীপাটক্ষেত্রের সূত্রপাত হয়েছিল বলেই মনে করা হয়, যা আজও মোহনানন্দের পৌত্র- দৌহিত্র দ্বারা বংশ পরম্পরায় উল্লেখযোগ্য ভাবেই সেবিত হয়ে আসছে।

শ্রী শ্রী হরিদাস দাসের শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে বিগ্রহের নাম 'শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজীউ' বলা হলেও ঠাকুরবাড়ির প্রস্তর ফলকে বিগ্রহের নাম 'শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউ' বলা হয়েছে। কমললোচন মহাশয় কাশ্যপ গোত্রজাত শাক্তব্রাহ্মণ ছিলেন। পত্নী বিরজাসুন্দরী। মূল পদবি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপাধি ছিল ভট্টাচার্য। পরে তাঁদের বংশধর অদ্বৈত আচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ কর্তৃক গৌতম গোত্র ও গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

শ্রীরাধাকান্তজীউ'র মন্দিরটি 'জোড়বাংলা' রীতিতে তৈরি হয়েছে। পশ্চিমমুখী মন্দিরটির গর্ভগৃহে প্রবেশের দুটি দ্বার রয়েছে। একটি দ্বার পশ্চিমদিকে, আর একটি দ্বার দক্ষিণদিকে। মূল মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ নাটমন্দির রয়েছে। আর সদর দরজার উপর দালানরীতির নহবতখানা রয়েছে।

সদর দরজার সম্মুখে উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দালানরীতির দোলমঞ্চ রয়েছে। দোলমঞ্চের বাইরে বারান্দায় খিলানযুক্ত তিনটি করে খোলা দরজা রয়েছে। এর গর্ভগৃহের চারদিকে চারটি খোলা দরজা রয়েছে। নীচ থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে গর্ভগৃহে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরটির উচ্চতা- ২০′ মন্দিরটির আয়তন- ২০′×২৪′ দোলমঞ্চের তলপত্তন- ৪′

মূল মন্দিরে প্রবেশ করা যায়নি, তাই দ্বারের পরিমাপ পাওয়া যায়নি।

বিগ্রহ :

'শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউ' মন্দিরের মূল বিগ্রহ হিসেবে সেবিত হন কৃষ্ণবর্ণের শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউ। এটি একটি ত্রিভঙ্গ মূর্তি। সুদৃশ্য, মনোহর শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউ বিগ্রহটিকে প্রতিদিন সকাল ৯টায় সময় মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার পর নিদ্রা হতে জাগিয়ে নিয়ে একটি গামছা পরিয়ে স্নান করান হয়। তারপর তাঁকে ধুতি পরিয়ে নিয়ে অলংকার এবং চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ করা হয়। বিগ্রহটিকে শিরে মুকুট, দুটি হাতে বিভিন্ন রকমের চুড়ি, কণ্ঠে হার এবং পায়ে নূপুর পরানো হয়। পায়ের নূপুর ব্যতীত সমস্ত অলংকার রূপোর উপর সোনার জল করা। দুটি পায়ে রূপোর নূপুর পরানো হয়। বংশীধর শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউ'র দুটি হাত দিয়ে একটি রূপোর বাঁশি ধরে আছেন। মুখমণ্ডল ও দুটি হাতে চন্দন দ্বারা অঙ্কন করা হয় প্রতিদিন।

বিগ্রহটি সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত হওয়ার পর গর্ভগৃহ হতে বাইরে নিয়ে এসে উপস্থিত করা হয় দর্শনার্থীদের জন্য। লক্ষণীয় হল যে, অনেক শ্রীপাটক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পাঁশে রাধার পূজন এবং গৌড়- নিতাই বিগ্রহ স্থাপিত হলেও এখানে শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তদেব একান্ত ভাবেই সেবিত হয়ে আসছেন।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউ'র বিগ্রহটি কষ্টি পাথর দ্বারা নির্মিত। মূর্তির উচ্চতা- ১½'

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – রাধাকান্তজীউ'র মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত শ্রী স্বদেশ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মন্দিরটি বর্তমানে তাঁদের পরিবারেরই মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে। বংশ পরম্পরায় তাঁরাই সেবা করে আসছেন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – এই মন্দিরের দ্বার সকাল ৯টার সময় উন্মুক্ত হয়ে যায়। সকাল ১০টায় বিগ্রহের সেবা হয়। দুপুরে ভোগের পর শয়ন হয় তখন গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। বিকেল ৪টের সময় মন্দির দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতী হয়। রাত্রি ৭.৩০ মিনিট নাগাদ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – সিঙ্গারকোণের শ্রীরাধাকান্তদেবের আকর্ষণে বর্ধমানরাজ উদয়চাঁদ মহতাব একবার দর্শন করতে আসেন বিগ্রহটি এবং বিগ্রহ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে মন্দির সংলগ্ন তমালতলা ইত্যাদি কিছু ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে ঐ সম্পত্তি দ্বারা কিছুই আয় হয় না। এছাড়া মন্দিরের নিজস্ব সম্পত্তি নেই। যা আয় হয় ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারা, সেই অর্থই মন্দিরের পূজার্চনার ক্ষেত্রে ব্যয় হয়। এছাড়া পুরোহিতের পরিবারই পূজার যাবতীয় খরচা বহন করে থাকে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউ মন্দিরে জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাসপূর্ণিমা, ঝুলনযাত্রা, মাঘী অমাবস্যায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা মোহনানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব দিবসে তিনদিন ধরে মহোৎসব হয়, সেবাইতদের কারও মৃত্যু হলে তাঁর উদ্দেশ্যে একদিন মহোৎসব পালিত হয়। এইসব অনুষ্ঠান পালন করা হলেও রাধাকান্তজীউ মন্দিরে মূল ও প্রধান উৎসব হল দোলযাত্রা। মহাধুমধাম করে এখানে দোলযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। সেই সময় রাধাকান্তকে দোলমঞ্চে আনা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে দোলযাত্রার উৎসব ব্যতীত মাঘমাসের অমাবস্যা তিথিতে মোহনানন্দের তিরোভাব উপলক্ষ্যে তমালতলায় মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোল উৎসব মূলত চারদিন পালন করা হয়। সয়লা, চাঁচর, দোল (আবির উৎসব) ও ধুলট। দোলের দিন সন্ধ্যাবেলায় শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহটি পুষ্প সজ্জায় সজ্জিত হয়ে পুষ্পশোভিত সিংহাসনে বিরাজ করেন। অপরূপ তাঁর বেশভূষা। গ্রামবাসীরা ছাড়াও আশেপাশের প্রচুর গ্রামের অধিবাসীরা এসে সমস্ত রাত্রি ধরে আতসবাজি পোড়ানোয় অংশগ্রহণ করে। বাজনার দল বাজনা বাজায়। শ্রীখোল, খঞ্জনী সহযোগে কীর্তন করতে করতে বিগ্রহটিকে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। তারপর শেষরাতে বিগ্রহটিকে দোলমঞ্চে দোলায় উপবেশন করান হয়। তখন শুরু দেবদোল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ঐ একটি দিনই সকলেই রাধাকান্তদেবের চরণে আবির নিবেদন করতে পারে। রাত শেষ পরদিন মধ্যাহ্নে দোলমঞ্চেই প্রভুর ফল ভোগ হয় এবং সেদিন বিকেলে হয় আবির উৎসব। এই আবির উৎসব সিঙ্গারকোণ গ্রামের ও শ্রীরাধাকান্তদেবের এক ব্যতিক্রমী ও উল্লেখযোগ্য উৎসব।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – অন্যান্য পূজোয় যত ভক্ত সমাগম হয় তার থেকে অনেক গুণ বেশি দোল উৎসবে ভক্ত সমাগম হয়। তাই ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারাই পূজার্চনার ব্যয় বহন করা হয় অনেকাংশেই। বাকী মন্দিরের সেবাইতদের পরিবারই ব্যয় বহন করে থাকে।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য তিনবার ভোগ নিবেদন করা হয়। সকালবেলায় মাখন, মিছরি দিয়ে, দুপুর বেলায় অন্নভোগ, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। আর সন্ধ্যাবেলায় ফল, মিষ্টি দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। দোলযাত্রার উৎসবের দিন অনেকবার ভোগ নিবেদন করা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিতের কোন নির্দিষ্ট বেতন ধার্য করা নেই। কারণ এই মন্দিরটি তাঁদের পারিবারিক মন্দিরে।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – নিত্য মন্দিরে ভক্ত সমাগম হয়। তবে জন্মাষ্টমী, রাসপূর্ণিমায় ভক্ত সমাগম বেশি হয়। দোলযাত্রার সময় শুধু গ্রামবাসীরাই নয়, আশেপাশের গ্রামের প্রচুর ভক্ত ও দর্শনার্থীর ভিড় জমে মন্দির প্রাঙ্গণে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরের বিগ্রহকে স্পর্শ করা নিষেধ। শুধুমাত্র দোলযাত্রায় দেবদোলের সময় স্পর্শ করা যায় বিগ্রহটি।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – উক্ত মন্দির সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে শ্রী তারকেশ্বর চট্টোরাজ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। মন্দিরের পুরোহিতের কাছে সেই গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থটির নাম, 'শ্রীরাধাকান্তদেব, সিঙ্গারকোণ'।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরগাত্রে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] চট্টরাজ তারকেশ্বর ও মণ্ডল দুর্গাপদ, শ্রীরাধাকান্তদেব সিঙ্গারকোণ শ্রীপাট; কাটোয়া; অজয় সাহিত্য পর্ষদ; ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

[২] দাশ বিবেকানন্দ, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি.; ১৯৯৯।

[৩] মন্দিরের পুরোহিত।

[৪] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৩] কাইগ্রামের বরাহ- বিষ্ণুদেবের মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কাইগ্রামের অন্যতম পুরাকীর্তি হল বরাহ- বিষ্ণুদেবের মন্দিরটি। বরাহ- বিষ্ণুদেবের বিগ্রহটি নিয়ে কয়েকটি মত ভেদ প্রচলিত আছে। মুসলমানগণ বরাহ- বিষ্ণুদেবের মন্দির ধ্বংস করার উদ্যোগ করলে, পুরোহিত গোপনে কোনক্রমে শ্রীবিগ্রহটি নিয়ে রাইগ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত কাইগ্রামে পলায়ন করেন। কাইগ্রামের উক্ত মন্দিরের সেবাইত বংশের শ্রী অচিন্ত্যনাথ ব্রহ্মচারী এই মত পোষণ করেন।

অন্যমতে ভারত সম্রাট আকবরের (১৫৫৬- ১৬০৫খ্রিঃ) পরম আত্মীয় রাজপুতবীর মানসিংহ, রাইসিংহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন খড়ি নদীর ধারে জায়গীরদার হওয়ার জন্য। উক্ত রাইসিংহ রায়গড় নামে একটি গড় খনন করে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁর বসতবাড়ির সামনে শ্রীশ্রী বরাহগোপালজিউ এবং মাতা সর্ব্বমঙ্গলার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাইসিংহের মৃত্যুর পর জায়গীরদার হন তাঁর পুত্র পূরণসিংহ। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানদের ধর্মীয় কারণে মতান্তর হয়। একটি অশুভ ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে পূরণসিংহের দূরদর্শী মন্ত্রী ব্রহ্মদত্ত সেবাইত ব্রহ্মচারীকে গোপালজিউ বিগ্রহ সহ কাইগ্রামে এবং দেবী সর্ব্বমঙ্গলার বিগ্রহ সহ রায়বংশীয় জনৈক সেবাইতকে রাউতগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। আবার অনেকের মতে প্রায় তিনশ বছর আগে কাইগ্রামের বরাহ-গোপালদেব আবিষ্কৃত হয়েছিলেন রাইগ্রামের গোরাচাঁদের মাজারের পশ্চিমে অবস্থিত মাটি থেকে অনেক উঁচু একটি ধ্বংসস্তূপ থেকে। এই উঁচু স্থানটিকে স্থানীয় ভাবে গোপালডাঙ্গা বলা হয়। বরাহ-গোপালদেব সেই থেকে ব্রহ্মচারী পরিবারের সেবা পেয়ে আসছেন। তবে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে মন্দিরের সেবাইতের কাছ থেকে কোন সঠিক তথ্য জানা যায়নি।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

বরাহ- বিষ্ণুদেবের মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং জোড়বাংলা রীতিতে নির্মিত। মন্দিরটির গর্ভগৃহের সম্মুখে ত্রিখিলান বিশিষ্ট ঢাকা বারান্দা রয়েছে। পশ্চিম ও দক্ষিণে রয়েছে দুটি প্রবেশ পথ। গর্ভগৃহের একটি প্রবেশপথ। মন্দিরটির পূর্বদিকে রয়েছে মন্দির সংলগ্ন একটি উচ্চভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দোলমঞ্চ। দোলমঞ্চের তলায় একটি কক্ষ রয়েছে। এটি পরবর্তী সময়ে নির্মিত বলে জানা গেছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরটির উচ্চতা- ২৫′ আয়তন- ১৭′× ১৭′ তলপত্তন- ৪.২′

দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫′ দ্বারের প্রস্থ- ২.৬′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে মূল বিগ্রহ রূপে পূজিত হন দণ্ডায়মান বরাহ-বিষ্ণুদেব। বরাহদেবের চারহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বর্তমান। এছাড়া গর্ভগৃহের অন্যান্য দেবদেবীদের মধ্যে পূজিত হন দণ্ডায়মান অনন্তবাসুদেব, গণেশ, নাড়ুগোপাল, মঙ্গলচণ্ডী, তিনটি নারায়ণ শিলা, রামচন্দ্র এবং তাঁর পাদুকা, গদাধরের পদ্ম।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

বরাহদেবের মূর্তিটি সবুজ আভাযুক্ত কষ্টি পাথর দ্বারা নির্মিত। এই মূর্তিটি একটি বিরলতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

বরাহগোপালের উচ্চতা- ২′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরের সেবাইত শ্রী অচিন্ত্যনাথ ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বর্তমানে মন্দিরটি ব্রহ্মচারী পরিবারের মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে। মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণ, পূজা পরিচালনা সমস্ত কিছুই এই পরিবারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, তাঁদের আদি পদবী চট্টোপাধ্যায়। কোন এক পূর্বপুরুষ সন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, সে কারণে তাঁদের পদবী ব্রহ্মচারী হয়। ব্রহ্মচারীদের বিবাহ নিষেধ। কিন্তু তিনি বংশের অধস্তনদের বিবাহ করার অনুমতি দান করেছিলেন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – দুটি মন্দিরের দ্বারই সকাল ৭টায় উন্মুক্ত হয়। নিত্যসেবার পর সকাল ১০টার মধ্যে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বেলা ১২টায় ভোগ নিবেদনের জন্য দ্বার উন্মুক্ত হয়। এরপর বিকেল ৬টার সময় সন্ধ্যারতী হওয়ার পর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের ব্যক্তিগত দেবোত্তর কিছু সম্পত্তি রয়েছে, যার আয় থেকেই মন্দিরের সেবা করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে বিশেষভাবে দোল, রথ, জন্মাষ্টমী সাড়ম্বরে পালন করা হয়। দোল উৎসবই এখানকার প্রধান উৎসব। এখানকার বিশেষত্ব হল, দোল উৎসব পালিত হয় চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। দোলের দিন বিগ্রহকে পার্শ্ববর্তী রাউতগ্রামে ও মশাডাঙ্গা গ্রামে বাজনাবাদ্য সহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ফকিরের কবরে মাটি দেওয়ার প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এই সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে, এক মুসলিম ফকির একবার মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে মন্দিরের বারান্দায় এক ছোট ছেলেকে খেলা করতে দেখেন। বালকটি বারান্দা থেকে পড়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা করে বাড়িতে খবর দিয়ে নিজের কাজে চলে যান। কিন্তু বাড়ির লোক এসে সেখানে কোন ছোট ছেলেকে দেখতে পায়নি। সকলের ধারণা হয় বরাহদেব বালকের বেশ ধারণ করে ফকিরকে দেখা দিয়েছেন। ফকিরের বাড়ি ছিল মাসডাঙ্গায়। সেই থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। বছরের ওই একদিনই বরাহদেবকে বাইরে বের করা হয়। জন্মাষ্টমী তিথিতে বরাহদেবের বিশেষ পূজা ও দুদিন ব্যাপী নন্দোৎসব পালিত হয়। গ্রামের মহিলারা হলুদ জল সহ মালসা মাথায় নিয়ে মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করে মন্দিরের সামনে এসে সেই মালসা মাটিতে আছাড় মেরে ভাঙে, তারপর সকলে মাটি থেকে হলুদ জল অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় ঠেকায়। রথের সময় মন্দিরের ভেতরে রথকে ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। বরাহদেব এই সময় রথে অধিষ্ঠান করে পূজা ও আরতি গ্রহণ করেন। ঐদিন রাত্রে জোড়া আরতি হয়, তারপর তিনি শয়নে যান। সাতদিন পর উল্টোরথের দিন বিশেষ পূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে কোন সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরে উৎসবে দেবোত্তর সম্পত্তি দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ এবং ভক্তদের দক্ষিণা বাবদ যে অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থই ব্যয় করা হয়।

(জ) ভোগ – গোপীনাথ মন্দিরে নিত্য অন্নভোগ হয়না। নিত্য চিড়াভোগ, বাতাসা, মিষ্টি ও ফল দিয়ে ভোগ হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরে বর্তমানে ৯টি পরিবার সেবাইত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। প্রত্যেকে পালা করে পূজার দায়িত্ব নেন। পুরোহিতের নির্দিষ্ট কোন বেতন নেই। আপদকালীন অবস্থায় গ্রামের কোন পুরোহিত মোতায়েন করে পূজা করানো হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – উৎসব ও অনুষ্ঠান ব্যতীত তেমন ভক্ত সমাগম হয় না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে হোমের সময় করবী ফুল বাঞ্ছনীয়।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরটি টেরাকোটা কারুকার্যে সমৃদ্ধ ছিল, তা প্রথম দর্শনেই বোঝা যায়। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়াল এবং বারান্দার স্তম্ভ দুটিতে অপূর্ব টেরাকোটার কারুকার্য লক্ষ করা যায়। মন্দিরের বাকি তিনদিকের দেওয়ালগুলি সংস্কার করার সময়ে সিমেন্টের পলেস্তারা করার ফলে টেরাকোটা কাজের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মন্দিরের সম্মুখাংশে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, নৌকাবিহার, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমায় নারী- পুরুষ, বিভিন্ন ফুলকারি নকশা, লতা পাতা প্রভৃতি টেরাকোটার কাজ লক্ষ করা যায়।

তথ্যঋণ :

[১] মুখোপাধ্যায় ডঃ যুগল, লৌকিক দেবদেবী ও পুরাকীর্তির আলোকে মন্তেশ্বর; কলকাতা; নব দিগন্ত প্রকাশনী; ১৪১৯।

[২] মন্দিরের সেবাইত।

[৩] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৪] বাঘনাপাড়ার বলরাম- কৃষ্ণ মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

বাঘনাপাড়ার মুখ্য গ্রামদেবতা যুগল বলরাম ও কৃষ্ণের ইষ্টক মন্দির ১৫৩৮শকাব্দ বা ১৬১৬খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। রাজবল্লভ গোস্বামীর রচিত মুরলীবিলাস ও প্রেমদাস রচিত বংশীশিক্ষা নামক দুটি অপ্রামাণ্য গ্রন্থের মতে নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবীদেবী যেসময় বৃন্দাবনে গিয়ে দেহরক্ষা করেন, সেবার রামচন্দ্র খড়দহে সংবাদ পাঠিয়ে বেশ কিছুকাল সেখানেই অবস্থান করেন। তারপর গৌড়ে ফিরে অম্বিকার পশ্চিমে বল্লুকা নদীর দক্ষিণ তীরে গভীর জঙ্গল কাটিয়ে তথায় বাঘনাপাড়া পাটের পত্তন করেন। 'বংশীশিক্ষা'র মতে রামাই বৃন্দাবনের তীর্থ থেকে কানাই- বলাই এর মূর্তি নিয়ে আসছিলেন। তখন- "কৃষ্ণ বলরাম কহিলেন, আর না যাইব।

এই বনে রহে মোরা বিহার করিব।"

এখানে এই বনটিকে পৌরাণিক মহিমায় মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যেই ব্যাঘ্রপাদ ঋষির কাহিনি যুক্ত করা হয়েছে, যা অতি মাত্রায় অলৌকিক এবং কাল্পনিক বলেই অধিকাংশ মানুষ মনে করেন।

বাঘনাপাড়ার এই বলরাম- কৃষ্ণ মন্দিরটি ১৫৩৮শকাব্দ বা ১৬১৬খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলেও, তার প্রায় ২৬- ২৮বছর আগেই, অর্থাৎ ১৫৮৮- ৯০খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবীদেবীর পালিত পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী নামক একজন বৈষ্ণব অরণ্য মধ্যে পর্ণশালায় বলরাম- কৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ যুগল স্থাপনা করেছিলেন।

ঐ মন্দিরলিপির পাঠ বিপিনবিহারী গোস্বামী ১৮৯৯খ্রিঃ প্রথম প্রকাশ করেন স্বরচিত 'দশমূলরস' গ্রন্থে। তাঁর প্রদত্ত পাঠ নিম্নরূপ- ॥ শ্রীমজ্জগমোহনর্মব্যস্থিতঃ শ্লোক ॥

শাকে নাগাগ্নি কামেষু বিধৌ শ্রীরামচন্দ্রতঃ।
আবিরাসীদিষ্টকং শ্রীরমাপতেঃ কার্যেহ স্মিন্।।

অর্থাৎ নাগ= ৮, অগ্নি=৩, কাম=৫ ও বিধু=১ ধরে অঙ্কস্য বামাগতি অনুযায়ী ১৫৩৮শকাব্দ বা ১৬১৬খ্রিঃ এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।

উদ্ধৃত লিপিটি বলরাম-কৃষ্ণ মন্দিরের জগমোহনের অন্তর্গত দুই প্রধান ইষ্টক স্তম্ভের ঊর্ধ্বস্থ খিলানে; উপরে ও নীচে নানা অলংকরণের মধ্যে উৎকীর্ণ রয়েছে। এই লিপিপাঠে নিঃসংশয়ে বোঝা যায়, ইষ্টক নির্মিত মন্দির রামচন্দ্র গোস্বামীর পরবর্তীকালে নির্মিত।

মন্দিরের নির্মাণকালজ্ঞাপক উদ্ধৃত শ্লোকটিতে 'রমাপতি'র উল্লেখ থাকলেও প্রধান গ্রামদেবতা বলরামের কোন উল্লেখ না থাকা বিস্ময়কর। শ্লোকে 'রমাপতি'র শব্দটি সরাসরি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ বা বিষ্ণু অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে।

'দশমূলরস' গ্রন্থে রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষ বিপিনবিহারী লিখেছেন যে, মন্দির রামভ্রাতা শচীনন্দনের কালে কোনো ক্ষত্রিয়রাজের আনুকূল্যে তৈরি। শচীনন্দনই 'জগমোহন-মধ্যস্থিত' মন্দিরলিপির শ্লোকটি রচনা করে অগ্রজ রামচন্দ্রের নামে এই ইষ্টকমন্দির বলরাম-কৃষ্ণ সেবায় উৎসর্গ করেন। কানন বিহারী গোস্বামীর মতে, এই রাজা হলেন কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার। ১৬০৮খ্রিঃ ঢাকার নবাব এস্মাইল খাঁ তাকে 'মজুমদার' উপাধি দিয়ে নিয়োগ করেন 'কানুনগুই' বা কানুনগো পদে। ভবানন্দ ১৬১০খ্রিঃ জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধি মহারাজ মানসিংহের কাছ থেকে নবদ্বীপ তথা নদীয়ার রাজ্যাধিকার পান। বাঘনাপাড়া নবদ্বীপেরই নিকটবর্তী স্থান। ভবানন্দ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁর পক্ষেই সেকালে নবদ্বীপ সন্নিহিত বৈষ্ণব শ্রীপাটে মন্দির নির্মাণে অর্থানুকূল্য করা সম্ভব। বাঘনাপাড়া শ্রীপাটের সঙ্গে ভবানন্দের উত্তরপুরুষদের দীর্ঘ সংযোগ পূর্ব হতেই ছিল। ১৬১৩খ্রিঃ ভবানন্দ 'রাজা' উপাধি পান। তার পরবর্তী তিন বছরের মধ্যেই ১৬১৬খ্রিঃ বাঘনাপাড়ায় বলরাম-কৃষ্ণের ইষ্টক মন্দিরটি নির্মিত হয়। আরও কিছুকাল পরে লাগোয়া অন্যান্য মন্দিরগুলি তৈরি হয়। বাঘনাপাড়ার গোস্বামী বংশ পেশায় বৃত্তিজীবী ছিলেন।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

বাংলার আটচালা রীতিতে তৈরি পোড়ামাটির সুপ্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে বাঘনাপাড়ার বলরাম-কৃষ্ণ মন্দিরটি অন্যতম, সম্ভবতঃ প্রাচীনতম। মন্দিরটি সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে, জাহাঙ্গীরের ভারত শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত।

মন্দিরটি গঠনে সপ্তদশ শতাব্দীর মন্দির নির্মাণশৈলী অনুসৃত। মূল মন্দির সংলগ্ন জগমোহনটি চারচালা রীতিতে তৈরি। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের চূড়াতল অষ্টকোণাকার। মন্দিরে দুটি প্রবেশদ্বার রয়েছে; পূর্বদ্বার ও দক্ষিণদ্বার। মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং দুটি দ্বার পত্রাকৃতি খিলানযুক্ত। বলরাম-কৃষ্ণ মন্দিরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত চারচালা রীতিতে তৈরি গোপীশ্বর মন্দির। বলরাম-কৃষ্ণ মন্দিরের বাম অর্থাৎ পশ্চিমদিকে রেবতী-রাধারানির পৃথক মন্দির। এটিও আটচালা রীতির মন্দির। এর প্রবেশদ্বার দক্ষিণ দিকে। এই মন্দিরটি বলরাম-কৃষ্ণ মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত। মন্দিরের সম্মুখে একটি ঢাকা বারান্দা রয়েছে, কিন্তু এটি বলরাম-কৃষ্ণ মন্দিরের জগমোহনের মতো নয়। রেবতী-রাধারানি মন্দিরের বিপরীত দিকে, নাটমন্দিরের ও বলরাম-কৃষ্ণ মন্দিরের দক্ষিণে জগন্নাথ মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটি চতুষ্কোণ বড়ো ঠাকুরদালানের মতো। মন্দিরের চূড়াটি বিচিত্র; ছাদের উপরে উত্তল অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ বিশিষ্ট। মন্দিরের প্রবেশ দ্বার উত্তরদিকে।

জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন বিপরীতমুখী একটি সাধারণ ঘর 'গুন্ডিচা ঘর' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মন্দিরের ডানপাশে পূর্বদিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি রয়েছে। দোতলায় ঠাকুরবাড়ির সিংহদ্বারের উপরে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগের ঘর এবং নহবৎখানা রয়েছে। পুরোনো নাটমন্দিরের ছাদ ও স্তম্ভগুলি জীর্ন হয়ে পড়ায় কিছুকাল আগে নাটমন্দিরটি ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন করে গড়া হয়েছে। নাটমন্দিরের বাইরে দেবোত্তর বাজারের উত্তরপ্রান্তে দ্বিতল দোলমঞ্চ রয়েছে। দোলমঞ্চটি চতুষ্কোণ মন্ডপাকার।

বলরাম-কৃষ্ণ, রেবতী-রাধারানি, জগন্নাথ ও গোপীশ্বরদেবের চারটি পৃথক মন্দির, নাটমন্দির, দুর্গামন্ডপ ও তার সামনের বিস্তৃত অঙ্গণ, নহবৎখানা, ঘড়িঘর ও অঙ্গরাগের ঘর, রন্ধনশালা ও ভোগক্ষেত্র এসব নিয়ে সমগ্র দেবস্থানটি সুপরিসর।

মন্দিরের পরিমাপ (আনুমানিক) :

বলরাম- কৃষ্ণ মন্দিরের পরিমাপ

তলপত্তনের দৈর্ঘ্য-	২½′
তলপত্তনের প্রস্থ-	৩৫′
মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্য-	২১′
মূল মন্দিরের প্রস্থ-	৩৩′
দ্বারের দৈর্ঘ্য-	৬½′
দ্বারের প্রস্থ-	৩′

রেবতী- রাধারানি মন্দিরের পরিমাপ

তলপত্তনের দৈর্ঘ্য-	২½′
তলপত্তনের প্রস্থ-	২৩′
দ্বারের দৈর্ঘ্য-	৮′
দ্বারের প্রস্থ-	৩′

জগন্নাথ মন্দিরের পরিমাপ

তলপত্তনের দৈর্ঘ্য-	২′
তলপত্তনের প্রস্থ-	৩৩′
দ্বারের দৈর্ঘ্য-	৬′
দ্বারের প্রস্থ-	৩½′

গোপীশ্বর মন্দিরের পরিমাপ

তলপত্তনের দৈর্ঘ্য-	৩′′
তলপত্তনের প্রস্থ-	১৪′
দ্বারের দৈর্ঘ্য-	৫′
দ্বারের প্রস্থ-	২′

বিগ্রহ :

বাঘনাপাড়া ঠাকুবাড়ির মূল বিগ্রহযুগল বলরাম ও কৃষ্ণের নিত্যপূজা হয় একই মন্দিরে তাঁদের পাশাপাশি রেখে সখ্য ও বাৎসল্যভাবে। স্পষ্টতঃই এই পূজায় বলরাম ও কৃষ্ণের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যকে স্মরণ করা হয়। বলরামের গাত্রবর্ণ শ্বেত এবং মাথায় কেশপাশ চূড়াবদ্ধ। প্রতিবছর বিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়। পুরুষানুক্রমে ভাস্করগণ প্রতিবছর শুদ্ধশুচি হয়ে, ব্রতনিয়মাদি ও সংযম পালন করে বিগ্রহের অঙ্গরাগ করেন। বিগ্রহের উপরের বস্ত্রাবরণ তুলে ফেলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেখানে নববস্ত্র পরিয়ে তার উপর চিত্রকর্ম, বর্ণলোপ ও অলঙ্করণাদি করা হয়।

বলরাম- কৃষ্ণ মন্দিরের গর্ভগৃহে একটি বড়ো কাঠের সিংহাসনে বলরাম মূর্তির বামপার্শ্বে তাঁর সঙ্গে একত্রে পূজিত হন ‘কানাইচাঁদ’ বা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ। এই বিগ্রহও গোপবেশ, বেণুকর মূর্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয় বিগ্রহের পদতলে পদ্মদল আঁকা পাদপীঠ। উভয় মূর্তি দণ্ডায়মান, কিন্তু ঠিক ‘সমভঙ্গ’ রীতিতে নয়। শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিটির ‘ত্রিভঙ্গিম’ ঠাম; বংশীবাদনরত, নৃত্যরত চরণযুগল আড়াআড়ি সংস্থাপিত। বলরাম মূর্তিটি ‘সম- দ্বিভঙ্গ’ রীতির; তাঁরও পদদ্বয় নৃত্যছন্দে পরস্পর বঙ্কিমভাবে স্থাপিত।

রেবতী- রাধারানি মন্দিরের গর্ভগৃহে রেবতী- রাধারানির যুগলমূর্তি বিরাজিত। মূর্তিদুটি একটি কারুকার্যশোভিত পিতলের পাতে মোড়া বড়ো কাষ্ঠ সিংহাসনে স্থাপিত। বিগ্রহদুটি উজ্জ্বল পীতবর্ণ ও চিত্রিত। রেবতীর বামহস্ত অধোবিলম্বিত, ঊর্ধ্বত্থিত দক্ষিণ হস্তে মাথার বস্ত্রাঞ্চল টানা। রাধিকা মূর্তি রেবতী মূর্তিরই অনুরূপ। রাধিকা মূর্তিটি রেবতী মূর্তির চেয়ে সামান্য ছোট।

রামচন্দ্র গোস্বামী বলরাম- কৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পরে এখানে রেবতী- রাধারানির যুগলমূর্তি আনীত হন। সেইজন্যই তাঁদের পৃথক মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ও পূজা করা হয়। জগন্নাথ মন্দিরে পূজিত মূলবিগ্রহত্রয় হল- ‘বলদেব’, ‘জগন্নাথ’ ও ‘সুভদ্রা’। মূর্তির গঠন পুরীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ বিগ্রহত্রয়ের মতোই। স্নানের জন্য তামার টাটে জগন্নাথদেবের একটি ছোট প্রায় বিঘৎ- প্রমাণ, প্রতিভূ বিগ্রহ আছেন। তাঁর নাম কাঁঠালী জগন্নাথ। বংশীবদনের কনিষ্ঠ পুত্র নিত্যানন্দ দাস সেবিত দুটি মূর্তি জগন্নাথ মন্দিরে নিত্য পূজিত হয়। মূর্তিদুটি- শ্যামল বর্ণ ‘গোকুলচাঁদ’ এবং পীতবর্ণ ‘রাধিকা’ বিগ্রহ। জগন্নাথ মন্দিরে পূজিত অন্যান্য দেবদেবীগণের মধ্যে আছেন- গৌড়নিতাই বিগ্রহ, নারায়ণ শিলা, ‘রাজরাজেশ্বর’ ছাড়াও আরো ১০৮টি নারায়ণ শিলা, ১০৮টি ক্ষুদ্রাকার প্রস্তর- শিবলিঙ্গ, বালগোপাল, লক্ষ্মী, যম ও কুবের। এছাড়া আরো কয়েকটি ভগ্ন দেবদেবী মূর্তিও পূজিত হন। গ্রামে যাঁরাই গৃহদেবতা পূজায় অসমর্থ হন, তাঁরাই জগন্নাথ মন্দিরে এসে বিগ্রহটি পূজার জন্য সমর্পণ করেন।

গোপীশ্বর মন্দিরে পূজিত দেবদেবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ‘জলেশ্বর’ ও ‘বাণেশ্বর’ শিব এবং ক্ষুদ্রাকৃতির দুর্গামূর্তি ‘সিংহবাহিনী’। আরও একটি প্রাচীন দশভুজা ‘জয়দুর্গা’ মূর্তি ছিল, ঐ মূর্তিটি রঘুনাথ পুরাধীশ

রঘুনাথ রায় গোপালকৃষ্ণকে দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ মূর্তিটি আনুখাল-বেলে গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। মূল বলরাম-কৃষ্ণ মন্দিরে দুটি বস্তু নিত্য পূজিত হয়। একটি রামচন্দ্র গোস্বামীর পিতলের করঙ্গা আর একটি চণ্ডীর কলস মূর্তি।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

বাঘনাপাড়া মন্দিরের মূল বিগ্রহযুগল বলরাম ও কৃষ্ণের দারুমূর্তি পূজিত হয়। রেবতী ও রাধারানির যুগলমূর্তি অষ্টধাতুর তৈরি।

জগন্নাথ মন্দিরে পূজিত বলদেব, জগন্নাথ ও সুভদ্রা, গৌড়নিতাই মূর্তি দারুনির্মিত।

গোপীশ্বর মন্দিরে পূজিত জলেশ্বর ও বাণেশ্বর এই দুই শিবলিঙ্গ প্রস্তর এবং প্রাচীন দশভুজা মূর্তিটি অষ্টধাতুর তৈরি।

বলরাম-কৃষ্ণ মূর্তিযুগল- ১$\frac{১}{২}$′ জগন্নাথ ও বলদেবের মূর্তিযুগল- ৩′

রেবতী মূর্তি- ১′ রাধিকা মূর্তি- ১ ′ সুভদ্রা- ২$\frac{১}{২}$′

গোপীশ্বর শিবলিঙ্গের দৈর্ঘ্য-৩′ গৌরীপট্ট- ১′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – বর্তমানে মন্দিরটি গোস্বামী পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার ভোর ৬টা থেকে ৬.৩০মিনিটের মধ্যে উন্মুক্ত হয়ে যায়। বেলা ১২.৩০মিনিট নাগাদ মন্দিরগুলিতে ভোগ নিবেদন করার পর গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বিকেল ৫টার সময় গর্ভগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং সন্ধ্যার পর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – গোস্বামী পরিবার মন্দিরের উদ্দেশ্যে কিছু সম্পত্তি দান করেছে। সেই সম্পত্তি থেকে যে অর্থ আয় হয়, সেই অর্থই মন্দিরের সেবায় ব্যয় করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় রামাই গোস্বামী বা রামচন্দ্র গোস্বামীর তিরোধান দিবসকে উপলক্ষ করে। মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে উৎসবের সূচনা হয়। সপ্তাহব্যাপী এই মহোৎসবের সূচনা হয় ঐদিন সন্ধ্যায় অধিবাসের মাধ্যমে। মহোৎসবের ছয়দিনের অনুষ্ঠানের পৃথক পৃথক নাম আছে। তৃতীয়া তিথিতে- ‘কর্মদণ্ড’। চতুর্থীর দিন- ‘জ্ঞানদণ্ড’। পঞ্চমীতে- ‘ভক্তিবরণ’। ষষ্ঠীতে- ‘আনন্দবাজার লুণ্ঠন’ বা ‘বাজারলুঠ’। সপ্তমীতে- ‘প্রেমভাণ্ডার লুণ্ঠন’ বা ‘ভাড়ার লুঠ’ এবং অষ্টমীতে- ‘প্রেম বিতরণ ধূলুণ্ঠন বা ধূলোট’। প্রতিদিনই নাটমন্দিরে কীর্তন-সমারোহ এবং রন্ধনশালা থেকে বাজার পর্যন্ত অন্নকূট প্রসাদ বিতরণ চলে। ‘ভাড়ার লুঠ’ ও ‘ধূলোট’ এর সময় নগরকীর্তনদল গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন।

ছয়দিনের অনুষ্ঠানে কানাই-বলাই কে ছয় রকমের বেশসজ্জা করা হয়। ১ম দিন- কানাই বলাই এর কাছাপরা। ২য় দিন- নবীন বেশ (ধরাচূড়া ধারণ)। ৩য় দিন- রাখাল বেশ। ৪র্থ দিন- নটবর বেশ। ৫ম দিন- রাজবেশ। ৬ষ্ঠ দিন- শিঙ্গারিয়া অর্থাৎ ফকির বা যোগীর বেশ। এছাড়া ফাল্গুনী দোলৎসবে বলরাম-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহযুগল দোলায় বসিয়ে বিশেষ পূজার্চনাদি হয়। চৈত্রমাসে গোপেশ্বরের গাজন, বৈশাখী পূর্ণিমায় কৃষ্ণ-বলরামের ফুলদোল, আষাঢ় মাসে জগন্নাথের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা, চৈত্রমাসে বংশীবদনের জন্মোৎসব, হেরাপঞ্চমীর অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – পূর্বোল্লিখিত দুটি প্রধান উৎসব ছাড়া পাটবাড়ি বা মন্দিরটিতে নানা উৎসব অনুষ্ঠান হয়। উৎসব সমাপ্ত হওয়ার পর একমাস ব্যাপী বাঘনাপাড়ায় মেলা বসে।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব ও অনুষ্ঠানে গোস্বামীদের ১৬টি পরিবারের সদস্যগণই পূজার্চনার জন্য যাবতীয় অর্থ ব্যয় করেন। বাকি আয় দেবত্তোর সম্পত্তি হয়। তাছাড়া ভক্তদের দক্ষিণা বাবদও প্রচুর অর্থ আয় হয়, যা মন্দিরের সেবায় ব্যয় করা হয়।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য অন্নভোগ হয়। উৎসবের সময় ছয়দিনই চিড়াভোগ দেওয়া হয়। নিয়মমত ২৮টি করে মালসা ভোগ দেওয়া হয়। উৎসবের সময় গোপেশ্বরকেও অন্নভোগ দেওয়া হয়, যা শিবের ক্ষেত্রে রীতি বিরুদ্ধ। এই

মন্দিরে নিত্য ভক্তগণ ভোগের প্রসাদ পেতে পারেন। অন্নভোগের সঙ্গে ডাল, তরকারী, পঞ্চব্যঞ্জন, পরমান্ন, টক ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। ভোগ নিবেদনের পর ঐ অন্ন প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – বর্তমানে পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন শ্রী বিশ্বদেব গাঙ্গুলী মহাশয় এবং তাঁর ভাই গৌতম গাঙ্গুলী। এই পুরোহিতদের পূর্বপুরুষ হতে এই মন্দিরের পৌরোহিত্য করে আসছেন। বর্তমানে নবম পুরুষধরে বংশপরম্পরায় এঁরা মন্দিরের সেবা করছেন। পুরোহিতের বেতন দেবত্তোর সম্পত্তি এবং গোপীশ্বর মন্দিরের দক্ষিণা থেকে প্রদান করা হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – মন্দিরের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর ভক্তেরা আসেন উৎসবে যোগদান করার জন্য। মেলা উপলক্ষ্যেও প্রচুর জনসমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য ছবি তোলা নিষিদ্ধ। নিত্যভোগে এই মন্দিরে মুসুরির ডাল, বাঁধাকপি ও ফুলকপি নিষিদ্ধ।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরের বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরগাত্র এক সময় সুন্দর টেরাকোটার ভাস্কর্যে সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কারুকার্যগুলির উপরে রঙের প্রলেপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে সৌন্দর্য অনেকাংশেই ম্লান হয়ে গেছে। কিছুক্ষেত্রে ভাস্কর্যগুলিকে চিহ্নিত করাও দুঃসাধ্য হয়ে গেছে।

তথ্যঋণ :

[১] গোস্বামী কাননবিহারী, বাঘনাপাড়া- সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য; কলকাতা; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; মে, ২০০৮।

[২] মন্দিরের পুরোহিতগণ।

[৩] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৫] দোগাছিয়া গ্রামের গোপীনাথ মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের পর মধ্যযুগে বৈষ্ণবীয় রীতি অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণের যে প্রবণতা প্লাবনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, দোগাছিয়ায় অবস্থিত গোপীনাথ মন্দিরটি সেই প্লাবনেরই একটি অংশ মাত্র। মন্দিরগাত্রে যে প্রতিষ্ঠা ফলক রয়েছে, কালের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই তা অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উদ্ধার হওয়া অংশটি এই রকম-

“ ১৫৭৬ ২০জৈষ্ঠ
ষট শপ্ত পঞ্চ চন্দ্রে
শাকে জৈষ্ঠস্য বিশী
শ্রাবণস্য শেষ সমপন
মনেদও খাঁ শোজনঃ। শ্রী হরি নমঃ ”

প্রতিষ্ঠা ফলকের লিপির প্রারম্ভে একটি পক্ষী এবং সমাপ্তির পর ডানদিকে একটি ময়ূর চিত্রিত আছে। ‘অঙ্কস্য বামাগতি’ অবলম্বনে ‘ষট শপ্ত পঞ্চ চন্দ্রে’ অর্থাৎ ১৫৭৬শকাব্দে বা ১৬৫৪খ্রিস্টাব্দের ২০জৈষ্ঠ্য মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। রায়চৌধুরী পরিবারের উত্তরপুরুষ শ্রী প্রণব রায়চৌধুরী মহাশয় দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী শ্রীধর কর বা অধর রায়চৌধুরী এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন তাঁর প্রথম পত্নীর অনুরোধে। প্রতিষ্ঠা ফলকে উৎকীর্ণ মনেদও খাঁ সম্ভবত নির্মাণশিল্পী ছিলেন বলে তিনি অনুমান করেছেন।

গোপীনাথ মন্দিরটি সংলগ্ন একটি দশভুজার মন্দির রয়েছে। শ্রী প্রণব রায়চৌধুরী মহাশয় জানিয়েছেন যে, শ্রীধর কর বা অধর রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় স্ত্রী একটি স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই দশভুজার মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে দুর্গা মন্ডপটি প্রায় ৪৫০বছর প্রাচীন বলে প্রণব বাবু জানিয়েছেন। তিনি এটাও জানিয়েছেন যে, 'রায়চৌধুরী' খেতাবটি তাঁদের পূর্বপুরুষ শ্রীধর কর মহাশয় মুর্শিদকুলি খাঁ এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

পোড়ামাটির কারুকার্য ও অলংকরণ সম্বলিত গোপীনাথ মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং 'আটচালা' রীতিতে নির্মিত। মন্দির লাগোয়া ত্রিখিলান যুক্ত ঢাকা বারান্দা রয়েছে। মন্দির শীর্ষে তিনটি লৌহশলাকা রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যবর্তী শলাকাটি একটু দীর্ঘ, দু'পাশের দুটি সম দৈর্ঘ্যের। গর্ভগৃহের একটিমাত্র প্রবেশপথে লৌহদ্বার লাগানো রয়েছে।

গোপীনাথ মন্দির সংলগ্ন দুর্গা মন্দিরটি উচ্চভিত্তি বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত সমতল ছাদ বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী দালান মন্দির। দালান লাগোয়া তিনটি দ্বার বিশিষ্ট ঢাকা বারান্দা এবং গর্ভগৃহে একটিমাত্র প্রবেশদ্বার রয়েছে। মন্দিরটিতে হলুদ রঙ দেওয়া রয়েছে। মন্দির সম্মুখে হাড়িকাঠ রয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণটি সিমেন্টের বাঁধান।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

গোপীনাথ মন্দিরের পরিমাপ-

তলপত্তনের দৈর্ঘ্য- ১'
মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্য- ৬০'
দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৬'
দ্বারের প্রস্থ- ২.৪'
খিলানের দৈর্ঘ্য- ৭'

দুর্গা দালানের পরিমাপ-

তলপত্তনের দৈর্ঘ্য- ২'
দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৬'
দ্বারের প্রস্থ- ৩'
আয়তন- ২৩.৪'× ১৫.৭'

বিগ্রহ :

গোপীনাথ মন্দির প্রকোষ্ঠে চারটি বিগ্রহ নিত্য পূজিত হন। সিংহাসনে রাধারানিকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে অধিষ্ঠিত রয়েছেন গোপীনাথ এবং বামপার্শ্বে মদনমোহন। তিন নামে তিনটি মূর্তি পূজিত হলেও আসলে তিনটি বিগ্রহই হলেন মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ। তিনটি বিগ্রহের পরনেই রেশমের বস্ত্র এবং অলংকার রয়েছে। উন্মুক্ত কেশ যুক্ত শিরে রয়েছে মুকুট এবং ময়ূরপুচ্ছ। ললাটে তিলক অঙ্কিত এবং মুখমণ্ডল সুসজ্জিত। রাধারানির পরনেও রয়েছে শাড়ি এবং অলংকার। শিরে মুকুট এবং নাকে নথ পরিহিত রাধারানির মুখমণ্ডলটি সুসজ্জিত। ইনি দক্ষিণহস্তটি সম্মুখে উন্মুক্ত করে দণ্ডায়মান। একমাত্র মদনমোহনের মূর্তিটি ছত্রের তলায় দণ্ডায়মান।

গোপীনাথ মন্দির সংলগ্ন দুর্গা দালানে দেবী দশভুজার নিত্য সেবা হয়। একটি কাষ্ঠ সিংহাসনে দেবী দণ্ডায়মান। দেবীর একটি দক্ষিণহস্তে রয়েছে ত্রিশূল, অন্যান্য হস্তগুলি পুষ্পদ্বারা আবৃত থাকার কারণে পরিলক্ষিত হয় নি। দেবীর পায়ের কাছে শায়িত রয়েছে অসুর। এর হস্তে রয়েছে ঢাল। কথিত আছে এই দেবী শ্রীধর কর রায়চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় স্ত্রীকে স্বপ্ন দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, ইনি দুটি গাছের মাঝখানের একটি জলাশয়ে পতিত আছেন। সেখান থেকে দেবীকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করতে। ত্রিনয়নী দেবীর পরনে শাড়ি, উন্মুক্ত কেশযুক্ত শিরে মুকুট এবং দক্ষিণ হস্তে রয়েছে একটি বৃহৎ চাঁদমালা। দেবীর কণ্ঠে মালা এবং কানে কুন্ডল রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

গোপীনাথ মন্দিরের গোপীনাথ-কৃষ্ণচন্দ্র-মদনমোহন এই তিনটি মূর্তি কষ্টি পাথর দ্বারা নির্মিত। আনুমানিক ৬০-৬৫বছর পূর্বে রাধারানির অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ায়, বর্তমানে পিতলের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

দুর্গা দালানে পূর্বে অষ্টধাতুর নির্মিত দশভুজার মূর্তি পূজিত হত। ঐ মূর্তিও চুরির হাত থেকে রেহাই না পাওয়ায়, বর্তমানে সেখানেও পিতল নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গোপীনাথের উচ্চতা- ২'   মদনমোহন ও কৃষ্ণচন্দ্রের উচ্চতা- ১½'   রাধারানির উচ্চতা- ১'

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ব – বর্তমানে মন্দিরটি শ্রীধর কর রায়চৌধুরী মহাশয়ের পাঁচ পুত্র এবং তাঁদের উত্তরপুরুষ রায়চৌধুরী পরিবারের মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – দুটি মন্দিরের দ্বারই সকাল ৯টায় উন্মুক্ত হয়। নিত্যসেবার পর বেলা ১১টার মধ্যে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বিকেল ৬টার সময় দ্বার উন্মুক্ত হয়ে সন্ধ্যারতী হওয়ার পর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – পূর্বে মন্দিরগুলির ব্যক্তিগত দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, তবে বর্তমানে এখন তার খুবই কম সম্পত্তি রয়েছে। বর্তমানে রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যরাই ব্যক্তিগত ভাবে এই মন্দিরের আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – গোপীনাথ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রিক সমস্ত পূজাই হয়ে থাকে। তবে বিশেষভাবে দোল উৎসবই এখানকার প্রধান উৎসব। ওই সময় চারটি বিগ্রহকে চতুর্দোলা ফুল দিয়ে সাজিয়ে বাইরে বের করা হয়ে থাকে। এছাড়া দুর্গাপূজা ও কালীপূজা হয়। পূর্বে পাঁচটি দুর্গাপূজা হতো। কিন্তু বর্তমানে একটিই দুর্গাপূজা হয়। পূর্বে মোষ বলি হতো, এখন শুধু ছাগ ও ছাঁচি কুমড়ো বলি হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে কোন উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না, তবে মন্দির সংলগ্ন ময়দানে দোল উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠানে বাবদ কোন আয়ব্যয় হয় না।

(জ) ভোগ – গোপীনাথ মন্দিরে কোন অন্নভোগ হয়না। নিত্য মিষ্টি, মিছরি, মাখন ও ফল দিয়ে ভোগ হয়। দুর্গা মন্দিরে দুর্গাপূজার সময়ই অন্নভোগ হয়। নিত্য পূজার সময় ফল, মিষ্টি দিয়েই ভোগ নিবেদন করা হয়ে থাকে।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরে দুজন পুরোহিত রয়েছেন। পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর পুত্র। রায়চৌধুরী পরিবার থেকেই বেতন নির্দিষ্ট করা হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – দোল উৎসবে, দুর্গাপূজায় ও কালীপূজায় প্রচুর লোক সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – পূর্বে ৩রা ফাল্গুন, সন ১৩৬৯ এই মন্দিরের একবার সংস্কার হয়েছিল, সংস্কারক হিসেবে মন্দিরের উপরের একটি ফলকে ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ নিবাসী সায়েদালী ভাই'এর নাম রয়েছে। তবে বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ টেরাকোটার ফুলকারি নকশায় আবৃত। মন্দিরটির সম্মুখভাগে পোড়ামাটির ভাস্কর্য, পঙ্খের কাজের অলংকরণ রয়েছে। উপরিভাগে শিবলিঙ্গ, পাখি, লতাপাতা অঙ্কিত পোড়ামাটির আকর্ষণীয় ভাস্কর্য রয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] পান মঙ্গল, সমুদ্রগড়ের ইতিহাস; সমুদ্রগড়; ব্যানার্জী বুক সিণ্ডিকেট; ৭ই ভাদ্র, ১৪১৭।

[২] মন্দিরের সেবাইত রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যগণ।

[৩] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৬]   কালনার লালজী মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

ব্রিটিশ শক্তির দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫খ্রিঃ) পূর্বে অম্বিকা কালনায় যে আটটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম লালজী মন্দির। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে : -

যৎ-পুত্রাঃ পৃথিবীতলে সুবিদিতাঃ সৎ কৃর্ত্তিচন্দ্রঃ কৃতী
সা শ্রীরাজকুমারিকাঃ ব্রজকিশোরী কৃষ্ণভক্ত্যর্থিনী।
শাকে বৈকষড়র্ত্তুচন্দ্র গণিতে প্রাসাদমেতম্ দদৌ
রাধাকৃষ্ণ যুগায় সৎ-কবিসভামধ্যেসু তৎ প্রিতয়ে।।

শকাব্দ ১৬৬১

অর্থাৎ যাঁর পুত্রগণ পৃথিবীতলে সুবিদিত কৃতী কীর্তিচন্দ্র সেই কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনাকারিণী শ্রীরাজকুমারী ব্রজকিশোরী ১৬৬১শকাব্দে (১৭৩৯খ্রিঃ) রাধাকৃষ্ণের চরণযুগলে এই প্রাসাদ (মন্দির) দান করে কবিসভায় তিনি প্রীত হয়েছিলেন। অর্থাৎ মন্দিরটি কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল।

কথিত আছে কীর্তিচাঁদ জননি ব্রজকিশোরীর নিকট একটি রাধিকামূর্তি ছিল। একদা এক সন্ন্যাসী একটি রমণীয় শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ মূর্তি নিয়ে জগন্নাথ ধামে যাওয়ার সময় অম্বিকায় এসে উপস্থিত হন। অম্বিকার জনগণ ঐ বিগ্রহের কমনীয় মূর্তি দেখে মোহিত হয়েছিলেন। তারপর ঐ বিগ্রহের বিষয় ব্রজকিশোরীর নিকট পৌঁছলে তিনি ঐ মূর্তি দেখার জন্য আগ্রহী হন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ভ্রমণে বার হয়ে পথপার্শ্বে এক গাছের তলায় এক সাধুকে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখলেন। তাঁর সামনে অপূর্ব কৃষ্ণমূর্তি যা তিনি লোকমুখে শুনেছিলেন এবং ঐ মূর্তি দেখে মুগ্ধ হন। কিছুক্ষণ পরে সাধুজীর ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সন্ন্যাসীর কাছে শ্যামসুন্দরকে ভিক্ষা চাইলেন। সাধুজী তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে ছাড়তে অসম্মত হন। তখন ব্রজকিশোরী কৌশলে সন্ন্যাসীর নিকট হতে বিগ্রহটি পাবার জন্য পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি বিশ্বস্ত লোক মারফৎ সন্ন্যাসীকে বলে পাঠান যে তাঁর কাছে রাধিকা মূর্তি আছে, তাঁর ইচ্ছা যে ঐ রাধিকার সঙ্গে সন্ন্যাসীর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহটির শুভ বিবাহ দিয়ে তাঁর জীবন সার্থক করতে চান। সরল প্রকৃতির ঐ সন্ন্যাসী রানির কৌশল বুঝতে না পেরে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেন। তখন রাজরাজাদের ছেলেমেয়েদের মত মহা সমারোহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ উৎসব সমাধা করেন। বিবাহের কয়েকদিন পর সন্ন্যাসী মহারানিকে তাঁর শ্যামরায়কে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলে পাঠালে ব্রজকিশোরী বলেন,"আমাদের রাজবংশের নিয়ম আছে যে, কন্যার বিবাহ দিয়া কখনও তাহাকে স্বামী গৃহে প্রেরণ করা হয় না। তাঁহাদিগকে গৃহেই রাখিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণের উপযুক্ত বৃত্তি বা ভূসম্পত্তি প্রদান করা হয়। আপনার পুত্রের সহিত যখন আমার কন্যার শুভ বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, তখন আমাদের বংশের চিরাচরিত প্রথানুসারে, তিনি আর পিতৃগৃহে গমন করিতে পারিবেন না। আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ চিরকাল এই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন। আপনার যখন ইচ্ছা, পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও আপনার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, রাজসরকার হতে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন।" তখন সন্ন্যাসীর বুঝতে কোন অসুবিধাই হলো না যে, রানি ব্রজকিশোরী তাঁর শ্যামরায়কে সুকৌশলে হস্তগত করেছেন। তখন তাঁর শ্যামরায়কে আক্ষেপ করে বলেছিলেন- 'বাবা তুমি রাজভোগ প্রাপ্ত হইয়া এই দরিদ্র সন্ন্যাসীকে বিস্মৃত হইলে। ভাল, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' সেইদিনই সন্ন্যাসী কালনা পরিত্যাগ করে চলে যান। কালনার সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ লালজীউই উক্ত শ্যামরায়। বর্ধমানে রাজ-জামাতাদিগকে 'লালজী' বলা হয়ে থাকে। তার থেকেই এই 'লালজী' নামকরণ হয়েছে।

কারও কাছ থেকে ঠাকুর নিয়ে নেওয়া, এর ইতিহাস এই রাজবংশের সাথে জড়িয়ে যে ছিল না, তা নয়। এই রাজবংশেরই কৃষ্ণরাম রায় (১৬৮৯-১৬৯৬খ্রিঃ) শিবমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবি রামকৃষ্ণ রায়ের গৃহদেবতা 'রাধাবল্লভজী'কে লুণ্ঠন করে বর্ধমানে প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে, পুতুলের বা ঠাকুরের বিয়ে দেওয়া রাজপরিবারের প্রবর্তনাতেই সংঘটিত হতো। সেদিক থেকে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ঠাকুর নিয়ে ঠাকুরের ব্যবস্থা যে করা হয়েছিল তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ঠাকুর যে সন্ন্যাসীর তা ঠাকুরকে ভোগের সাথে পোড়া রুটি নিবেদন করা থেকে অনুমিত হয়।

সবদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, লালজীর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যতই গল্পকথা থাক না কেন, গল্পে কথিত সন্ন্যাসী ছিলেন বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর প্রবর্তনাতেই কালনায় কীর্তিচন্দ্রের মাতা ব্রজকিশোরী কর্তৃক 'বালগোপাল সেবা' প্রবর্তিত হয়, স্থাপিত হয় লালজী মন্দির। লালজীউর মন্দিরের সামনের দিকে একটি 'বারদুয়ারী' নাটমন্দির বর্তমান। এই ঠাকুর বাড়িতেই আছে গিরিগোবর্ধন মন্দির। এটি নির্মিত হয় ১৬৮০শকাব্দ বা ১৭৫৮খ্রিস্টাব্দে। এছাড়া লালজী বাড়ির সম্মুখে রয়েছে রাসমঞ্চ। লালজী বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করার মূলদ্বারের বামদিকে রয়েছে- গিরিগোবর্ধন মন্দির। এই মন্দির গঠনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী স্থাপত্যের কাজ লক্ষ করা যায়। মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীগণ কৃষ্ণের দ্বারা গিরিগোবর্ধন পর্বত ধারণ, কৃষ্ণলীলার এই বিশিষ্ট কাহিনি অনুসরণ করে এবং পর্বতের ধারণাটি মাথায় রেখে দালান মন্দিরের ছাদে শিলাখণ্ড সাজিয়ে পাহাড়ের রূপ দিয়েছিলেন। এই মন্দিরটি উঁচু ভিতের উপর স্থাপিত, যার সম্মুখভাগে রয়েছে থাম এবং পশ্চাৎ ও দুপাশে দেওয়ালের উপর ছাদে কালো স্লেট পাথরের দ্বারা নির্মিত পাহাড়ের আকৃতিতে গিরিগোবর্ধন পর্বত আকৃতির মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণের পুরাণের কাহিনিকে অনুসরণ করে বড় বড় স্লেট পাথরের শিলাখণ্ড দিয়ে সম্পূর্ণ খিলান ছাদের উপর পাহাড় নির্মাণ করে নানা দেবতা, সাধক, মুনি ঋষি থেকে বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর মূর্তি পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে স্থাপনা করা হয়েছে।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিটি কালোপাথরের উপর খোদাই করে বাংলা এবং রাজস্থানী ভাষায় লিখিত। রাজস্থানী ভাষায় কেন লিখিত তা গবেষণা সাপেক্ষ। কিন্তু প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা যায় যে, কোন রাজস্থানী শিল্পীর দ্বারা এই মন্দিরের পরিকল্পনা ও নির্মাণ করা হয়েছিল অথবা রাজস্থানী চিত্রকলায় কৃষ্ণলীলার প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়ে এই মন্দিরের পরিকল্পনা করা হয়েছিল যার প্রভাব প্রতিষ্ঠালিপির ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠালিপিটি জীর্ণ। যা থেকে জানা যায় ১৬৮০শকাব্দে (১৭৫৯খ্রিঃ) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠালিপি একটু ব্যতিক্রমী অন্যান্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির তুলনায়। কারণ, এই প্রতিষ্ঠালিপিতে কৃষ্ণরাম, জগৎরাম, ব্রজকিশোরী, কীর্তিচাঁদ, মিত্রসেন এবং ত্রিলোকচাঁদের নাম দেখা যায়। একই প্রতিষ্ঠালিপিতে এতগুলো নাম খোদিত যা কালনার অন্যকোনো মন্দিরে লক্ষ করা যায় না। তবে সময়ের বিচারে মহারাজা ত্রিলোকচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭৪৪-১৭৭০খ্রিঃ) এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

একদিক উন্মুক্ত এই গিরিগোবর্ধন মন্দিরের গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে তিন পাশের দেওয়ালে চুন সুরকি দ্বারা রঙিন ফ্রেস্কো কাজে নির্মিত কৃষ্ণের নৌকাবিলাস, বস্ত্রহরণ, গরুড় পাল, যশোদার দুগ্ধদোহন ইত্যাদি কিছু মূর্তি কৃষ্ণলীলার খণ্ডিত অংশকে তুলে ধরা হয়েছে।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

রাজবাটি চত্বরের মধ্যে অবস্থিত কালনার লালজী মন্দিরটি 'রথপগ' গড়নে নির্মিত পঁচিশচূড়া মন্দির। মন্দিরটি পূর্ব-দক্ষিণ মুখী। এর গঠনের সাথে কালনার গোপালজীউ মন্দিরের গঠনগত মিল আছে।

এই মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়াল ২১′। তার পূর্ব প্রান্ত থেকে ৯০° কোণ করে দক্ষিণদিকে ৫′ বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে পূর্বদিকে ৪′ বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে দক্ষিণদিকে ৪′ বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে পূর্বদিকে ৪′ বাড়ানো। সেখান থেকে দক্ষিণমুখী ১৮′। তার দক্ষিণপ্রান্ত থেকে ৯০° কোণ করে ৫′ পশ্চিমদিকে বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে ৪′ দক্ষিণে বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে ৪′ পশ্চিমে বাড়ানো, তার প্রান্ত থেকে ৪′ দক্ষিণে বাড়ানো। অন্যদিকে পশ্চিমদিকের দেওয়াল সমভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণদিকে বর্ধিত।

দুই দিকের দক্ষিণদিকের বর্ধিত অংশে জগমোহন ও নাটমন্দির। এই মন্দির উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এর সংলগ্ন ভূমির সমতল বেদীতে আর একটি পৃথক সুবৃহৎ চারচালাবিশিষ্ট নাটমন্দির সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং এর দুপাশে ৫টি করে, সম্মুখে ২টি উন্মুক্ত দ্বার রয়েছে।

মন্দিরটির প্রথম তলের ছাদের চারকোণে যে খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তিনটি করে চূড়া রয়েছে। তার মধ্যে দুটি চূড়া সমমাপে এগিয়ে, মাঝেরটা একটু পিছিয়ে মোট ১২টি চূড়া স্থাপিত। তারপর বেড় কমিয়ে খানিকটা উপরে অষ্টকোণাকৃতি দ্বিতীয় তল সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদে আটকোণে ৮টি চূড়া রয়েছে। এরপর বেড়ের উচ্চতা কমিয়ে দ্বিতীয় তলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় তৃতীয় তল সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদের ৪কোণে ৪টি, এবং মাঝে

একটি বড় চূড়া। অর্থাৎ চূড়াগুলি ১২+৮+৪+১ এইভাবে সাজানো হয়েছে। এই চূড়াগুলো চারকোণে এবং তাদের ছাদ উঁচু নীচু কার্নিশের বিন্যাসে কিছুটা পীড়া শিখরের অনুরূপ। মন্দিরের ত্রি- খিলান দালানের ছাদ ধনুকাকৃতি 'ভল্ট' এর উপর, এবং গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের উপর স্থাপিত।

পূর্বদিকের দ্বার দিয়ে গর্ভগৃহে ঢুকতেই ডানদিকে রয়েছে সিঁড়ি, যা দিয়ে মন্দিরের ওপরে ওঠা যায়। পূর্ব ও পশ্চিমদিকে রয়েছে এক দালানযুক্ত ঢাকা বারান্দা। পূর্বদিকের বারান্দা- সংলগ্ন কাঠের দ্বার দিয়ে নাটমন্দিরে যাওয়া যায়। উত্তরদিকে রয়েছে ২টি কাঠের জানালা যেহেতু গর্ভগৃহের উত্তরে রয়েছে শয়নকক্ষ।

মন্দিরের পশ্চিমদিকে রয়েছে ঢাকা বারান্দা। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে রয়েছে এক দালানযুক্ত ঢাকা বারান্দা। দক্ষিণে ত্রি- খিলানযুক্ত বারান্দা রয়েছে। মন্দিরের পিছনে রয়েছে রন্ধনশালা। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে সমস্তদিক উন্মুক্ত বিশাল একটি 'বারোদুয়ারী' নাটমন্দির রয়েছে- সেটি খাঁটি 'চারচালা' রীতির স্থাপত্য। ঢালু চাল ও চারচালের বাঁকানো কার্নিশের ছাঁচা গ্রামবাংলার সেকালের খোড়ো চালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চালাটি 'ইমারতি' থামের উপর স্থাপিত। এই ঠাকুরবাড়িতেই যে উত্তরমুখী 'গিরিগোবর্ধন' মন্দির রয়েছে, এটি একটি নূতন স্থাপত্যকীর্তি। প্রচলিত 'চালা' রীতিতে নির্মিত না হলেও এর চালু চালের মধ্যে চালার সাদৃশ্য আছে। তবে চাল বড় বড় শিলার আকারে তৈরি। যেন পর্বতের অনুকরণ। এর সম্মুখে কোনো ঢাকা বারান্দা নেই। এই মন্দির প্রাঙ্গণে 'গিরিগোবর্ধন' মন্দির ব্যতীত আধুনিক বারান্দাযুক্ত নারায়ণের মন্দিরও রয়েছে।

লালজী বাড়ির সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যে রাসমঞ্চ আছে, তা অন্যান্য স্থানের মতো প্রচলিত রাসমঞ্চ আদৌ নয়। বৃত্তাকার রাসমঞ্চটির দুটি অংশ; বাইরের বৃত্তে আছে উন্মুক্ত চব্বিশটি দ্বার এবং ভেতরের বৃত্তে আটটি দ্বার। উন্মুক্ত আটদ্বারযুক্ত গর্ভগৃহের ছাদের ওপর গম্বুজ স্থাপিত ছিল বলে অনুমিত হয়। এই রাসমঞ্চ মূলতঃ লালজী বাড়িরই এক অঙ্গ।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

গর্ভগৃহের দ্বারের দৈর্ঘ্য-৮. ৫′ গর্ভগৃহের দ্বারের প্রস্থ-৩. ৮′
মন্দিরের থামের দৈর্ঘ্য-৬. ৪′ মন্দিরের থামের প্রস্থ- ২. ৮′
জানালার দৈর্ঘ্য- ৫. ৬′ জানালার প্রস্থ- ৪. ৩′
মন্দিরের উচ্চতা -৬০′
গরুড় সিংহাসনের উচ্চতা- ৬. ২′ গরুড় সিংহাসনের প্রস্থ- ২. ৯′
নাট মন্দিরের পরিসীমা- ৩০′ × ১৪′ রাসমঞ্চের উচ্চতা- ২৫′
২৪টি উন্মুক্ত দ্বারের প্রস্থ (বেড়)- ৪′ × ২৪= ৯৬′
৮টি উন্মুক্ত দ্বারের প্রস্থ (বেড়)- ৪′ × ৮= ৩২′

বিগ্রহ :

লালজী মন্দিরে প্রধান বিগ্রহ হিসেবে স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান লালজী ও তাঁর পাশে রাধারানির মূর্তি আরাধনা করা হয়। এছাড়া লালজী মন্দিরে পূর্বমুখী সিংহাসনে রয়েছে দ্বাদশ গোপাল, ছোট আকৃতির পাঁচটি শিব, ছয় জোড়া রাধাকৃষ্ণ। গর্ভগৃহের দক্ষিণ- পূর্ব কোণের সিংহাসনে রয়েছে মদন গোপালের মূর্তি, দ্বাদশ নারায়ণ, লক্ষ্মীর পঞ্চমুখী শঙ্খ এবং গোপাল মূর্তি।

এই মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দির কিন্তু এই মন্দিরে পঞ্চশিব রক্ষিত হয় এবং বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, এই মন্দির- প্রাঙ্গণেই যে গোবর্ধন মন্দির, যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৯খ্রিঃ, অর্থাৎ লালজী মন্দিরের ২০ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাছাড়া ১০৮ শিলার নারায়ণের আধুনিক দালানযুক্ত মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থাৎ সময় সাপেক্ষে লালজী মন্দির বিবর্ধিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সময় সাপেক্ষে এই মন্দিরে মধ্বাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব সঞ্চারিত হতে পারে তা বলা যায়। এই 'মধ্বাচারীদিগের দেবালয়ে বিষ্ণুর সহিত একত্রে শিব, পার্বতী প্রভৃতিরও পূজা হয়'। সুতরাং সেদিক থেকে লালজীর মন্দিরে শিবের এবং তাঁর শক্তিরূপে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

অন্যদিকে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে যিনি শ্রদ্ধা সহকারে একশত শালগ্রাম শিলা পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে বাসান্তে চক্রবর্তী অর্থাৎ রাজা হন। আর এই বাসনায় শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের প্রভাবে এক শতকে বর্ধিত করে ১০৮শিলার নারায়ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

লালজী ও রাধারানির পরনে রাজবেশ। লালজীর পরনে রেশমের ধুতি, পাঞ্জাবী, শিরে মুকুট ও কণ্ঠে মালা, হাতে বাঁশি, পায়ে নুপুর। আর রাধারানির পরনে রয়েছে শাড়ি, মাথায় সিঁদুর আর মুকুট, কণ্ঠে মালা আর পায়ে নুপুর। মন্দিরের ভক্তগণের দর্শনের সুবিধার্থে বিগ্রহ দুটি মন্দির দালানে উন্মুক্ত অংশে দণ্ডায়মান রাখা হয় সকালে এবং বিকেলে। ভোগের জন্য এবং শয়নের জন্য গর্ভগৃহে বিগ্রহগুলি প্রবেশ করানো হয়।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

লালজী মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ লালজী ও রাধারানি দারু নির্মিত। এছাড়া ছয় জোড়া রাধাকৃষ্ণের মধ্যে তিন জোড়া দারু নির্মিত ও তিন জোড়া শিলামূর্তি ও দ্বাদশ নারায়ণ শিলা পূজিত হয়।

লালজীর উচ্চতা- ২′ রাধারানির উচ্চতা- ১$\frac{১}{২}$′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরটি বর্ধমানের রানি ব্রজকিশোরী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বলা যায় মন্দিরটি বর্ধমানরাজাদের মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে। তবে মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মন্ডলের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। মন্দিরের সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী দ্বারাই হয়ে থাকে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – লালজী মন্দিরের দ্বার সকাল ৬.৩০মিনিটে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারপর মন্দির পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার পর নিত্যসেবা হয়। দুপুর ১১টায় ভোগ হওয়ার পর মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল ৪টের সময় মন্দির দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতী এবং নাটমন্দিরে ভাগবত গীতা পাঠ হয়। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি নেই। মন্দিরের পুরোহিত শ্রী মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই মন্দিরের যাবতীয় আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে 'মহতাবচাঁদ রিলিজিয়াস ট্রাস্ট'।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – লালজী মন্দিরে নিত্যসেবা ব্যতীত আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী এবং রাস উৎসব পালন করা হয়। রথের সময় মন্দির প্রাঙ্গণে রাখা রথ, মন্দির চত্বরের বাইরে নিয়ে আসা হয়। জন্মাষ্টমীর সময় মন্দির প্রাঙ্গণে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে কোন সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – লালজী বাড়ির বিশেষ তিথিতে পূজাগুলির জন্য রাজবাড়ি থেকে অর্থ দেওয়া হয় এবং এই অর্থ ব্যতীত ভক্তগণের দক্ষিণা দ্বারাও পূজার খরচ চালানো হয়।

(জ) ভোগ – নিত্য ফল, মিষ্টি ব্যতীত অন্নভোগ দেওয়া হয় পঞ্চব্যঞ্জন সমাহারে। পরমান্ন ভোগ দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ ভোগের সঙ্গে একটি পোড়ারুটি লালজীকে নিবেদন করা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – বর্ধমান রাজপরিবার থেকেই পুরোহিতের বেতন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে পুরোহিতের বেতন হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – নিত্য মন্দিরে ভক্ত সমাগম হয়। বিশেষ তিথিতে পূজার সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে মন্দির সম্পর্কিত কোনরকম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

মন্দিরের ভাস্কর্য :

রাজবাটি চত্বরে অবস্থিত লালজী মন্দির তার অসামান্য গঠনশৈলী এবং টেরাকোটার ভাস্কর্যের দ্বারা যে কোন শিল্পীমনকে আকর্ষণ করতে পারে। মন্দিরটি এককথায় মনমুগ্ধকর। মূল মন্দিরের খিলানের দুপাশের দেওয়ালের দুটি খাড়া সারিতে একটি মূর্তি স্থাপিত পৃথক পৃথক ফ্রেমের মধ্যে। এই ফ্রেমের সারি কার্নিশের নীচ থেকে ঘুরে এসে মিলিত হয়েছে দুপাশের লম্ব সারিগুলির সঙ্গে। আর পশ্চিমদিকের আর পূর্ব দিকের দেওয়াল ভরাট করা হয়েছে নানাবিধ ফুলকারি নকশার মাধ্যমে। মৃত্যুলতার ভাস্কর্য উল্লম্বভাবে লাগানো হয়েছে দেওয়ালের কোণে ও গায়ে। তাছাড়া পূর্ব ও দক্ষিণদিকের কোণের পাশ বেয়ে তলের কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে ফুলকারি কাজের পদ্ম ভাস্কর্য।

এই মন্দিরের দক্ষিণমুখী গর্ভগৃহের দ্বারের শীর্ষভাগে এবং দুপাশে থামের মাঝে ভাস্কর্য রয়েছে। থামগুলির ভিত্তি থেকে শুরু করে কার্নিশ পর্যন্ত ভাস্কর্য রয়েছে। মধ্যেখানের দুটি থামেই ভাস্কর্য রয়েছে। দেওয়াল লাগোয়া দুদিকের দ্বারে কোনরকম ভাস্কর্য নেই। দ্বারের শীর্ষভাগে রথের মাঝে শিবলিঙ্গ এই ফলক দ্বারা পরিপূর্ণ। রথের শীর্ষভাগে পতাকা রয়েছে। দ্বারের একেবারে শীর্ষাংশে একটি নকশা করা দণ্ড রয়েছে।

এই মন্দিরে টেরাকোটার ভাস্কর্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যগুলি হল- পালকি চালকগণ পালকি নিয়ে চলেছে এবং পালকির তলায় মানুষ ও পশু দুই রয়েছে। পালকির মাঝে দুজন মানুষ অর্ধেক শায়িত অবস্থায় রয়েছে; হাতে ছেনি দিয়ে সূত্রধর জিনিস তৈরি করছে এবং চারপাশে মানুষজন রয়েছে; ঘাগরা, চোলি পরিহিতা দণ্ডায়মান নারী; যুদ্ধরত সৈন্য; উৎসব মুখর মহিলাদের সমাবেত চিত্র; হাতি টানা রথে বসে দুজন মানুষ, অস্ত্রহাতে দণ্ডায়মান সৈনিকের দল; হাতে পাখা নিয়ে দণ্ডায়মান নারী, শিকারির প্রতি ব্যাঘ্রের আক্রমণ; উটের পিঠে সামরিক বাদ্যকর বাহিনী, হাতি ও সিংহের যুদ্ধ; হরিণ শিকারের চিত্র; গোষ্ঠের চিত্র; টিয়া পাখি, ময়ূর, পেঁচা, হনুমান, রথের উপর নহবৎ যাত্রা প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে- জগদ্ধাত্রী, সিংহবাহিনী, কালী, বালগোপাল, গণেশ, বালকৃষ্ণের নন্দালয়ে যাত্রা ইত্যাদি।

তথ্যঋণ :

[১] দাশ বিবেকানন্দ, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি.; ১৯৯৯।

[২] রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

[৩] মন্দিরের পুরোহিতগণ।

[৪] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৭] কালনার কৃষ্ণচন্দ্রজীউ মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কালনার রাজবাটিবৃত্তের মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে এবং লালজী মন্দিরের অগ্নিকোণে কোণাকুণি বিপরীতে অবস্থিত কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির। এই মন্দিরে যে প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে তা হলো- শ্রীহরিচরণ সরোজ গুণমুনি
ষোড়শ সংখ্যকে শকাব্দে
মন্দিরমর্পিতমেতদ্রাজা শ্রী
তিলকচন্দ্র মাত্রা।। ১৬৭৩
সন ১১৫৯

মন্দিরটি গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের দেওয়ালে প্রস্তর ফলকে খোদিত একটি লিপি থেকে জানা যায়, তিলকচন্দ্রের মাতা রানি লক্ষ্মীকুমারী ১৬৭৩ শকাব্দে (১৭৫১খ্রিঃ) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে শ্রীহরির চরণপদ্মে এই মন্দিরটি অর্পণ করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দায় দক্ষিণমুখী হয়ে দাঁড়ালে বামদিকে পড়ে রাম-সীতার মন্দির, ডানদিকে বদ্রিনারায়ণের মূর্তি, আর সামনাসামনি রাধাবল্লভজীউ'র মন্দির।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

দক্ষিণমুখী এই কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরটি ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত পঁচিশচূড়া মন্দির। ভূমিতল নিয়ে এর চারটি তল। দ্বিতলে বারোটি, ত্রিতলে আটটি ও চতুস্তলে পাঁচটি 'চূড়া' বা 'রত্ন' সন্নিবেশিত হয়েছে। সব তলের প্রবেশ পথই 'ইমারতি' থামে গঠিত। মন্দিরের প্রথম তলের ছাদ ধনুকাকৃতি হয়ে যে কোণের সৃষ্টি করেছে, তার চারটি কোণই পর্দার আকারে খানিকটা উঁচু করা। এই পর্দায় চুন সুরকির বড় আকৃতির হাতি ও সিংহের মূর্তি রয়েছে। এই পর্দার উপরেই উঁচু করা কোণগুলিতে ৩টি করে চারকোণে মোট ১২টি চূড়া। মাঝেরটি সামনে এগোনো, আর পাশের দুটি সমমাপে পিছনে ঢোকানো। এইভাবে প্রথম তলের ছাদে মোট ১২টি চূড়া। এরপর বেড় কমিয়ে খানিকটা উপরে অষ্টকোণাকৃতি দ্বিতীয় তল সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদের আটকোণে ৮টি চূড়া। এরপর বেড়ের প্রসারতা কমিয়ে দ্বিতীয় তলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় ৩য় তল সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদের চারকোণে ৪টি, এবং মাঝে একটি বড় চূড়া। এক্ষেত্রে চূড়াগুলির সজ্জা হচ্ছে ১২+৮+৪+১, পঁচিশ রত্ন মন্দির। এর চূড়াগুলি চারকোণা এবং ছাদ উঁচু নীচু কার্নিশের বিন্যাসে কিছুটা পীরা শিখরের অনুরূপ। ইঁটের তৈরি সুদৃশ্য মন্দিরটির সঙ্গেই সন্নিবিষ্ট রয়েছে একটি 'একচালা' মন্ডপ। 'চালা' মন্ডপটির মাথায় লম্বা একটি মটকাবাঁধা যা গ্রামবাংলার সুপরিচিত খোড়ো চালার কথা মনে করিয়ে দেয়।

মন্দিরটির পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দক্ষিণপ্রান্তকে ৯০° কোণ করে যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্বদিকে ৬' বাড়ানো হয়েছে। আবার উভয়ের ঐ শেষপ্রান্ত থেকে দক্ষিণদিকে খিলানের দ্বারা ১০' বাড়ানো হয়েছে। আবার উভয়ের ঐ শেষপ্রান্ত থেকে দক্ষিণদিকে খিলানের দ্বারা ১০' বাড়ানো হয়েছে। এই বাড়ানো অংশেই সৃষ্টি করা হয়েছে জগমোহন ও নাটমন্দির। জগমোহন ও নাটমন্দিরের ছাদ ধাপযুক্ত চারচালার উপর রক্ষিত এবং গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজের উপর স্থাপিত।

গর্ভগৃহের মূলদ্বার ১টি। এর ভেতরের দুই বিপরীতমুখী দরজা দিয়ে যুক্ত পূর্বদিকে শয়নকক্ষ, তার জানালা দুটি। আর পশ্চিমদিকে ভোগকক্ষ। তার বাইরের দরজা ১টি, আর দুইপাশে দুটি জানালা রয়েছে। ভিতরের উত্তর দিকে সিঁড়ি রয়েছে, যা তৃতীয় তলে উঠে গেছে। মন্দিরের বাইরের দিকে পূর্ব ও উত্তরদিকের দেওয়াল গাত্রে ২টি পূর্ণ এবং ২টি অর্ধস্তম্ভের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে কৃত্রিম দরজা। এই মন্দিরের ত্রি-খিলানযুক্ত দালান একমাত্র সামনের দিকেই নিবন্ধ। তোরণগুলির তিনটি খিলান ধারণের জন্য মধ্যে দুটি পূর্ণস্তম্ভ এবং ধারের দুটি অর্ধস্তম্ভ রয়েছে।

রামসীতার মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। এটি পাঁচ খিলানের বারান্দাযুক্ত সমতল ছাদের দালানরীতির দেবালয়। এতে গর্ভগৃহ ছাড়াও দুপাশে রয়েছে দুই কক্ষ। গর্ভগৃহকে কেন্দ্র করে মোট পাঁচটি কোণ সৃষ্টি করে পঞ্চকোণাকৃতি খিলানের আধুনিক বারান্দা সৃষ্টি করা হয়েছে। রামসীতা মন্দিরের যে আকৃতি, সেই একই আকৃতির মন্দির বদ্রিনারায়ণের। এটি পূর্বমুখী। রামসীতা মন্দিরের মুখোমুখি। রাধাবল্লভজীউ'র মন্দিরটি হলঘরের মতো দালানরীতির। সম্মুখে উন্মুক্ত বারান্দা রয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

গর্ভগৃহের দ্বারের দৈর্ঘ্য-৯' গর্ভগৃহের দ্বারের প্রস্থ- ৪'

জানালার দৈর্ঘ্য- ৫.৭' জানালার প্রস্থ- ৪'

মূল মন্দিরটির উচ্চতা-৬০' মূল মন্দিরের আয়তন - ৩৬'×৩৬'

রামসীতা মন্দিরের আয়তন- ৪৮'×১৩' রাধাবল্লভজীউ'র মন্দিরের আয়তন- ৩৬'×১০'

গর্ভগৃহকে কেন্দ্র করে যে কোণগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই কোণের পরিমাপ- ৯$\frac{১}{২}$'

বিগ্রহ :

কৃষ্ণচন্দ্রজীউ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রধান সিংহাসনে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান কৃষ্ণচন্দ্র রয়েছেন এবং তাঁর পাশে দণ্ডায়মান রয়েছেন রাধারানি। দুজনের দুপাশে দণ্ডায়মান রয়েছেন চারজন সখী। অন্য আর একটি সিংহাসনে রয়েছেন দু'জোড়া রাধাকৃষ্ণ। পূর্বদিকে রয়েছেন রাধাবল্লভজীউ এবং পশ্চিমদিকে অবস্থান করছেন বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ। এই দু'জোড়া বিগ্রহকেই রাধাবল্লভজীউর মন্দির থেকে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রাধারানির বামহস্তের

তলদেশে রয়েছেন বালগোপাল। কৃষ্ণচন্দ্র এবং রাধারানি যুগলের পরনেই কাপড় রয়েছে। রাধারানির মাথায় ওড়না রয়েছে। যুগলের মাথায় মুকুট এবং কণ্ঠে মালা রয়েছে। চারজন সখীর পরনে একই রকমের বস্ত্র রয়েছে। প্রত্যেকের কেশ উন্মুক্ত এবং মাথায় ওড়না রয়েছে। একজন সখীর কণ্ঠেই মালা রয়েছে।

রামসীতা মন্দিরে রামচন্দ্র তাঁর পরিবার ও পারিষদসহ একটি কাষ্ঠনির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। পদ্মাসনে উপবিষ্ট রামচন্দ্রের পরনে রয়েছে ধুতি, উত্তরীয় এবং পৈতে। ললাটে তিলক আঁকা, শিরে শিরস্ত্রাণ রয়েছে। বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান সীতা। পরনে কাপড় এবং মাথায় ঘোমটা টানা। উন্মুক্ত দীর্ঘায়িত কেশরাশি লক্ষণীয়। রামচন্দ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান লক্ষ্মণ। পরনে ধুতি ও উত্তরীয় রয়েছে, ললাটে তিলক আঁকা রয়েছে। কণ্ঠে প্রত্যেকেরই মালা রয়েছে।

রামসীতার আসনের দুপাশে হনুমান করজোড়ে প্রণামরত অবস্থায় দণ্ডায়মান। এদের পরনেও ধুতি ও উত্তরীয় রয়েছে। রামচন্দ্রের সম্মুখে একটি ছোট সিংহাসনে শালগ্রাম শিলা রয়েছে। অপূর্ব নারায়ণ মূর্তিটি হিমালয়বাসী বদ্রীনাথদেবের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত। একটি উচ্চবেদীতে পদ্মের উপর দণ্ডায়মান বদ্রীনারায়ণের পরনে সোনালি রঙের পার যুক্ত ধুতি এবং উত্তরীয় রয়েছে। মুখমণ্ডল সুন্দর করে অঙ্কিত চতুর্ভুজ বিগ্রহটির চারটি হস্তের মধ্যে একটি দক্ষিণহস্ত সম্মুখে প্রসারিত এবং ওপর হস্তে গদা রয়েছে। বামহস্তের একটিতে শঙ্খ এবং ওপরটিতে চক্র রয়েছে। শিরে মুকুট এবং কণ্ঠে মালা রয়েছে। বদ্রীনারায়ণের বামপার্শ্বে বীণাহস্তে দেবী মহাসরস্বতী এবং দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মহস্তে দেবী মহালক্ষ্মী দণ্ডায়মান রয়েছেন। এঁরা আকারে বদ্রীনারায়ণের তুলনায় ক্ষুদ্র। উভয়ের শিরে মুকুট রয়েছে। মূল বিগ্রহের সম্মুখে একটি ক্ষদ্র আসনে শালগ্রাম শিলারূপী নারায়ণ এবং একটি পাত্রে শ্বেত শিবলিঙ্গ পূজিত হয়।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরে বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ'র বিগ্রহ ব্যতীত সকল বিগ্রহই দারুমূর্তি। একমাত্র বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ'র বিগ্রহটি প্রস্তর নির্মিত। রামসীতা মন্দিরেরও সমস্ত বিগ্রহই দারু নির্মিত।

বদ্রীনারায়ণ মন্দিরে যে নারায়ণ মূর্তিটি রয়েছে, সেটি কালো পাথরের উপর 'বা- রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত। একখণ্ড পাথরেই মূর্তিটি খোদাই করা হয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের উচ্চতা- ২$\frac{১}{২}$' রাধারানির উচ্চতা- ২'

রামচন্দ্রের উচ্চতা- ২$\frac{১}{২}$' বদ্রিনারায়ণের উচ্চতা- ৪'

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরের পুরোহিত শ্রী কানাই রায় এবং বিশ্বনাথ রায় দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মন্দিরটি বর্ধমানরাজার মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে। তবে মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মন্ডলের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। মন্দিরের সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী দ্বারাই হয়ে থাকে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – এই মন্দিরের দ্বার সকাল ৬.৩০মিনিটে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারপর মন্দির পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার পর নিত্যসেবা হয়। দুপুর ১১টায় ভোগ হওয়ার পর মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল ৪টের সময় মন্দির দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতীর পরে ৭টায় মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি নেই। মন্দিরের পুরোহিত শ্রী কানাই রায় এবং বিশ্বনাথ রায় দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই মন্দিরের যাবতীয় আয়- ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে 'মহতাবচাঁদ রিলিজিয়াস ট্রাস্ট'।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – মন্দিরে রাস, দোল, ঝুলন এবং জন্মাষ্টমী তিথিতে বিশেষ পূজা হয়ে থাকে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে কোন সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরে বিশেষ তিথিতে পূজাগুলির জন্য রাজবাড়ি থেকে অর্থ দেওয়া হয় এবং এই অর্থ ব্যতীত ভক্তগণের দক্ষিণা দ্বারাও পূজার খরচ চালানো হয়।

(জ) ভোগ – নিত্য ফল, মিষ্টি ব্যতীত অন্নভোগ দেওয়া হয় পঞ্চব্যঞ্জন সমাহারে। পরমান্ন ভোগ দেওয়া হয়। সকালে মিছরি ও মাখন এবং সন্ধ্যায় ফল, মিষ্টি বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – বর্ধমান রাজপরিবার থেকেই পুরোহিতের বেতন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে পুরোহিতের বেতন হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – নিত্য মন্দিরে ভক্ত সমাগম হয়। বিশেষ তিথিতে পূজার সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে মন্দির সম্পর্কিত কোনরকম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরটিতে টেরাকোটার অপূর্ব কারুকার্য রয়েছে। টেরাকোটার কারুকার্য শুধুমাত্র দক্ষিণদিকের অংশেই রয়েছে। বাকী পূর্ব- পশ্চিম ও উত্তরদিকের দেওয়ালগাত্রে রয়েছে একমাত্র ফুলকারি কাজের সজ্জা, কোন মূর্তি সজ্জা নেই। স্তম্ভগুলিতে ফুলকারি কাজ ছাড়াও টেরাকোটার প্রসাধন রয়েছে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে 'মৃত্যুলতা'কে দেওয়ালের কোণে বা গায়ে খাড়া করে লাগানোই সর্বত্র প্রচলিত রীতি। এখানেও প্রতি কোণের দুপাশে তা সমতলভাবে নিবদ্ধ। তাছাড়া কামরাঙ্গার পলের মতো যে কোন একতলার কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে তাতেও খাড়া করে রক্ষিত। মন্দিরের খিলানগুলি টেরাকোটা কারুকার্যে মণ্ডিত।

মন্দিরটির টেরাকোটার কারুকার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারুকার্য রয়েছে। সেগুলি হল- নাটমন্দিরের ভেতরের মূলদ্বারের খিলানশীর্ষে যেখানে প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে তার দুপাশে রয়েছে রাসমন্ডলের চিত্র। মন্দিরের বিভিন্ন স্তম্ভে রয়েছে কীর্তন শোভাযাত্রা; হিরণ্যকশিপু বধ, ব্রহ্মা- বিষ্ণু- মহেশ্বর; দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ; একজন নারী দণ্ড দিয়ে একটি শিশুকে প্রহার করছে; কালীয়দমন দৃশ্য; হনুমান হাতজোড় করে দণ্ডায়মান; শ্রীকৃষ্ণ যশোদা মায়ের সঙ্গে লীলারত; নৌকাবিলাস; বন্দুকধারী ফিরিঙ্গি; যুদ্ধচিত্র; সেবক কর্তৃক গড়গড়া দান; বেহালা বাদনরত নারী; পূজার সামগ্রী নিয়ে চারজন দণ্ডায়মান নারী; ফুলকারি কল্কার উপর দুটি টিয়াপাখি; কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্রহরণ করে গাছে উঠে বাঁশি বাজাচ্ছে এবং গাছের তলায় গোপীরা বস্ত্র প্রার্থনা করছে; কৃষ্ণ বামহাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলে গোবর্ধন পর্বত তুলে দণ্ডায়মান; বর্শা হস্তে দণ্ডায়মান সৈনিক; চতুর্ভুজ দেবী, হংসপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ব্রহ্মা; একজন পুরুষ শিবলিঙ্গ পূজারত, ষাড়ের পিঠে উপবিষ্ট শিব; ময়ূরের পিঠে উপবিষ্ট কার্তিক; হাতির পিঠে উপবিষ্ট সৈনিক, হাতে অস্ত্র; চতুর্ভুজকালীর পদতলে শিব ইত্যাদি।

মন্দিরের পশ্চিমদিকের নিম্নাঙ্গে সমান্তরাল প্যানেলে বা সারিতে রয়েছে- জন্মের পূর্বে বাসুদেব কর্তৃক বিষ্ণুমূর্তি দর্শন, কংসের কারাগারে রক্ষীদের মায়ানিদ্রা, কৃষ্ণকে নিয়ে বাসুদেবের যমুনা পার, নন্দালয়ে শিশুবদল এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতৃদুগ্ধপান। মন্দিরটির বিভিন্ন জায়গায় টেরাকোটার ফলক নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় সিমেন্ট দিয়ে সমান করে দেওয়া হয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] দাশ বিবেকানন্দ, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি.; ১৯৯৯।

[২] রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

[৩] মন্দিরের পুরোহিতগণ।

[৪] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৮] কালনার অনন্ত বাসুদেব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কালনার সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়ির বিপরীত দিকে অনন্তবাসুদেব মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের কার্নিশের নীচে কয়েকসারি সংস্কৃত ভাষায় লিপি খোদিত রয়েছে। লিপিটি হল-

রসাব্ধিরস চন্দ্রাঙ্কগণিত্যেব্দে শকাবধি।
চক্রে বৈকুণ্ঠনাথস্য মন্দিরং সুমনোহরম্।।
জগদ্রামস্য মহিষী কৃত্তিচন্দ্রনৃপ প্রসূ।
শ্রী শ্রী ত্রিলোকচন্দ্রস্য নৃপতের্যা পিতামহী।।

অর্থাৎ রস= ৬, অব্ধি= ৭, রস= ৬, চন্দ্রাঙ্ক= ১।

১৬৭৬শকাব্দ বা ১৭৫৪খ্রিস্টাব্দে জগৎরাম রায়ের মহিষী ব্রজকিশোরী অনন্তবাসুদেবের মন্দিরটি নির্মাণ করান। লিপি অনুসারে মন্দিরটিকে বৈকুণ্ঠনাথ মন্দির বলা যেতে পারে, সেই সময় বর্ধমানের রাজা ছিলেন তিলকচাঁদ। বন্যায় যাতে মন্দিরটির কোন ক্ষতি না হয়, তার জন্য গঙ্গার পার থেকে একটু দূরে একটি উচ্চস্থানে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

সমতল ভিত্তিবেদীর উপর 'আটচালা' রীতির এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। মন্দিরটিতে খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা এবং তিনটি উন্মুক্ত দ্বার রয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। মন্দির শীর্ষে রয়েছে তিনটি লৌহ শলাকা। মন্দিরটি চতুর্দিকে উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং মন্দিরের পশ্চাতে উত্তরদিকে বর্তমান সেবাইতদের বসতবাটী রয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে রয়েছে একটি নাটমন্দির। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা উচ্চস্থানে মন্দিরটি অবস্থান করায় দূর থেকে মন্দিরটির উচ্চতা এবং বিশালতত্ত্ব খুব সহজেই লক্ষণীয়।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরটির উচ্চতা- ৫০′ মন্দিরটির আয়তন- ২৫′×২৭′ তলপত্তন- ৫′

মূল দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৭.৪′ মূল দ্বারের প্রস্থ- ৪.১′

বিগ্রহ :

অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের গর্ভগৃহে মূল সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন বাসুদেব। ইনি পদ্মফুলের উপর গরুড়ের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। বাসুদেবের বামহস্তে শঙ্খ এবং দক্ষিণ হস্তটি উন্মুক্ত রয়েছে। পরনে রাজবেশ, মাথায় মুকুট এবং কণ্ঠে পুষ্পমালা রয়েছে। এছাড়া সুন্দর কারুকার্য শোভিত মুখমণ্ডল অনায়াসে দর্শনার্থীকে মুগ্ধ করে। বাসুদেবের শিরের উর্দ্ধে তিনদিকে দশাবতারের মূর্তি একটি সারিতে খোদিত রয়েছে। বাসুদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে চামর হাতে দেবী মহালক্ষ্মী এবং বামপার্শ্বে বীণাবাদনরত দেবী মহাসরস্বতী দণ্ডায়মান রয়েছেন পদ্মফুলের উপর। এঁদের পোশাক রঙের মাধ্যমে অঙ্কন করা হয়েছে। এই একই আসনে বাসুদেবের বামপার্শ্বে জগন্নাথদেব এবং দক্ষিণ পার্শ্বে নৃসিংহদেব অধিষ্ঠিত রয়েছেন। এঁরা উভয়েই রেশমের বস্ত্র পরিহিত, শিরে মুকুট, কণ্ঠে পুষ্পমালা এবং ললাটে তিলক অঙ্কিত রয়েছে। নৃসিংহদেবের দুটি হস্ত সম্মুখে প্রসারিত। বর্তমানে মূর্তির উপর রঙের প্রলেপ লাগিয়ে মূর্তিগুলিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। এই আসনের মধ্যে দারু নির্মিত কাঠামোয় বাঁধানো গৌড়- নিতাইয়ের নৃত্যরত ছবি এবং ক্ষুদ্রাকৃতির সিংহাসনে শিবলিঙ্গ রাখা রয়েছে।

অনন্তবাসুদেবের দক্ষিণপার্শ্বের একটি দারুনির্মিত আসনে রয়েছেন দণ্ডায়মান জগন্নাথদেব। পরনে রয়েছে জরির পার যুক্ত রেশমের বস্ত্র, শিরে একটি বস্ত্র পরিহিত রয়েছে। জগন্নাথ ব্যতীত এই আসনে একজোড়া স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা সহ বিরাজমান। এঁদের পরনেও সুসজ্জিত বস্ত্র এবং অলংকার রয়েছে। উভয়েরই শিরে মুকুট এবং কণ্ঠে মালা রয়েছে।

অনন্তবাসুদেবের বামপার্শ্বে দারুনির্মিত আসনে গোপীনাথ, রাধাবল্লভ, গিরিধারী এবং অন্যান্য কিছু দেব- দেবী একত্রে বিরাজমান। দণ্ডায়মান রাধাবল্লভ রাধারানি সহ অধিষ্ঠিত। রাধাবল্লভের অঙ্গে সুসজ্জিত রেশমের বস্ত্র এবং উন্মুক্ত কেশে মুকুট পড়ানো রয়েছে। মুখমণ্ডল সুসজ্জিত এবং ললাটে তিলক অঙ্কন করা রয়েছে। রাধারানির পরনে

রয়েছে সুসজ্জিত বস্ত্র, শিরে ওড়না ও টিকলি, নাকে নথ, কানে দুল এবং কণ্ঠে পুষ্পমালা রয়েছে। রাধা দুইহস্তে দুটি পুষ্প ধারণ করে রয়েছেন। অন্যান্য মূর্তির মধ্যে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর দুজন পারিষদ অন্যান্য বিগ্রহগুলির মতোই সুসজ্জিত।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

অনন্তবাসুদেব মন্দিরে কেবলমাত্র অনন্তবাসুদেব মূর্তিটি একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরের পুরু পাটার উপর খোদিত এক অপূর্ব দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য সমন্বিত দেবমূর্তি। অন্যান্য সকল মূর্তিগুলি দারু নির্মিত।

বাসুদেবের মূর্তির উচ্চতা- ৩′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরের পুরোহিত শ্রী পার্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বর্তমানে মন্দিরটি তাঁর পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে। মন্দিরটি তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – এই মন্দিরের দ্বার ভোর ৪টের সময় উন্মুক্ত হয়ে যায়। দুপুর ১২.৩০মিনিটে অন্নভোগ হওয়ার পর মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল ৪টের সময় মন্দির দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতী হয়। রাত্রি ৮.৩০ মিনিট নাগাদ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নেই। মন্দিরের ব্যয় বহন করে ‘গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ’।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – মন্দিরে রাস, দোল, ঝুলন এবং জন্মাষ্টমী ইত্যাদি তিথিতে বিশেষ পূজা হয়ে থাকে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে কোন সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব ও অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোন আয়- ব্যয় নেই।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য পাঁচবার ভোগ নিবেদন করা হয়। ভোর ৪টের সময় আরতি হওয়ার পর মাখন- মিছরি ভোগ হয়। তারপর সকাল ৮টায় বিগ্রহের নিত্যপূজার পর ফল- মিষ্টি দিয়ে ভোগ হয়। তারপর ১২.৩০মিনিটে পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে অন্নভোগ হয়। বিকেল ৫টায় ফল সহযোগে এবং রাত ৮টায় লুচি,সব্জী,ফল ও মিষ্টান্ন সহযোগে ভোগ নিবেদন করা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরে পৃথকভাবে পুরোহিত নিযুক্ত হননি। মন্দিরের মালিকই মন্দিরের পুরোহিত। তাই নির্দিষ্ট কোন বেতনের বন্দোবস্ত নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – নিত্য মন্দিরে ভক্ত সমাগম হয়। বিশেষ তিথিতে পূজার সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরের পুরোহিত মহাশয় জানিয়েছেন, **১৯৬৪খ্রিঃ** বিড়লা ট্রাস্টের আর্থিক সহযোগীতায় মন্দিরটির মূল কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে সার্বিক সংস্কার করা হয়। সেই সময় নাটমন্দির নির্মাণ এবং ভগ্নপ্রায় প্রাচীরগুলির আমূল সংস্কার করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

অনন্তবাসুদেব (বৈকুণ্ঠনাথ) মন্দিরে প্রচুর টেরাকোটার সুন্দর সুন্দর কাজ ছিল কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় সবগুলি নষ্ট হয়ে মন্দির কাঠামোটি ধ্বংস হওয়ার পূর্বে **১৯৬৪খ্রিঃ** বিড়লা ট্রাস্টের আর্থিক সহযোগীতায় এই মন্দিরের আমূল সংস্কার হয়, কিন্তু টেরাকোটার সব অমূল্য শিল্পকর্মগুলি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালে কিছু ভাস্কর্য এখনও আছে। এই দেওয়ালের দু’পাশে উল্লম্বভাবে দুটি করে ফিগারেটিভ প্যানেলের সারি কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে। মন্দিরের কার্নিশ বরাবর একটি ফিগারেটিভ প্যানেলের সারি অনুভূমিক ভাবে রয়েছে। মন্দিরের স্তম্ভগুলি বরাবর একটি উল্লম্ব সারি এবং এই উল্লম্ব সারিগুলির উপর থেকে একটি ফিগারেটিভ প্যানেলের সারি অনুভূমিক ভাবে রয়েছে। অলিন্দের মধ্যেও ভাস্কর্য রয়েছে। তিনটি বহিঃদ্বারের শীর্ষে দুটি

করে বড় বড় ফুলের নকশা করা রয়েছে। এছাড়া দু'দিকের দেওয়ালে জাফরির নকশার সরু স্তম্ভও রয়েছে। এই মন্দিরের কিছু উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য হল- হাতে ধনুক নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষ; হাতে বর্শা নিয়ে দণ্ডায়মান সৈনিক; হাতে চামর নিয়ে দণ্ডায়মান নারী; হুকোর নল হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষ; শিশুকে আদর করছে একজন নারী; শিঙা বাজনরত পুরুষ; হাতে ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে দণ্ডায়মান সৈনিক; দু'হাত তুলে নৃত্যরত শ্রীচৈতন্য; দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ; হাতে বল্লম ধরে দণ্ডায়মান পুরুষ; কৃষ্ণ গরু চরাচ্ছে; হাতে বাঁশি নিয়ে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ; হংসের উপর উপবিষ্ট তিনমুখী ব্রহ্মা; বীণা বাজনরত পুরুষ; মিথুন দৃশ্য; একজন নারী পাখিকে খাবার দিচ্ছে; নৃত্যরত রমণী; মৎস্য কন্যা; নরসিংহ; দশভুজা দেবী; লাঙল কাঁধে নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষ; হাতে কুঠার নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষ; শিবলিঙ্গ পূজারত পুরুষ; উটের পিঠে উপবিষ্ট দুজন পুরুষ প্রভৃতি। তবে এই ভাস্কর্যগুলির অনেকগুলিই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবুও এই মন্দিরটির বিশালতা ও নান্দনিক রূপ সকল দর্শককেই মুগ্ধ করে।

তথ্যঋণ :

[১] রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

[২] মন্দিরের পুরোহিতগণ।

[৩] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৯] কালনার গোপালজীউ মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এই গোপালজীউ মন্দির এক বিশিষ্ট পুরাকীর্তি। এটি কালনার তৃতীয় পঁচিশচূড়া মন্দির। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে আছে- শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৬৮৮

শকাব্দে শর ভাগরি-রাত্রিপ-কলাকোত্রির মূর্ত্যাঙ্গ
ভূসংখ্যে বাহুজ বংশভূর্বিমলধিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুধীঃ ।
প্রসাদম্ প্রদদৌ বিধিয়া পরয়া ভক্ত্যাপরব্রহ্মণে
গোপালায় সমস্ত বাংময়- পথাপীতায় বিশ্বাত্মনে।।

অর্থাৎ ১৬৮৮শকাব্দে (১৭৬৬খ্রিঃ) বাহুজবংশভূ (ক্ষত্রিয় বংশজাত) শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নামক এক সুধী, গোপালের নিমিত্ত এই মন্দির নির্মাণ করান। সুতরাং বলা যায় যে, এটি রাজবৃত্তের পরিধির অন্তর্গত মন্দির নয়। এর নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজানুকূল্য থাকলেও থাকতে পারে, বা প্রতিষ্ঠাতার সাথে রাজপরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু রাজবৃত্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এই মন্দিরটি স্থাপিত হওয়ার সময় বর্ধমানের রাজা ছিলেন তিলকচাঁদ। তিঁনি কোন ভাবে বদাণ্যতা দেখিয়েছিলেন কিনা তা স্পষ্ট ভাবে জানা যায় না।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

গোপালজীউ মন্দিরটি হলো কালনার আরেকটি পঁচিশচূড়া মন্দির। এর সুচারু খাঁজকাটা রত্নগুলির মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্য লক্ষ করা যায়। বিশালতা ও আয়তনের দিক থেকে পূর্বোক্ত লালজী ও কৃষ্ণচন্দ্রজীউ মন্দিরের সঙ্গে মন্দিরটির তুলনা করা যেতে পারে।

পূর্বমুখী মন্দিরটির মূল প্রবেশপথ পূর্বদিকেই রয়েছে। উচ্চ ভিত্তি বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটির সংলগ্ন দোচালা বিশিষ্ট নাটমন্দির রয়েছে। নাটমন্দিরের পরের অংশটিতে রয়েছে তিনটি খিলানের উন্মুক্ত দ্বার বিশিষ্ট ঢাকা বারান্দা। এবং মন্দিরের উত্তর- দক্ষিণ পার্শ্বে রয়েছে দুটি দ্বার। কিছু পার্থক্য থাকলেও মন্দিরটির গঠনের সঙ্গে লালজী বাড়ির গঠনগত সাদৃশ্য রয়েছে। এই মন্দিরের পশ্চিমদিকে রয়েছে ১৭′ দেওয়াল। তার দক্ষিণপ্রান্তে ৯০° কোণ করে পূর্বদিকে ৩½′ বর্ধিত। তার প্রান্ত থেকে ৩′ দক্ষিণ দিকে বর্ধিত। সেখান থেকে ১৭′ পূর্বমুখী। তার পূর্বপ্রান্ত থেকে ৯০°

কোণ করে ৩$\frac{১}{২}$′ উত্তরদিকে বর্ধিত, তার প্রান্ত থেকে পূর্বে ৩′ বর্ধিত, তার প্রান্ত থেকে উত্তরে ৩$\frac{১}{২}$′ বর্ধিত, তার প্রান্ত থেকে পূর্বে ৩′ বর্ধিত রয়েছে।

অন্যদিকেও উত্তরদিকের দেওয়াল সমভাবে পশ্চিম ও উত্তরদিকে পর্যায়ক্রমে বর্ধিত হয়েছে। দুইদিকেরই পূর্বদিকস্থ বর্ধিত অংশে রয়েছে জগমোহন ও নাটমন্দির।

মূল মন্দিরটির প্রথম তলের ছাদের চারকোণে যে খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তিনটি করে মোট বারোটি চূড়া স্থাপন করা হয়েছে। এরপর খানিকটা উপরের বেড় হ্রাস করে অষ্টকোণাকৃতি দ্বিতীয় তল সৃষ্টি করা হয়েছে। তার ছাদে আটকোণে স্থাপন করা হয়েছে আটটি চূড়া। এরপর বেড় হ্রাস করে দ্বিতীয় তলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় তৃতীয় তলের সৃষ্টি করে সেখানে ছাদের চারকোণে চারটি, মাঝে একটি বড় চূড়া স্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ চূড়াগুলির বিন্যাস ১২+৮+৪+১। এই চূড়াগুলি চারকোণা ও এদের ছাদ উঁচু-নীচু কার্নিশের বিন্যাসে কিছুটা পীড়া শিখরের মতো। এই মন্দিরের ত্রি-খিলান দালানের ছাদ ধনুকাকৃতি ‘ভলট’ এর উপর এবং গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরযুক্ত গম্বুজের উপর স্থাপন করা হয়েছে।

গোপালজীউ মন্দিরের উত্তরে রয়েছে সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠ, যেগুলি আবাস, ভাঁড়ার ও রন্ধনশালা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মন্দিরের দক্ষিণাংশে পাকা পৃথক একটি ঘরে গোপাল এবং শ্রীকৃষ্ণদেবের দুটি রথ ছিল, একটি প্রায় ভগ্নদশায় রয়েছে, অপরটি বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে। মন্দিরের বাইরে উত্তরাংশে রয়েছে রাসমঞ্চ। উচ্চ ভিত্তি বেদীর উপর আটটি উন্মুক্ত দ্বার রয়েছে। তার উপর অষ্টকোণের আদল রেখে গম্বুজাকৃতির শিখর সৃষ্টি করা হয়েছে।

গোপালজীউ মন্দির চত্বরটি একটি সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের মুখে ভেতরের দিকে দুপাশে দুটি আটচালা রীতির শিব মন্দির রয়েছে। মন্দির সম্মুখে রয়েছে বিস্তৃত উঠান এবং দুপাশ থেকে দুটি সিঁড়ি মন্দিরে উঠে গেছে। উঠানের মাঝখানটি সিমেন্টের বাঁধানো। পূর্বে উঠানের চারিপাশে কয়েকটি লোহার থাম পোঁতা ছিল, বর্তমানে চারটি ইঁটের থাম রয়েছে। অতীতে এখানেই কাঠের বীমের উপর খড়ের চালের ছাউনি দিয়ে নাটমন্দির তৈরি করা হয়েছিল বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তন বা ভিত্তির উচ্চতা - ৪′ — মন্দিরের উচ্চতা- ৪৫′

গর্ভগৃহের দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৯′ — গর্ভগৃহের দ্বারের প্রস্থ- ২.৬′

রাসমঞ্চের উচ্চতা- ১৫′

মন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের দুটি দ্বারের পরিমাপ,

উত্তর দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৭.২′ — উত্তর দ্বারের প্রস্থ- ৩.৯′

দক্ষিণ দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৪′ — দক্ষিণ দ্বারের প্রস্থ- ২.৩′

স্তম্ভের দৈর্ঘ্য- ৫.৩′ — স্তম্ভের প্রস্থ- ২.৮′

পশ্চিমের জানালার দৈর্ঘ্য- ৭.৪′ — পশ্চিমের জানালার প্রস্থ- ২.১′

রথের উচ্চতা- ৯.৮′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে মূল বিগ্রহ হিসেবে নিত্য সেবিত হন কৃষ্ণবর্ণের নাড়ুগোপাল। একই সিংহাসনের ওপর গোপালের দু’পাশে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ বিরাজমান। নাড়ুগোপালের দক্ষিণহস্ত সম্মুখে প্রসারিত এবং সেই হস্তে রয়েছে একটি রূপোর বাঁশি। এই বিগ্রহের শিরে মুকুট, কণ্ঠে মালা এবং হাতে বালা রয়েছে। মুখমণ্ডল তিলক ও চন্দন দ্বারা সুসজ্জিত। বিগ্রহের দু’পাশে যে রাধাকৃষ্ণের দণ্ডায়মান মূর্তি রয়েছে তাঁদের পরনে রয়েছে জমকালো পোশাক। স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান বংশীবাদনরত কৃষ্ণের শিরে রয়েছে মুকুট ও কণ্ঠে ফুলের মালা। উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাধার শিরে মুকুট, কণ্ঠে মালা, কানে কুন্ডল, কপালে টিপ এবং সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে। সিংহাসনের নিম্নাংশে রয়েছে একটি শালগ্রাম শীলা এবং একটি নাড়ুগোপালের মূর্তি। প্রতিটি মূর্তি সালঙ্কারে ও সুন্দর আভরণে সজ্জিত। মূর্তিগুলি রাজা তেজচাঁদের সময়কার বলে মন্দিরের পুরোহিত জানিয়েছেন। প্রতি বছর জন্মাষ্টমীর আগে বিগ্রহগুলি রঙ করা হয়।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

গোপালজীউ মন্দিরে নাড়ুগোপালের বিগ্রহটি প্রস্তর নির্মিত। বিগ্রহের বামপার্শ্বে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটি দারু নির্মিত এবং দক্ষিণপার্শ্বের রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটি পেতল নির্মিত। দুইপার্শ্বের রাধাকৃষ্ণের মূর্তিগুলি সম উচ্চতা বিশিষ্ট।

নাড়ুগোপালের উচ্চতা- ১½′ রাধারানির উচ্চতা- ১½′ কৃষ্ণের উচ্চতা- ২′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরের পুরোহিত শ্রী তিমির চক্রবর্তী দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মন্ডলের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। মন্দিরের সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী দ্বারাই হয়ে থাকে। তবে মন্দিরটি বর্তমানে বারোয়ারি মন্দির। স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি সংগঠন আছে, যাদের হাতে মন্দিরের বহিঃদ্বারের চাবির দায়িত্ব থাকে। গর্ভগৃহের চাবি থাকে পুরোহিতের কাছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – এই মন্দিরের দ্বার সকাল ৬টায় উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারপর মন্দির পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার পর নিত্যসেবা হয়। দুপুর ১২টায় ভোগ হওয়ার পর মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল ৪টের সময় মন্দির দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতী এবং নাটমন্দিরে ভাগবত গীতা পাঠ হয়। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি নেই। মন্দিরের পুরোহিত শ্রী তিমির চক্রবর্তী দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই মন্দিরের যাবতীয় আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংগঠন। ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারা প্রাপ্ত অর্থই নিত্যসেবার জন্য ব্যয় করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ এবং বালগোপাল কেন্দ্রিক সকল তিথিতেই বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। রথের সময় মন্দির প্রাঙ্গণেই রথটান উৎসব পালিত হয়। এছাড়া এই মন্দিরে শরৎকালীন দূর্গোৎসব পালিত হয় সাড়ম্বরে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে কোন সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরে ভক্তগণের দক্ষিণা দ্বারা বিশেষ তিথির পূজার খরচ চালানো হয়।

(জ) ভোগ – নিত্য ফল, মিষ্টি ব্যতীত অন্নভোগ দেওয়া হয় পঞ্চব্যঞ্জন সমাহারে। পরমান্ন ভোগ দেওয়া হয়। সকালে মিছরি ও মাখন এবং সন্ধ্যায় ফল, মিষ্টি বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। শনিবার অন্নের বদলে খিচুড়ি ভোগ হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – স্থানীয় বাসিন্দাদের সংগঠন দ্বারাই পুরোহিতের বেতন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে পুরোহিতের বেতন হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – নিত্য মন্দিরে ভক্ত সমাগম হয়। বিশেষ তিথিতে পূজার সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে মন্দির সম্পর্কিত কোনরকম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

গোপালজীউ মন্দিরগাত্রে চমৎকার সব টেরাকোটার কারুকার্য লক্ষ করা যায়। জগমোহনের খিলানের শীর্ষে রঙিন ফ্রেস্কোর কারুকার্য রয়েছে, মন্দিরের যে খাঁজ থেকে নাটমন্দিরের আরম্ভ তার বাইরের দু'পাশে কিছু টেরাকোটার কাজ কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে। দেওয়াল ও স্তম্ভগুলিতেও ফুলকারি নকশা ও মূর্তির কারুকার্য রয়েছে।

এই মন্দিরে উল্লেখযোগ্য টেরাকোটার কারুকার্যগুলি হল- অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণু; চতুর্ভুজ নারায়ণ; চতুর্ভুজ দেবীকে কেন্দ্র করে ভক্তগণের সমাগম; শিবলিঙ্গের অভিষেক করছেন একজন উপবিষ্ট পুরুষ; দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ; রাখাল বালকেরা গোচারণরত; ঘোড়ার উপর উপবিষ্ট দুজন সৈনিক; সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজপুরুষ; প্রসাধনরত নারী; হাতির পিঠে পতাকা হাতে সৈনিকগণ বসে আছে; শিঙা বাজনরত পুরুষ; বন্দুকধারী দণ্ডায়মান পুরুষ; কৌপীন পরিহিত যোগীপুরুষ; ঢোল বাজনরত পুরুষ; মাথায় পাগড়ি পড়ে স্থূলকায় পুরুষ; হাতে তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধরত সৈনিক; উটের

পিঠে হাতে অস্ত্র নিয়ে উপবিষ্ট সৈন্য; গরু গাড়ী টানছে; ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট সৈনিক পশুকে হত্যা করছে একটি লম্বা বল্লম দিয়ে; পদাতিক সৈনিক; দণ্ডায়মান ইংরেজ রাজপুরুষ; চামর হাতে নারী; হাতে ময়ূর নিয়ে দণ্ডায়মান নবাবি রমণী; হাতে শঙ্খ নিয়ে উপবিষ্ট পুরুষ; মিথুন দৃশ্য ইত্যাদি।

মন্দিরটির বহিঃদ্বারের অলিন্দের শীর্ষভাগে কৃষ্ণের রাসলীলার চক্র রয়েছে দুটি। আর তার দু'পাশে উপরে ও নীচে রাধা-কৃষ্ণের লীলারত ভাস্কর্যের সারি রয়েছে। পূর্বমুখী দেওয়ালের প্রান্তগুলিতে মৃত্যুলতার মধ্যে মিথুন দৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই মন্দিরটির ভাস্কর্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় মিথুন দৃশ্য রয়েছে, যা অন্য মন্দিরগুলিতে বিরল।

মন্দির গাত্রে অপূর্ব এবং মূল্যবান কিছু টেরাকোটার কারুকার্য ছিল যা অবহেলায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস হয়ে গেছে। পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ থেকে শুধু টালি দিয়ে সেই শূণ্যস্থান গুলি পূরণ করে দেওয়া হয়েছে। তবে যেগুলি অবশিষ্ট আছে, সেইগুলি দর্শককে চমৎকৃত এবং আকর্ষণ করে।

তথ্যঋণ :

[১] দাশ বিবেকানন্দ, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি.; ১৯৯৯।

[২] মন্দিরের পুরোহিতগণ।

[৩] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১০] গোপালদাসপুরের রাখালরাজা মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

রাখালরাজা মন্দিরের একজন প্রবীণ সেবাইত শ্রী বিশ্বনাথ গোস্বামী দ্বারা গৃহীত তথ্যানুযায়ী মন্দিরটির সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, মন্দিরটি প্রায় ২০০বছরের প্রাচীন। তিনি আরো বলেন যে, একসময় মুর্শিদকুলি খাঁ এখানে ৭০০বিঘা জমি দেবভূমি হিসেবে দান করেছিলেন। সেই দেবভূমিতেই মন্দিরটি রয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি একটি ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রাখালরাজার মন্দিরটি এই নিয়ে পঞ্চমবার নির্মাণ হল। তবে এর কোন নথিপত্র নেই। শ্রী বিশ্বনাথ গোস্বামীর মতে এটি তাঁর শোনা কথা মাত্র। মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরালে একটি স্বপ্নতত্ত্ব রয়েছে, সেটি এইরকম- খাটুন্তি গ্রামের ব্রাহ্মণ রামকানু বৃন্দাবন যাওয়ার পথে ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পান। ঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন যে, তাঁর আর বৃন্দাবন যাওয়ার দরকার নেই। বাঘনাপাড়া থেকে একটি ছেলে আসবে। গ্রামের শেষে যে ছোট্ট ডোবাটি আছে যেটি রাখালরাজাতলার যমুনা দিঘি নামে পরিচিত, তাতে একটি নিমকাঠ ভাসবে। ছেলেটি ৭দিন পরে এসে ঐ নিমকাঠ দিয়ে রাখালরাজার মূর্তি তৈরি করে দেবে। ঠাকুর এখানেই প্রতিষ্ঠিত হবেন। এইভাবেই রাখালরাজার মূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

রাখালরাজার বর্তমান মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত 'জোড়বাংলা' রীতির মন্দির। দুটি পাশাপাশি দোচালা কুটিরকে যুক্ত করে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। প্রথমটি দরদালান এবং দ্বিতীয়টিতে বিগ্রহ অধিষ্ঠিত রয়েছে। এই মন্দিরের দোলমন্দির ও নাটমন্দির পরবর্তী সময়ের সংযোজন। দোলমন্দিরটি উড়িষ্যারীতির রেখ মন্দির। দোল মন্দিরের চারটি খোলা দরজা রয়েছে। মন্দিরের সম্মুখে ১২টি থামযুক্ত ঢাকা নাটমন্দির রয়েছে। বিগ্রহপূজা চলাকালীন ঐ নাটমন্দিরে হরিনাম সংকীর্তন হয়।

মন্দির শিল্পের এই 'জোড়বাংলা' রীতিটিকে কালনা মহকুমায় নিয়ে আসেন প্রথম বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায়। কালনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি নির্মাণ করা হয় ১৭৩৯খ্রিস্টাব্দে। অনুমান করা যায় যে রাখালরাজা মন্দিরটি এর পরবর্তী সময়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ পথ দুটি। একটি পশ্চিম আর একটি দক্ষিণ দিকে। দর্শনার্থীরা দক্ষিণ দ্বারটি দিয়েই বিগ্রহ দর্শন করেন। মন্দিরের পশ্চাতে রন্ধনশালা রয়েছে। সেখানে রাখালরাজার

উদ্দেশ্যে নিত্য ভোগ রান্না হয় এবং দর্শনার্থীদের জন্যেও ভোগ প্রস্তুত করা হয়। সাধু ভোজনের জন্য মন্দিরে পূর্বদিকে ঢাকা বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরের পশ্চাতে রন্ধনশালা লাগোয়া বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে দর্শনার্থীদের ভোগ খাওয়ানোর জন্য। বর্তমানে মন্দির চত্বরে ভক্তদের বিশ্রামাগারও নির্মাণ করা হয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের উচ্চতা- ২০′ গর্ভগৃহের দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৭.২′ গর্ভগৃহের দ্বারের প্রস্থ- ৪′

তলপত্তন- ৪′ নাটমন্দিরের আয়তন- ৩৫′×২৫′

বিগ্রহ :

মূল মন্দিরে নিত্য সেবিত হন গোপীনাথ এবং রাখালরাজা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় বংশীধারী রাখালরাজা একটি সিংহাসনে দণ্ডায়মান। তাঁর পরনে রেশমের ধুতি ও উত্তরীয়, কণ্ঠে মালা, শিরে মুকুট রয়েছে। যখন যে সেবাইত পূজা করেন, তখন তাঁর নিজ ইচ্ছানুসারে বিগ্রহটির সাজসজ্জা করানো হয়।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

রাখালরাজা মূর্তিটি দারু নির্মিত। বিগ্রহের নিকট পৌছানো যায় নি, তাই বিগ্রহের সঠিক মাপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে অনুমান করা যায়, বিগ্রহটি উচ্চতায়- ৩′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – বর্তমানে মন্দিরটি কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে নেই। মন্দিরটি বারোয়ারি। গোপালদাসপুর গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ির সদস্য এই মন্দিরের সেবাইত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – রাখালরাজা মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার এবং রুদ্ধ হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যখন যে পুরোহিত মন্দিরের পৌরোহিত্য করেন, তখন তাঁর সময় অনুযায়ী মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হয়। বিশ্বনাথ বাবু'র বক্তব্য অনুযায়ী, মন্দিরটির দ্বার আনুমানিক সকাল ১০টায় উন্মুক্ত হয়, বেলা ১.৩০টা নাগাদ ভোগ হয়। সকলকে প্রসাদ বিতরণের পর মন্দির দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তারপর বিকেল ৫টায় পুনরায় দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার পর সন্ধ্যারতীর পর সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিট নাগাদ মন্দির বন্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির এবং তৎসংলগ্ন জমি নিয়ে ১৯৬৭খ্রিঃ পরে আইনগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমিটিকে খাস জমি বলে ঘোষণা করে দিয়েছিল। তারপর শ্রী বিশ্বনাথ গোস্বামী প্রায় ২০বছর ধরে মামলা লড়ে আবার সমস্ত জমি ফিরিয়ে আনেন এবং সমস্ত আইনগত সমস্যা সমাধান করেন। বর্তমানে কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – গোপালদাসপুর গ্রামটি ১৯৪৬খ্রিঃ থেকে দেবোত্তর সম্পত্তি হয়ে রয়েছে। এর উপরেই গ্রামবাসীরা ভোগদখল করে রয়েছে। দেবোত্তর সম্পত্তির থেকেই মন্দিরের খরচ চালানো হয়। সেবাইতদের আয় হয় ঐ সম্পত্তির থেকেই। সেবাইতগণ মন্দিরের পূজাবাবদ যে অর্থ ব্যয় করে, সেই অর্থ ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি দ্বারাই আয় হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে বার্ষিক উৎসব হয় চৈত্রের রামনবমী তে। এছাড়া জন্মাষ্টমী, দোল উৎসব বা নন্দোৎসব হয়। দোলের সময় দুই মূর্তিই ওঠেন দোলমন্দিরে। প্রতিবছর কার্ত্তিক মাসে বিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়। রাখী পূর্ণিমার দিন ঠাকুরের অভিষেক হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – রাখালরাজার মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে কোন সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না। শুধুমাত্র রামনবমীতে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। রামনবমীর পূর্বদিন চাঁচর ও বারুদ পোড়ানো হয়।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – বার্ষিক উৎসবে যা খরচ হয় তা মন্দিরের সেবাইতগণ মিলেই সেই ব্যয়ভার বহন করে। এছাড়া প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়, তাদের দক্ষিণা দ্বারাও অর্থ আয় হয়।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য অন্নভোগ হয়। আতপ চালের ভাত সঙ্গে ডাল, তরকারী, তিন- চাররকম ভাজা, টক, পরমান্ন ইত্যাদি দিয়ে নিত্য ভোগ নিবেদন করা হয়। ভক্তেরা অর্থের বিনিময়ে সেই ভোগ পেতে পারেন।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের প্রায় ২৫-৩০ঘর সেবাইত রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট পুরোহিত এই মন্দিরে পৌরোহিত্য করে না। তাই বেতনও নির্দিষ্ট করা নেই। যখন যার পালা পড়ে, সেই সময় ভক্তেরা যা দক্ষিণা বাবদ দিয়ে থাকে, সেই সেবাইত তখন সেই দক্ষিণার অর্থ সম্পূর্ণটাই পেয়ে থাকেন।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – নিত্য মন্দিরে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। উৎসবের সময় গ্রামবাসীরা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে এবং শহর থেকেও প্রচুর ভক্তরা আসেন।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে মুসুরির ডাল এবং পুঁইশাক নিষিদ্ধ। মন্দির ছাড়াও সম্পূর্ণ গোপালদাসপুর গ্রামটিতে রসুন, পেয়াজ ও মাংস বহু পূর্ব থেকেই নিষিদ্ধ করা আছে।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে মন্দিরটি সংস্কার করে রঙ করা হয়েছে। নাটমন্দিরটিকে নতুন করে টালি বসিয়ে সুন্দর করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও মন্দিরটিকে আরো সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্দিরের প্রবীণ সেবাইত শ্রী বিশ্বনাথ গোস্বামী মহাশয়।

(ড) প্রকাশনা – শ্রী অজিত কুমার গোস্বামী, ১৩৬৫খ্রিঃ 'শ্রীশ্রী রাখালরাজের পাঁচালি' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। কিন্তু মন্দিরের নিজস্ব কোন প্রকাশিত গ্রন্থ বা পুস্তিকা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরগাত্রে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] গাইন বিশ্বজিৎ, কালনার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড; বর্ধমান; কালনা মহকুমা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র; অক্টোবর ২০১২

[২] দাশ বিবেকানন্দ, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি.; ১৯৯৯।

[৩] মন্দিরের পুরোহিত।

[৪] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১১] বর্ধমান শহরের শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ জিউ মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

শ্রীশ্রী ৺রাধাবল্লভজিউ মন্দিরটি মহারানি কমলকুমারীর ইচ্ছায় মহারাজ তেজচাঁদ নতুনগঞ্জ এলাকায় ১৭৪২শকাব্দে (১৮২০ খ্রিঃ) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরে শ্বেতপাথরের ফলকে খোদিত আছে-

পঞ্চ- বেদান্তৌধচন্দ্র- বিমিতে শাক-হায়নে ।
কমলাদি- কুমারিতি- শ্রুতয়া ভার্য্যয়াহন্বিতঃ ।।
শ্রীমদ্‌ভগবতঃ প্রীত্যে তেজচন্দ্র মহীপতিঃ ।
আস্তাপয়ৎ শক্তি সখং রাধাবল্লভ বিগ্রহম্‌ ।।

আরও দুছত্র বাংলা ভাষায় লেখা আছে, '১৭৪২ শকাব্দে মহিষী কমলকুমারীর সহিত মহীপতি তেজচন্দ্র শ্রীমদ্- ভগবত্- প্রীত্যর্থে সশক্তি রাধাবল্লভ মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন।'

৺রাধাবল্লভজিউ মন্দিরের গায়েই অপর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বর শিব মন্দির।

অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরে পাথরে উৎকীর্ণ আছে, '১৭৪১শকাব্দে মহিষী কমলকুমারী সহিত নৃপতি কুলমান্য বর্ধমানধিরাজ দানবীর শিবভক্ত ভূপতি তেজচন্দ্র, মহাদেব প্রীত্যর্থে সশক্তি রাজরাজেশ্বর নামক শিব স্থাপন করিয়া ১৭৪২শকাব্দে সর্ব্ব শুভ বিধাত্রী অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা স্থাপন করিয়াছেন।'

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং দালানরীতিতে তৈরি। মন্দিরটির নির্মাণশৈলী অপূর্ব। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই প্রথমে সদর, সদরের উপর নহবৎখানা। এরই উপরের অংশ হচ্ছে জগমোহন। ঢুকেই সামনে কোকিল ঘর রয়েছে। আগে এই ঘরে

অনেক কোকিল থাকত। সদরে ঢুকে পাশে আর একটি প্রবেশপথ রয়েছে। বিশাল মন্দির চত্বরের চারদিকে চকমেলান দালান। বামদিকের ঘরগুলিতে পূজারি ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত লোকেদের বাসস্থান। ডানদিকের ঘরগুলি দ্বিতল। দ্বিতল ঘরের জানালাগুলি কাঠের তৈরি বিশেষ ধরনের জাল দিয়ে ঢাকা। বামদিকের ভেতরে ভোগ ঘর এবং তৎ সংলগ্ন প্রতিষ্ঠিত পাকা ইঁদারা। মন্দির চত্বরের দক্ষিণে নাটমঞ্চ এবং শ্বেতপাথরে বাঁধানো চাতাল। নাটমন্দির সংলগ্ন মূল মন্দির বা গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের সামনে সুন্দর জলের ফোয়ারা। অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বর শিব সংলগ্ন আছে অতিথিশালা, রাসমঞ্চ, গোলাবাড়ি প্রভৃতি। ৺রাধাবল্লভজিউ মন্দির সংলগ্ন অন্নপূর্ণ ও রাজরাজেশ্বর শিব মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরটিও ৺রাধাবল্লভজিউ মন্দির ধাঁচের তৈরি।

মন্দিরের পরিমাপ :

পুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে, সুরক্ষার কারণে কোনরকম পরিমাপ পাওয়া সম্ভব হয়নি।

বিগ্রহ :

রাধাবল্লভজিউ মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে মূল বিগ্রহ হিসেবে পূজিত হন বংশীবদন ও রাধিকা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান কৃষ্ণমূর্তির বামপাশেই শুভ্র রাধিকামূর্তি দণ্ডায়মান রয়েছে চাঁদির সিংহাসনে। বংশীবদনের দেহ সম্পূর্ণ রাজবেশে আবৃত। উন্মুক্ত কেশযুক্ত শিরে মুকুট এবং ললাটে তিলক আঁকা রয়েছে। ইনি দুহস্তে বাঁশি ধরে রয়েছেন। রাধিকার পরনেও রয়েছে রাজবেশ। উন্মুক্ত কেশযুক্ত শিরে মুকুট এবং ওড়না রয়েছে। রাধিকার কণ্ঠে হার, কানে কুন্ডল এবং ললাটে টিকা, আর দু'হস্তে চুরি রয়েছে।

রাধাকৃষ্ণের বামপাশে রয়েছেন পঞ্চদশ এবং দক্ষিণদিকে রয়েছেন একজন গোপিনি অর্থাৎ ষোড়শ গোপিনি সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে পরিবেষ্টন করে আছে রাধাকৃষ্ণকে। এছাড়া রয়েছেন দণ্ডায়মান বলরাম ও তাঁর বামপাশে রয়েছেন রেবতী। এঁদের দুপাশে চারজন সুসজ্জিত পোশাকে সজ্জিত সখী। বলরাম ও রেবতী মূর্তি দুটি সুসজ্জিত সুন্দর পোশাকে সজ্জিত এবং উন্মুক্ত কেশযুক্ত শিরে রয়েছে মুকুট। আরও আছে তিনটি শালগ্রাম শিলা তিনটি ছোট ছোট রূপোর সিংহাসনে মাথায় ছত্র শোভিত এবং একটি গরুড় মূর্তি। এছাড়া আরও কয়েকজন দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে গর্ভগৃহে। রাধাবল্লভ জিউ মন্দির সংলগ্ন অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির রয়েছে। মূল মন্দিরের তিনটি প্রকোষ্ঠের মধ্যের প্রকোষ্ঠে শ্বেতপাথরের রাজরাজেশ্বর শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের উপরে রূপোর অর্ধচন্দ্রশোভিত। রাজরাজেশ্বর শিবের ডানদিকের প্রকোষ্ঠে আছেন একখানি খোদিত একচালে শ্রীশ্রীদুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, পদতলে সিংহ, অসুর প্রভৃতি মূর্তি, বামদিকের প্রকোষ্ঠে বিরাজিতা আছেন স্বয়ং সর্বশুভ বিধাত্রী অন্নদাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা। এই দেবীমূর্তির দক্ষিণে মহাদেব এবং বামে ভৈরব।

মন্দিরের প্রবেশ পথের বামদিকে, রাজরাজেশ্বর শিবের ঠিক বিপরীত দিকে একটি ছোট উত্তরমুখী মন্দির আছে। এই মন্দিরের মধ্যে আছেন করজোড়ে পদ্মাসনে উপবিষ্টা ধ্যানমগ্না যোগমায়া দেবীমূর্তি। দক্ষিণমুখী রাজরাজেশ্বর ও বিপরীতে এক সরলরেখায় অবস্থিত আছেন যোগমায়া মূর্তি। এইসব দেবদেবীর নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

মন্দিরে সেবিত মূল বিগ্রহ বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ হলেন কষ্টি পাথরের এবং রাধিকা মূর্তিটি শ্বেতপাথরে নির্মিত। ষোড়শ গোপিনি এবং চারজন সখী অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত। বলরাম ও রেবতী মূর্তি দুটি শ্বেতপাথরের। শ্রীদুর্গা মূর্তি এবং অন্নপূর্ণা মূর্তি শ্বেতপাথরের উপর খোদাই করে নির্মিত।

কোন দেবদেবীর পরিমাপ নেওয়া সম্ভব হয়নি নিষেধাজ্ঞার কারণে।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে বর্ধমান রাজপরিবার।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার সকাল ৮টায় উন্মুক্ত হয়। নিত্যসেবার পর দুপুর ১২টার মধ্যে মূল বিগ্রহের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বিকেল ৬টার সময় দ্বার উন্মুক্ত হয়ে রাত্রি ৮টায় শীতল হওয়ার পর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। মহতাবচাঁদ রিলিজয়াস ট্রাস্ট বোর্ড থেকে মন্দিরের আয় ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – পুরোহিত নিখিলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই মন্দিরে জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, রথযাত্রা, দোল উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বিশেষ পূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে কোন উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠানে বাবদ কোন আয়ব্যয় হয় না।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য দুপুর ১২টার সময় অন্নভোগ হয়। বাল্য ভোগ হয়। সন্ধ্যাবেলায় লুচি, মিষ্টি, ফল দিয়ে ভোগ হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – বর্তমানে মন্দিরে তিনজন পুরোহিত রয়েছেন।মহতাবচাঁদ রিলিজয়াস ট্রাস্ট বোর্ড থেকে পুরোহিতের বেতন দেওয়া হয়। পুরোহিত নিখিলেশ্বর মহাশয় জানিয়েছেন, বংশ পরম্পরায় তাঁরা মন্দিরের নিত্যসেবা করে আসছেন।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – উৎসব অনুষ্ঠানে ভক্তদের ভিড় জমে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরের বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] সরকার নীরদবরণ, বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত; কলকাতা; কল্যাণ বুক এজেন্সি; ২৪শে আগস্ট ২০০৮।

[২] মন্দিরের পুরোহিত।

[৩] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১২] বর্ধমান শহরের ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

৺লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরটি রাজবাড়ির মধ্যেই অবস্থিত। এই মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন রাজা ত্রিলোকচাঁদ। কিন্তু মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। পরবর্তী কাজ শুরু করেন তাঁর পুত্র মহারাজ তেজচাঁদ। কিন্তু মন্দির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তিনিও ইহলোক ত্যাগ করেন। তবে শেষ করতে না পারলেও সিংহভাগ কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। মন্দিরটির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল পরবর্তী রাজা মহতাবচাঁদের সময়ে। অর্থাৎ ১৮৩২খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে মন্দির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দিরটি দালানরীতির তৈরি। গর্ভগৃহের সংলগ্ন রয়েছে জগমোহন ও বৃহৎ নাটমন্দির। গর্ভগৃহের প্রবেশের পথ একটি।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

গর্ভগৃহের দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৭′ গর্ভগৃহের দ্বারের প্রস্থ- ৫′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে মূল বিগ্রহ হিসেবে পূজিত হন ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ। লক্ষ্মীকে বামে নিয়ে উপবিষ্ট নারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যতীত এই আসনে রয়েছেন বেণুকর শ্রীকৃষ্ণ, বালগোপাল, কৃষ্ণের সখীগণ, হনুমান, বরাহ এবং নারায়ণ শিলা।

নারায়ণের পরনে সুসজ্জিত ধুতি এবং গলায় উত্তরীয় রয়েছে। দক্ষিণহস্তে তির এবং বামহস্তে ধনুক রয়েছে। লক্ষ্মীর পরনে কাপড় এবং মাথায় ঘোমটা রয়েছে। এছাড়া বংশীধারীর পরনেও রয়েছে রেশমের ধুতি ও উত্তরীয়। মাথায় মুকুট রয়েছে। সখীদের পরনেও ঘোমটা সহকারে কাপড় রয়েছে। হনুমান, বরাহের পরনেও রয়েছে ধুতি ও উত্তরীয়। বালগোপাল সম্মুখে দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে উপবিষ্ট এবং এঁর পরনেও রয়েছে সুসজ্জিত পোশাক। এছাড়া এই মন্দিরে বর্ধমান মহারাজার কুলদেবী চণ্ডী'ও পূজিতা হন।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

এই মন্দিরে সেবিত নারায়ণ শিলা ব্যতীত লক্ষ্মী- নারায়ণ এবং অন্যান্য মূর্তিগুলি দারুমূর্তি।

উপবিষ্ট নারায়ণের উচ্চতা- ২'　　　　উপবিষ্ট লক্ষ্মীর উচ্চতা- ১$\frac{১}{২}$'

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে বর্ধমান রাজপরিবার।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার সকাল ৮টায় উন্মুক্ত হয়। নিত্যসেবার পর দুপুর ১টার মধ্যে মূল বিগ্রহের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বিকেল ৪টের সময় দ্বার উন্মুক্ত হয়ে সন্ধ্যারতীর পর রাত্রি ৮টায় দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। মহতাবচাঁদ রিলিজয়াস ট্রাস্ট বোর্ড থেকে মন্দিরের আয়ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – পুরোহিত শিবপ্রসাদ চোংদার কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই মন্দিরে ঝুলন উৎসব খুব বড়ো করে পালিত হয়। এছাড়া জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, রথযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বিশেষ পূজা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপূজার সময় মা চণ্ডী'র গরবা, ডান্ডিয়া নাচ হয় নবমীর দিন। গুজরাটি সম্প্রদায়ের ভক্তগণ এই পূজা উপলক্ষ্যে উৎসব করে থাকে।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরে অনুষ্ঠিত উৎসব অনুষ্ঠানে মহতাবচাঁদ রিলিজয়াস ট্রাস্ট বোর্ড ব্যয়ভার বহন করে। দুর্গাপূজা উৎসবের খরচ স্থানীয় গুজরাটি সম্প্রদায়ের ভক্তগণ বহন করে থাকেন।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য দুপুর ১২টার সময় গোবিন্দভোগ চালের অন্নভোগ, সঙ্গে তিন- চাররকম ভাজা ও চাটনি দেওয়া হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – মহতাবচাঁদ রিলিজয়াস ট্রাস্ট বোর্ড থেকে পুরোহিতের বেতন দেওয়া হয়। পুরোহিত মহাশয় জানিয়েছেন, বংশ পরম্পরায় তাঁরা মন্দিরের নিত্যসেবা করে আসছেন।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – মন্দিরে নিত্য ভক্ত সমাগম খুব বেশি হয় না। তবে উৎসব অনুষ্ঠানে ভক্তদের ভিড় জমে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরের বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১]　সরকার নীরদবরণ, বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত; কলকাতা; কল্যাণ বুক এজেন্সি; ২৪শে আগস্ট ২০০৮।

[২]　মন্দিরের পুরোহিত।

[৩]　পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১৩] দেবীপুর গ্রামের শ্রীশ্রী ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

মন্দিরটির গাত্রে খোদিত রয়েছে মন্দিরটির নাম- 'শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন ঠাকুর জীউর শ্রীশ্রী মন্দির'। পুরোহিত সুকুমার সিদ্ধান্ত কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রী৺চন্ডীলাল সিংহ। মন্দিরটিতে প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে পুরোহিত মহাশয়ের তথ্য অনুযায়ী ১৮৪৪খ্রিঃ মন্দিরটি নির্মাণ হয়েছিল। এই সিংহ বংশ জাতে তাম্বুলী, এবং পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি 'আটচালা' রীতিতে তৈরি করা হয়েছে। পুরোহিতের বক্তব্য, যে মন্দিরটি গঙ্গামাটি ও জল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। মন্দির শীর্ষে তিনটি দন্ডের মধ্যে চক্র করা রয়েছে। এগুলি বজ্রপাত থেকে মন্দিরকে রক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণমুখী মন্দিরটিতে গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বার একটি। মন্দিরটিতে খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা ও পাঁচটি দ্বার রয়েছে। দ্বারগুলিতে লোহার দরজা লাগানো রয়েছে।

পূর্বে মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির এবং মন্দির চত্বরে ছোট ছোট ঘর ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। নাটমন্দিরের কিছুই অবশেষ নেই ভিত্তিটুকু ছাড়া অন্যান্য ঘরগুলির ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তনের দৈর্ঘ্য- ৫.২′ দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৭.৪′ দ্বারের প্রস্থ- ২.৭′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে লক্ষ্মীজনার্দ্দন পূজিত হন। এছাড়া বামপার্শ্বে মঙ্গলচন্ডীর শিলা রাখা রয়েছে এবং গরুড় পাখি রয়েছে মূল বিগ্রহের পশ্চাতে, হাতদুটি জোড়া করে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ (আনুমানিক) :

এই মন্দিরে শালগ্রাম শিলারূপী লক্ষ্মীজনার্দ্দন জীউ পূজিত হন।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – বর্তমানে মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূজার্চনার যাবতীয় দায়িত্ব লক্ষ্মীজনার্দ্দন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের উপর রয়েছে। সেই বোর্ডই বর্তমানে মন্দিরের মালিক। ট্রাস্টি বোর্ড সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, সেটি গোপনীয়।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার সকাল ১০টায় উন্মুক্ত হয়। নিত্যসেবার পর বেলা ১১টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় সন্ধ্যে ৬টার সময় গর্ভগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে সন্ধ্যারতীর পর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের কোন ব্যক্তিগত বা দেবত্তোর সম্পত্তি বলে কিছু নেই, তাই কোন আয়ও নেই। মন্দিরের যাবতীয় ব্যয়ভার ট্রাস্টি বোর্ড বহন করে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে বর্তমানে কোন পূজাই জাঁকজমক করে হয় না। দোল উৎসব হতো পূর্বে, এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে। সরস্বতী পূজা হয়। ঠাকুরের পালকি আছে। অতীতে ঠাকুরকে পালকি করে ঘোরানো হতো।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে কোন রকম উৎসব অনুষ্ঠান পালন হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরে কোন উৎসব ও অনুষ্ঠান বাবদ কোন অর্থ আয়ব্যয় হয় না।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য নারায়ণ'কে আতপচাল, ফল, বাতাসা দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। আর মঙ্গলচন্ডী'কে সেদ্ধচাল, বাতাসা ভোগ দেওয়া হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – বর্তমানে পুরোহিত সুকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয় মন্দিরে পৌরোহিত্য করছেন। এনার পূর্বপুরুষও এই মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। পুরোহিতের বেতন ট্রাস্টিবোর্ড থেকে নির্দিষ্ট করা হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – মন্দিরটিতে স্থানীয় কিছু জনসাধারণ ব্যতীত, সেই অর্থে কোন ভক্ত সমাগম হয় না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিগ্রহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরের বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরটি টেরাকোটা কারুকার্যে সমৃদ্ধ একটি মন্দির। মন্দিরটির তিনটি স্তম্ভ, খিলান ভাস্কর্য মণ্ডিত। মন্দিরের কার্ণিশ পর্যন্ত অনুভূমিক সারিতে টেরাকোটার কারুকার্য করা রয়েছে। এই মন্দিরের উল্লেখযোগ্য টেরাকোটার ফলকগুলি হলো- ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট দেশি সৈনিক; বর্শা নিয়ে হাতির পিঠে উপবিষ্ট সৈনিক, ঘোড়ার পিঠে গমনরত ইংরেজ সৈনিক; নৃত্যরত নবাবি পোশাক পরিহিতা নারী; দুইহস্তে তবলা বাদনরত নবাবি পুরুষ; শিবলিঙ্গ পূজারত হিন্দু পুরুষ; হস্তে গড়গড়া নিয়ে দণ্ডায়মান নবাবি নারী; বারাঙ্গনা; যশোদার বানানো ননির হাড়ি থেকে শ্রীকৃষ্ণের ননি চুরি; গোচারণরত কৃষ্ণ প্রভৃতি। মন্দিরের বহিঃদ্বারের বামপার্শ্ব থেকে প্রথম স্তম্ভের উপর উল্লম্বভাবে ভাস্কর্যের ফলকগুলি সজ্জিত রয়েছে। তারপর ফলকগুলি অনুভূমিক ভাবে বিস্তৃত হয়ে চতুর্থ স্তম্ভের উপর উল্লম্বভাবে উর্দ্ধে উঠে যাওয়া ভাস্কর্যের ফলকের সারির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভের শীর্ষেও উল্লম্বসারির ভাস্কর্যের ফলক অনুভূমিক সারিতে এসে মিলিত হয়েছে। উল্লম্ব সারিতে সজ্জিত ভাস্কর্যের সারিগুলির মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যগুলি হল- হস্তে কমণ্ডলু নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষ; ঢোল বাদনরত হিন্দু পুরুষ; ঘাগরা ও চোলী পরিহিত দণ্ডায়মান নবাবি রমণী; স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান কৃষ্ণ; বামহস্তে পানপাত্র নিয়ে দণ্ডায়মান নবাবি রমণী; বাম কাঁখে কলসী নিয়ে দণ্ডায়মান হিন্দু রমণী; বিকলাঙ্গ পুরুষ; শিঙা বাজনরত নবাবি পুরুষ; নগ্ন মাতৃমূর্তি প্রভৃতি।

এই মন্দিরে বিভিন্ন রকমের ফুলকারি নকশা, কল্কার বিভিন্ন নকশা লক্ষ করা যায়। মন্দিরটি সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ক্রমশ ভাস্কর্যগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলকের গাত্রে শ্যাওলা ধরে ফলকগুলিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। মন্দির কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের পুরোহিত।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১৪] কুলীনগ্রামের মদনগোপাল মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া দুষ্কর। মন্দিরের সেবাইত পাঁচুগোপাল অধিকারীর মাধ্যমে জানা যায় যে, মন্দিরটি চৈতন্য পূর্ববর্তী সময়ে তৈরি হয়েছিল। মন্দিরটির প্রধান প্রবেশপথের উপর উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়- পুনঃ সংস্কারকারক

শ্রীরামানন্দ বসু
দাস পুত্র সত্যখান
শ্রীরাম বসু

মন্দিরটির প্রাচীনতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ জাগে না। কারণ, রামানন্দ বসু দ্বারা 'পুনঃ সংস্কার কারক' কথাতেই তা প্রমাণিত। বসুবংশই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলে ধরে নিতে হবে। এই বসুবংশ জাতিতে কায়স্থ, পেশায় বৃত্তিজীবী এবং ভূস্বামী ছিলেন।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

কুলীনগ্রামের রাজাধিরাজ হলেন মদনগোপাল, এই কথা লোকমুখে প্রচলিত। মদনগোপাল মন্দিরটি বৃহৎ জগমোহন ও নাটমন্দির সহ, ওড়িশা স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত মন্দিরটি পূর্বমুখী। মন্দিরে গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য একটিমাত্র প্রবেশদ্বার রয়েছে। মন্দির সংলগ্ন রয়েছে গোপালদিঘি।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মূল মন্দিরের তলপত্তনের দৈর্ঘ্য- ১.৭′ মূল মন্দিরের আয়তন- ১৭′ × ৩০′

গর্ভগৃহের দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৬′ গর্ভগৃহের দ্বারের প্রস্থ- ২.৭′

বিগ্রহ :

মদনগোপাল মন্দিরে মূলবিগ্রহ হল শ্রীমদনগোপাল। মদনগোপালের বামে শ্রীমতি রাধিকা ও দক্ষিণে শ্রীমতি ললিতার মূর্তি সুসজ্জিত। মদনগোপাল বিগ্রহ প্রথমে একা ছিলেন, পরবর্তীকালে শ্রীমতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এছাড়া রয়েছেন, নাড়ুগোপাল, দেবী চন্ডী, দেবী জগদ্ধাত্রী ও আটটি শালগ্রাম শিলা। এগুলির মধ্যে একটির নাম শ্রীধর, ইনি সত্যরাজ খানের পূর্ববর্তী সময়ের; অন্য একটি শিলা মহাপ্রভুর সময়ে ওই স্থানের জনৈক কৃষ্ণদেব আচার্য দ্বারা সেবিত। মদনগোপাল বিগ্রহটির পরনে ধুতি, গলায় মালা, মাথায় মুকুট রয়েছে। মুখমণ্ডল চন্দন দ্বারা শোভিত। আর দুপাশে রাধিকা ও ললিতার পরনে ঘাগরা ও ওড়না রয়েছে। গলায় মালা ও মাথায় মুকুট রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

এই মন্দিরে পূজিত মদনগোপাল মূর্তিটি কষ্টি পাথরের তৈরি। তবে বিগ্রহের সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায়নি। বিগ্রহের আনুমানিক পরিমাপ হল- মদনগোপালের উচ্চতা- ২′ রাধিকা ও ললিতার উচ্চতা- ১$\frac{১}{২}$′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – সেবাইত পাঁচুগোপাল অধিকারীর দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বর্তমানে মন্দিরটি বারোয়ারি। ছ'জন সেবাইতের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের সমস্ত কাজকর্ম হয়।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার সকাল ৮টায় উন্মুক্ত হয়। নিত্যসেবার পর দুপুর ১টার মধ্যে মূল বিগ্রহের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বিকেল ৪টের সময় গর্ভগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে সন্ধ্যারতীর পর রাত্রি ৮টায় দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের ব্যক্তিগত দেবত্তোর সম্পত্তি এবং দিঘি রয়েছে। সেই সম্পত্তি থেকে আয় হয় ও সেই অর্থ থেকেই মন্দিরের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, কালীয়দমন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে ১লা মাঘ মন্দিরের সামনে অবস্থিত গোপালদিঘির পাড়ে উত্তরায়ণের মেলা বসে। পৌষ পূর্ণিমা থেকে মাঘী পূর্ণিমা পর্যন্ত উৎসব- অনুষ্ঠান ও মেলা হয়। ভাদ্রমাসের রাধাষ্টমীর পরের দশমী তিথিতে কৃষ্ণের কালীয়দমন ঘটনার অনুকরণ যোগ্য লীলা প্রদর্শিত হয়।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব ও অনুষ্ঠানে আগত ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারা আয় হয়। এছাড়া সেবাইতগণ দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে আগত অর্থ থেকেই মন্দিরের উৎসব ও অনুষ্ঠানের কার্য সম্পন্ন করে থাকেন।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য অন্নভোগ হয়। এছাড়া সকাল ও সন্ধ্যেতে ফল ও মিষ্টান্ন সহযোগে পূজা সম্পন্ন হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরে পুরোহিতদের কোন রকম বেতন দেওয়ার প্রথা নেই। পুরোহিতগণ বংশ পরপম্পরায় পূজা করে আসছেন। সেবাইত পাঁচুগোপাল অধিকারী জানালেন যে, এই মন্দিরে ছ'জন সেবাইত রয়েছেন, প্রত্যেকের একবছর করে পালা বা দায়িত্ব পড়ে।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – উত্তরায়ণের মেলায় সময় এবং রাধাষ্টমীর পরের দশমী তিথিতে কালীয়দমন লীলা দেখার জন্য প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। এছাড়া নিত্য অনেক দূরদূরান্ত থেকে ভক্তগণ মদনগোপাল বিগ্রহ দর্শন করতে আসেন।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা –এই মন্দিরে বিগ্রহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা –এই মন্দিরের বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] বন্দ্যোপাধ্যায় পুলক কুমার সম্পাদিত, বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম; কলকাতা; পারুল প্রকাশনী প্রা.লি.; ২০১২।

[২] মন্দিরের সেবাইত।

[৩] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

॥ বর্ধমান জেলার শৈব মন্দির ॥

[১] কাঁকসার, আড়রা গ্রামের রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কাঁকসার আড়রা গ্রামের এই রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির কতো বছরের পুরানো, তার নির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মন্দিরের সেবাইত শ্রী নন্দদুলাল চক্রবর্তী মহাশয় কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, মন্দিরটি রাজা বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য নেই। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রোথিত বোর্ড থেকে জানা যায়, মন্দিরটি দ্বাদশ শতকে তৈরি। মন্দিরটির খ্যাতি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিশাল আকৃতির শিবলিঙ্গের জন্য।

কিছু মানুষ মনে করেন, গ্রীক সেনাপতিদের বিরুদ্ধে গঙ্গারাঢ়ি বা গঙ্গারিডিদের বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধ জয়ের স্মারক রূপে এটি নির্মিত হয়।গ্রীকেরা রাঢ় অঞ্চলে বিজিত হয়েই পরিত্যাগ করেছিলেন। গ্রীকশক্তিকে প্রতিহত ও রাঢ় অঞ্চল পরিত্যাগ করার কথা মেগাস্থিনিস তাঁর ‘ইন্ডিকা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মহাকবি ভার্জিল তাঁর জর্জিক গ্রন্থে গঙ্গারিডিদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই গগনস্পর্শী রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির, বস্তুত গঙ্গারিডিদের ক্ষাত্রবীর্যের প্রামাণ্য স্মারক।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

দেউল আকৃতির এই মন্দিরটি, মাকড়া পাথর ও বেলে পাথর দ্বারা নির্মিত এবং চুনের পলেস্তারায় আবৃত। এটি রাঢ়ের ঐতিহ্য।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তনের উচ্চতা- ২.৩′ মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৮′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ৩.৬′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে একটি কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পূজিত হয়। শোনাযায়, এই শিবলিঙ্গটি মন্দিরের থেকেও পুরানো।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত। বিগ্রহটি স্পর্শ না করতে পারায়, সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় নি। তবে বিগ্রহটি আকারে বিরাট।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরটি বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ, কলকাতা মন্ডলের তত্ত্বাবধানে অধিগৃহীত।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার সকাল ১০টায় উন্মুক্ত হয় এবং দ্বার রুদ্ধ হয় নিত্যসেবার পর বেলা ১২টা নাগাদ।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় –মন্দিরের কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নেই। সেবাইত শ্রী নন্দদুলাল চক্রবর্তী ও তাঁর ভাই শ্রী সুধীর কুমার চক্রবর্তী মন্দিরের পূজার যাবতীয় খরচ বহন করে থাকেন।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – মন্দিরে শিব সংক্রান্ত যাবতীয় তিথিই সাড়ম্বরে পালিত হয়। যেমন, শিবরাত্রি, নীলপূজা ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য হল, বল্লালসেনের আমল থেকেই, এই মন্দিরে মাঘ মাসে, আরোগ্য সপ্তমী (মাকড়ী সপ্তমী) তিথিতে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – মন্দিরকে কেন্দ্র করে মাঘ মাসে মাকড়ী সপ্তমী তিথিতে বড় মেলা বসে। গাজনের সময়েও বড় মেলা বসে, হোমযজ্ঞ করে পূজা হয়।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান বাবদ ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারা আয় হয়। তবে মন্দিরের নিত্যসেবা ও বিশেষ পূজার খরচ সাধারণ ভাবে উপরোক্ত সেবাইতগণ করে থাকেন।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য ফল, মিষ্টান্ন, ঘি, দুধ সহযোগে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে উপরোক্ত দুই সেবাইত ভাই সেবা করে থাকেন। ১৫দিন করে নিজেদের মধ্যে পালা ভাগ করে নিয়ে, এনারা পূজা পরিচালনা করেন। বংশ পরম্পরায় এই চক্রবর্তীরাই এই মন্দিরের সেবা করে আসছেন।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – এই মন্দিরে মাঘ মাসে মাকড়ী সপ্তমী ও গাজনের সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিগ্রহ স্পর্শ করা ভিন্ন কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরে কোন ভাস্কর্যের অলংকরণ নেই। তবুও মন্দিরের গঠনের জন্য মন্দিরটি খুবই দৃষ্টি নন্দন।

তথ্যঋণ :

[১] ভট্টাচার্য মালিনী, বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সম্পাদনা, জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গন্থ বর্ধমান; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০২।

[২] মন্দিরের পুরোহিত।

[৩] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[২] কাইগ্রামের ভোলানাথ মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট অবস্থিত ভোলানাথ মন্দিরটি গ্রামের বোস পরিবারের পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। গ্রামবাসীদের মতানুযায়ী, মন্দিরটি প্রায় ৫০০বছরের পুরনো। তবে সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি উত্তরমুখী, আটচালা রীতির এবং মুখ্যদ্বার একটি। মন্দিরে কাঠের দরজা রয়েছে। মন্দিরের শীর্ষে একটি দণ্ড বিদ্যমান।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৪′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ১′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পূজিত হন।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত। দ্বার রুদ্ধ থাকায় বিগ্রহ দর্শন করা যায়নি, তাই পরিমাপ সম্পর্কিত কোন তথ্য গৃহীত হয় নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দির সংলগ্ন 'ইয়ং স্টার ক্লাব'এর সদস্য কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মন্দিরটি বংশ পরম্পরায় বোস পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – ভগ্নপ্রায় এই মন্দিরটিতে দিনে একবার মাত্র জল, ফুল দিয়ে সকাল ১০টা নাগাদ পূজা হয়ে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতি হয়না।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরগুলির কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নেই, তাই আয়- ব্যয় বলে কিছু হয়না।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রি ও নীলপূজা তিথি বিশেষভাবে পালিত হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠান বলে কিছু হয়না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান বাবদ আয়- ব্যয় বলে কিছুই নেই।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে কোনপ্রকার ভোগ হয়না। শুধুমাত্র ফুল, জল দিয়ে নিত্য পূজা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পূজা জন্য বর্তমানে ঘেঁটু চক্রবর্তী পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। বোস পরিবারের থেকে বেতনের ব্যবস্থা করা হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – শিবরাত্রি ও নীলপূজার দিন ব্যতীত, তেমন কোন ভক্ত সমাগম হয়না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরের কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরটির সম্মুখ অংশে পোড়ামাটির কারুকার্য করা রয়েছে। এই কারুকার্য মন্দিরটির কার্নিশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও ফুলকারি নকশা এবং মন্দিরের দ্বারের দুপাশে ও উর্ধ্বাংশে একটিমাত্র ফিগারেটিভ প্যানেল রয়েছে। প্যানেলটি একটি করে ফলক দিয়ে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের অধিকাংশ ভাস্কর্য ধংস হয়ে গেছে। বিশেষ করে দ্বারের দুপাশের ভাস্কর্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

তবুও যেটুকু ভাস্কর্য রয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মৎস্যকন্যা; মাথায় টুপি পরিহিত বিদেশি পুরুষ; চতুর্ভুজ দেবতা; অশ্বারোহী; ধনুর্ধারী; নৃত্যরত পুরুষ; দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বরাহ; স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান পুরুষ; আসনে উপবিষ্ট দেবচরিত্র; প্রভৃতি।

এছাড়া দ্বারের উর্ধ্বাংশে আটচালা দেবালয়ের মধ্যে শিবলিঙ্গ, এই ধরনের ভাস্কর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফুলকারি নকশা করা অনেকগুলি ফলক রয়েছে, এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কল্কার কাজ করা অনেকগুলি প্যানেল রয়েছে। তবে যাই হোক, এই মন্দিরের ভাস্কর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, কারণ শিল্পীর নৈপুণ্যতা কারুকার্যগুলির মধ্যে তেমন ভাবে প্রকাশ পায়নি।

তথ্যঋণ :

[১] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং অন্যান্য তথ্য স্থানীয় বাসিন্দা কর্তৃক প্রাপ্ত।

****

[৩] বনকাটি গ্রামের গোপালেশ্বর শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

গোপালেশ্বর শিবমন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী নীলমণি রায়ের পূর্বপুরুষ। পূর্বোক্ত বনকাটি গ্রামের রায় পরিবারের প্রবীণ সদস্য শ্রী অনিল কুমার রায় সম্পর্কে নীলমণি রায়ের কাকা হন। নীলমণি রায়ের মতে গোপালেশ্বর মন্দিরটি আনুমানিক ২৫০-৩০০ বছরের পুরানো। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলক থেকে জানা যায়, মন্দিরটি **১২৩৯**শকাব্দে **(১৩৭১ খ্রিঃ)**) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

দক্ষিণমুখী এই পঞ্চরত্ন শিবমন্দিরটির গর্ভগৃহে প্রবেশের পথ একটি।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তনের উচ্চতা-৩.৪′ মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই মন্দিরে গোপাল এবং শিব একই সঙ্গে পূজিত হয়ে থাকেন।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ প্রস্তর নির্মিত। দ্বার রুদ্ধ থাকায় মন্দিরের বিগ্রহের পরিমাপ পাওয়া যায় নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – এই মন্দিরটি নীলমণি রায়ের মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার সকাল ৯টায় উন্মুক্ত হয়ে নিত্যসেবা হয়ে থাকে। পুনরায় বিকেল ৪টের সময় দ্বার উন্মুক্ত হয়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হয়ে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। সেই সম্পত্তির আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ মন্দিরের পূজা বাবদ ব্যয় করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রি তিথিতে বিশেষ পূজা হয়। তবে মন্দিরে গোপাল প্রতিষ্ঠিত থাকায়, বড় উৎসব হিসেবে রথ হয়। জৈষ্ঠ্য মাসে চব্বিশ প্রহর কীর্তন হয়, যেকোন একটি দিনে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দির কে কেন্দ্র করে রথের দিন মেলা বসে।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব ও অনুষ্ঠানের এবং বিশেষ পূজার খরচ দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকেই বহন করা হয়। যেটুকু বাকি থাকে তা এই রায় পরিবারের সদস্যরাই বহন করে থাকেন।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য ফল, মিষ্টান্ন, আতপচাল, গুড়, কলা সহযোগে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। কোন বলিদান হয় না।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে এই পরিবারের সদস্য শ্রী অনিল কুমার রায় মহাশয় পূজা করে থাকেন। আলাদা করে কোন পুরোহিত মোতায়েন করা হয় নি। তাই কোন বেতনের বিষয় নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম –এই মন্দিরে শিবরাত্রির সময় ভক্ত সমাগম হয়। এছাড়া রথের মেলায় প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

মন্দিরটিতে সুন্দর টেরাকোটার ভাস্কর্যের কারুকার্য রয়েছে। কার্নিশের নিম্নভাগ পর্যন্ত কারুকার্য করা রয়েছে। কিছু উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যের বিবরণ দেওয়া হল- সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা ও রানি, তাঁদের দু'পাশে সেবা দাসী; রথ; ঢাল ও তরোয়ালধারী সৈনিক; চতুর্ভুজ দেবতা; স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ; দণ্ডায়মান নারী; ময়ূরের পিঠে উপবিষ্ট কার্তিক; নৌকাযাত্রা; ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ; কৌপীন পরিহিত সন্ন্যাসী; চতুর্ভুজ কালিকা, খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান; দুটি হাতির শিরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট দেবতা; দণ্ডায়মান গাভী; মাতা ছিন্নমস্তা; বন্দুকধারী সৈন্যগণ সার বেঁধে দণ্ডায়মান; ঘোড়া; টিয়াপাখি; ড্রাগন; প্রভৃতি। তবে অনেক ভাস্কর্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে।

তথ্যঋণ :

[১] রায় পরিবারের সদস্যগণ।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৪] সিঙ্গারকোণ গ্রামের শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

সিঙ্গারকোণ গ্রামের সর্বত্র অতি পরিচিত শ্রীশ্রী ৺রাধাকান্ত জীউ'র মন্দিরে প্রবেশ করার মুখে পশ্চিমমুখী এই শিব মন্দিরটির অবস্থান লক্ষ করা যায়। ভগ্নপ্রায় এই মন্দিরটির গাত্রের খোদিত ফলক থেকে জানা যায়, ১৬৭৭খ্রিঃ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কিত কোন তথ্য মেলে নি। জনশ্রুতি রয়েছে, মন্দিরটি প্রায় ৫০০বছরের পুরনো।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটি উচ্চবেদীর উপর আটচালা শৈলীতে প্রতিষ্ঠিত। গর্ভগৃহের প্রবেশের দ্বার একটি।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তন - ৩′ মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২.৩′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পূজিত হন।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত।

শিবলিঙ্গটির উচ্চতা- ২′ গৌরীপট্টের দৈর্ঘ্য- ১.৫′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরটি বারোয়ারি। গ্রামের বাসিন্দারাই মন্দিরটির সেবা করেন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরটির পুরোহিত শ্রী স্বদেশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, মন্দিরটির দ্বার সকাল ৯.৩০মিনিট নাগাদ উন্মুক্ত হয়, দুপুরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার সন্ধ্যে বেলা দ্বার উন্মুক্ত করে সন্ধ্যারতির পর দ্বার রুদ্ধ করা হয়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের নিজস্ব কোন সম্পত্তি না থাকায়, আয়- ব্যয় কিছু হয় না।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রি ও নীলপূজা তিথি গ্রামের মানুষের উদ্যোগে পালিত হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠান বলে কিছু হয়না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান বাবদ আয়- ব্যয় বলে কিছুই নেই।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে কোনপ্রকার ভোগ হয়না। শুধুমাত্র ফুল, জল দিয়ে নিত্য পূজা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরটিতে শ্রীশ্রী ৺রাধাকান্ত জীউ’র পুরোহিত শ্রী স্বদেশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিত্যসেবা করেন। তার কোন বেতনের ব্যবস্থা নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – শিবরাত্রি ও নীলপূজার দিন ব্যতীত, তেমন কোন ভক্ত সমাগম হয়না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরের কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই। মন্দিরটির সংস্কারের কোন পরিকল্পনা না নেওয়া হলে, খুব শীঘ্রই পূজা বন্ধ হয়ে গিয়ে মন্দিরটি *‘Dead Temple’* হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে পোড়ামাটির কিছু ভাস্কর্য রয়েছে। মুখ্যদ্বারের দুপাশে এবং কার্নিশের নিম্নভাগ পর্যন্ত টেরাকোটার কারুকার্য করা রয়েছে। তবে মন্দিরটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কোন কারুকার্য নেই। টেরাকোটার ফলকগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফলকের বিবরণ দেওয়া হল- কাসর বাজনরত সন্ন্যাসী; পদ্মাসনে উপবিষ্ট পুরুষ; হাতে ধনুক নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষ এবং সামনে প্রণামরত ভক্ত; দণ্ডায়মান সন্ন্যাসী শিবলিঙ্গে জল ঢালছে; শঙ্খ বাজনরত রমণী; শিঙা বাজনরত উপবিষ্ট পুরুষ; দুটি আলিঙ্গনরত হনুমান; মিথুন দৃশ্য; একজন নারী হাতের কলসি নামিয়ে রাখছে; হাতে পাখি নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষ; দণ্ডায়মান দেবী কালিকা, পদতলে শিব শায়িত, হাতের আয়ুধ গুলি অস্পষ্ট; চতুর্ভুজ দেবতা; দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ, হাতে বাঁশি; কোলে শিশু নিয়ে উপবিষ্ট রমণী; ইত্যাদি।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের পুরোহিত।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৫] পুটশুড়ী গ্রামের জোড়া শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

পুটশুড়ী গ্রামের জোড়া শিবমন্দিরের একটি 'গণ' ও অপরটি 'চৌধুরী' পরিবারের মালিকানাধীন। এই মন্দিরগুলির মধ্যে পশ্চিমদিকের মন্দিরটি 'গণ' পরিবারের পূর্বপুরুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, বংশ পরম্পরায় পূজা হয়ে আসছে। পূর্বদিকের মন্দিরটি চৌধুরী পরিবারের পূর্বপুরুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং বংশ পরম্পরায় পূজা চলে আসছে। মন্দিরগুলির সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়না। জনশ্রুতি আছে, মন্দিরগুলি ৩০০ বছরেরও অধিক পুরনো।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরদুটি দেউল রীতির মন্দির। মন্দিরগুলির কোন তলপত্তন নেই।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

দুটি মন্দিরের পরিমাপই সমান।

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৪′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২.৭′ মন্দিরের আয়তন- ১০′×১০′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরগুলির প্রতিটিতে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পূজিত হন।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

দ্বার রুদ্ধ থাকায় বিগ্রহ দর্শন করা সম্ভব হয়নি। তাই পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরগুলি বংশ পরম্পরায় রায়চৌধুরী পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরগুলিতে নিত্যসেবা হয়ে থাকে। প্রত্যহ সকাল ৯টা নাগাদ মন্দিরের নিত্যসেবা হয়ে দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। দিনে একবারই নিত্যসেবা হয়ে থাকে।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – 'গণ' পরিবারের সদস্য শ্রী অচিন্ত্য গণ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, এই মন্দিরগুলির কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরগুলির কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নেই, তাই আয়ব্যয় বলে কিছু হয়না।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রি ও নীলপূজা তিথি বিশেষভাবে পালিত হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠান বলে কিছু হয়না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – বছরের দুটি বড় পূজায় যা ব্যয় হয়, তা দুটি পরিবার মিলেই বহন করে থাকে। আর দক্ষিণা বাবদ যা আয় হয়, ওই দুই পরিবারই তার অংশীদার হয়।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে কোনপ্রকার ভোগ হয়না। শুধুমাত্র ফুল, ফল দিয়ে নিত্য পূজা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরগুলির প্রায় ২০-২২জন সেবাইত রয়েছে। বর্তমান পুরোহিত শ্রী বিনয় আচার্য মহাশয়। পুরোহিতের বেতন দুই পরিবার মিলে বহন করে।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – শিবরাত্রি ও নীলপূজার দিন ব্যতীত, তেমন কোন ভক্ত সমাগম হয়না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – মন্দিরগুলি প্রায় ৫০বছর আগে একবার সংস্কার করা হয়েছিল। মন্দিরের ভিত থেকে ৪ফুট উঁচু পর্যন্ত সংস্কার করা হয়েছে। বাকী অংশে এখনও কিছি টেরাকোটা ফলক অক্ষত রয়েছে, কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে এই মন্দিরের কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

দুটি শিবমন্দিরেই একই ধরনের ভাস্কর্য রয়েছে। টেরাকোটার ফলক দ্বারা মন্দিরগুলি সজ্জিত ছিল একসময়, কিন্তু এখন বেশিরভাগ ভাস্কর্যই নষ্ট হয়ে গেছে। টেরাকোটার যেসকল ফলকগুলি এখনও অক্ষত রয়েছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- উপবিষ্ট দেবচরিত্র; বামহস্তে হাল ধরে দণ্ডায়মান বলরাম; শিঙা বাজনরত পুরুষ; দুজন পুরুষ

বামহস্ত উর্ধ্বে তুলে দণ্ডায়মান; নৃত্যরত পুরুষ; কেশ বিন্যাসরত রমণী; বামহাতে ঢাল এবং দানহাতে তরোয়াল নিয়ে সৈনিক; বামহস্তে ছিন্ন নরমুণ্ড আর দক্ষিণ হস্তে খড়্গ নিয়ে উপবিষ্ট দেবচরিত্র; চতুর্ভুজ বরাহ দণ্ডায়মান; ইত্যাদি। এবং মন্দিরগুলিতে জাফরির নকশা এবং কিছু ফুলকারি নকশা দেখতে পাওয়া যায়।

তথ্যঋণ :

[১] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং অন্যান্য তথ্য স্থানীয় বাসিন্দা কর্তৃক প্রাপ্ত।

****

[৬] রক্ষিতপুর গ্রামের চট্টরাজ পরিবারের তিনটি শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

চট্টরাজ পরিবারের প্রবীণ সদস্য শ্রী রবিন চট্টরাজ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, শিব মন্দির তিনটি এই পরিবারের পূর্বপুরুষ প্রায় ৩০০বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূর্বপুরুষ থেকে বংশ পরম্পরায় তাঁরাই মন্দিরগুলির সেবা করে আসছেন। মন্দির চত্বরে অবস্থিত জোড়া শিবমন্দিরটি পূর্বমুখী। এবং অপরটি অর্থাৎ তৃতীয় মন্দিরটি মন্দির চত্বরেই অবস্থিত, সেটি দক্ষিণমুখী।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

জোড়া শিবমন্দিরটি দেউল রীতির। আর একটি পৃথক শিব মন্দির চালা রীতির। প্রতিটি মন্দিরেই গর্ভগৃহে প্রবেশের দ্বার একটি। তিনটি মন্দিরেই ৫টি করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

জোড়া শিব মন্দিরের প্রতিটির পরিমাপ সমান। মূল মন্দিরের আয়তন- ৭.৬′ × ৭.৬′

জোড়া মন্দিরের একটির পরিমাপ-		**চালা মন্দিরটির পরিমাপ-**	
তলপত্তনের উচ্চতা-	৩.৩′	তলপত্তনের উচ্চতা-	৩.৬′
মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য-	৪.১০′	মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য-	৪.১০′
মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ-	২′	মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ-	২′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরগুলির প্রতিটির পৃথক নাম রয়েছে। উমেশচন্দ্র, পরেশনাথ ও পঞ্চানন। প্রতিটি মন্দিরেই কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গগুলি প্রস্তর নির্মিত। দ্বার রুদ্ধ থাকায় মন্দিরের বিগ্রহের পরিমাপ পাওয়া যায় নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – চট্টরাজ পরিবারের প্রবীণ সদস্য শ্রী রবিন চট্টরাজ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, এই মন্দিরগুলি চট্টরাজ পরিবারের মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে। বর্তমানে চট্টরাজ পরিবার তিনটি অংশে বিভক্ত, তাই প্রতি পরিবারের বছরে চারমাস করে পালা করে, মন্দিরগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার সকালেই উন্মুক্ত হয়ে থাকে, তবে তার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। বেলা ১টা নাগাদ নিত্যসেবা হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হয়ে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নেই। মন্দিরের যাবতীয় ব্যয়ভার চট্টরাজ পরিবারের সদস্যরাই বহন করে থাকেন।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রি হয়। এছাড়া শিবতলায় গাজন হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে একমাত্র গাজনের উৎসবই হয়। এছাড়া কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে কোন বিশেষ উৎসব পালন করা হয় না, তাই আয়-ব্যয়ের কোন ব্যাপার নেই। শুধুমাত্র গাজনের উৎসবের সময় যা ব্যয় হয়, তা চট্টরাজ পরিবারই বহন করে থাকেন।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য ফল, মিষ্টান্ন, আতপচাল, গুড়, কলা সহযোগে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। কোন বলিদান হয় না।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে যখন যে অংশের পালা পড়ে, তখন সেই অংশের সদস্য পূজা করে থাকেন। আলাদা করে কোন পুরোহিত মোতায়েন করা হয় নি। তাই কোন বেতনের বিষয় নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম –এই মন্দিরে গাজনের সময় ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে স্ত্রীলোকের বিগ্রহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

দেউল মন্দিরগুলিতে কোনরকম টেরাকোটার কারুকার্য করা নেই। খুবই সাধারণ মন্দিরগুলি। তবে মন্দিরগুলি পোড়ামাটির তৈরি। মন্দিরের বহিঃগাত্র পোড়ামাটির নকশা করা।

চালা মন্দিরটিরও একই অবস্থা। তবে অন্য দুটি তুলনায় এই মন্দিরটির স্থায়িত্ব খুবই কম বলে মনে হয়। মন্দিরটির উর্ধ্বাংশ ও দ্বারের অনেকটা অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই মন্দিরের গাত্রে কোন টেরাকোটার ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] চট্টরাজ পরিবারের সদস্যগণ।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৭] রায়দোগাছিয়া গ্রামের রায়চৌধুরী পরিবারের দুজোড়া শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

রায়দোগাছিয়া গ্রামের রায়চৌধুরী পরিবারের চারটি শিবমন্দির একই স্থানে অবস্থিত। এই মন্দিরগুলি রায়চৌধুরী পরিবারের বংশগত মন্দির। এই পরিবারের উত্তর পুরুষ শ্রী প্রণব রায়চৌধুরী মহাশয় দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মন্দিরগুলি তাঁর পূর্বপুরুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায়নি। তাঁর মতানুযায়ী, মন্দিরগুলি প্রায় ৩০০-৩৫০বছরের পুরনো। বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে। চারটি মন্দির দুটি জোড়ায় রয়েছে এবং মন্দিরগুলি প্রতিটি পূর্বমুখী।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

প্রতিটি মন্দির আটচালা এবং উচ্চভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, মুখ্যদ্বার একটি। প্রতিটি মন্দিরে কাঠের দরজা রয়েছে। মন্দিরে তিনটি সিঁড়ির মাধ্যমে উঠতে হয়। প্রতিজোড়া শিবমন্দিরের জন্য পৃথক সিঁড়ি রয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তন - ৩′	মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.২′
মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২′	মন্দিরের আয়তন- ৮.৭′ × ৮.৭′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরগুলির প্রতিটিতে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পূজিত হন।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত। দ্বার রুদ্ধ থাকায় বিগ্রহ দর্শন করা যায়নি, তাই পরিমাপ সম্পর্কিত কোন তথ্য গৃহীত হয় নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরগুলি বংশ পরম্পরায় রায়চৌধুরী পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরগুলিতে নিত্যসেবা হয়ে থাকে। প্রত্যহ সকাল ৯টা নাগাদ মন্দিরের নিত্যসেবা হয় এবং বেলা ১১টা নাগাদ দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যারতির সময় পুনরায় দ্বার খোলা হয়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – অতীতে মন্দিরের নিজস্ব সম্পত্তি থাকলেও, বর্তমানে তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। রায়চৌধুরী পরিবারের অর্থানুকুল্যেই মন্দিরের ব্যয়ভার হয়ে থাকে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রি ও নীলপূজা তিথি বিশেষভাবে পালিত হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠান বলে কিছু হয়না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান বাবদ আয়- ব্যয় বলে কিছুই নেই। বিশেষ তিথিগুলিতে স্থানীয় কিছু ভক্তের দক্ষিণা দ্বারা সামান্যই আয় হয়। মন্দিরের যাবতীয় খরচ রায়চৌধুরী পরিবারই বহন করে।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে কোনপ্রকার ভোগ হয়না। শুধুমাত্র ফুল, ফল দিয়ে নিত্য পূজা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরগুলির জন্য রায়চৌধুরী পরিবার থেকে নিয়োজিত দুজন সেবাইত রয়েছেন। পরমানন্দ ভট্টাচার্য এবং তাঁর পুত্র। বেতনের ব্যবস্থা রায়চৌধুরী পরিবারের থেকেই করা হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – শিবরাত্রি ও নীলপূজার দিন ব্যতীত, তেমন কোন ভক্ত সমাগম হয়না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরের কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরগুলিতে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের সেবাইত।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৮] বৈদ্যপুর গ্রামের নন্দী জমিদার বংশের শিব মন্দির সমূহ

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

১১২২বঙ্গাব্দে নন্দী জমিদার বংশের সূত্রপাত হয়। সীতারাম নন্দী চৌধুরী এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। 'চৌধুরী' উপাধি বর্ধমান রাজার নিকট হতে প্রাপ্ত। নন্দী জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠিত মোট পাঁচটি শিব মন্দির রয়েছে। প্রতিটি মন্দিরেই নিত্য সেবা হয়ে থাকে। তবে মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাকাল নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় নি। সেবাইতদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য হল, মন্দিরগুলি আনুমানিক ২৫০বছরের পুরনো।

উল্লিখিত পাঁচটি মন্দিরের মধ্যে একটি মন্দির জমিদার বাড়ির মধ্যেই অবস্থিত। রাস্তা থেকে একটি জানালার মাধ্যমে শিব মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি পূর্বমুখী। জমিদার বাড়ির প্রবেশদ্বারের ডানদিকে সামান্য দূরেই অবস্থিত জোড়া শিব মন্দির। এই মন্দিরদুটিও পূর্বমুখী। পরবর্তী আরেকটি মন্দির পূর্বোক্ত জোড়া শিবমন্দিরগুলির বিপরীত দিকে একটি সংকীর্ণ গলিপথের ভেতরে অবস্থিত। ভগ্নপ্রায় এই মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। পঞ্চম মন্দিরটি জমিদার বাড়ির প্রবেশপথের বামপার্শ্বে রাস্তার উপর অবস্থিত। এটি পশ্চিমমুখী।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

জমিদার বাড়ির মধ্যে অবস্থিত মন্দিরটির কোন চালা নেই, কারণ সেটি গৃহের মধ্যেই অবস্থিত। সম্মুখে পৃথক প্রবেশদ্বার রয়েছে। জোড়া শিবমন্দিরগুলির উত্তরদিকের মন্দিরটি নবরত্ন শৈলীর এবং দক্ষিণ দিকের মন্দিরটি

আটচালা রীতির। সংকীর্ণ গলির ভেতরে অবস্থিত মন্দিরটি প্রায় চালারীতির। সর্বশেষ অর্থাৎ জমিদার বাড়ির বামদিকে রাস্তার উপরের মন্দিরটি পঞ্চরত্ন শৈলীতে গঠিত।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

জমিদার বাড়ির অন্তর্গত মন্দিরের পরিমাপ-

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৩.৫′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২′

গলিপথের ভেতরের মন্দিরটির পরিমাপ পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। কারণ মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

জোড়া শিব মন্দিরগুলির মধ্যে আটচালা মন্দিরের পরিমাপ-

তলপত্তন - ১′ মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.২′

মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২′ মন্দিরের আয়তন- ১২′× ১০′

জোড়া শিব মন্দিরগুলির মধ্যে নবরত্ন মন্দিরের পরিমাপ-

তলপত্তন - ১′ মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫′

মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২′ মন্দিরের আয়তন- ১৩′× ১৩′

জমিদার বাড়ির বামদিকের পঞ্চরত্ন মন্দিরের পরিমাপ-

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২′ মন্দিরের আয়তন- ১২′× ১০′

বিগ্রহ :

প্রতিটি মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পূজিত হন।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

এই মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গগুলি প্রস্তর নির্মিত। পরিমাপ পাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ মন্দিরগুলিতে বিগ্রহ স্পর্শ করার কোন অধিকার নেই।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরগুলি নন্দী পরিবারের ব্যক্তিগত। এটি এই পরিবারের ‘রাজরাজেশ্বর ট্রাস্ট বোর্ড’ এর মালিকানাধীন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – জমিদার বাড়ির মন্দিরটি ব্যতীত বাকি মন্দিরগুলির দ্বার একপ্রকার উন্মুক্তই থাকে। শুধু পুরোহিত সকাল ৯টা নাগাদ নিত্য পূজা করে থাকেন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হয়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরগুলির কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরগুলির নিজস্ব কোন সম্পত্তি না থাকায়, আয়-ব্যয় কিছু হয় না। ‘রাজরাজেশ্বর ট্রাস্ট বোর্ড’ যাবতীয় খরচ বহন করে থাকে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রি ও নীলপূজা তিথি সামান্য উপাচারে পালিত হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠান বলে কিছু হয়না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান বাবদ আয়-ব্যয় বলে কিছুই নেই।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরগুলিতে কোনপ্রকার ভোগ হয়না। শুধুমাত্র ফুল, জল দিয়ে নিত্য পূজা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরগুলিতে পূজা করার জন্য ‘রাজরাজেশ্বর ট্রাস্ট বোর্ড’ থেকে তিনজন পুরোহিত মোতায়েন করা রয়েছে। পুরোহিতের বেতন ‘রাজরাজেশ্বর ট্রাস্ট বোর্ড’ই বহন করে থাকে।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – শিবরাত্রি ও নীলপূজার দিন ব্যতীত, তেমন কোন ভক্ত সমাগম হয়না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরগুলিতে বিগ্রহ স্পর্শ ব্যতীত, অন্য কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরগুলির কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

জমিদার বাড়ির মধ্যে অবস্থিত শিব মন্দিরটিতে সামান্য টেরাকোটার ফুলকারি নকশা করা রয়েছে। গলির মধ্যে অবস্থিত মন্দিরটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়েছে, তবুও সামান্য কিছু ভাস্কর্য স্পষ্ট বোঝা যায়। আর জোড়া শিবমন্দিরগুলিতে সামান্য কিছু টেরাকোটার কারুকার্য লক্ষ করা যায়। এই মন্দিরগুলির টেরাকোটার কারুকার্য কুলটি গ্রামের নন্দী পরিবারের শিবমন্দিরের সমতুল্য। মন্দিরগুলির কারুকার্য দেখে অনুমান করা যেতে পারে, একই কারিগর দ্বারা টেরাকোটার ভাস্কর্যগুলি করা হয়েছে। জমিদার বাড়ির বামদিকের রাস্তার উপরের শিবমন্দিরটির গাত্রেও কিছু টেরাকোটার ফলক রয়েছে। তবে সেগুলি খুব একটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের পুরোহিত।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[৯] কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কালনার রাজবাটী বৃত্তের মধ্যেই বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটি স্বতন্ত্র প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত হলেও, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের প্রাচীরদ্বারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে মন্দির প্রাঙ্গণ অতিক্রম করেই বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরটিতে শ্বেতপ্রস্তর ফলকে লিখিত একটি প্রতিষ্ঠা লিপি রয়েছে। যা হয়তো বিনষ্ট মূল প্রতিষ্ঠা ফলকের পরিবর্তে সংস্থাপিত। এটির পাঠ-

কুমার মিত্রসেন- ধর্মপত্নী- শ্রিয়ান্বিতা।
লক্ষ্মীদেবী বৈদ্যনাথং সমারাধ্য সুতার্থিনী ।।১।।
ত্রিলোকচন্দ্রং তনয়ং লব্ধা দেব প্রসাদতঃ।
নির্ম্মায় মন্দিরমিদং কারুকার্য্যসুশোভিতম্ ।।২।।
বিজয়াদি বৈদ্যনাথনাম্নাত্র শিবলিঙ্গকম্।
মহেশ্বরস্য প্রীত্যর্থং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ।।৩।।

অর্থাৎ কুমার মিত্রসেনের ধর্মপত্নী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদেবী বৈদ্যনাথকে আরাধনা করে সুতপ্রার্থী। দেবতার প্রসাদে ত্রিলোকচন্দ্র তনয় লাভ করে কারুকার্য সুশোভিত এই মন্দির নির্মাণ করে মহেশ্বরের প্রীতির জন্য বিজয় আদি বৈদ্যনাথ নামক শিবলিঙ্গটিকে এখানে ভক্তিতে স্থাপন করেছিলেন। কুমার মিত্রসেন ছিলেন রাজা চিত্রসেন রায়ের পিতৃব্য। তাঁর পত্নী ত্রিলোকচন্দ্রের জননি বৈদ্যনাথকে আরাধনা করেই ত্রিলোকচন্দ্রকে লাভ করেন। সেই ত্রিলোকচন্দ্র যখন রাজা হন, তখন মানত পূরণার্থেই এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। মনে করা হয় যে, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরটির নির্মাণ কালেই (১৭৫২খ্রিঃ) এই মন্দিরটি নির্মিত হয় এবং কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের অঙ্গীভূত বলেই হয়তো স্বতন্ত্রভাবে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে সময় উল্লেখিত হয় নি।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি পূর্বমুখী। আটচালা বিশিষ্ট এই মন্দিরটিতে রয়েছে খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা, ২টি অর্ধস্তম্ভ এবং ২টি পূর্ণস্তম্ভ দিয়ে তৈরি তিনটি উন্মুক্ত দ্বার। মন্দিরের দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দেওয়াল বালি সিমেন্টের দ্বারা মসৃণ করে দেওয়া হয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের উচ্চতা- ৩′	মন্দিরের বারান্দাসহ আয়তন- ২০′× ২০′
মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৮′	মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ৩′
স্তম্ভের দৈর্ঘ্য- ৫.৮′	স্তম্ভের প্রস্থ - ২.২′

বিগ্রহ :

বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহটি হল কৃষ্ণবর্ণের একটি শিবলিঙ্গ।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত। শিবলিঙ্গের উচ্চতা- ৪.৫′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

পূর্বোক্ত ১০৮শিব মন্দিরের পুরোহিত শ্রী বিশ্বনাথ রায় মহাশয় এবং তার ভাই শ্রী কানাই রায় এই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তাই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পূর্বোক্ত তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে। (ক) থেকে (ড) পর্যন্ত তাই আর পুনরুল্লেখ না করে আমরা পরবর্তী আলোচনা গুলির দিকে চলে যাব।

ভাস্কর্য :

বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরটির সম্মুখাংশ টেরাকোটার কারুকার্য সমন্বিত। মন্দিরটির দুপাশ থেকে দুটি সারি টেরাকোটার ব্লক কাজ কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। মন্দিরের ভিত্তিতলের উপর দুটি ফিগারেটিভ প্যানেল লক্ষ করা যায়। পাশেও দুটি সারি নানাবিধ ফুলকারি কাজ নিয়ে উঠে গেছে। মুখ্যদ্বারের দুপাশে দুটি থাম রয়েছে। থামে কোন বিশেষ কারুকার্য নেই। দ্বারের শীর্ষে একটি কারুকার্য করা দণ্ড রয়েছে। তার দুপাশে চারটে করে আটটা রথ রয়েছে, আর রথের মাঝখানে রয়েছে শিবলিঙ্গ। দ্বারের উপরিভাগে গোল গোল চাকতির মতো দুদিকে দুটো কারুকার্যকরা ফলক রয়েছে।

মন্দিরটি টেরাকোটার ভাস্কর্যে পরিপূর্ণ। মন্দিরের সম্মুখাংশটিতেই ভাস্কর্য রয়েছে। দুপাশে আর মন্দিরের পৃষ্ঠভাগে কোন কারুকার্য নেই। এই মন্দিরের উল্লেখযোগ্য টেরাকোটার ফলকগুলি হল। নৃত্যরত নারী; সিংহাসনে উপবিষ্ট বিদেশি পুরুষ, যার হাতে গড়গড়ির নল ধরা রয়েছে; বামহাতে বন্দুক এবং ডানহাতে দণ্ড ও কোমরে তরোয়াল নিয়ে দণ্ডায়মান সৈনিক; পালোয়ান; দুটি ঘোড়া মুখোমুখি সামনের দিকে পা তুলে দাঁড়িয়ে আর তাদের পায়ের কাছে তিনটি শেয়াল রয়েছে; সারি বেঁধে বিদেশি সৈন্যরা যুদ্ধের পোশাক পরে দণ্ডায়মান, এদের মাথায় টুপি ও তিনজনের হাতে বন্দুক আর একজনের হাতে বাদ্যযন্ত্র; দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ, মাথায় মুকুট রয়েছে; একজন দণ্ডায়মান পক্ষীমানব, যার কোমর থেকে পা পর্যন্ত পাখির মতো, মাথাটা মানুষের, হাতে একটি লম্বা বাদ্যযন্ত্র রয়েছে; নকশাকাটা বৃহৎ একটি জাহাজের উপর সৈন্যের দল; একটি ঘোড়া ও একটি হাতি পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাদের পিঠে সৈন্যরা যুদ্ধরত; শিবলিঙ্গ পূজারত উপবিষ্ট পুরুষ; উপবিষ্ট হনুমান; শঙ্খ বাজনরত পুরুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া ফুলকারি নকশা ফলক, জাফরির কাজ করা ফলক রয়েছে। তবে লক্ষণীয় হল, অনেক ফলকই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে অথবা প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

তথ্যঋণ :

[১] দাস সুমাল্য সম্পাদনা, অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্রঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস; কালনা; তটভূমি প্রকাশনী; ২০১৩।

[২] রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

[৩] মন্দিরের পুরোহিত।

[৪] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১০] কালনার জগন্নাথবাড়ির জোড়া শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কালনা শহরের পশ্চিমপ্রান্তে বর্ধমান পুরনো সড়কের উপর, গঙ্গার ধারে জগন্নাথবাড়ির মূল প্রাঙ্গণে জগন্নাথবাড়ির জোড়া শিব মন্দির অবস্থিত। প্রথমটিতে, যেখানে উৎকীর্ণ শিলালিপি রয়েছে, সেই মন্দিরটি রাজেশ্বর শিব মন্দির এবং অপরটি ভুবনেশ্বর শিব মন্দির নামে পরিচিত।

পূর্বে প্রায় ছ'বিঘা জমির উপর জগন্নাথ বাড়ি অবস্থিত ছিল। বর্তমানে একটা বড় অংশে ঘরবাড়ি নির্মিত হয়ে গিয়েছে। জগন্নাথ মন্দির, ভগ্নপ্রায় জগন্নাথ দেবের স্নান বাড়ি এবং বিলুপ্তির পথে রয়েছে চারটি শিব মন্দির; পঞ্চমটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৭৪৪খ্রিঃ রাসপূর্ণিমার আগের দিন মহারাজা চিত্রসেন পরলোক গমন করেন। এরপর ১৭৫৩খ্রিঃ (১৬৭৫শকাব্দ) তাঁর জ্যেষ্ঠা মহিষী রানি ছঙ্গকুমারী দেবী শ্রীশ্রী রাজেশ্বর শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে রাজা চিত্রসেনকে নিবেদন করেন। মন্দিরের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে রয়েছে –

"বানাদ্রি মাতৃ কামানে
শাকে প্রামাদামৈষ্টকম্।
চিত্রসেনস্য মহিষী
মহেশায় ন্যবেদয়ৎ ।। শকাব্দ ১৬৭৫"

পরের বছরেই ঠিক এই শিবমন্দিরটির পাশে রাজা চিত্রসেনের কনিষ্ঠা মহিষী রানি ইন্দুকুমারী ভুবনেশ্বর শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবমন্দিরের গাত্রের শিলালিপিটি নষ্ট হয়ে গেছে, তবে যে অংশটুকু বোধগম্য হয় তাতে বোঝা যায় কনিষ্ঠা রাজমহিষী ইন্দুকুমারী দেবী ভুবনেশ্বর শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। দুটি শিবমন্দির পাশাপাশি অবস্থান করার জন্য জগন্নাথবাড়ির জোড়া শিব মন্দির হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

জোড়া শিবমন্দির দুটির অবস্থান একটি পূর্বে ও অন্যটি পশ্চিমে। মন্দির দুটি আটচালা রীতিতে তৈরি। দক্ষিণমুখী এই আটচালা মন্দির দুটিতে রয়েছে খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা। ২টি অর্ধস্তম্ভ এবং ২টি পূর্ণস্তম্ভ দিয়ে তৈরি তিনটি উন্মুক্ত দ্বার। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য রয়েছে একটি দ্বার। মন্দিরের চূড়াতে রয়েছে বেকি, আমলক, খপরি এবং কলস সমেত তিনটি ত্রিশূল।

তবে বর্তমানে মন্দিরগুলির অতিশয় দুরাবস্থা এবং ভগ্নদশা দুই'ই চোখে পড়ে। মন্দিরগুলির তলপত্তনের একটি পাশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙে গেছে। মূল মন্দিরে ওঠার জন্য পূর্বে সিঁড়ি থাকলেও, এখন তা প্রায় নিশ্চিহ্ন। রাজেশ্বর মন্দিরের চালা থেকে অনেকটা অংশ খসে পড়ে পূর্বে দুর্ঘটনাও ঘটেছিল বলে শোনা যায়। সে অর্থে বর্তমানে মন্দিরে যাতায়াত করা খুবই বিপজ্জনক। এই মন্দিরগুলির ভগ্নদশা যে কোন শিল্পরসিকের মনকেই ভারাক্রান্ত করে তুলবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

দুটি মন্দিরেরই পরিমাপ সমান।

তলপত্তন - ৫.৩′	মূল মন্দিরের উচ্চতা- ৩৪′
মন্দিরের আয়তন- ৩২′ × ২৮′	মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৬′
মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২.৬′	বহিঃদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৬′

বিগ্রহ :

দুটি শিবমন্দিরেই বেদীসহ কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ রয়েছে। গৌরীপট্ট গুলি উত্তরমুখী। শিবলিঙ্গে তিনটি রূপোর নেত্র বসানো রয়েছে। শিবলিঙ্গের নিম্নাংশে বেদীটি একটি লাল রঙের গামছা দিয়ে আবৃত। শিবলিঙ্গের পাশে কোন ত্রিশূল নেই। মূলদ্বারের মাঝখানে তিনটি পূর্ণঘট পরস্পর বসানো রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

দুটি মন্দিরেরই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দুটি, প্রস্তর নির্মিত। শিবলিঙ্গ গুলির উচ্চতা- ৪.৬′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রবীণ বাসিন্দা, নিমাই বিশ্বাস কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায়, এই মন্দিরগুলি বর্ধমান রাজার মালিকানাসত্ত্বের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু বর্ধমান রাজার নিকট হতে কোন প্রকার অর্থ সাহায্য বা অন্য কোন সহায়তা পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্যস্তরের পুরাতত্ত্ব বিভাগও মন্দিরগুলিকে অধিগ্রহণ করে নেয়নি, যার ফলে মন্দিরগুলি বর্তমানে বারোয়ারি মন্দির হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরগুলি বারোয়ারি হওয়ার দরুন, দ্বার খোলা অথবা বন্ধ হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। মন্দিরগুলিতে নিত্যসেবা হয় না।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরদুটি বর্ধমান রাজার ব্যক্তিগত জমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকায় কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নেই। তাই আয়- ব্যয় বলেও কিছু নেই।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শুধুমাত্র শিবরাত্রির দিন স্থানীয় কিছু ভক্তের জমায়েত হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠান বলে কিছু হয়না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোন আয়- ব্যয় নেই।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে কোন ভোগ হয়না।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরে কোন নির্দিষ্ট ভেতনভুক্ত পুরোহিত বা সেবাইত নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – শিবরাত্রির দিন ব্যতীত, তেমন কোন ভক্ত সমাগম হয়না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরদুটি টেরাকোটা ভাস্কর্যে একসময় সুসজ্জিত থাকলেও, বর্তমানে তার অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে গেছে। বর্ধমান রাজা অথবা সরকার, কেউই তেমন ভাবে মন্দিরগুলির সংরক্ষণ নিয়ে দায়িত্বশীল নয়। বর্তমানে স্থানীয় কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মন্দিরগুলিকে সংরক্ষণের জন্য চিঠিপত্র দিয়ে সরকারের দৃষ্টিনিক্ষেপ করার চেষ্টা করছে বলে জানা যায়।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই জোড়া শিব মন্দির দুটিতে রয়েছে একই ধরনের ফুলকারি কাজ ও টেরাকোটা সজ্জা। ভিত্তিবেদীর উপর প্রথম সারিতেই এবং বারান্দার প্রবেশদ্বারের মাথাতেও রয়েছে নানাবিধ ফুলকারি কাজ। তবে দ্বারের নীচের অংশেই টেরাকোটার আধিক্য রয়েছে। মন্দিরগাত্রে জাফরির নকশা, ফিগারেটিভ প্যানেল রয়েছে যেগুলি ফ্লোরাল নকশা দ্বারা বিভাজিত। প্রতিটি উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ ফলকের শীর্ষে রথের চূড়ার মতো নকশা করা হয়েছে, আর প্রতিটি ফলক একটি করে স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। জাফরির কারুকার্য যুক্ত উল্লম্ব সারিগুলির প্রারম্ভে একটি করে ফিগারেটিভ ফলক বর্তমান। দুপাশের দেওয়াল লাগোয়া অর্ধ ও পূর্ণ স্তম্ভগুলির কারুকার্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্তম্ভের ভিত্তির কারুকার্য দেওয়ালের ভিত্তির সঙ্গে মিশে গেছে। ভিত্তির উপর থেকে খিলানের নিম্নাংশটিতে দুটি ফিগারেটিভ প্যানেল স্তম্ভের বহিরাংশটিকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে। এখানে ফলকগুলি অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত হয়েছে।

এই মন্দিরগুলির টেরাকোটা কারুকার্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল- মকরমুখী নৌকায় নৌকাবিলাস; অশ্বারোহী ও গজারোহী যোদ্ধা; ঘোড়ার টমটম গাড়ী; জগদ্ধার্থী মূর্তি; কৃষ্ণের পুতনা বধ; ষাঁড়ে টানা গোযান; সপরিবারে দুর্গা; সাধু; বন্দুকধারী; ঢোলবাজনরত নবাবি রমণী; নৃত্যভঙ্গিমায় দেবচরিত্র; হুকো সেবনরত স্থূলকায় পুরুষ; ধুতি পরিহিত হিন্দু পুরুষ; ডুবকী বাজনরত নবাবি রমণী; ধনুর্ধারী পুরুষ; চিৎ হয়ে যাওয়া হাতির পাশে নর্তকী; হরিনাম সংকীর্তন; কদমতলায় দুই সখী সহ শ্রীকৃষ্ণ; খোল- করতাল সহ নর্তকী; ধুতি পরিহিত করজোড়ে দণ্ডায়মান হনুমান; মেঘ চড়াচ্ছে তিনজন বালক; শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন; শিঙ্গাবাজনরত হিন্দু পুরুষ; গবাক্ষে দণ্ডায়মান পুরুষ; কাসর বাজনরত পুরুষ; তরোয়ালধারী; ছুরিকাধারী পুরুষ; লোকজনসহ শিবিকাবাহিত জমিদার; উটের পিঠে সামরিক বাজিয়ের দল; বেদেবেদিনীদের কসরত; বাইজি নাচ; তাকিয়ায় হেলান দেওয়া ফরসিসেবী বাবু ইত্যাদি নানা চিত্র।

তথ্যঋণ :

[১] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং স্থানীয় বাসিন্দা কর্তৃক প্রাপ্ত।

****

[১১] কালনার রূপেশ্বর শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কালনার রাজবাটী বৃত্তের মধ্যেই এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। মহারাজা তিলকচাঁদের জ্যেষ্ঠা মহিষী রূপকুমারী দেবী ১৭৬১খ্রিঃ রূপেশ্বর শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রতিষ্ঠা লিপিতে বলা হয়েছে-

শ্রীরাম প্রতিম মহাগুণময়স্ত্রৈলোকচন্দ্রো নৃপ
স্তস্যান্তে নৃপশেখরস্য মহিষী জ্যেষ্ঠা ধরিত্রী সুতা।
সাকার্ষী ত্রিপুরান্তকস্য ভবনং কৈলাস শৈলোপমং
শাকে তত্র রসাস্টষড়বনিমে চাপেয়মার্তন্ডকে।।
শকাব্দ ১৬৮৩

অর্থাৎ রাম প্রতিম মহাগুণের অধিকারী রাজা তিলকচাঁদের জ্যেষ্ঠা মহিষী রূপকুমারী দেবী ১৬৮৩শকাব্দে (১৭৬১খ্রিঃ) কৈলাস পর্বতের তুল্য ত্রিপুরারী শিবের ভবন নির্মাণ করেন। প্রচলিত মতে, রূপকুমারী নির্মিত 'রূপেশ্বর শিব মন্দির'টির নামকরণ করা হয়েছে রূপকুমারী দেবীর নামে।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। লালজী বাড়ির পূর্বদিকে এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটি দালান রীতির শিব মন্দির। এই মন্দিরে কোন চূড়া নেই, এটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট। এর চারিদিকে উন্মুক্ত রোয়াক আছে। মন্দিরটি সমতল আয়তাকার আকারের। তিনটি দ্বার চারটি স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত। অন্য সকল মন্দিরের থেকে এটি ব্যতিক্রমী। এই মন্দিরের গঠনশৈলীতে পাশ্চাত্য প্রভাব রয়েছে। একটি খিলানের উপর এক দালান এই অদ্ভুত গঠনশৈলী নিয়ে আজও অম্লান এই রূপেশ্বর শিব মন্দির। ২টি সিঁড়ি রয়েছে এই মন্দিরে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের আয়তন-	১৮′× ১৫′	মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য-	৫.৩′
মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ-	২.৬′	বহিঃদ্বারের দৈর্ঘ্য-	৭.৩′
বহিঃদ্বারের প্রস্থ -	৩.২′	তলপত্তন -	২.৪′

বিগ্রহ :

বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহটি হল কৃষ্ণবর্ণের একটি শিবলিঙ্গ।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত। শিবলিঙ্গের উচ্চতা- ৪.৫′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

পূর্বোক্ত ১০৮শিব মন্দিরের পুরোহিত শ্রী বিশ্বনাথ রায় মহাশয় এবং তার ভাই শ্রী কানাই রায় এই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তাই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পূর্বোক্ত তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে। (ক) থেকে (ড) পর্যন্ত তাই আর পুনরুল্লেখ না করে আমরা পরবর্তী আলোচনা গুলির দিকে চলে যাব।

ভাস্কর্য :

টেরাকোটা কাজে সমৃদ্ধ এই মন্দিরটির প্রতিটি স্তম্ভ টেরাকোটার কাজ যুক্ত। মন্দিরের সম্মুখাংশে বহিঃদ্বারের দুপাশ থেকে টেরাকোটা ফলকের উল্লম্বসারি কার্নিশের নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দ্বারগুলির উপরের অংশটি অনুভূমিকভাবে বর্গাকার ছককাটা নকশায় সমৃদ্ধ। এখন অবশ্য টেরাকোটার কাজ গুলি প্রায় অস্পষ্ট এবং কোন কোন স্থানে ধ্বংসও হয়ে গেছে, ফলে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি সেই অর্থে আকৃষ্ট হয় না।

তথ্যঋণ :

[১] দাস সুমাল্য সম্পাদনা, অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্রঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস; কালনা; তটভূমি প্রকাশনী; ২০১৩।

[২] রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

[৩] মন্দিরের পুরোহিত।

[৪]	পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১২] গ্রাম কুলটির নন্দী পরিবারের শিব মন্দির (কাশীনাথ শিবমন্দির)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

গ্রাম কুলটির নন্দী পরিবারের কাশীনাথ শিব মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের ফলকে লেখা আছে। প্রতিষ্ঠাতা নন্দী পরিবারের পূর্বপুরুষ, নাম জানা যায় নি। ১৬৮৩শকাব্দে (১৭৬১ খ্রিঃ) মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নন্দী বংশ পেশায় তেলি।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি আটচালা শৈলীর। উচ্চভিত্তির উপর স্থাপিত মন্দিরটি উত্তরমুখী। মন্দিরটির পশ্চিম দেওয়ালে একটি জাল লাগানো গৌণদ্বার রয়েছে। মন্দিরটির শীর্ষে তিনটি ত্রিশূল ছিল। কিন্তু বর্তমানে একটি ত্রিশূল অক্ষত রয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তন - ২′	মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৪.৫′	মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ১.৬′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে একটি কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত। পুরোহিতের নিষেধে পরিমাপ নেওয়া যায় নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – কাশীনাথ মন্দিরটি নন্দী পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – নন্দী পরিবারের সদস্য, শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, এই মন্দিরের দ্বার সকাল ৯.৩০মিনিটে উন্মুক্ত হয়ে, পূজার্চ্চনার পর বেলা ১১টা নাগাদ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর শেতল হয়, তারপর শয়ন হয় বিগ্রহের।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নেই। তাই আয়-ব্যয় বলেও কিছু নেই। মন্দিরের খরচ নন্দী পরিবারই বহন করে থাকে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রি ও নীলপূজার দিন বিশেষ পূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠান বলে কিছু হয়না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোন আয়-ব্যয় নেই। বিশেষ পূজার ব্যয়ভার নন্দী পরিবারই বহন করে।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে অন্নভোগ ভোগ হয়না। নিত্য আতপচাল, ফল, মিষ্টান্ন সহযোগে পূজা করা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিতের বেতন নন্দী পরিবারের আট-দশ ঘর সেবাইত বহন করে থাকে।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – শিবরাত্রি ও নীলপূজার দিন ব্যতীত, তেমন কোন ভক্ত সমাগম হয়না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দিরের কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরে সামান্যই টেরাকোটার কারুকার্য করা রয়েছে। এই কারুকার্যগুলি দেখে শিল্পীর দক্ষতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মন্দিরের ভাস্কর্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নৌকাযাত্রা; গরুড় গাড়ী; ঘোড়ায় করে যুদ্ধ; দণ্ডায়মান

সৈন্য; দণ্ডায়মান নারী ও পুরুষ; ময়ূরকে বক্ষে ধরে দণ্ডায়মান নবাবি নারী; হাতে দণ্ড নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষ; মকড়মুখী রথে বসে যাত্রীগণ; দণ্ডায়মান সাধু; অনেকে একসাথে খেলা দেখাচ্ছে ইত্যাদি।

মন্দিরটির ভিত্তি থেকে কার্নিশের নিম্নাংশ পর্যন্ত কারুকার্য করা রয়েছে। পশ্চিমদিকের গৌণদ্বারটির দু'পাশে উল্লম্ব এবং উর্ধ্বাংশে অনুভূমিকভাবে ফলক রয়েছে। ফিগারেটিভ ফলক ছাড়াও ফুলকারি নকশা, জাফরির কাজ করা রয়েছে। গৌণদ্বারটির শীর্ষে রথের মাঝে শিবলিঙ্গ করা ভাস্কর্যের ফলক রয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের পুরোহিত।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১৩] বনকাটি গ্রামের রায় পরিবারের পাঁচটি শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

রায় পরিবারের প্রবীণ সদস্য শ্রী অনিল কুমার রায় কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, মন্দিরগুলি তাঁর পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পূর্বমুখী তিনটি শিবমন্দির ১৭৫৬শকাব্দে **(১৮৩৪ খ্রিঃ)** প্রতিষ্ঠিত হয়, আর উত্তরমুখী দুটি শিবমন্দির, যেগুলি সবচেয়ে প্রাচীন, ১৭০৪শকাব্দে **(১৭৮২ খ্রিঃ)** প্রতিষ্ঠিত হয়।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

পূর্বমুখী শিবমন্দির তিনটি দেউল রীতির এবং উত্তরমুখী শিবমন্দির দুটি চালা রীতির। প্রতিটি মন্দিরেই গর্ভগৃহে প্রবেশের দ্বার একটি।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

পূর্বমুখী (দেউল) শিবমন্দিরের প্রতিটির পরিমাপ সমান। এবং চালা (উত্তরমুখী) মন্দিরগুলির পরিমাপও এক।

দেউল মন্দিরের একটির পরিমাপ-

তলপত্তনের উচ্চতা- ১.৯′

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৪.৭′

মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ১.৭′

চালা মন্দিরের একটির পরিমাপ-

তলপত্তনের উচ্চতা- ১′

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৪.৭′

মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ১.৭′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরগুলির প্রতিটি মন্দিরেই কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। প্রতিটি বিগ্রহের আলাদা নাম রয়েছে, বিশ্বেশ্বর, উমেশেশ্বর, গোপালেশ্বর, কালীশ্বর এবং সোমেশ্বর।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গগুলি প্রস্তর নির্মিত। দ্বার রুদ্ধ থাকায় মন্দিরের বিগ্রহের পরিমাপ পাওয়া যায় নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব –এই মন্দিরগুলি বংশ পরপম্পরায় রায় পরিবারের মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার সকাল ৯টায় উন্মুক্ত হয়ে থাকে। বেলা ১টা নাগাদ নিত্যসেবা হয়। বিকেল ৪টের সময় দ্বার উন্মুক্ত হয়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হয়ে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নেই। মন্দিরের যাবতীয় ব্যয়ভার রায় পরিবারের সদস্যরাই বহন করে থাকেন।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রি, নীলপূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে কোন বিশেষ উৎসব পালন করা হয় না, তাই আয়-ব্যয়ের কোন ব্যাপার নেই।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য ফল, মিষ্টান্ন, আতপচাল, গুড়, কলা সহযোগে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। কোন বলিদান হয় না।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে এই পরিবারের সদস্য শ্রী অনিল কুমার রায় মহাশয় পূজা করে থাকেন। আলাদা করে কোন পুরোহিত মোতায়েন করা হয় নি। তাই কোন বেতনের বিষয় নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম –এই মন্দিরে শিবরাত্রির সময় ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

প্রতিটি মন্দিরে চিত্তাকর্ষক কোন ভাস্কর্য নেই। তিনটি দেউল মন্দিরের শীর্ষেভাগে কিছু ভাস্কর্যের ফলক লক্ষ করা যায়। যেমন- কালী দেবী, মহিষমর্দিনী দুর্গা, চতুর্ভুজ দেবী, বীণা বাজনরত পুরুষ ইত্যাদি কিছু ফিগারেটিভ ফলক লক্ষ করা যায়।

তথ্যঋণ :

[১] রায় পরিবারের সদস্যগণ।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১৪] কালনার রামেশ্বর শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কালনার বড়বাজার থেকে রাজবাড়িতে উত্তরদিকের প্রবেশদ্বারের মধ্যদিয়ে প্রবেশ করে ডানদিকেই এই মন্দিরটির অবস্থান লক্ষ করা যায়। অধুনা নেতাজী স্কাউটের সংলগ্ন উত্তর- পূর্ব কোণে এই মন্দিরটি অবস্থিত। এর প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে,

বাণব্যোম ধরধিরেন্দু গণিতে শাকে শশাঙ্ক প্রভ
শ্রীকন্ঠস্য নিবাস-মন্দিরমিদং রাধাপতি প্রীতয়ে।
ধীর শ্রীযুত তেজচন্দ্র ধরনী ধৌরেয় চূড়ামনে
স্মার্তা সম্প্রতি নির্ম্মমে সুরসরিৎ ক্ষেত্রেহম্বিকাখ্যেপুরে।।
১৭০৫শক।

অর্থাৎ মন্দিরটি মহারাজ তেজচন্দ্রের জননি বিষণকুমারী ১৭০৫শকাব্দে (১৭৮৩খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে মন্দিরটি পরিত্যক্ত। মন্দিরটির তালা বন্ধ। তালার চাবির দায়িত্ব ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল কর্তৃপক্ষের অধীনে রয়েছে। এই মন্দিরে দীর্ঘদিন যাবৎ নিত্যপূজা স্থগিত রয়েছে।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

রাজবাটী বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের আদলে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। সমতল ভিত্তিবেদীর উপর আটচালা রীতির এই মন্দিরটি। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটির মূল প্রবেশদ্বারটিও দক্ষিণদিকে, তবে পূর্বদিকেও একটি দরজা রয়েছে। মন্দিরটিতে খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা এবং তিনটি উন্মুক্ত দ্বার রয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের আয়তন- ১৬′ × ১৬′ উচ্চতা - ৩০′

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৬.৪′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২.৪′

বহিঃদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৮′ বহিঃদ্বারের প্রস্থ - ৩.৬′

বিগ্রহ :
এই মন্দিরে পূর্বে শ্বেতবর্ণের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তা অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :
মন্দিরে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কোন বিগ্রহ উপস্থিত নেই।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :
পূর্বোক্ত ১০৮শিব মন্দিরের পুরোহিত শ্রী বিশ্বনাথ রায় মহাশয় এবং তার ভাই শ্রী কানাই রায় এই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। পুরোহিত দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, এই মন্দিরটি 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল' দ্বারা অধিগৃহীত। মন্দিরে কোন বিগ্রহ না থাকায় মন্দিরে কোন পূজা হয়না। তাই সেই সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি নেই।

ভাস্কর্য :
মন্দিরটিতে কারুকার্য বলতে আকর্ষণীয় কিছুই নেই। টেরাকোটার কারুকার্য রয়েছে দ্বার ও তোরণগুলিতে। তিনটি দ্বারের উপরে খোদিত রয়েছে নয়টি রথের অর্ধগোলাকৃতি সারি বিন্যাস, উপরের দিকে নয়টি স্তম্ভের বিন্যাস এবং ফাঁকে ফাঁকে চারটি করে আয়তাকার পরিসর। মূলদ্বারের নিম্নাংশের দুপাশের কোণায় হনুমানের মূর্তি রয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] দাস সুমাল্য সম্পাদনা, অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্রঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস; কালনা; তটভূমি প্রকাশনী; ২০১৩।

[২] রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

[৩] মন্দিরের পুরোহিত।

[৪] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১৫] নবাবহাটের ১০৮ শিব মন্দির (বর্ধমান সদর)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :
একশো আট শিবমন্দির নাম হলেও, এগুলির সংখ্যা আসলে একশো নয়টি। অতি রমণীয়, পবিত্র স্থান এটি। মাঝখানে প্রশস্ত স্বচ্ছ সরোবর, তার চারপাশে অপূর্ব সুষমায় সুবিন্যস্ত এই মন্দিরগুলি। ১০৮শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা লোকমুখে প্রচারিত হলেও, আসলে ১০৯টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারানি বিষণকুমারী দেবী। শিবমন্দিরের পশ্চিমে প্রবেশ পথের উপর শিলালিপিতে খোদিত ছিল-

"শাকে পূণ্য শশাঙ্ক শৈল কুমিতে নির্ম্মায় রাধা হরি প্রীত্যৈ
পূণ্যবতী নবাধিকসতং শ্রীমন্দিরানি স্বয়ম্।
ধীর শ্রীযুত তেজচন্দ্র ধরনী-ধোরেয় চূড়ামনে
মাতা তৎসবিধে বিধায় সুসরস্তীরে সমস্থাপয়তু।"

মন্দিরের এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৭১০শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৮খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। মন্দির নির্মাণে তখনকার দিনে লক্ষাধিক অর্থ ব্যয় হয়েছিল। আরো জানা যায়, বিষণকুমারী দেবী মন্দিরের নির্মাণকার্য ১৭৮৮খ্রিঃ আরম্ভ করান এবং সম্ভবতঃ ১৭৯০খ্রিঃ এই নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। বিষণকুমারী দেবী মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপন করে ১০৮শিব মন্দিরের দরজার উপর শ্বেতপাথরের নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন।

"শ্রীহরি শকাবর ১৭১০ সন ১১৯৫, ইং ১৭৮৮ খ্রিঃ
পূণ্য শশাঙ্ক শৈল কুমেতি নির্ম্মায়।
রাধা হরি প্রীতে পূণ্যবতী নবাধিক শত শ্রীমন্দিরানি
স্বয়ং শ্রীল শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র ধরণী ধেয়র চূড়ামনে মাতা
তৎস্ববিধে বিধাও মুরাস্তীনে সংপাদশয়তঃ।"

এখান থেকে অনুমান করা যায় যে, মন্দিরের নির্মাণকার্য এবং লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে। শিবমন্দিরের শ্বেতপাথরের উৎকীর্ণ লিপিতে রাধা হরি লিখিত আছে।

বিদূষী মহারানি বিষণকুমারী স্বপ্নে দেখা মন্দিরের অনুরূপ মন্দির নির্মাণ করার জন্য শ্রীকান্ত তর্কালঙ্কারের শ্লোক অনুসারে ১০৯টি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। পুত্রের সুবুদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করে মন্দির নির্মাণের পর তিনি লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং পুত্র তেজচন্দ্রকে আদেশ দিয়েছিলেন, রাজসম্মান ও ঐতিহ্যকে রক্ষার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন সেখানে উপস্থিত থেকে শুদ্ধচিত্তে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ন ও তাঁদের পদধূলি গ্রহণ করেন আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করার জন্য। মহারাজ তেজচন্দ্র পরম যত্নসহকারে মাতৃআজ্ঞা পালন করে ব্রাহ্মণদের পদধূলি গ্রহণ করে রাজ অন্তঃপুর রক্ষা করেন।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

রানি বিষণকুমারী বালেশ্বরের মন্দিরের আটচালার নকশাকে নমুনা হিসাবে সাজিয়ে বর্ধমানের নবাবহাটে ১০৮ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরগুলি আটচালা রীতিতে তৈরি এবং আয়তক্ষেত্রের প্রতিটি কোণের শিবমন্দিরগুলি বহুকৌণিক বিন্যাসে সজ্জিত। মন্দিরগুলির প্রবেশের দরজা পশ্চিমদিকে। দরজার সম্মুখে টানা খোলা বারান্দা রয়েছে। পূর্বদিকের কিছুদূরে আয়তক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা একটি ছোট মন্দির অর্থাৎ ১০৯তম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল মেরুকে প্রদক্ষিণ করার জন্য। মন্দিরগুলির ভিতর অঙ্গনে রয়েছে স্বচ্ছসলিলা প্রশস্ত পুষ্করিণী। ১০৯টি মন্দিরের মধ্যে ১০৮টি সমতলভূমিতে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের আকার নিয়ে বিন্যস্ত। আর বহিঃদেশে একটি।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ৩′

উচ্চতা- ১৫′ মন্দিরের আয়তন- ১০′×১০′

বিগ্রহ :

প্রতিটি মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ নির্মিত হয়েছিল, যা আয়তাকার মুক্তার হারের মতো দেখতে হয়েছিল। এই মন্দিরগুলির লিঙ্গগুলি গৌরীপট্ট ভেদকারী। বিগ্রহে রূপার মুকুট এবং রূপার সর্প পরানো রয়েছে। বিগ্রহের পশ্চাতে ত্রিশূল রাখা রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

প্রতিটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত। উচ্চতা- ১.৬′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দির সম্পর্কিত একটি পত্রিকার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পূর্বে এই মন্দির বর্ধমান রাজার অধীনে অর্থাৎ মালিকানায় ছিল। জমিদারি উচ্ছেদের ফলে সেই ধারা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। এই ১০৮ শিবমন্দিরের পরিচালনার জন্যও মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব ১৯৭৪খ্রিঃ ১৯শে জানুয়ারি, ১৯জন সদস্য নিয়ে ‘বর্ধমান ১০৮শিবমন্দির ট্রাস্ট বোর্ড’ গঠন করেন। এই বিশাল দেব মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের সমস্ত প্রকার দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। সেই থেকে এই মন্দিরের মালিকানাসত্ত্বে মন্দিরের ট্রাস্ট বোর্ড রয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – সকাল ৮টায় মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং বেলা ১টা পর্যন্ত পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আবার বিকেল ৪টের সময় মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে, রাত ৮টা নাগাদ ভোগ হয়ে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরগুলিতে যা দক্ষিণা প্রদান করা হয়, সেই থেকে আয় হয় এবং মন্দিরের নিজস্ব পত্রিকা বিক্রয় করেও কিছু আয় হয়। মন্দিরের পূজার খরচ ট্রাস্ট বোর্ড বহন করে থাকে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – ১০৯টি মন্দিরেই নিত্যপূজা হয়ে থাকে। সোমবারই শিবপূজার প্রশস্ত দিন। বিশেষ পূজা হয় সংক্রান্তিতে। তবে সবচেয়ে জাঁকজমক করে পূজা হয় শিবরাত্রিতে। শ্রাবণমাসে মন্দির দিবারাত্র খোলা থাকে। বৈশাখ মাসে বৈকালী হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – প্রতিবছর শিব চতুর্দশীতে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান শহর ছাড়াও আশেপাশের বহু দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন শিবলিঙ্গে জল ঢালার উদ্দেশ্যে। বেশ করেকদিন ধরেই ঐ সময় মেলা থাকে এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান বাবদ যা আয় হয়, তা ট্রাস্ট বোর্ডের কাছেই জমা হয়। পূজা বাবদ যাবতীয় খরচ ট্রাস্ট বোর্ডই করে থাকে।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে আতপ চাল, গুড়, ঘি, কলাই ডাল দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হয়। কোন কোন ভক্তেরা গাঁজা, কলকে, সিদ্ধি ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। শিবকে উদ্দেশ্য করে কোথাও বলি হয় না।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিত হলেন শ্রী প্রসাদ মুখার্জী। বংশ পরম্পরায় এই মুখার্জী পরিবারই মন্দিরে পূজা করে আসছেন। প্রসাদ মুখার্জীর দুই পুত্রও বর্তমানে মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। ট্রাস্ট বোর্ডের মাধ্যমে মন্দিরের পুরোহিতের বেতন নির্দিস্ট করা আছে।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – নিত্য ভক্ত সমাগম হয় এই মন্দিরগুলিতে। তবে শিবরাত্রি তিথিতে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – এই মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় পরিকল্পনা ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই। ১৯৬৫খ্রিঃ একবার মন্দিরটি সম্পূর্ণ সংস্কার করা হয়েছিল 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট'এর অর্থানুকূল্যে।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের ট্রাস্ট বোর্ড দ্বারা একটি প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। বর্ধমান ১০৮শিবমন্দির, দেবনাথ মণ্ডল সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৪১১, বর্ধমান।

ভাস্কর্য :

আটচালা রীতিতে তৈরি মন্দিরগুলিতে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] মণ্ডল দেবনাথ সম্পাদিত বর্ধমান ১০৮ শিব মন্দির; বর্ধমান; ১০৮ শিবমন্দির ট্রাস্ট বোর্ড; ১লা বৈশাখ ১৪১১।

[২] মন্দির কর্তৃপক্ষ দ্বারা মন্দির ও পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য সংগৃতীত।

****

[১৬] মানকরের দেউলেশ্বর শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

মানকর, দক্ষিণরায়পুরে অবস্থিত দেউলেশ্বর শিব, কুন্ডু পরিবারের দ্বারা বংশ পরম্পরায় সেবিত হয়ে আসছে। কুন্ডু পরিবারের পূর্বপুরুষ প্রায় ২০০ বছর পূর্বে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দির গাত্রে কোন খোদিত ফলক নেই। তাই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি দেউল রীতির মন্দির। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার একটি।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তনের উচ্চতা- ৩.১০′ মূল মন্দিরের আয়তন- ১০′×১০′

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.১০′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে একটি কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পূজিত হয়।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত। বিগ্রহের উচ্চতা- ৪′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ব – শ্রী দিলীপ কুন্ডু দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, মন্দিরটি কুন্ডু পরিবারের মালিকানাসত্বে রয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার ভোর ৬টায় খোলে এবং বেলা ১২টার সময় বন্ধ হয়। আবার বিকেল ৫টার সময় উন্মুক্ত হয়ে রাতে বন্ধ হয়, নির্দিষ্ট কোন সময় নেই।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় –মন্দিরের কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নেই। কুন্ডু পরিবারের সদস্যরা পালা করে মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করেন। আর ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারা সামান্য কিছু আয় হয়, যা মন্দিরের সেবার কাজে ব্যয় করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – শিবরাত্রি ও শ্রাবণমাসের তিথিতে বিশেষ পূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – মন্দিরকে কেন্দ্র করে কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান বাবদ কোন আয়ব্যয় কিছুই হয় না।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য আতপচাল, ফল, মিষ্টান্ন সহযোগে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। প্রতি পূর্ণিমায় খিচুড়ি ভোগ হয়। শিবরাত্রি ও শ্রাবণমাস ছাড়াও অনেকদিনই ভোগ দেওয়া হয়। শিবরাত্রির দিন গ্রামবাসীদের ভোজন করানো হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিত শ্রী বেনীমাধব আচার্য মহাশয়েরা বংশ পরম্পরায় এই মন্দিরের সেবা করে আসছেন। কুন্ডু পরিবারের থেকেই বেতনের ব্যবস্থা করা আছে।

(ঞ) ভক্ত সমাগম –এই মন্দিরে শিবরাত্রি এবং শ্রাবণমাসের প্রতি সোমবার অনেক ভক্তের ভিড় জমে। অনেক দূরদূরান্ত থেকে ভক্তের আগমন হয়ে থাকে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – প্রায় বছর দশেক আগে একবার মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরের তলপত্তনটুকু বাদ দিয়ে পাদদেশ থেকে কার্নিশের নিম্নভাগ পর্যন্ত টেরাকোটার কারুকার্য করা রয়েছে। ফিগারেটিভ প্যানেল ছাড়াও, রয়েছে ফুলকারি নকশা ও জাফরির কারুকার্য। চিত্তাকর্ষক কারুকার্য কিছু লক্ষ করা যায় না। তবে মন্দিরের দ্বারের শীর্ষভাগে ভাস্কর্যের সুন্দর দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

এই মন্দিরের ভাস্কর্যের কিছু বিবরণ দেওয়া হল, রাজসভায় রাজা-রানি উপবিষ্ট সিংহাসনে এবং দুদিকে সেবক রয়েছে; পতাকা হাতে সৈন্যদল গমন করছে; মাথায় গোল টুপি পরিহিত বাদ্যযন্ত্র বাজনরত পুরুষ; দুজন স্ত্রীলোক পাশাপাশি দণ্ডায়মান; উপবিষ্ট ভোলানাথ; চতুর্ভুজ দেবতা বিশেষ; মাতা ও বালক দণ্ডায়মান; বীণা বাজনরত স্ত্রীলোক; দণ্ডায়মান বরাহ অবতার; মৎস্যাবতার, মৃত্যুলতা; ইত্যাদি।

তবে ক্রমশ মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্ষয় হয়ে ফলক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দির সংক্রান্ত স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ কর্তৃক প্রাপ্ত।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১৭] কালনার রাজবাড়ি প্রাঙ্গণের পঞ্চশিব শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

রাজবাটী বৃত্তের রূপেশ্বর শিবমন্দিরের সংলগ্ন, পঞ্চশিব মন্দির (পাঁচটি ক্ষুদ্রাকায় মন্দিরের সমাবেশ)। এই মন্দিরের পাশেই রয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির ও বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের একক প্রবেশদ্বার। এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠালিপি বর্তমানে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। পঞ্চশিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির অবশেষ থেকে জানা যায়, তৃতীয় মন্দিরটি তেজচন্দ্রের পঞ্চম পত্নী রানি কমলকুমারী দেবীর প্রিয় সহচরী দেবকী দেবীর প্রতিষ্ঠিত। আনুমানিক ১৮০০-১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

পঞ্চশিব মন্দিরগুলি সমতল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি মন্দির আটচালা রীতির। মন্দিরগুলি দক্ষিণ দিক থেকে পরপর চারটি পশ্চিমমুখী, শেষেরটি পূর্বমুখী। এগুলির মধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে ধরলে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত বড়। মন্দিরগুলি বর্তমানে মেরামত করা হয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ :

মন্দিরে 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, কলকাতা মণ্ডল' কর্তৃক মেরামতির কাজ হওয়ার জন্য পরিমাপ নেওয়া যায় নি।

বিগ্রহ :

দক্ষিণদিক থেকে ধরলে, তৃতীয় এবং পঞ্চম শিব মন্দিরটি ব্যতীত, বাকি তিনটি মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। তৃতীয়টিতে একটি ভগ্নপ্রায় কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ এবং পঞ্চম মন্দিরটিতে একটি ক্ষুদ্রাকায় শিবলিঙ্গ বর্তমান।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

মন্দিরদুটিতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গগুলি প্রস্তর নির্মিত। তৃতীয় মন্দিরের ভগ্নপ্রায় শিবলিঙ্গের পরিমাপ নেওয়া যায়নি এবং পঞ্চম মন্দিরটিতে একটি বিঘৎ প্রমাণ শিবলিঙ্গ বর্তমান।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

পূর্বোক্ত ১০৮শিব মন্দিরের পুরোহিত শ্রী বিশ্বনাথ রায় মহাশয় এবং তার ভাই শ্রী কানাই রায় এই মন্দিরসমষ্টির পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তাই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পূর্বোক্ত তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে। (ক) থেকে (ড) পর্যন্ত তাই আর পুনরুল্লেখ না করে আমরা পরবর্তী আলোচনা গুলির দিকে চলে যাব।

ভাস্কর্য :

মন্দিরটিতে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের পুরোহিত।

****

[১৮] কালনার ১০৮ শিব মন্দির (নব কৈলাস মন্দির)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

বর্ধমান মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ১৮০৯খ্রিঃ ১০৮ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লোকমুখে এই মন্দিরটি ১০৮ শিবমন্দির নামে কথিত। কিন্তু এর প্রকৃত নাম 'নব কৈলাস মন্দির'। প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে এটি ১০৯ শিব মন্দির। প্রতিষ্ঠালিপিতে রয়েছে-

"শাকে চন্দ্র শিবাব্ধি সপ্ত কুমিতে শ্রী
তেজচন্দ্রাভিধোবা সূর্য্যইব স্থি
রার্পিত চলচ্চন্ড প্রতাপানলঃ
শম্ভোর্ধাম পরম নবাধিকশত শ্রী
মন্দিরৈর্মন্ডলম প্রকার্ষীম্মহদ
অম্বিকাখ্য নগরে কৈলাসমেতং নমং।"

অর্থাৎ এই 'নবাধিক শত' মন্দিরটি ১৭৩১শকাব্দে অর্থাৎ ১৮০৯খ্রিঃ রাজা তেজচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত হয়। এই মন্দির নির্মাণের পূর্বেই ১৭৮৮খ্রিঃ বর্ধমানের নবাবহাটে তেজচন্দ্রের মাতা বিষণকুমারী 'নবাধিকশতং' শ্রীমন্দির নির্মাণ

করিয়েছিলেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং'এর তত্ত্বাবধানে। ১০৮শিব মন্দিরের পশ্চিমে একটি শিব মন্দির অবস্থিত রয়েছে, ওটিই ১০৯তম মন্দির। যদিও ওই মন্দিরের সামনে যে পরিচিতি বা ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাতে দেখা যায় সেটি জলেশ্বর মন্দির।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরগুলি আটচালা এবং প্রতিটি মন্দিরের শীর্ষে চক্র রয়েছে। কালনার ১০৮শিব মন্দিরটি বৃত্তাকার। মন্দিরটি দুটি বৃত্তে সজ্জিত। প্রথম বৃত্তে ৭৪টি মন্দির এবং দ্বিতীয় বৃত্তে ৩৪টি মন্দির সজ্জিত রয়েছে। প্রত্যেকটি মন্দির বর্গাকৃতি ভূমি নকশার উপরে গম্বুজের দ্বারা ছাদটি নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বৃত্তটির মাঝখানে একটি বড়ো ইঁদারা রয়েছে। এই মন্দিরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ৪টির বেশি শিবলিঙ্গ দেখা যায় না। এই মন্দিরের প্রতিটি বৃত্তের দুটি করে দরজা। প্রথম বৃত্তের একটি উত্তরদিকে এবং একটি দক্ষিণদিকে। ভেতরের বৃত্তে একটি পূর্বদিকে ও অপরটি পশ্চিমদিকে। যাতায়াতের জন্য দুদিকই খোলা। প্রথম বৃত্তের দক্ষিণদিকের দ্বারটি নিরাপত্তার কারণে বন্ধ করে রাখা থাকে। বৃহৎ বৃত্তের বাইরের এবং ভেতরের চারিদিকে ২ফুট উঁচু সরু রোয়াক রয়েছে। এর দুটি উদ্দেশ্য, এক মন্দিরের ভিত্তির দৃঢ়তা বজায় রাখা এবং দ্বিতীয়টি হল মন্দির পরিক্রম করে পুণ্যার্জন করা। লক্ষ করলে দেখা যাবে, গৌরীপট্ট গুলি সবই নির্দিষ্ট ভাবে উত্তরমুখী, বৃত্তটি পরিক্রম করার সাথে সাথে গৌরীপট্টের মুখও উত্তরদিকে ঘুরে গিয়েছে।

১০৮শিব মন্দিরের পশ্চিমে যে জলেশ্বর নামক শিব মন্দিরটি রয়েছে, ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী সেটি পঞ্চরত্ন মন্দির। এর ছাদের চারকোণে চারটি চূড়া এবং মাঝে অপেক্ষাকৃত বড় চূড়া রয়েছে। উচ্চভিত্তির মন্দিরটিতে সিঁড়ির ৭টি ধাপ ভেঙে উঠতে হয়। ইষ্টক নির্মিত মন্দিরটির সম্মুখে ত্রিখিলান বিশিষ্ট উন্মুক্ত দ্বার ও এরপর গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার রয়েছে। গর্ভগৃহে রয়েছে জলেশ্বর শিবলিঙ্গ। এই মন্দিরের অন্য একটি নাম হল নীলকন্ঠেশ্বর মন্দির। একমাত্র নীলপূজার দিনই এর পূজা হয় বলে হয়তো এমন নামকরণ হয়েছে। এর কোন প্রতিষ্ঠালিপি পাওয়া যায় না।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

১০৮ শিব মন্দিরের পরিমাপ-

মন্দিরের দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৭.৮′ মন্দিরের দ্বারের প্রস্থ- ৫.৫′

জলেশ্বর শিব মন্দিরের পরিমাপ-

তলপত্তনের উচ্চতা- ৫.৭′ মুখ্যদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৭′

মুখ্যদ্বারের প্রস্থ- ২.২′ বহিঃদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৭′

বহিঃদ্বারের প্রস্থ- ২.৮′

বিগ্রহ :

১০৮শিব মন্দিরটিতে বৃহৎ বৃত্তটির মধ্যে ৭৪টি শ্বেতবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ ক্রমান্বয়ে সাজানো আছে। প্রতিটি শিবলিঙ্গের নামকরণ লিপিবদ্ধ আছে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরে। দ্বিতীয় বৃত্তে রয়েছে ৩৪টি শ্বেত শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গগুলি বৃহৎ বৃত্তের শিবলিঙ্গগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। রূপতত্ত্বের দিক থেকে বলা যায় কালনার এই ১০৮শিবমন্দিরের শুভ্রবর্ণের শিবগুলি ভগবান সদাশিবের প্রতীক এবং কৃষ্ণবর্ণের গুলি রুদ্রের প্রতীক।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের প্রতিটি শিবলিঙ্গ প্রস্তর নির্মিত।

বড় বৃত্তের শিবলিঙ্গগুলির উচ্চতা- ১.৮′ গৌরীপট্টের দৈর্ঘ্য- ১.৪′

ছোট বৃত্তের শিবলিঙ্গগুলির উচ্চতা-১.৭′ গৌরীপট্টের দৈর্ঘ্য- ১′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব - মন্দিরের পুরোহিত শ্রী বিশ্বনাথ রায় দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মন্দিরটি 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল' দ্বারা অধিগৃহীত। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা, সুরক্ষা

বজায় রাখা সমস্ত কিছুরই দায়িত্বভার এই বিভাগের কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয়। পূর্বোল্লিখিত কাজগুলির জন্য ২জন স্থায়ী, ৭জন অস্থায়ী কর্মচারী এই বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার খোলে সকাল ৬টায়। বেলা ১টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বিকেল ৪টের সময় খোলা হয়, রাত ৮টায় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের পুরোহিতের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মন্দিরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, তাই ব্যয় বলে কিছু নেই। ভক্তদের দক্ষিণা মারফৎ যা আয় হয়, তাই পূজার উপাচার ক্রয়ের কাজে ব্যয় হয়। এছাড়া 'মহতাবচাঁদ রিলিজিয়াস ট্রাস্ট' পূজার উপাচার ক্রয়ের জন্য সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করে থাকে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রির দিন মহাসমারোহে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া নীলপূজার দিন বিশেষ পূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠান বলে কিছু হয়না। তবে শিবরাত্রির দিন মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে অর্থাৎ রাস্তার উপর মেলা বসে।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – পুরোহিতের মত অনুযায়ী, সারা বছরের তুলনায় শিবরাত্রির উৎসবে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং পূজার দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ব্যয়ও বৃদ্ধি পায় বলে ধরে নেওয়া যায়। উৎসব অনুষ্ঠানে 'মহতাবচাঁদ রিলিজিয়াস ট্রাস্ট' থেকে অর্থ সাহায্য করা হয়।

(জ) ভোগ – প্রত্যহ এই মন্দিরে কোন ভোগ হয়না। শিবরাত্রি, নীলপূজার দিন ভক্তরা বিভিন্ন ফল সহযোগে পূজা করে যায়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – ভক্তরা যা দক্ষিণা দেয় তা সবই পুরোহিতের প্রাপ্য হয়। তাছাড়া 'মহতাবচাঁদ রিলিজিয়াস ট্রাস্ট' থেকে পুরোহিতের বেতন নির্দিষ্ট করা রয়েছে। ইংরাজি মাসের প্রথম সপ্তাহেই পুরোহিতের বেতন দেওয়া হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – ১০৮শিব মন্দির চত্বরে প্রত্যহ প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তেরা আসেন এই মন্দির দর্শন করতে। শিবরাত্রির দিন ভক্ত সমাগম বৃদ্ধি পায়। সারা বছরের তুলনায় ঐ দিনটিতে সবচেয়ে বেশি ভক্তের আগমন ঘটে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে এই মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলে কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরগাত্রে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] গাইন বিশ্বজিৎ, কালনার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড; বর্ধমান; কালনা মহকুমা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র; অক্টোবর ২০১২।

[২] হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩।

[৩] মন্দিরের পুরোহিত।

[৪] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[১৯] বনপাস, কামারপাড়ার দেউলেশ্বর মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

মন্দিরগাত্রে খোদিত ফলক থেকে জানা যায়, ১৭৪৮শকাব্দে (১৮২৬ খ্রিঃ) এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হয়। তবে প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় নি।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

কামাড়পাড়ার এই দেউলেশ্বর শিবমন্দিরটি অষ্টকোণযুক্ত মন্দির। মন্দিরটি পূর্বমুখী। একটিমাত্র প্রবেশদ্বার রয়েছে। আর ৫টি কৃত্রিমদ্বার রয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৬′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ১′ তলপত্তন- ১.৬′

বিগ্রহ :

দেউলেশ্বর মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ নিত্য সেবিত হয়। শিবলিঙ্গের গায়ে রূপার বেলপাতা এবং একটি রূপার ত্রিশূল রয়েছে। বিগ্রহের দক্ষিণপার্শ্বে একটি বড় ত্রিশূল রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি কষ্টিপাথর নির্মিত। উচ্চতা- ৩.৬′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – কামাড়পাড়া অঞ্চলের অধিবাসী শ্রী সজল দাস এবং শ্রী প্রদীপ যশ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, মন্দিরটি 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল' দ্বারা অধিগ্রহণ করে নিয়েছে। এই মন্দিরের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার দায়িত্ব 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল'এর। বর্তমানে মন্দিরটি 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল'এর মালিকানাধীন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরটির দ্বার একবারই পূজার জন্য উন্মুক্ত হয় সকাল ৯টা বা ১০টা নাগাদ, নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। নিত্যপূজা হয়ে যাওয়ার পর মন্দিরের দ্বার সেদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরে যা দক্ষিণা প্রদান করা হয়, সেই থেকে আয় হয়, এবং সেই আয় পূজা বাবদ ব্যয় করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – প্রতিবছর শ্রাবণমাসে এবং শিবরাত্রিতে বিশেষ পূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – দেউলেশ্বর মন্দিরটি কেন্দ্র করে বৃহৎ কোন সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান কিছু হয় না, তাই এই বাবদ কোন আয় বা খরচা কিছু হয় না। বিশেষ পূজা বাবদ যাবতীয় খরচ পুরোহিতগণ ব্যক্তিগতভাবে বহন করে থাকেন।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে কোন অন্নভোগ হয় না। ফল, মিষ্টি, আতপচাল ইত্যাদি দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরে বর্তমানে দুজন পুরোহিত রয়েছেন, অচিন্ত্য চক্রবর্তী এবং পীযূষ চক্রবর্তী। পুরোহিতের কোন বেতনের ব্যবস্থা নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম –এই মন্দিরে নিত্য ভক্ত সমাগম হয় না । তবে শিবরাত্রি তিথিতে ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

দেউলেশ্বর মন্দিরগাত্রে টেরাকোটার ভাস্কর্য লক্ষ করা যায়। ফিগারেটিভ ফলক আর ফুলকারি নকশার মাধ্যমে মন্দিরটি সুসজ্জিত করা হয়েছে। টেরাকোটার ফলকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- দণ্ডায়মান রাম- সীতা, এবং সীতার পাশে দণ্ডায়মান ছত্রধারী; যুদ্ধদৃশ্য; বাদ্যযন্ত্র নিয়ে দণ্ডায়মান বিদেশি পুরুষ; বালকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে মাতা যশোদা ও তাঁর সখীদের লীলাখেলা; ডানহাতে দণ্ড নিয়ে দণ্ডায়মান সন্ন্যাসী; বামহাতে ঢাল ও ডানহাতে তরোয়াল নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষ; রাসমণ্ডল; বেহালা হাতে দণ্ডায়মান নারী; পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ দেবতা; ষাঁড়ের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হরগৌরী; দশভুজা দুর্গা এবং দুপাশে গণেশ- লক্ষ্মী ও কার্তিক- সরস্বতী; হাতে খড়্গ ও তরোয়াল নিয়ে নগ্ন নারী; প্রভৃতি। মন্দিরটির মূল দ্বার এবং কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষে সুন্দর টেরাকোটা কারুকার্যের নমুনা দেখা যায়।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের স্থানীয় ভক্তবৃন্দ।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[২০] কাটোয়ার শ্রীবাটি গ্রামের তিনটি শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত শ্রীবাটি গ্রামের অপূর্ব টেরাকোটার কারুকার্য দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত তিনটি শিবমন্দির 'চন্দ্র' পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 'চন্দ্র'রা জমিদার ছিলেন। ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে জৈষ্ঠ্য (১৮৩৬ খ্রিঃ), ৺শ্রী রামকানাই চন্দ্র কর্তৃক এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। বনপাস কামারপাড়ার বুধন মিস্ত্রী, এই মন্দিরগুলি তৈরি করেছিলেন।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

শ্রীবাটির এই শিব মন্দির চত্বরটিতে বামদিকে অবস্থিত পূর্বমুখী মন্দিরটি হল দেউল রীতির মন্দির। মাঝের দক্ষিণমুখী শঙ্কর মন্দিরটি হল পঞ্চরত্ন মন্দির আর ডানদিকের পশ্চিমমুখী ভোলানাথ মন্দিরটি হল ষড়কোণাকৃতি দেউল মন্দির। প্রতিটি মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বার একটি।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

প্রতিটি মন্দিরের পরিমাপ সমান।

তলপত্তনের উচ্চতা- ৩′ মূল মন্দিরের আয়তন- ১২′×১২′

মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫′ মূলদ্বারের প্রস্থ- ১.৬′

বিগ্রহ :

চন্দ্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিব মন্দিরের মধ্যে, মাঝের শিব মন্দিরটিতে একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ এবং ওপর দুটি শিব মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি কষ্টি পাথরের ষাঁড় ছিল, সেটি চুরি হয়ে গেছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গগুলি প্রস্তর নির্মিত। দ্বার রুদ্ধ থাকায় বিগ্রহের পরিমাপ পাওয়া যায় নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – গ্রামের অধিবাসী শিশির চন্দ্র ও সুভাষ চন্দ্র কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মন্দিরগুলি বর্তমানে 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল' দ্বারা অধিগৃহীত। পূর্বে এই সরকারি বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত কর্মী মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার কার্যে নিযুক্ত থাকলেও, বর্তমানে কোন কর্মী নেই।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরগুলির দ্বার একবারই পূজার জন্য উন্মুক্ত হয়। দ্বার খোলার বা বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের কোন নিজস্ব সম্পত্তি নেই। তাই আয়ব্যয় বলে কিছু হয় না। পূজার যা কিছু খরচা হয়, তা গ্রামবাসীরাই বহন করে থাকেন।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – বিশেষ তিথি হিসেবে কোন পূজাই জাঁকজমক করে হয় না। শিবরাত্রিতে গ্রামবাসীরাই সামান্য কিছু আয়োজন নিজেদের দায়িত্বে করে থাকেন।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – মন্দিরটি কেন্দ্র করে কোন সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান বাবদ কোন আয় বা ব্যয় হয় না।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে কোন প্রকার ভোগ হয় না। সামান্য কিছু ফুল, জল দিয়ে নিত্য সেবা হয়। বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামবাসীরা শিবরাত্রির দিন কিছু ফল, মিষ্টান্ন নিবেদন করে থাকেন।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিত শ্রী বাসুদেব চক্রবর্তী। পুরোহিতের কোন বেতনের ব্যবস্থা নেই। গ্রামবাসীদের দক্ষিণা দ্বারা প্রাপ্ত সামান্য অর্থেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম –এই মন্দিরে নিত্য ভক্ত সমাগম হয় না। মাঝেমধ্যে মন্দিরের কারুকার্যের আকর্ষণে কিছু ভ্রমণ পিপাষু মানুষ মন্দির দর্শন করতে আসেন।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা কিছু জানা যায় নি।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

শ্রীবাটির শিব মন্দির চত্বরে প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিব মন্দির গাত্রেই অপূর্ব টেরাকোটার কারুকার্য বিদ্যমান। পূর্বমুখী দেউল মন্দিরটির কিছু উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যের বিবরণ দেওয়া হল- হাতি, ঘোড়া ও সিংহের পিঠে বসে যুদ্ধ; পুরুষ-মহিলার একত্রে বসে কথোপকথন; হাঁটু মুড়ে বসে দুই করজোড়ে প্রণামরত হনুমান; হাতির পিঠে উপবিষ্ট দেবী; মৎস্যকন্যা; দণ্ডায়মান বরাহ; জগন্নাথদেব; উপবিষ্ট ভোলানাথ; বামদিকে পার্বতীকে নিয়ে উপবিষ্ট জটাধারী মহাদেব; চতুর্ভুজ দেবতা পদ্মাসনে উপবিষ্ট; নরসিংহ দ্বারা হিরণ্যকশিপু বধ; বামহাতে হাল ধরে বলরাম; চতুর্ভুজ দেবী কালিকা, পদতলে শায়িত দেবাদিদেব মহাদেব; চতুর্ভুজ গণেশ; তরোয়াল নিয়ে দণ্ডায়মান সৈন্য; বাতায়নে দক্ষিণ হস্তে ছুরি নিয়ে দণ্ডায়মান নারী; বেহালা বাজনরত রমণী; ইত্যাদি।

পঞ্চরত্ন মন্দিরটির কিছু উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য- স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান শিঙা বাজনরত রাজপুরুষ; দণ্ডায়মান দেবী কালিকা; দুটি হাতির শিরের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ দেবতা; মৃত্যুলতা; বাদ্যযন্ত্র নিয়ে উপবিষ্ট নারীগণ; হুকো সেবনরত উপবিষ্ট পুরুষ; উপবিষ্ট রামসীতা; ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট সৈনিক; ড্রাগন; ডানহাতে তরোয়াল ও বামহাতে ঢাল নিয়ে দণ্ডায়মান রাজপুরুষ; হাতে ধনুক নিয়ে রাজপুরুষ; প্রভৃতি।

ষড়কৌণিক দেউল মন্দিরটির কিছু উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য হল, মাথায় ঘোমটা পরিহিত দণ্ডায়মান নারী; ঢাল তলোয়ারে সজ্জিত সৈনিক; নৌকাযাত্রা; পাশবালিস নিয়ে উপবিষ্ট নারী ও পুরুষ; মৃত্যুলতা; সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজপুরুষগণ; ঢোল ও শিঙা বাজনরত পুরুষ; প্রভৃতি। এই মন্দিরটির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এর আকৃতি। এর ভাস্কর্যও অন্যান্য মন্দিরগুলির থেকে অনেকাংশেই পৃথক। সুদৃশ্য কল্কা ও নকশার মাঝে ফিগারেটিভ প্যানেলগুলি যেন অন্য মাত্রা পেয়েছে। মৃত্যুলতার সুন্দর ব্যবহার মন্দিরটিকে আরও মনোরম করে তুলেছে। বলতে গেলে উল্লিখিত তিনটি মন্দিরের মধ্যে এই মন্দিরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার অনন্য সাধারণ টেরাকোটার ভাস্কর্যের জন্য।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং অন্যান্য তথ্য স্থানীয় আধিবাসীবৃন্দ কর্তৃক প্রাপ্ত।

****

[২১] কালনার প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় অবস্থিত রাজবাড়ির মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তরদিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে বামদিকে যে টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরটি অবস্থিত, সেটিই হল প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির। এই মন্দিরটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, বর্ধমান রাজপরিবারের ভারতে আলোড়নকারী 'জাল প্রতাপচাঁদ' ঐতিহাসিক মামলার সমাপ্তির প্রেক্ষাপটে। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহতাবচাঁদের রাজত্বকালে (১৮৩২- ৭৯খ্রিঃ), প্রতাপচাঁদের প্রথমা স্ত্রী রানি প্যারীকুমারী দেবীর আগ্রহে প্রতাপচাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে ১৮৪৯খ্রিঃ (১৭৭১ শকাব্দ) রাজবাটী প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে এই অনিন্দ্যসুন্দর মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। প্যারীকুমারী প্রতাপচন্দ্রের মহিষী ছিলেন, একথা মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে উল্লেখ থাকলেও, একথার উল্লেখ নেই যে, প্যারীকুমারী প্রতাপচন্দ্রের নামে মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দিরের সংস্কৃত প্রতিষ্ঠালিপিটি হল-

“সংসারার্ণবতারনৈক তটিনী তীরে মুরারয়ের্মুদে
শাকেভেশানগাগভেশ বিমিতে তারেশকায়াদদৎ।
শ্রীরাধেশ সুবেশ রাসরসিকানন্দস্য দাসী।
মহারাজাধীশ প্রতাপচন্দ্র মহিষী প্যারীকুমারী মঠম্।।”

এছাড়া বাংলা লিপিতে আছে-

“ শাকে সপ্তদশ শত একাত্ত প্রমাণে
অম্বিকায় অমর বাহিনী সন্নিধানে,
শ্রীরাধাবল্লভ রাস রসিক সুন্দর
শ্যামাঙ্গ ত্রিভঙ্গ অঙ্গ বিশ্বমনোহর।
তাঁহার কিঙ্করী প্যারীকুমারী প্রধানা
মহেন্দ্র প্রতাপচন্দ্র নরেন্দ্র অঙ্গনা,
মহাস্থানে করি মহামন্দির নির্ম্মাণ
হরিপ্রিতে হরসিতে হরে দিলা দান।।”

‘শকাব্দ ১৭৭১ সন বাংলার ১২৫৬, ইংরেজির ১৮৪৯ খ্রিঃ দেয়ুল সোনামুখী নিবাসী শ্রীরামহরি মিস্ত্রির দ্বারা এই মন্দির নির্মিত।’ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠালিপি অনুসরণে বলতে গেলে প্রতাপেশ্বর মন্দিরটিকে ‘প্যারীকুমারী মঠ’ বলতে হয়।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

প্রতাপেশ্বর মন্দিরটি ঊনবিংশ শতকের ‘রেখ দেউল’ রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু দেউল রীতির ঐতিহ্যগত নিয়ম এখানে পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় নি। প্রথাগত এই ধরনের মন্দির নির্মাণ রীতি অনুযায়ী মন্দিরের নীচে ভিত্তিভূমি থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত তিনটি মূল অংশে ভাগ করা হয়; যাকে বলা হয় যথাক্রমে, বাঢ়, গন্ডী এবং মস্তক। এছাড়া থাকে তলপত্র যা মন্দিরের ভার বহন করে, এটিকে দেখা যায় না। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে, চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থানকালের বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার যে যোগসূত্র স্থাপন হয়েছিল, তার ফলে উড়িষ্যার প্রভাবিত শিখরমন্দির যা পীঢ়া নামে পরিচিত ছিল, সেই স্থাপত্যের সনাতন রীতির অনুসরণে বাংলায় বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণ হতে শুরু করেছিল।

আমাদের আলোচিত মন্দিরটিও উড়িষ্যারীতি অনুসরণেই নির্মিত। মন্দিরটি উচ্চ, চতুষ্কোণ, অনাবৃত প্রশস্ত বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটির বেদীর উপর পরিক্রমার জন্য প্রশস্ত জায়গা রয়েছে। পূর্বমুখী এই মন্দিরটির মুখ্য প্রবেশদ্বার একটি। বাকি তিনদিকে তিনটি কৃত্রিম দ্বার রয়েছে, যা টেরাকোটার ভাস্কর্য দ্বারাই নির্মিত। মন্দিরের চূড়াটি গর্ভগৃহের উপর বাঁকানো ভাবেই সোজা হয়ে উঠে গিয়েছে। এর মাঝের অংশটি কিছুটা স্ফীত। চূড়ার চারদিকে রয়েছে চারটি তল যা উপরের দিকে উঠে গিয়ে কলসের সঙ্গে মিশেছে। সাবেক মন্দির স্থাপত্যে যেমন লহর করে ধাপে ধাপে ছাদ নির্মাণ করা হতো, ঠিক সেই কৌশলেই এই মন্দিরটির ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দির শীর্ষে রয়েছে কলস এবং তার উপর একটি লৌহ শলাকার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে একটি ত্রিশূল। মন্দির সম্মুখে ৬টি অর্ধগোলাকার সিঁড়ি ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে বেদীর উপর উঠে গেছে। এই মন্দিরটি তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দির নির্মাণে স্থানীয় শিল্পী কারিগরদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সোনামুখী নিবাসী শ্রীরামহরি মিস্ত্রি। তাঁর নামটি মন্দিরের পাদদেশে খোদিত রয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তনের উচ্চতা- ৫′ মন্দিরের উচ্চতা- ৪৫′ মন্দিরের আয়তন- ১৫′ × ১৫′ মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৬.৫′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২.৩′

বহিঃদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৮.৩′ বহিঃদ্বারের প্রস্থ- ৩.১′

কৃত্রিম দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৯′ কৃত্রিম দ্বারের প্রস্থ- ২.৩′

বিগ্রহ :

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহটি হল কৃষ্ণবর্ণের একটি শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের গৌরীপট্টটি উত্তরমুখী।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত। শিবলিঙ্গের উচ্চতা- ৪.৫′ গৌরীপট্টের দৈর্ঘ্য- ২.৩′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :
পূর্বোক্ত ১০৮শিব মন্দিরের পুরোহিত শ্রী বিশ্বনাথ রায় মহাশয় এবং তার ভাই শ্রী কানাই রায় এই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তাই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পূর্বোক্ত তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে। (ক) থেকে (ড) পর্যন্ত তাই আর পুনরুল্লেখ না করে আমরা পরবর্তী আলোচনা গুলির দিকে চলে যাব।

ভাস্কর্য :
প্রতাপেশ্বর মন্দিরগাত্রের অপূর্ব ভাস্কর্য অনায়াসেই শিল্প রসিকের মনকে আকৃষ্ট করে। সম্পূর্ণ মন্দিরটি 'টেরাকোটা' কাজের একটি অসাধারণ নিদর্শন। দালানের চারপাশের বাইরের দেওয়ালের প্রতিটি স্থানে ছোট ছোট অসংখ্য টেরাকোটা ফলক শিল্পীদের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই মন্দিরের ভাস্কর্য নিয়ে কথিত আছে, এই মন্দিরের চারটি দেওয়ালে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চারটি যুগের অবতারগণ খুব স্পষ্ট ভাবে ভাস্কর্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন। মন্দিরটির ভাস্কর্য, দৃষ্টিকে তো আকর্ষণ করেই সঙ্গে হৃদয়কেও স্পর্শ করে। সমসাময়িক আর কোন মন্দিরে এই রকম নিখুঁত ভাস্কর্য প্রায় বিরল। পোড়ামাটির ছাঁচে তৈরি এইরূপ অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত অলংকরণ, যা একবার দর্শনেই মনে ছাপ রেখে যায়।

এই মন্দিরের বাইরের প্রতিটি দেওয়ালেই অনুভূমিক সারি এবং উল্লম্ব সারিতে বিভক্ত রয়েছে। পূর্বমুখী দেওয়াল ব্যতীত প্রতিটি দেওয়ালের কৃত্রিমদ্বারে সুন্দর অলংকরণ রয়েছে। মুখ্য এবং কৃত্রিম দ্বারের খিলান অংশেও ভাস্কর্য রয়েছে। মন্দিরটির ভিত্তির অংশটুকু ব্যতীত যে স্থান থেকে মন্দিরটি আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ পা ভাগ থেকে মস্তক শুরু হওয়ার পূর্বসারি পর্যন্ত পোড়ামাটির অপূর্ব ভাস্কর্য দ্বারা প্রতাপেশ্বর মন্দিরটি সজ্জিত হয়েছে।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের প্রবেশদ্বারের শীর্ষে রাম-সীতার অভিষেক দৃশ্যকে ভাস্কর্যমণ্ডিত করে তোলা হয়েছে। রাম-সীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁদের বামদিকে রয়েছে পাখা হাতে সেবাদাসী এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে ছত্রধারী। গবাক্ষ থেকে জনগণ এই দৃশ্য দেখছেন। নীচের সারিতে বাজনদারেরা বাজনা বাজাচ্ছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের খিলানশীর্ষে রয়েছে 'বা-রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত শিবদুর্গা । শিব বা মহাদেবের দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান করেছেন চতুর্ভুজ কার্তিক, ইনি ময়ূরের পিঠে উপবিষ্ট। মহাদেবের বামপার্শ্বে রয়েছেন দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

পশ্চিমদিকের কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষটি এবং তার আশেপাশের অংশগুলিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সমগ্র অংশটিতে গৌর-নিতাইকে কেন্দ্র করে নগরসংকীর্তনের ভাস্কর্যটি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে গৌর-নিতাই নৃত্যরত আর তাঁর বাকী পার্ষদগণ হাতে খোল, করতাল, শিঙা নিয়ে বাজাচ্ছে এবং তার সাথে নাচছে। কয়েকজন পার্ষদের হাতে পতাকা রয়েছে। পরনে ধুতি আর গলায় উত্তরীয় রয়েছে। দ্বারের শীর্ষদেশটি লক্ষ করলে দেখা যায়, সেখানে মধ্যবর্তী অংশে রাজবেশে দণ্ডায়মান রয়েছেন গৌর-নিতাই। পরনে ধুতি ও গলায় উত্তরীয়। মাথায় মুকুট। তাঁদের অবস্থান দেখে অনুমিত হয় যে, তাঁরা কোন রাজবাড়ির মুখ্যদ্বারের নিকট এসে উপস্থিত হয়েছেন। দ্বারের শীর্ষে সুন্দর নকশা করা খিলান এবং তার উপর নকশা করা রঙ্গমঞ্চের পর্দা ঝুলছে। এই রঙ্গমঞ্চের পর্দাটি সম্পূর্ণ প্যানেলের উপরিভাগে রয়েছে।

মন্দিরের উত্তরদিকের কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষে লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্যটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বামপাশের রাবণ রথে করে যুদ্ধে যাচ্ছেন, সঙ্গে রয়েছে সেনাগণ। রাবণের দশটি মাথা আর দশটি হাত লক্ষ করা যাচ্ছে। রাবণের পশ্চাতে দুজন নগ্ন নারী সেনা হাতে খড়্গ নিয়ে দণ্ডায়মান। যুদ্ধে সিংহবাহিনী দুর্গার আবির্ভাব। দেবীর দুপাশে ঘোড়ায় করে সেনারা যুদ্ধে চলেছে। অন্যদিকে রামের বানরসেনা যুদ্ধ করছে। রামের হাতে তীর ও ধনুক। রাবণকে লক্ষ্য করে তির ছুড়ছেন রাম।

মন্দিরের দক্ষিণ দিকের কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ এবং এঁদের মাঝে রেখে দুপাশে রয়েছে ললিতা, বিশাখা। এছাড়া অন্যান্য গোপিনিদের মধ্যে কেউ ছত্রধারী, কেউ বা পাখা দিয়ে বাতাস করছে, কেউ বা চামর দোলাচ্ছেন।

এছাড়াও মন্দিরগাত্রে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফুলকারি নকশা, জাফরির কারুকার্য। রয়েছে স্থূল পেট মহাদেব, চতুর্ভুজ গণেশ, ময়ূরের পিঠে উপবিষ্ট কার্তিক, বালগোপাল, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, ষড়ভুজা কালী, সাধক, চারটি হাতির

উপর উপবিষ্ট গজলক্ষ্মী, যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণ, শিবলিঙ্গ পূজারত ব্রাহ্মণ, দুজন সখীর মাঝখানে স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ, দলবদ্ধ বিদেশিনী, বীণাবাদিনী, বীণাবাদনরত পুরুষ, ক্রন্দনরতা নারী, মৎসাবতার, বামন অবতার, বরাহ অবতার, কূর্মাবতার, নৃসিংহাবতার, পদাতিক যোদ্ধা, ছিন্নমস্তা নারী, হাতে কাটা মুণ্ড, মাথার উপর সিংহের মুখ বিশিষ্ট বর্শা হাতে যোদ্ধা, নৃত্যরত নারী, বেহালাবাদনরত পুরুষ, নবাবি ঘাগরা পরিহিতা নারী, মাথায় ঘোমটা টানা হিন্দু নারী, বিদেশিনী নারী, ঢোলবাদনরত নারী, ধ্যানমগ্ন যোগী পুরুষ, পালোয়ান, চতুর্ভুজ শিব, নগ্ন যোগীনী, বাঘের উপর উপবিষ্ট দেবী, ইংরেজ রাজপুরুষ, বৈষ্ণব পুরুষ যার হাতে জপমালা আর মাথা ন্যাড়া; কপালে তিলক রয়েছে, সাপুড়ে, ভাল্লুক খেলা দেখাচ্ছে, হাতে শিঙা নিয়ে মৎসকন্যা, তিরন্দাজ যোদ্ধা, হস্তি সেনা, জগন্নাথ, মহিষমর্দিনী, কৌপীন পরিহিত যোগী, নৃত্যভঙ্গিমায় পুরুষ, স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান পুরুষ, জোড়া সিংহের শিরের উপর পদ্মফুলের পাপড়ি নির্মিত আসনে পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ দেবতা, উৎসব মুখর নরনারীগণ ঢোল, কাসর, দামামা, সানাই ইত্যাদি বাজিয়ে নৃত্য করছে, কামার শালায় কামার কাজে লিপ্ত ইত্যাদি।

উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণ ছাড়াও প্রচুর টেরাকোটা ভাস্কর্য রয়েছে যেগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পীদের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণ ও বৈষ্ণব ধর্মের কাহিনির চিত্ররূপ যেভাবে সজ্জিত হয়েছে তাতে শিল্পীরা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখেন। মোট কথা শিল্পীরা নিজের খেয়ালে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে টেরাকোটার ফলকগুলোর মধ্যে এক আশ্চর্য জীবনধর্মী সজীবতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। তবে 'টেরাকোটা' মূর্তিফলকগুলি ও ফুলকারি নকশাকাজ খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের ক্রম- অপসৃয়মান ধারাটিকেই প্রতিফলিত করেছে। মূর্তি ও নকশাগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম কারুনৈপুণ্যের পরিচয় না মিললেও, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, মূর্তিগুলির সাজপোশাক ও অঙ্গভঙ্গিমা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তথ্যঋণ :

[১] দাস সুমাল্য সম্পাদনা, অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্রঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস; কালনা; তটভূমি প্রকাশনী; ২০১৩

[২] রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

[৩] মন্দিরের পুরোহিত।

[৪] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[২২] কালনার রত্নেশ্বর শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

ইষ্টক নির্মিত রত্নেশ্বর শিবমন্দিরটি রাজবাড়ি চত্বরের বাইরে, পূর্বদিকে অবস্থিত। পূর্বে মূল রাজবাড়ির মধ্যে গোলাবাড়ির পাশে ওই মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। জলেশ্বর শিব মন্দিরের মতো, রত্নেশ্বর মন্দিরগাত্রে বা প্রবেশদ্বারে কোন প্রকার স্থাপন ফলকের দেখা মেলে না। ফলে নির্মাণকারীর পরিচয় বা নির্মাণকাল সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। উড়িষ্যা রীতির গঠনশৈলী দেখে অনুমিত হয়, এটি প্রতাপেশ্বর মন্দিরের সমসাময়িক (আনুমানিক ১৮৪৯ খ্রিঃ)।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি উত্তরমুখী। পঞ্চরত্ন এই মন্দিরটিতে পাঁচটি চূড়া এবং চারদিকে প্রবেশদ্বার রয়েছে। এই মন্দিরটির সম্মুখাংশে খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা এবং তিনটি উন্মুক্ত দ্বার রয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তন - ৩.৬′ মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৭′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২.২′

বহিঃদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৬.৬′ বহিঃদ্বারের প্রস্থ - ২.৬′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে একটি কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গ রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত। দ্বার রুদ্ধ থাকায় পরিমাপ পাওয়া যায় নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

পূর্বোক্ত ১০৮শিব মন্দিরের পুরোহিত শ্রী বিশ্বনাথ রায় মহাশয় এবং তার ভাই শ্রী কানাই রায় এই মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তাই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পূর্বোক্ত তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে। (ক) থেকে (ড) পর্যন্ত তাই আর পুনরুল্লেখ না করে আমরা পরবর্তী আলোচনা গুলির দিকে চলে যাব। পুরোহিত দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, এই মন্দিরটিও 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল' দ্বারা অধিগৃহীত।

ভাস্কর্য :

মন্দিরটিতে কারুকার্য বলতে আকর্ষণীয় কিছুই নেই। সামান্য কিছু টেরাকোটার কারুকার্য সম্মুখে করা রয়েছে, তাতে বেশিরভাগই রথের ফলক খোদিত রয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের পুরোহিত।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[২৩] গ্রাম কুলটির দত্তবাড়ির শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

গ্রাম কুলটির দত্তবাড়ির শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী কাশীনাথ দত্ত, ১২৭২সনের (১৮৬৫ খ্রিঃ) ১৭ই বৈশাখ। প্রথম সংস্করণ করান শ্রীমতি হিঙ্গলকুমারী দাসী, ১৩২৪সনের ১৩ই চৈত্র। মন্দিরটি সদ্য রঙ করা হয়েছে।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি উচ্চবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন শৈলীতে নির্মিত। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকেই মুখ্যদ্বারটি রয়েছে। এছাড়াও মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে একটি দ্বার রয়েছে। দুটি দ্বারই লৌহনির্মিত। দুটি দ্বার দিয়েই সরাসরি গর্ভগৃহে প্রবেশ করা যায়।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তন - ৩′ মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৬′ মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ- ২.৩′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পূজিত হন। শিবলিঙ্গটিতে রূপোর নেত্র, ভ্রু, নাসিকা এবং দুটি ভ্রুর ঊর্দ্ধাংশে একটি অর্ধচন্দ্র রয়েছে। লিঙ্গটির দু'পাশে দুটি শ্বেতবর্ণের ষাঁড় রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত।

শিবলিঙ্গটির উচ্চতা- ৩.৩′ গৌরীপট্টের দৈর্ঘ্য- ২′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মন্দিরটি বংশপরম্পরায় (প্রতিষ্ঠাতা কাশীনাথ দত্তের উত্তরপুরুষ) দত্ত পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – সকাল ৮টায় মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করে, নিত্য পরিচ্ছন্নতার পর ৯.৩০মিনিট নাগাদ নিত্যপূজার পর ১০টা নাগাদ মন্দিরের দ্বার রূদ্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বেলা ১২টা নাগাদ মন্দির

খোলা হয় ভোগ নিবেদনের উদ্দেশ্যে। তারপর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মন্দিরের দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত করে সন্ধ্যারতি, শেতল হয়ে যাওয়ার পর বিগ্রহের শয়ন হয়ে গেলে, মন্দিরের দ্বার সেদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নেই। তাই আয়-ব্যয় বলেও কিছু নেই। মন্দিরের খরচ দত্ত পরিবারই বহন করে থাকে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শিবরাত্রি ও নীলপূজা, গাজন তিথিতে বিশেষ পূজা হয়। এছাড়া পুরো বৈশাখ মাস ব্যাপী প্রত্যহ বিকেল বেলায় 'বৈকালী' নামক বিশেষ পূজা হয়ে থাকে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠান বলে কিছু হয়না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – বিশেষ পূজার ব্যয়ভার দত্ত পরিবারই বহন করে। স্থানীয় ভক্তদের দক্ষিণা বাবদ সামান্য কিছু আয় হয়।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে অন্নভোগ ভোগ হয়না। নিত্য আতপচাল, ফল, লুচি, মিষ্টান্ন সহযোগে ভোগ নিবেদন করা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরটিতে পুরোহিত হিসেবে কেউ পূজা করেননা। শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, এই মন্দিরে অধিকাংশ সময় পূজা করে থাকেন। এটি ওনার পারিবারিক মন্দির, তাই আলাদা করে কোন বেতনের ব্যবস্থা নেই। বংশ পরম্পরায় এই মন্দিরে পরিবারের লোকেরাই পৌরোহিত্য করে থাকেন।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – শিবরাত্রি ও নীলপূজার দিন ব্যতীত, তেমন কোন ভক্ত সমাগম হয়না।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে শিবলিঙ্গটিকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে মন্দিরের চতুর্দিকে দেওয়াল তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরে কোনরকম ভাস্কর্য নেই। তবে সম্পূর্ণ মন্দিরটিতে সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়ায় দেখতে সুন্দর লাগছে।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের পুরোহিত।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[২৪] বনপাস, রায়পাড়ার চারটি শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

বনপাস, রায়পাড়ার রায় পরিবারের দ্বারা একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত চারটি শিব মন্দির রয়েছে। ১২৯৮খ্রিঃ এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমান রায় পরিবারের পূর্বপুরুষ ৺জগৎদুর্লভ রায় মহাশয়। মন্দিরগাত্রে খোদিত ফলক থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

চারটি মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণমুখী দুটি শিব মন্দির হল, দেউল রীতির। পূর্বমুখী একটি মন্দির দেউল রীতির। ওপর মন্দিরটি আটচালা রীতিতে নির্মিত, এটি দক্ষিণমুখী।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

অভিন্ন তলপত্তনের উচ্চতা- ২'

দক্ষিণমুখী বড় দেউলের পরিমাপ

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৬'

দক্ষিণমুখী ছোট দেউলের পরিমাপ

মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৪.৬'

মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ-	২′	মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ-	২′
দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরের পরিমাপ-		**পূর্বমুখী দেউলের পরিমাপ-**	
মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য-	৪.১০′	মন্দিরের মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য-	৪.৮′
মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ-	২′	মন্দিরের মূলদ্বারের প্রস্থ-	১.১′

বিগ্রহ :

প্রতিটি মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ নিত্য সেবিত হয়।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গগুলি প্রস্তর নির্মিত। দ্বার রুদ্ধ থাকায় বিগ্রহের পরিমাপ পাওয়া যায় নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – শ্রীমতি জ্যোৎস্না চক্রবর্তী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, চারটি শিবমন্দিরই রায় পরিবারের মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে বংশ পরম্পরায়। ‘রায়’ উপাধিটি প্রাপ্ত উপাধি।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরগুলির দ্বার একবারই পূজার জন্য উন্মুক্ত হয়। দ্বার খোলার বা বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে। সেই সম্পত্তির আয় থেকেই পূজা বাবদ খরচ করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – শিবরাত্রিতে বিশেষ পূজা হয়। তাছাড়া বিপত্তারিণী ও নারায়ণ শিলা পূজিত হন।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – মন্দিরটি কেন্দ্র করে কোন সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠান বাবদ কোন খরচ না হলেও, বিশেষ পূজার খরচ দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ের থেকে রায় পরিবারের সদস্যরা করে থাকেন।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে কোন অন্নভোগ হয় না। দুধ, গুড়, ফল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিত দিলীপ চক্রবর্তী, রায় পরিবারেরই সদস্য। তাই পুরোহিতের কোন বেতনের ব্যবস্থা নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম –এই মন্দিরে নিত্য ভক্ত সমাগম হয় না। শিবরাত্রি তিথিতে স্থানীয় কিছু ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

রায়েদের এই চারটি মন্দিরেই কিছু টেরাকোটার ভাস্কর্য লক্ষ করা যায়। তবে দক্ষিণমুখী বড় দেউলটিতে অপেক্ষাকৃত বেশি কারুকার্য লক্ষ করা যায়। সম্পূর্ণ মন্দিরটি টেরাকোটার ফলক ও ফুলকারি নকশার দ্বারা কারুকার্য করা হয়েছে। এই মন্দিরটিতে পূর্বোক্ত দেউলেশ্বর মন্দিরের ন্যায় ভাস্কর্য লক্ষ করা যায়। যেমন, মহিষমর্দিনী দশভুজা; চতুর্ভুজ দেবতা; বন্দুকধারী সৈনিক; উপবিষ্ট পুরুষ; প্রভৃতি।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের সেবাইত পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

[২] পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

****

[২৫] চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি নিয়ে আলোচনার পূর্বে মন্দিরটি যে গ্রামে অবস্থিত, সেই গ্রাম সম্পর্কে কিছু কথা বলে রাখা প্রয়োজন। বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার, বুদবুদ থানার অন্তর্গত কসবা গ্রাম। গ্রামটি প্রাচীন এবং বর্ধিষ্ণু। দামোদর নদের তীরবর্তী এই গ্রামকে কেন্দ্র করে, একটি কিংবদন্তি সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। কিংবদন্তি হল, 'মনসামঙ্গল কাব্য'এর কেন্দ্র বিন্দু চাঁদ সদাগরের চম্পাই নগর এই গ্রামেই অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ এই গ্রামই প্রাচীন চম্পাই নগর। কসবা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে চম্পাই নগরটি অবস্থিত ছিল, তার প্রমাণ মেলে শিবমন্দির ও সাঁতালি পর্বত (একটি মাটির উচ্চ ঢিবি) থেকে। মানুষের বিশ্বাস যে, উক্ত মন্দির ও সাঁতালি পর্বত চাঁদের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। চাঁদ সদাগরের শিবমন্দির থেকে সাঁতালি পর্বতের দূরত্ব ৩০০মিটারের মতো। এই মাটির ঢিবির উপরেই বেহুলা-লখিন্দরের বাসরঘর রচিত হয়েছিল বলে এখনকার মানুষের বিশ্বাস। মনসামঙ্গলের সাঁতালি পর্বতের কাহিনি হল এই ৫০ফুট উঁচু মাটির ঢিবিকে নিয়েই কল্পিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। চম্পাই নগর যে কোথায় অবস্থিত, তেমন কোন ভৌগোলিক অবস্থানের কথা কোন কবি বলেননি। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের কবিগণ তাঁদের পরিচিত স্থানকে নিয়েই মনসামঙ্গলের লৌকিক কাহিনির কাব্যরূপ দিয়েছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ যে চম্পাই নগরের উল্লেখ করেছেন, তা অবশ্যই বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। সেদিক থেকে অধুনা কসবা গ্রামের চম্পাই নগর সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায়। এই গ্রাম কিন্তু চম্পাই নগর পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব কসবা গ্রাম যে প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত চম্পাই নগর, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সাঁতালি পর্বতের পশ্চিমে প্রায় ৩০০মিটার দূরবর্তী স্থানে চাঁদ সদাগরের শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ এখনও বর্তমান। এই মন্দির ও লিঙ্গমূর্তি শৈব চাঁদ সদাগর কর্তৃক স্থাপিত বলে, এই গ্রামের মানুষের বিশ্বাস। চাঁদ অবশ্য ধনী বণিক ছিলেন। তাঁর দ্বারা এই মন্দির ও মূর্তি স্থাপন অসম্ভব ছিল না। কিন্তু চাঁদ সদাগরের কাহিনি কতটা বাস্তব, আমাদের কাছে তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। যা আছে, তা হল কিংবদন্তি, মন্দির ও লিঙ্গমূর্তি আর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিলীয়মান চিহ্ন। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কীত কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

এই মন্দিরটি একটি ঐতিহাসিক মন্দির। মন্দিরটি চারচালা রীতির। গর্ভগৃহের প্রবেশপথ একটি। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই খিলানযুক্ত উন্মুক্ত বৃহৎ বারান্দা রয়েছে। পূর্বমুখী এই মন্দিরটির দক্ষিণপার্শ্বে আরও একটি ক্ষুদ্র দালান মন্দির রয়েছে। মূল মন্দিরটি চুন, সুরকি ও ইঁটের তৈরি, যা বর্তমানে সিমেন্ট বালির পলেস্তারায় ঢাকা পড়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ :

মন্দিরটির পরিসর বৃহদাকৃতির। সেই কারণে পরিমাপ নেওয়া সম্ভবপর হয়নি।

বিগ্রহ :

শোনা যায় উক্ত মন্দিরে পূর্বে দুটি মন্দির ছিল, একটি রামেশ্বর ও অপরটি বাণেশ্বর। বাণেশ্বর মন্দিরটি কালাপাহাড়ের সময় ধ্বংস হয়ে যায়। যদিও বর্তমানে রামেশ্বর শিব মন্দির নামে একটি মন্দিরই বর্তমান, তাতে কৃষ্ণবর্ণের একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এছাড়াও অদূরে দেবী মনসার একটি ছোট মন্দির রয়েছে। রামেশ্বর শিবলিঙ্গের কোন গৌরীপট্ট নেই। মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে একটি ষাঁড় এবং আরও একটি কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ পূজিত হয়।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি একটি বিরাট বেলেপাথর নির্মিত। বিগ্রহের উচ্চতা- ৭′ বিগ্রহের ব্যাস- ৮′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – বর্তমানে মন্দিরটি কালীসাধন নায়ক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার সকাল ৮.৩০মিনিটে খোলে এবং বেলা ১টার সময় বন্ধ হয়। আবার বিকেল ৩টের সময় উন্মুক্ত হয়ে রাত ১০টা নাগাদ বন্ধ হয়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের পুরোহিত শ্রী অশোক ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, মন্দিরটির কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের ব্যয় বহন করেন কালীসাধন বাবুর পরিবার। এছাড়া দর্শনার্থীদের দক্ষিণা দ্বারা কিছু আয় হয়। মন্দিরের কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নেই।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – শিবরাত্রি তিথিতে বিশেষ পূজা হয়। এছাড়াও চৈত্র মাসে গাজন হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – মন্দিরে গাজনকে কেন্দ্র করে উৎসব হয়। এছাড়া আর কোন উৎসব হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠানে যা ব্যয় হয়, তা ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারা এবং বাকি অংশ কালীসাধন বাবুর পরিবার কর্তৃক বহন করা হয়। উৎসব অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত দক্ষিণা কালীসাধন বাবু ও পুরোহিত মহাশয়ের মধ্যে বিভাজন হয়।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য চিড়ে, কলা, ফল, মিষ্টান্ন সহযোগে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। প্রতি পূর্ণিমায় খিচুড়ি ভোগ হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিতের মাসিক বেতন কালীসাধন বাবু ধার্য করে রেখেছেন। তিনিই এই বেতন দিয়ে থাকেন।

(ঞ) ভক্ত সমাগম –এই মন্দিরে নিত্য ভক্ত সমাগম হয় না। স্থানীয় গ্রামবাসীরা নিত্যপূজা দিয়ে থাকেন। তবে পূর্ণিমায় এবং গাজন উপলক্ষ্যে অনেক ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে কোন বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – ১৩৩৫বঙ্গাব্দে গন্ধবণিক মহামন্ডলের পক্ষ থেকে শ্যামাচরণ, মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন। আর একবার মন্দিরটি ১৪০৮বঙ্গাব্দে সংস্কার করা হয়েছে। তবে বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরটিতে কোন কারুকার্য বা ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] বিগ্রহের পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য মন্দিরের পুরোহিত কর্তৃক প্রাপ্ত।

****

॥ বর্ধমান জেলার শক্তি মন্দির ॥

[১] কয়রাপুর গ্রামের দেবী ত্রৈলোক্যতারিণী মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কয়রাপুর গ্রামের দেবী ত্রৈলোক্যতারিণী মন্দিরটি সেন বংশের দ্বারা সেন আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায় পুরোহিত মহাশয়ের নিকট থেকে। কিন্তু নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি দক্ষিণমুখী দেউল রীতির মন্দির। গর্ভগৃহে প্রবেশপথ একটি। মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ আকৃতির দালান রীতির নাটমন্দির রয়েছে। মন্দিরের পূর্বদিকে রয়েছে একটি রন্ধনশালা। সেখানে দেবীর ভোগ রান্না করা হয়।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তনের উচ্চতা-	৩′	আয়তন-	২০′ × ২০′
দ্বারের দৈর্ঘ্য-	৬.৬′	দ্বারের প্রস্থ-	২.৫′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে বিগ্রহ হিসেবে পূজিত হন দেবী ত্রৈলোক্যতারিণী। দণ্ডায়মান অষ্টভুজাদেবীর বামহস্ত গুলিতে রয়েছে কমন্ডলু, ঘন্টা, ধনুক এবং অপরটিতে কোন আয়ুধ রয়েছে কিনা, সেটি স্পষ্ট নয়।দক্ষিণ হস্তগুলিতে রয়েছে শঙ্খ, তির, তরোয়াল এবং অন্যটিতে পুষ্প সজ্জিত হওয়ার কারণে অনুমান করা যায়নি।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

বিগ্রহটি কষ্টি পাথরে নির্মিত। আনুমানিক উচ্চতা- ২′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরের পুরোহিত শ্রী সুশান্ত মুখার্জী দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সেন বংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি বর্তমানে একটি মন্দির কমিটির মালিকানাধীন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – প্রতিদিন দু'বেলা পূজা হয়। মন্দিরের দ্বার খোলে সকাল ১০টায়। নিত্যসেবার পর বেলা ১২টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হয়ে ৭টা নাগাদ বন্ধ হয়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। মন্দিরের যাবতীয় খরচ ভক্তগণ ও মন্দির কমিটি বহন করে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণনবমী তিথিতে দেবীর বাৎসরিক পূজা সম্পন্ন হয়। চৈত্র মাসের রাম নবমী তিথিতে বিশেষ পূজার আয়োজন হয় এবং তিনদিন ধরে এই পূজা চলে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণনবমী তিথির বাৎসরিক পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। নানা অনুষ্ঠান হয়।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসবের সময় আগত দর্শনার্থীদের দক্ষিণাই মন্দিরের সেবায় ব্যয় করা হয়। বাকী অর্থ মন্দির কমিটির সদস্যরা এবং সেবাইতগণ ব্যক্তিগত ভাবে দিয়ে থাকেন।

(জ) ভোগ – মন্দিরে প্রতিদিন পরমান্ন ভোগ নিবেদন হয়। অন্নভোগ হয় না। মাঝেমধ্যে ছাগ বলি হয়। বাৎসরিক পূজায় ও বিশেষ পূজার সময় প্রচুর ছাগবলি দেওয়া হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – মন্দিরের ৬টি সেবাইত পরিবার রয়েছে। প্রধান পুরোহিত শ্যামাপদ মুখার্জী। পুরোহিতদের বেতন মন্দির কমিটি থেকেই নির্দিষ্ট করা রয়েছে।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – বিশেষ তিথির পূজার সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে অন্নভোগ নিষিদ্ধ।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – প্রাচীন এই মন্দিরটিকে ভবিষ্যতে রঙ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের পুরোহিত।

[২] পরিমাপ সম্পর্কিত তথ্য নিজস্ব সংগ্রহ।

****

[২] ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যার সতীপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

‘পীঠ’ কথাটির অর্থ দেবতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এটাই ছিল প্রাচীনকালের ধারণা। তবে সব অধিষ্ঠান ক্ষেত্র যে পীঠ হত তা নয়। পীঠের সঙ্গে প্রাচীনতা, জনপ্রিয়তা, তথাকথিত মাহাত্ম্য ইত্যাদির যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মচারীগণ বিভিন্নতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পীঠকে কখনও শৈবপীঠ, কখনও শাক্তপীঠ এবং বৈষ্ণবপীঠ বা বৈষ্ণবপাট বলা হয়। তবে ‘পীঠ’ বলতে সাধারণত শাক্তপীঠকেই বোঝান হয়। শাক্তপীঠস্থলে যখন দক্ষকন্যা সতীর খণ্ডিত দেহাংশের উপস্থিতি বোঝায়, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় সতীপীঠ।

পৌরাণিক কাহিনি হল, পিতা দক্ষের গৃহে দক্ষরাজ কর্তৃক স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। তখন শিব সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে উন্মত্তের মত নৃত্য করতে থাকেন। এই অবস্থার অবসান করার জন্য মহাশক্তি সতীর দেহ ভগবান শ্রীবিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা একান্নটি খন্ডে খণ্ডিত করে দেন। ঐ একান্নটি খণ্ডিত অংশ একান্নটি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিটি স্থান এক একটি সতীপীঠস্থান হিসেবে মর্যাদা পায়। বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মঙ্গলকোট ব্লকের ক্ষীরগ্রাম সেইরূপ একটি সতীপীঠ।

পীঠদেবী বর্তমানে যোগাদ্যা এবং পীঠভৈরব এখন ক্ষীরেশ্বর বা ক্ষীরকন্টক নামে প্রসিদ্ধ। ক্ষীরগ্রামে সতীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়েছিল বলে কথিত রয়েছে। সংস্কৃত পীঠমালা, ঘনরাম চক্রবর্তীর ‘শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য’ (শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬২), ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’ এবং আরও নানা গ্রন্থে এই দেবীপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।

একান্নটি পীঠের একটি অন্যতম পীঠ হল এই ক্ষীরগ্রাম। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার পীঠগুলির মধ্যে একমাত্র যোগাদ্যাপীঠের নামই কুব্জিকাতন্ত্রের পুথিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কারণে যোগাদ্যাপীঠ কাটোয়া মহকুমার অন্যান্য পীঠ থেকে স্বতন্ত্র, জনপ্রিয় এবং প্রাচীন। বহু প্রাচীনকাল থেকে এই অঞ্চলে একটি কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। সেটি হল- রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে যাওয়ার পর হনুমান সমুদ্র অতিক্রম করে নিঃশঙ্কচিত্তে লঙ্কাপুরীতে অবতীর্ণ হন। তারপর মহীরাবণ যখন লঙ্কাযুদ্ধের সময় মহামায়ার সমক্ষে বলিদান দেওয়ার জন্য মায়াবলে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষণকে হরণ করে পাতালে প্রস্থান করেন, তখন মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান অনুসন্ধান করে পাতালপ্রবিষ্ট হয়ে মহীরাবণকে বধ করে শ্রীরাম ও লক্ষণকে উদ্ধার করেন এবং সেই সঙ্গে দেবী যোগাদ্যাকে আনয়ন করে ক্ষীরগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন।

যোগাদ্যাবির্ভাব সময়ে দেবী ক্ষীরগ্রামে মৃত্তিকা দেউলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্রামের বিত্তবান আগুরি সম্প্রদায়ভুক্ত হরিদত্ত নামক পরমধার্মিক নরপতিকে স্বপ্নাদেশ দেন। স্বপ্নাদেশ পেয়েই রাজা দেবীর পূজার প্রচলন করেন। দেবীর আদেশে নিত্য নরবলি দিয়ে তাঁর তৃপ্ত সাধন করতে হতো। রাজার সাতপুত্র দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে প্রজাদের প্রতিটি বাড়ি থেকেই একজন করে বলি দেওয়া হতে থাকে। এইভাবে একদিন যোগাদ্যাদেবীর পূজারি ব্রাহ্মণের বলির দিন এল এবং পূর্বদিন রাতে ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে একমাত্র পুত্র সন্তান সহ পলায়নের জন্য গ্রাম ত্যাগ করার সময় পথমধ্যে দেবী পথরোধ করে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেন এবং বরাভয় দেন

নির্ভয়ে গ্রামে ফিরে যেতে। সেই থেকে আর কোন দিন নরবলি দিতে হয়নি। এরপর রাজার সাতপুত্র সহ উৎসর্গীকৃত সকল নিরীহপ্রাণ পুনরুজ্জীবিত হয় এবং মহামায়ার মহাপ্রভাব দিগন্তব্যাপ্ত হয়ে দেবী যোগাদ্যার জয়জয়কার হতে শুরু করে।

এছাড়াও ধামাচিয়ার ঘাটে ভানুদত্ত নামে জনৈক এক শাঁখারীর নিকট হতে দেবীর শাখা পড়ার একটি কাহিনিও লোকমুখে শোনা যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এখনও সেই শাঁখারীর পরিবারের থেকেই দেবীর পূজার শাখার ব্যবস্থা করা হয়।

দেবী যোগাদ্যার বর্তমান মন্দিরটি সম্ভবত একাদশ শতকে নির্মিত, বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নীরদবন্ধু সান্যাল এই মত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান মন্দিরটির পূর্বে এখানে অন্য একটি মন্দির ছিল। পরবর্তীকালে বর্ধমানরাজা কীর্তিচাঁদ একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছেন।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

গ্রামের মাঝে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই মন্দির প্রাঙ্গণে গর্ভগৃহটি ত্রিরথাকৃতি, গম্বুজাকৃতি অর্ধমন্ডপ। দক্ষিণে নাটমন্দির, বলির যুপকাষ্ঠ এবং উত্তর দিকে শ্যামরায় ও শ্রীরাধার একটি মন্দির বর্তমান। পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। অনতিদূরে উত্তর- পশ্চিমে ক্ষীরকন্টক ভৈরবের একটি উচ্চ মন্দির রয়েছে। আর রয়েছে রন্ধনশালা, গুয়ো ডাকার বেদী ও অতিথিশালা।

মন্দিরের পরিমাপ :

মন্দিরের পরিমাপ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় নেওয়া সম্ভবপর হয়নি।

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে দশভুজা মহিষমর্দিনী বিগ্রহ পূজিত হন। দেবীর মূল বিগ্রহের কোন চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি কারণ, মূর্তিটি সারাবছর শালশকটে গ্রামের পশ্চিমে ক্ষীরদিঘি নামক পুষ্করিণীতে নিমজ্জিত থাকেন। বিশেষ কয়েকটি তিথির গভীর নিশীথে তাঁকে সলিলসজ্জা থেকে তুলে মন্দিরে স্থাপন করে পূজা করে, সূর্যোদয়ের পূর্বেই যথাস্থানে পুনরায় নিমজ্জিত করে দেওয়া হয়। এবলমাত্র বৈশাখী সংক্রান্তি তিথির দিন তাঁর বিগ্রহটি একদিনের জন্য উত্থান মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে পূজার্চ্চনা করা হয়। কেবল ঐদিন ব্যতীত দেবীর আদতমূর্তি দর্শন সম্ভব নয়। তবে দেবীর মূর্তির একটি প্রতিরূপ মূর্তি পুষ্করিণী সংলগ্ন একটি নব নির্মিত মন্দিরে পূজা করা হয়। শোনা যায় পূর্বে দুবার ঐমূর্তি লুণ্ঠিত হয়। যদিও প্রতিবারই মূর্তিটি স্বস্থানে দৈববলে ফিরে এসেছে। তাই সুরক্ষার তাগিদেই এই ব্যবস্থা।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

দেবী যোগাদ্যার মূল বিগ্রহটি কষ্টিপাথরের নির্মিত। মূর্তিটির দর্শন না মেলায় এঁর পরিমাপ ও গঠনাকৃতি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – এই মন্দিরটি বর্তমানে বারোয়ারি মন্দির। গ্রামবাসীদের একটি সংগঠন 'শ্রী যোগাদ্যা মন্দির উন্নয়ন কমিটি' এর মালিকানাধীন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – গ্রামবাসীদের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মন্দিরের দ্বার সকাল ১০টার মধ্যে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারপর বেলা ১টার সময় গর্ভগৃহের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বিকেল ৪টের সময় দ্বার উন্মুক্ত হয়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর দ্বার রুদ্ধ হয়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরের এই দেবীর সেবা ও পূজার জন্য বর্ধমান রাজার দান করা অনেক সম্পত্তি রয়েছে। তাছাড়া ভক্তগণের দক্ষিণা দ্বারাও আয় হয় এবং মন্দিরের সেবায় ব্যয় করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – যোগাদ্যা মাতার নিত্যপূজা কবে থেকে শুরু হয়েছিল সেই সংক্রান্ত কোন তথ্য জানা যায় না। দুর্গাপূজার আগে ও পরে নানা অনুষ্ঠান হয়। ১৫ই বৈশাখ উৎসবের লগ্ন। মহাপূজা শুরু হয় ঐদিনই। দেবীপূজায় অংশগ্রহণে প্রাধান্য লক্ষ করা যায় উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরিদের। এছাড়া ব্রাহ্মণ ও ডোমরাও বিশেষ ভাবে অংশ নেয়।

দেবীর পুজায় যে বাঁশের ঝাপি দেওয়া হয়, স্থানীয় ডোমরাই সেটি তৈরি করেন। বলিদান অনুষ্ঠানও ডোমরাই করে থাকে। এর থেকে অনুমান করা যায়, এই অঞ্চলের আদিবাসিন্দা হল এই ডোম জাতি, তাই এই পূজায় অন্যান্য উচ্চজাতির সাথে তাদেরও বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যোগাদ্যা দেবীর পূজার বার্ষিক পূজা ১৫ই বৈশাখ থেকে শুরু হলেও, এর সূত্রপাত হয় চৈত্র তথা শিব সংক্রান্তির দিন। উৎসব লগ্নের শেষদিনে ধামাচিয়ার বিশাল পুষ্করিণীতে দেবীর সলিল সমাসীন হয়।

পুনরায় ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে রাতে দেবীকে জল থেকে তুলে সাধারণের দর্শনের পর অভিষেক বা পঞ্চামৃত দ্বারা সংস্কার করে গভীর রাত্রিকালে পূজা ও বলি অন্তে পুনরায় নিমজ্জিত করে দেওয়া হয়। আর বছরের মাত্র ৫দিন দেবীকে জল থেকে তোলা হয়। যেমন, অক্ষয় নবমী, বিজয়া দশমী, ১৫ই পৌষ, মাকুরী সপ্তমী ও পাটনড়ান বা বৈশাখী সংক্রান্তির দুইদিন পূর্বে গভীর নিশীথে দেবীকে জল থেকে তুলে পূজার্চ্চনা ও বলিদান অন্তে পুনরায় সূর্যোদয়ের পূর্বে নিমজ্জিত করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য হচ্ছে, এই দিনগুলিতে মন্দিরে গ্রামস্থ পূজারি সামন্ত, দত্ত ও ডোম ছাড়া আর কেউ থাকতে পারে না। পূর্বে প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে মন্দিরে ছাগবলি হত, এখন বৈশাখী সংক্রান্তি ও দুর্গানবমীতে বলি হয়। এছাড়া মেষ ও একটি মোষ বলি হয়ে থাকে। পূর্বের নরবলির নমুনা হিসেবে, ডোম গোষ্ঠীর কোন একজন সবল পুরুষ দেহে বেলকাঁটা ফুটিয়ে দু'ফোঁটা রক্ত দেবীকে নিবেদন করে বলে, 'নে মা রক্ত খা'!

ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা পূজায় আগুরিদের সঙ্গে ডোম তথা অন্ত্যজ শ্রেণির মূখ্য ভূমিকা দেখে মনে হয়, এই পূজা, প্রকারান্তরে এই সমস্ত সিদ্ধপীঠ, শাক্তপীঠ, সতীপীঠ, উপপীঠ ইত্যাদিগুলি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সাধনপীঠ। ক্ষীরগ্রামের ডোম সম্প্রদায় হয়তো পরবর্তীকালে বিত্ত ও শক্তির প্রতাপে সামনে চলে আসেন। সিদ্ধপীঠগুলি সতীপীঠ আখ্যাও অনেক পরে পেয়েছে, অন্তত ষোড়শ শতকের আগে পায়নি। ক্ষীরগ্রাম ছাড়াও বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৫০টি গ্রামে যোগাদ্যা দেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে। 'মহাপীঠনিরুপনম তন্ত্র'তে যোগাদ্যা দেবীকে ভূতধাত্রী বা কৃষিদেবী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

"ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকন্টক
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষানুঙ্গুষ্ঠ পদোপম।।"

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – যোগাদ্যা দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে কোন সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠান হয় না। কিন্তু যোগাদ্যা পূজার শেষে 'গুয়ো ডাকা'র অনুষ্ঠানটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি উচ্চবেদীর উপর ঘট স্থাপন করে পুরোহিত ও যোগাদ্যার পূজার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীকে (বর্তমানে গ্রামের মন্দির কমিটির নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি) সাক্ষী রেখে মালাকার হাতে পান ও সুপুরি নিয়ে 'গুয়ো ডাকে'। যেমন, 'ফোপল মশায়ের গুয়ো', ভরতদত্ত শাসমলের গুয়ো, নাসগাঁয়ের আগুরি কেউ আছ? কোলগাঁয়ের আগুরি কেউ আছ? কুড়মুনের আগুরি কেউ আছ – বলে মালাকার উচ্চস্বরে ডাকে এবং কেউ সাড়া দিলে তার হাতে পান সুপুরি দিয়ে দেয়। একে 'গুয়ো ডাকা' বলে, এর অর্থ আগুরি (উগ্রক্ষত্রিয়) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে গাঁওয়ারী সম্মান জানানো। বিভিন্ন জায়গায় পান সুপুরি দিয়ে সম্মান জানাবার রীতি আছে।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – যাবতীয় অনুষ্ঠানের ও বিশেষ পূজার খরচ মন্দির কমিটি নিয়ন্ত্রণ করে।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে অন্নভোগ ও পরমান্ন নিবেদন হয়। সাথে ফল, মিষ্টান্ন থাকে।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের 'শ্রী যোগাদ্যা মন্দির উন্নয়ন কমিটি' পুরোহিত নিয়োগ করে এবং বেতন নির্দিষ্ট করে থাকে।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – এই মন্দিরে নিত্য লোক সমাগম হয়। বিশেষ তিথির পূজার সময়গুলিতে অজস্র ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দির প্রাঙ্গণে জুতো নিয়ে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সমস্ত বৈশাখ মাস ধরে গ্রামের কেউ ছাতা ব্যবহার করতে পারে না, কেউ গৃহে সলতে পাকায় না, অন্নে কাঠি দেয় না, হলকর্ষণ করেনা, এক শয্যায় কোন রকম স্ত্রী-পুরুষ শয়ন নিষিদ্ধ, ধান থেকে তন্ডুল উৎপাদন নিষিদ্ধ। বৈশাখের প্রথম ও শেষ পাঁচদিন,

লগনের (১৫ই বৈশাখ) দিন কর্মবিরতি এবং লিখনবন্ধ, উত্তরদ্বারী গৃহে কেউ বসবাস করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। দেবী নির্দেশিত বিধিনিষেধগুলি সম্ভবত আর্যেতর জাতির সংস্কার।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – যোগাদ্যা মন্দির উন্নয়ন কমিটি, ক্ষীরগ্রাম ও মা যোগাদ্যা।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরটিতে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] শ্রী যোগাদ্যা মন্দির উন্নয়ন কমিটি, ক্ষীরগ্রাম ও মা যোগাদ্যা; ক্ষীরগ্রাম, কাটোয়া; ১৪২০।

[২] মন্দিরের সেবাইত।

****

[৩] তেজগঞ্জের বিদ্যাসুন্দর মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

বিদ্যাসুন্দর কালীবাড়ির কাহিনি ছড়িয়ে আছে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যে। বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা এবং কাঞ্চী দেশের গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র হলেন সুন্দর। এদের দুজনের প্রেম কাহিনি নিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে ভারতচন্দ্র এই কাব্য রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসুন্দর কালীবাড়ির পূর্ববর্তী পূজারি এই কালীবাড়ির ইতিহাস এবং তার বৃত্তান্ত লিখে কাঠের কাঠামোয় বাঁধিয়ে দিয়ে গেছেন। যাতে এই কালীবাড়ির ইতিহাস জানতে অসুবিধা না হয়। বিদ্যাসুন্দর এবং ঁমা কালীর কথা আলোচনার পূর্বে তেজগঞ্জ জায়গাটি সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

পূজারি হরিশঙ্কর বটব্যাল লিখেছিলেন যে, বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদ এই কালী মন্দিরে এসে পূজা করতেন। তখন তেজগঞ্জে ভীষণ জঙ্গল ছিল। কেউ একাএকা যাতায়াত করতে পারত না। যারা অন্যায় অত্যাচার করত, তাদের মায়ের কাছে নিয়ে এসে নরবলি দেওয়া হত। তখন মায়ের নাম ছিল দক্ষিণ মশানী কালী। পূজারি মহাশয় লিখেছেন, তখন এখানে সুন্দর নামে এক পূজারি ছিলেন। আর রাজার একটি কন্যা ছিল। তার নাম বিদ্যা। রাজবাড়িতে একজন মালিনী ছিল, যে প্রতি ঠাকুরবাড়িতে ফুলের মালা দিত। তিনি একদিন এই কালীবাড়িতে ফুলের মালা নিয়ে আসেন। সুন্দর, মালাটি দেখে ফুলের মালাটি কে গেঁথেছে, তাঁকে একবার দেখতে চান। কিন্তু মালিনী জানায় যে সে রাজবাড়ি থেকে তাঁকে আনতে পারবে না। একথা শুনে সুন্দর বলে যে, সে কি রকম বাড়িতে থাকে, তা বর্ণনা করতে, এবং সে ওই বর্ণনা শুনে একটি ছক আঁকবে। মালিনী তাই করে। তারপর থেকে সেই গুপ্তপথ ধরে সুন্দর বিদ্যার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে তারা প্রেম সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। রাজামশাই ঘটনাটি জানতে পারায় তিনি সুন্দর ও বিদ্যাকে বলি দেওয়ার আদেশ করেন। যে কাপালিক তাঁদের বলি দেবে, তাকে বিদ্যা-সুন্দর বলে যে তাঁরা মাকে ডাকতে চায়, এবং মাকে ডাকার পর যেন তাঁদের বলি দেওয়া হয়। তারপর তাঁরা দুজন মাকে ডাকতে থাকে, এবং কাপালিক হঠাৎ মূর্ছা গিয়ে ভূপতিত হয়ে যায়। বিদ্যা-সুন্দর কোথায় যে চলে যায়, তারপর থেকে তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর সেই সময় থেকেই এই মন্দিরের নাম বিদ্যাসুন্দর কালীবাড়ি হয়। অর্থাৎ এই মন্দির কবে, কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সঠিক ভাবে জানা যায়না। তবে বর্তমান পুরোহিত শ্রী অসিত মজুমদারের বক্তব্য অনুযায়ী, মন্দিরটি প্রায় ৩০০বছরের পুরোনো। এই মন্দিরের সম্মুখে রয়েছে উত্তরমুখী একটি শিব মন্দির। এটি অনেক পরবর্তী সময়ে তৈরি হয়েছে বলে জানা যায়।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি দালানরীতিতে নির্মিত। মন্দিরটিতে ত্রিখিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা রয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বার একটি। মন্দিরটির চারটি সিঁড়ি। মন্দিরটির সম্মুখে পুরোহিতের বাসস্থান। বর্তমানে মন্দিরটি রঙ করে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে তোলা হয়েছে, ফলে মন্দিরটিতে কোন প্রাচীনত্বের ছাপ নেই। মন্দিরের বিপরীতে উত্তরমুখী

একটি শিব মন্দির রয়েছে যেটি আটচালা রীতির। তার গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার একটি। এই মন্দিরের সম্মুখে রয়েছে বলি দেওয়ার হাঁড়িকাঠ।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

তলপত্তনের উচ্চতা- ২.৬′ আয়তন- ২২′ × ২২′

দ্বারের প্রস্থ- ৩′ দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৬.৬′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে নিত্য সেবিত চতুর্ভুজা দেবী কালী শিবের উপর দণ্ডায়মান। উর্দ্ধের বামহস্তে খড়্গ এবং নিম্নের বামহস্তে অসুরমুণ্ড। দক্ষিণ হস্তগুলি উন্মুক্ত। দেবীর ললাটে একটি বৃহৎ রূপোর নেত্র এবং শিরে একটি বৃহৎ মুকুট রয়েছে। এই মন্দিরে পঞ্চমুন্ডির আসন প্রতিষ্ঠিত আছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের দেবীমূর্তিটি প্রস্তর নির্মিত। গর্ভগৃহে প্রবেশাধিকার নেই, তাই বিগ্রহের পরিমাপ পাওয়া যায় নি। তবে পরিমাপ অনুমান করা যায়, বিগ্রহটির উচ্চতা- ৩′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরের পুরোহিত শ্রী অসিত মজুমদার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুসারে মন্দিরটি বর্তমানে তাঁরই মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুরক্ষার দায়িত্ব তাঁর পরিবারের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে। বংশ পরম্পরায় এঁনারাই মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার খোলে সকাল ৬টায়। নিত্যসেবার পর সকাল ১০টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হয়। ৭টায় শেতল হয়ে রাত ৮টায় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই, কারণ মন্দিরটির সম্পত্তি বর্ধমানরাজা পূজারি হরিশঙ্কর বটব্যালকে উইল করে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের পুরোহিতের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মন্দিরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। মন্দিরের যাবতীয় খরচ পুরোহিত পরিবারই বহন করেন। পূর্বে বর্ধমান রাজারাই মন্দিরের সকল খরচ বহন করতেন।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে কার্তিক মাসে কালীপূজা হয়। সাথে ছাগ বলির প্রচলন আছে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে কার্তিক মাসে কালীপূজা ব্যতীত অন্য কোন উৎসব অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – কার্তিক মাসের কালীপূজার খরচা পুরোহিত পরিবারই বহন করে থাকেন। বর্ধমান রাজা পূজার যাবতীয় খরচ দেওয়া বহুকাল পূর্বেই বন্ধ করে দিয়েছেন।

(জ) ভোগ – মন্দিরে প্রতিদিন মাছ সহযোগে অন্নভোগ ভোগ নিবেদন করা হয়। পূর্বে বর্ধমানরাজার তত্ত্বাবধানে যখন মন্দিরটি ছিল, তখন প্রত্যেকদিন ২০কেজি চালের ভোগ হতো। প্রতি অমাবস্যায় মায়ের সামনে ছাগবলি হতো আর সেই মাংস রাজবাড়িতে যেত। বর্তমানেও সেই অন্নভোগ হলেও, তার পরিমাণ খুবই সামান্য।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – মন্দিরের পুরোহিত অসিত মজুমদার মহাশয়ের পূর্বপুরুষ এই মন্দিরের সেবা করেছেন। বর্তমানে এই মন্দিরে তিনি পূজা করছেন, তাই আলাদা করে কোন বেতনের ব্যবস্থা নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – নিত্য মন্দিরে ভক্ত সমাগম তেমন হয় না। তবে বিশেষ তিথির পূজার সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে মন্দির রঙ করা হয়েছে এবং পাথর দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ বাঁধানো হয়েছে। কোনরকম ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত পরিকল্পনা করা হয়নি।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরের সম্মুখাংশে দুপাশে দুটি ফিগারেটিভ প্যানেল রয়েছে। তবে অনুমান করা যায়, দেবদেবীদের মূর্তির ফলকই বসানো রয়েছে, তবে রঙের প্রলেপ পড়ায় সেগুলি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরের থামগুলিতে ফুলকারি নকশা রয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] পরিমাপ সম্পর্কিত তথ্য নিজস্ব সংগ্রহ ।

[২] মন্দিরের সেবাইতগণ।

****

[৪] বর্ধমান শহরের সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

বর্ধমান শহরের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত দেবী সর্ব্বমঙ্গলা সর্বজনপূজিতা। এই দেবীমূর্তিকে কে বা কবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আদি পূজাবেদী কোথায় ছিল তা জানা যায় না। ষষ্ঠ কুব্জিকাতন্ত্রে বর্ধমানে মঙ্গলা দেবী পিঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনাকার মানিক দত্ত, নতুন বর্ধমানকেই 'দেবী পিঠ' বড় বর্ধমান বলেছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ও রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং দেবী সর্ব্বমঙ্গলা নিঃসন্দেহে অতিপ্রাচীন।

দেবী সম্বন্ধে কিছু কাহিনি প্রচলিত আছে। বর্ধমানের উত্তরে বাহির সর্ব্বমঙ্গলা পল্লীতে দেবীর প্রস্তর নির্মিত মূর্তিটি এক বাগদী বাড়িতে ছিল। বাগদীরা এই প্রস্তর খন্ডের উপর গুগলি, ঝিনুক, শামুক ভাঙত। চুনুরীরা চুন করবার জন্য ঐগুলি কুড়িয়ে নিয়ে যেত। একদিন চুনুরীরা ঐ প্রস্তর খণ্ডটিকে আগুনে দিয়ে দেয়। তারপর তারা দেখতে পায় প্রস্তর খণ্ডটি অবিকৃত রয়েছে। তখন চুনুরীরা স্থানীয় ব্রাহ্মণের হাতে ঐ পাথরটিকে তুলে দেয়। ব্রাহ্মণ সেটি জলে ধুয়ে পরিস্কার করে দেখেন, এক অপূর্ব দেবীমূর্তি। সেই রাত্রেই দেবী বর্ধমান রাজাকে স্বপ্নাদেশ দেন যে তিনি, দামোদরের তীরে চুনের ভাটায় শিলা রূপে আছেন, তাঁকে উদ্ধার করে রাজবাড়ির কাছে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজার ব্যবস্থা করতে। ভোর না হতেই রাজা চুনভাটায় গিয়ে জানতে পারেন যে, তাঁর সেখানে পৌঁছানোর আগেই তিনজন ব্রাহ্মণ ঐ শিলাটি পূজার জন্য নিয়ে গেছেন। শোনামাত্র রাজা ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে মায়ের স্বপ্নাদেশের কথা জানিয়ে শিলাটি ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ দেবী বিগ্রহটিকে ফেরত দিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় রাজা তাঁদের বলেন দেবীর অধিকারী তাঁরাই হবেন, তিনি শুধু দেবীর মন্দির নির্মাণ করিয়ে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবেন এবং তাঁর পূজার সমস্ত ব্যয় তিনিই করবেন। এতে ব্রাহ্মণগণ সম্মত হন। সেই মতোই রাজবাড়ির কাছে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়ে দেন। ব্রাহ্মণগণ সেখানে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে অনুমান করা যায় যে, বর্ধমানরাজা চিত্রসেনের পূর্বে তাঁর পিতা কীর্তিচাঁদই দেবী মন্দিরটি ১৭৪০খ্রিঃ নির্মাণ করিয়েছিলেন। দেবী মন্দিরের দক্ষিণে রাজা তেজচাঁদ নির্মিত তিনটি শিব মন্দির এবং মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে চিত্রসেন নির্মিত দুটি শিব মন্দির রয়েছে। মন্দির গাত্রে গ্রথিত শিলালিপি থেকে জানা যায়, দক্ষিণপার্শ্বের শিবলিঙ্গটির নাম চন্দ্রেশ্বর এবং বামপার্শ্বের শিবলিঙ্গটির নাম ইন্দ্রেশ্বর। এই শিব মন্দিরগুলি নির্মাণের পূর্বেই দেবী মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে মাতা সর্ব্বমঙ্গলা ঠাকুরবাড়ি বর্ধমানের নিত্য তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

দক্ষিণমুখী এই সর্ব্বমঙ্গলা শক্তি মন্দিরটি নবরত্ন শৈলীর মন্দির। মন্দিরের রত্নগুলি প্রথমধাপে চারটি, দ্বিতীয় ধাপে চারটি এবং মাঝখানে একটি- এইভাবে সজ্জিত রয়েছে। মন্দিরের দুদিকে ত্রিখিলান যুক্ত ঢাকা বারান্দা রয়েছে। বারান্দার খিলানের মাঝে দ্বারগুলিতে লোহা দ্বারা নির্মিত দ্বার রয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করার জন্য তিনটি লৌহ নির্মিত দ্বার রয়েছে। যে দ্বারগুলির মাধ্যমে দর্শনার্থীরা পূজার অর্ঘ্য সামগ্রী দিয়ে দেবীকে আরাধনা করেন। মন্দিরের প্রত্যেকটি রত্নের শীর্ষে আমলক এবং ত্রিশূল রয়েছে। ত্রিশূলের সাথে একটি ধ্বজা লাগানো রয়েছে।

মন্দিরের পশ্চিমে একটি নাট্যমঞ্চ রয়েছে, এখানে নানা অনুষ্ঠান হয়। দেবী মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে নাটমঞ্চ রয়েছে। মন্দিরের চত্বরে অবস্থিত তিনটি শিব মন্দির উত্তরমুখী। আর মন্দির চত্বরের বাইরের দিকে অবস্থিত দুটি শিব মন্দির দক্ষিণমুখী।

উত্তরমুখী একটি শিব মন্দির আটচালা রীতির। এখানে ত্রিখিলান যুক্ত ঢাকা বারান্দা রয়েছে। এবং দুপাশে অবস্থিত বাকি মন্দির দুটি রেখদেউল রীতির। এই মন্দিরের শীর্ষে একটি ত্রিশূল এবং তার সাথে ধ্বজা লাগানো রয়েছে। মন্দিরগুলির প্রবেশদ্বার একটি। মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরের দিকের শিব মন্দির দুটি আটচালা রীতির এবং এদের প্রবেশদ্বার একটি করে। বর্তমানে প্রতিটি মন্দির গাত্র রঙ করে এবং প্রস্তর দ্বারা আবৃত করে সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছে। ফলে মন্দিরগুলিতে প্রাচীনত্বের কোন ছাপ নেই।

মন্দিরের পরিমাপ :

মন্দিরে ভিড় থাকায় এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমতি না মেলায় পরিমাপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিগ্রহ :

শ্রীশ্রী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী অষ্টাদশভুজা। মূর্তির চরণতলে মহিষ এবং তাঁর নিকট অসুর শায়িত আছেন। দেবী শূলাঘাতে মহিষাসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করছেন। দেবীর প্রতিটি হস্তে আয়ুধ রয়েছে। এই মূর্তিকে মন্বন্তরা মূর্তি বলে। মহারাজ রূপোর সিংহাসনে দেবীকে অধিষ্ঠিত করেন।

মূর্তির তলদেশে অস্পষ্ট কি লেখা তা কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। দেবীর মন্দিরে একটি সূর্যমূর্তি রয়েছে। পুরোহিতেরা বলে, তাঁর অঙ্গ থেকে সূর্যের ছটা বের হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত তিনটি শিব মন্দিরের মধ্যে, দেউল মন্দিরদুটিতে সাদা শিবলিঙ্গ এবং আটচালা মন্দিরটিতে কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ :

দেবী সর্ব্বমঙ্গলার মূর্তিটি কষ্টি পাথর এবং শিবলিঙ্গগুলি প্রস্তর নির্মিত। গর্ভগৃহে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ বলে, কোন বিগ্রহের পরিমাপ পাওয়া যায়নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব– মন্দিরের পুরোহিত শ্রী প্রশান্ত চ্যাটার্জী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মন্দিরটি বর্ধমান রাজার তৈরি, তাই মন্দিরটি বর্ধমানরাজার মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে। কিন্তু মন্দিরের বিগ্রহের উপর মালিকানাসত্ত্ব রয়েছে বেগুট ও রায়ান এই দুটি গ্রামের। তাই দুটি গ্রামের পূজার সেবাইতরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ১৫দিন করে পালা করে বিগ্রহের সেবা করে থাকেন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময়– সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের দ্বার খোলে সকাল ৬টায়। শনি, মঙ্গল ও রবিবার দ্বার রুদ্ধ হয় দুপুর ১টার পর, অন্যদিনগুলি বেলা ১২টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। আবার বিকেল ৪টের সময় মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে রাত্রি ৮.৩০টার সময় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। চৈত্র থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এরকম ব্যবস্থা করা রয়েছে। কার্তিক মাস থেকে মন্দির দ্বার সকাল ৬.৩০টার সময় খোলে।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের পুরোহিতের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মন্দিরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। যা আয় হয় ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারা, সেই অর্থই মন্দিরের সেবায় ব্যয় করা হয়। বর্ধমানরাজের রাজত্ব অধিগ্রহণের পর থেকে শ্রী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী মন্দিরের দায়িত্বে রয়েছে "শ্রীশ্রী সর্ব্বমঙ্গলা ট্রাস্ট বোর্ড"।

বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী কুমার মিত্রের প্রচেষ্টায় এটি গঠিত হয়। এই ট্রাস্ট বোর্ড মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ, পূজার্চনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে সমস্ত আয়- ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে জাঁকজমক করে দুর্গাপূজা ও বাসন্তী পূজা হয়। এছাড়া নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছেই। প্রতি অমাবস্যায় বলি হয়। দুর্গাপূজার নবমীর দিন মেষ, মোষ ও পাঁঠা বলি হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরটিতে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া অন্য কোন অনুষ্ঠান হয় না। দুর্গাপূজার সময় মন্দিরের চতুর্দিকে পাঁচদিন ব্যাপী মেলা বসে।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – উৎসব অনুষ্ঠানে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে "শ্রীশ্রী সর্ব্বমঙ্গলা ট্রাস্ট বোর্ড"এর ৭জন সদস্য।

(জ) ভোগ – মন্দিরে প্রতিদিন মাছ ও বিভিন্ন রকম সব্জী সহযোগে অন্নভোগ ও পরমান্ন ভোগ নিবেদন করা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – মন্দিরের ৫০জন সেবাইতের বেতন মন্দির কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – নিত্য মন্দিরে ভক্ত সমাগম হয়। বিশেষ তিথির পূজার সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে মুরগীর মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন নিষিদ্ধ।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে মন্দির সম্পর্কিত কোনরকম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের ত্রিখিলান যুক্ত বহিঃদ্বারের শীর্ষে এবং দুধারে টেরাকোটার ভাস্কর্যের সারি রয়েছে। কিন্তু ভাস্কর্যের ফলকগুলি খুব স্পষ্ট নয়। নতুন রঙের প্রলেপ পড়ার ফলে ফলকগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

মূল মন্দিরের সম্মুখে যে দুটি রেখদেউল রীতির শিব মন্দির রয়েছে, তার গর্ভগৃহের দ্বারের শীর্ষাংশে এবং দুধারে তিনটি করে ফিগারেটিভ প্যানেল আর মন্দিরগুলির পদভাগে দুটি ফিগারেটিভ প্যানেল রয়েছে।

চারচালা রীতির মন্দিরটির সম্মুখে বহিঃদ্বারের শীর্ষে একটি এবং মন্দিরের দুধারে দুটি ফিগারেটিভ প্যানেল রয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে যে দুটি মন্দির রয়েছে তার কেবলমাত্র বহিঃদ্বারের শীর্ষেই ভাস্কর্য রয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বামপার্শ্বের মন্দিরের মধ্যখানের দ্বারের শীর্ষাংশে মহিষাসুরমর্দিনীর ভাস্কর্যের ফলকটি। আর দক্ষিণপার্শ্বের মন্দিরটিতে দ্বারের শীর্ষে ফুলকারি নকশা করা রয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২।

[২] সরকার নীরদবরণ, বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত; কলকাতা; কল্যাণ বুক এজেন্সি; ২৪শে আগস্ট ২০০৮।

[৩] মন্দিরের পুরোহিতগণ।

****

[৫] কালনার শ্রীশ্রীঅম্বিকাসিদ্ধেশ্বরী মহামায়া মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

অম্বিকা কালনার অধিষ্ঠাত্রী হলেন দেবী অম্বিকাসিদ্ধেশ্বরী মহামায়া। ইনি হলেন পুরাণের অম্বুমুনির আরাধ্যা দেবী। ঐতিহাসিক ভাবে ইনি জৈন দেবী অম্বিকার রূপান্তরিত রূপ কালীমূর্তি হয়ে হিন্দু দেবী অম্বিকাসিদ্ধেশ্বরী রূপে পূজিত হচ্ছেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। সেটি হল- কালনায় সিদ্ধেশ্বরী পাড়া নামে একটি পাড়া রয়েছে। পূর্বে ওই অঞ্চল গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। রাজা চিত্রসেন কালনায় অবস্থানকালীন একদা ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বনের মধ্যে ঘণ্টা ধ্বনি শুনে শব্দ অনুসরণ করে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে লক্ষ করেন, সেখানে এক জনশূণ্য জীর্ণ মন্দিরে চতুর্ভুজা কালীমূর্তির সম্মুখে পূজাসামগ্রী ষোড়শোপচারে সজ্জিত। পরবর্তী সময় রাজা জানতে পারেন সেটি দেবী সিদ্ধেশ্বরী অম্বিকার মন্দির। মন্দিরের জীর্ণদশা দেখে তিনি সেখানে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করান। দেবী অম্বিকার নামানুসারে গ্রামের নাম হয় অম্বিকা কালনা। দেবী মন্দিরটি ১৬৬৩শকে (১৭৪১খ্রিঃ) নির্মিত হয়। মন্দির গাত্রে গ্রথিত ফলকে রয়েছে-

" শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৬৩/২
২৬/৬ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবী
শ্রীযুক্ত মহারাজা চিত্রসেন রায়স্য। মিস্ত্রী শ্রীরামচন্দ্র। "

অর্থাৎ বর্তমান মন্দিরটি রাজা চিত্রসেন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং মন্দিরটির প্রধান কারিগর ছিলেন বাঁকুড়ার সোনামুখীর রামচন্দ্র মিস্ত্রী। দেবী অম্বিকাকে নিয়ে একটি পৌরাণিক কাহিনিও প্রচলিত রয়েছে। সেটি হল- অম্বুমুনি অম্বিকা নামক এক পুকুর পাড়ের গহন বনে পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে সাধনা করে একটি পাথরের ঘট রূপে পুষ্করিণী থেকে দেবীকে

লাভ করেছিলেন। জনশ্রুতি রয়েছে, বর্তমান স্থানে পূজার পূর্বে দেবী তিনবার স্থান পরিবর্তন করেছিলেন। অনুমান করা হয় প্রথম অম্বুমুনির আশ্রমে পূজিতা হওয়ার পূর্বে অন্যকোন স্থানে, দ্বিতীয় বার অম্বুমুনির আশ্রমে এবং তৃতীয় বার রাজা চিত্রসেন রায় কর্তৃক দৃষ্ট জীর্ণ মন্দিরে পূজিতা হতেন। বর্তমান মন্দিরটি তাঁর চতুর্থ অবস্থান।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির চত্বরে পূর্বদিকে উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর উঁচু ভিত্তির উপর পাঁচটি শিবমন্দির বর্তমান। পরস্পর লাগোয়া তিনটি মন্দির অক্ষত রয়েছে এবং ডানদিকের শেষ মন্দিরটি প্রায় ধ্বংস হয়েছিল, সংস্কার করার পরেও সেটি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেনি। বামদিকের প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষত মন্দিরের মাঝখানে একটি ছোট কুঠুরির আকারে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। এই মন্দিরটিকে নিয়েই বর্তমানে পাঁচটি শিবমন্দির বিদ্যমান। শিবমন্দিরগুলির কোনটিতেই কোন প্রতিষ্ঠা ফলক না থাকায় সেগুলির প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রতিষ্ঠাতার সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে মন্দিরের সেবাইত শ্রী কাজল মুখার্জীর নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, রাজা তিলকচাঁদের আমর্ত রামদেব নাগ মন্দির প্রাঙ্গণে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর রাজা তিলকচাঁদের জননি রাজমাতা লক্ষ্মীকুমারী দেবী এই মন্দির প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় শিবমন্দির স্থাপনা করেছিলেন। এরপর আরেকটি মন্দির মহারানির রাধিকা নাম্নী নামে এক অনুচরী স্থাপন করেন। এছাড়া তিলকচাঁদের পত্নী বিষণকুমারী দেবী আরেকটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরটির কোন প্রতিষ্ঠালিপি ছিল না। ক্ষুদ্র কুঠুরির ন্যায় শিবমন্দিরটি ১৯৮০খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি উঁচু জমির উপর অবস্থিত। রাস্তা থেকে পাঁচটি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে মূল মন্দির ফটকের চৌকাঠে পৌঁছতে হয়। ফটকটি প্রশস্ত এবং ফটকটির শীর্ষে একটি দণ্ডায়মান সিংহ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এটিকে সিংহদুয়ার বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যা প্রাচীন রীতির ঐতিহ্য বহন করছে। দালান আকৃতির সিংহদুয়ার পেরিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে মূল মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য নটি ঢেউ খেলানো আকৃতির সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটির উত্তরদিক ঘেঁষে মাঝ বরাবর রয়েছে হাঁড়িকাঠ। তারপর উঁচু দাওয়ার উপর সেবাইতদের বসতবাড়ি রয়েছে।

মূল মন্দিরটি জোড়বাংলা রীতিতে নির্মিত। এই রীতিতে নির্মিত মন্দিরটি বাংলার নিজস্ব গ্রামীণ ভাবনার ধ্রুপদী রূপ। মন্দিরটি বারান্দা থেকে প্রায় আট ইঞ্চি উচ্চতায় রয়েছে। মন্দিরটির শীর্ষে ছয়টি বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র ক্রমান্বয়ে কলস লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করে পাশাপাশি তিনটি শিখরচূড়া স্থাপিত রয়েছে। মন্দিরটির অভ্যন্তর আড়াআড়ি ভাবে তিনভাগে বিভক্ত রয়েছে। যথা- প্রথম ভাগ হল দালান বারান্দা, যার থেকে একটি মাত্র দরজা দিয়ে দ্বিতীয় ভাগে বারান্দায় প্রবেশ করতে হয়। তৃতীয় ভাগটি হল গর্ভগৃহ। খিলান আকৃতির মূল প্রবেশদ্বারের দুপাশে রয়েছে দুটি কৃত্রিম দ্বার। মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত পাঁচটি শিবমন্দিরের মধ্যে তিনটি আটচালা রীতির এবং দুটি দালান রীতিতে নির্মিত।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মূলদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৫′	মূলদ্বারের প্রস্থ- ২.৭′
বহিঃদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫.৮′	বহিঃদ্বারের প্রস্থ- ২.৭′

বিগ্রহ :

এই মন্দিরে বিগ্রহ হিসেবে পূজিত হন চতুর্ভুজা দেবী অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী। দক্ষিণ দুইহস্তে বরাভয় এবং বাম ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ ও নিম্ন হস্তে নরমুণ্ড শোভিতা দেবী শবরূপী শিবের উপর বামপদ এগিয়ে দিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছেন। শিবের মস্তকটি পূর্ব দিকে রয়েছে। দেবী সিদ্ধেশ্বরী বস্ত্র পরিহিতা এবং বিভিন্ন অলংকারে শোভিতা। মায়ের দক্ষিণপার্শ্বে রয়েছে যুগ প্রাচীন বিখ্যাত মূলযন্ত্র, যেটি একটি কালো ঘট। এই ঘটটিকে মাতৃ কল্পনা করে পূজা চলে আসছে। ঘটের পিছনে শিবের প্রতীক হিসেবে রয়েছে একটি ত্রিশূল। শিব সহ এই প্রতিমাটি শ্বেতপাথরের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

সিদ্ধেশ্বরী মূর্তিটি দারুমূর্তি এবং শিবমূর্তিটি মৃত্তিকা নির্মিত।

আনুমানিক উচ্চতা- ৬.৬′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – মন্দিরের পুরোহিত শ্রী কাজল মুখার্জী দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মন্দিরটি বর্তমানে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী ট্রাস্টি বোর্ডের মালিকানাধীন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – নিত্য ভোর ৫টা ৩০মিনিটে উন্মুক্ত হয়ে দুপুর ১২টায় দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় বিকেল ৪টের সময় দ্বার উন্মুক্ত হয়ে রাত্রি ৮টায় বন্ধ হয়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারা প্রাপ্ত অর্থই মন্দিরের সেবায় ব্যয় করা হয়।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে নিত্য পূজা ব্যতীত কালীপূজা ও বিপত্তারিণী পূজা হয়ে থাকে। কালীপূজার দশ দিন পূর্বে দেবীর অঙ্গরাগ শুরু হয়। সেই সময় মন্দির বন্ধ থাকায় মায়ের ঘটটি গর্ভগৃহের বাইরে স্থাপন করে পূজা করা হয়। কালীপূজার পূর্বের দিন দেবীকে দিগম্বরী রূপে সাজানো হয়, তখন একমাত্র পুরোহিত এবং মহিলারাই দেবী দর্শনে অধিকারী হন। এই পূজাতে একজোড়া ছাগল, একটি ভেড়া, তিনগাছা আখ, কুমড়ো, ডাব সকালে বলি দেওয়া হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে কোন সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠান হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – আগত দর্শনার্থীদের অর্থানুকূল্যই মন্দিরের সেবায় ব্যয় করা হয়। বাকী অর্থ শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা এবং সেবাইতগণ ব্যক্তিগত ভাবে দিয়ে থাকেন।

(জ) ভোগ – মন্দিরে প্রতিদিন মাছ ও পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে অন্নভোগ এবং পরমান্ন ভোগ হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – মন্দিরে পুরোহিত ব্যতীত ১১জন সেবাইত আছেন। দক্ষিণা দ্বারা যা আয় হয়, মাসান্তে তাই বেতন হিসেবে ভাগ করা হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – নিত্য প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – কালীপূজার পূর্বদিন পুরোহিত ব্যতীত কোন পুরুষ দর্শনার্থী প্রবেশ নিষিদ্ধ।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – প্রাচীন এই মন্দিরটিকে বর্তমানে রঙ করা হয়েছে। ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দির গাত্রে টেরাকোটার বিশেষ কোন ভাস্কর্য নেই। কিছু ফুল ও লতাপাতার কারুকার্য চুন সুরকি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। প্রবেশ দ্বারের খিলানের শীর্ষে টেরাকোটার কাজের লতাপাতা কেয়ারী এবং মাথার উপর দেওয়ালের দুপাশে চুন সুরকির তৈরি মুখোমুখি সিংহ মূর্তি রয়েছে।

শিবমন্দির গুলির উপরে দুটি করে পদ্মাকৃতির ফুলের টেরাকোটার কাজ রয়েছে এবং মাঝে রয়েছে বিজয় পতাকা।

তথ্যঋণ :

[১] গাইন বিশ্বজিৎ, কালনার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড; বর্ধমান; কালনা মহকুমা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র; অক্টোবর ২০১২।

[২] মন্দিরের পুরোহিত।

[৩] পরিমাপ সম্পর্কিত তথ্য নিজস্ব সংগ্রহ।

****

[৬] কুসুমগ্রামের দক্ষিণাচণ্ডী মাতার মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

দক্ষিণাচণ্ডী মাতার মন্দিরটি সাধক কৈলাস মুখার্জী মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। গ্রামবাসীদের মত অনুযায়ী এই মন্দিরটি প্রায় ৪০০বছরের প্রাচীন মন্দির। তবে নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় নি। পুরাতন মন্দিরটি ভেঙ্গে নতুন করে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দির গাত্রের লেখা অনুযায়ী মন্দিরটি স্থাপিত হয় ১১৭৯সনে (১৭৭২ খ্রিঃ) এবং সংস্কার করা হয় ১৪০৬সনে। বর্তমানে মন্দিরটিতে কোন প্রাচীনত্বের ছাপ নেই।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটি দালানরীতির মন্দির। দালানের মাঝখানে উঁচু চূড়া রয়েছে। চূড়ার শীর্ষে একটি ত্রিশূল এবং ওঁ রয়েছে। মন্দিরটির প্রবেশদ্বার তিনটি। গর্ভগৃহের বাইরে তিনটি দ্বার যুক্ত ঢাকা বারান্দা রয়েছে। গর্ভগৃহে প্রবেশের দ্বার একটি। প্রতিটি দ্বারে লোহার দরজা লাগানো। মন্দিরটিতে উঠতে গেলে অনেকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। মন্দিরটির সম্মুখে নাটমন্দির রয়েছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। প্রাচীন মন্দিরটিতে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল, কিন্তু কোথায় তা জানা যায় নি; তাই পুরনো মন্দিরের উপরেই নতুন করে মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। সম্পূর্ণ মন্দিরটিতে সেরামিক টালি বসানো এবং মন্দিরে পাথর বসানো। পাথরের বেদীর উপর পিতলের সিংহাসনে দেবী উপবেশন করেন।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের আয়তন- ২০′ × ২০′ মুখ্যদ্বারের উচ্চতা- ১০′

দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৭′ দ্বারের প্রস্থ- ৫′

বিগ্রহ :

দক্ষিণাচণ্ডী মাতার মূর্তিটি দণ্ডায়মান অষ্টভুজা মূর্তি, প্রতিটি হস্তে আয়ুধ বর্তমান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মূর্তিটি চতুর্মুখ বিশিষ্ট। পরনের বস্ত্র এবং হাতগুলিতে শিলার উপর খোদিত চুড়ি রয়েছে। শিলায় খোদিত বস্ত্র ছাড়াও দেবীর দেহে কাপড়ের বস্ত্র পড়িয়ে রাখা হয়েছে। দেবীর উপবেশনের জন্য জন্য নির্দিষ্ট পিতলের আসন এবং শয়নের জন্য পালঙ্ক রয়েছে। এই মন্দিরে কৈলাস মুখার্জী মহাশয় স্বপ্নাদেশে শিবের প্রতীক হিসেবে একটি রাম দাঁ পেয়েছেন। সেটি দেবীর পালঙ্কের পাশে রাখা রয়েছে। মন্দিরটির মধ্যে পঞ্চমুণ্ডীর আসন রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

দক্ষিণাচণ্ডী মাতার বিগ্রহটি কষ্টিপাথরের নির্মিত। বিগ্রহটির আনুমানিক উচ্চতা হল, ১$\frac{১}{২}$′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – এই মন্দিরটি হল মুখার্জী পরিবারের পারিবারিক মন্দির। মন্দিরের সেবাইত সন্দীপ মুখার্জী মহাশয় মন্দিরটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানিয়ে সাহায্য করেছেন। এই মন্দিরটিতে তাঁরই পূর্বপুরুষ হতে পূজা হয়ে আসছে। এখন মন্দিরে গ্রামবাসীরাও নিত্যসেবা করে থাকেন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরটি সকাল ১০টায় খোলে, নিত্যসেবার পর বেলা ১২টায় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর পুনরায় বিকেল ৫টায় দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং সন্ধ্যারতির পর দেবীর শয়ন হয়ে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরের কোন নিজস্ব সম্পত্তি নেই।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – শ্রাবণ মাসের শুক্লাঅষ্টমী তিথিতে বাৎসরিক বাস্তু পূজা হয়। নবান্নে বিশেষ পূজা হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠান কিছু হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – শ্রাবণ মাসের বাৎসরিক বাস্তু পূজার সময় ভক্তদের দক্ষিণা এবং সেবাইতদের ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করে মন্দিরে পূজার আয়োজন করা হয়। এছাড়া মন্দিরের যাবতীয় খরচ মন্দিরের সেবাইতগণ মিলিতভাবেই করে থাকেন।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্যভোগে চিড়ে এবং চালের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। এছাড়া ফল, মিষ্টান্ন থাকে। বাৎসরিক পূজা এবং নবান্নের সময় সেবাইতের বাড়িতে ভোগ দেওয়া হয়। ভক্তরা যে যেরকম পারেন ভোগ দিয়ে দেবীর সেবা

করেন। এই সময় ভোগ মাছ সহযোগে দেওয়া হয়। রাতেও ভোগ হয়। নবান্নের সময় দুপুরে ভোগ হয়। শ্রাবণ মাসে শুয়োর ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরে ৬টি পরিবার বর্তমানে সেবাইত হিসেবে নিযুক্ত আছে। প্রত্যেকের নিজস্ব পুরোহিত মাইনে দিয়ে নিযুক্ত করা রয়েছে। মন্দির থেকে যা আয় হয় তা থেকেই পুরোহিতের বেতন দেওয়া হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – এই মন্দিরে নিত্য খুব বেশি লোক সমাগম হয় না। তবে বিশেষ তিথির পূজার সময়গুলিতে অজস্র ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরটিতে কোন ভাস্কর্য নেই। মন্দিরটি বহু প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীনত্বের কোন ছাপই নেই।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য শ্রী সন্দীপ মুখার্জী কর্তৃক প্রাপ্ত।

[২] পরিমাপ সম্পর্কিত তথ্য নিজস্ব সংগ্রহ।

****

[৭] কেতুগ্রামের অট্টহাস সতীপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিত মানস'এ পাওয়া যায় পালযুগে দু- একজন সামন্তরাজ এই এলাকায় রাজত্ব করতেন। চন্দ্রকেতু, বৃষকেতু, মকরকেতু ইত্যাদি তাঁদের সম্ভাব্য নাম। এর বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের গড় অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও গ্রামের মাঝখানে নজরে পড়ে। এঁরা রাজত্ব করার আগে স্থানটির নাম ছিল বহুলাপুর বা বহুলাপীঠ। কেতু ও গড় মিলিয়ে কেতুগড় এবং কালক্রমে কেতুগ্রাম হয়েছে।

গ্রামবাসীদের মতে কেতুগ্রামে যুগ্ম সতীপীঠ রয়েছে। প্রথমটি বগুলাপীঠ, দেবীর নাম বহুলাক্ষী। আয়তনয়না দেবীর অপূর্ব সৌন্দর্য লক্ষ করার মতো। এখানে সতীর বামবাহু পড়েছিল বলে লোকবিশ্বাস। গ্রামের ঘন জনবসতি এলাকায় দেবীর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। দেবীর ভৈরব ভীরুক নামে শিবলিঙ্গ কিছুদূরে কাটোয়া থানার একটি বড়ো ও প্রাচীন গ্রাম বৈষ্ণবপাট শ্রীখন্ডে বিরাজ করেন। ইনি ভূতনাথ নামে জনমানসে পরিচিত। দেবী চতুর্ভুজা, একহাতে কাঁকুই, আর একহাতে দর্পন এবং অন্যদুই হাতে বরদান ও অভয় দিচ্ছেন। দেবীর দক্ষিণ দিকে গণেশ ও বামদিকে কার্তিক মূর্তি খোদিত। দেবী নিত্য সেবিতা তবে দুর্গা নবমীর দিন বিশেষ পূজা হয়। মোষ বলি হয়।

এই গ্রামের দ্বিতীয় পীঠটি গ্রাম ছাড়িয়ে মজে যাওয়া উত্তরবাহিনী ঈশানী নদীর দক্ষিণপাড়ে একটি নির্জন বনকুঞ্জে অবস্থিত। স্থানটির নাম মরাঘাট। এখানেই দেবী অট্টহাসের মন্দিরটি অবস্থিত। দেবী অট্টহাসের আবিষ্কারের একটি প্রচলিত কাহিনি রয়েছে। সেটি হল-

বহুযুগ পূর্বে, যদিও সঠিককাল জানা যায় না, পূর্বোক্ত অঞ্চলটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একদিন দুর্গাপূজার সময় সপ্তমীর সকালে অট্টহাসের জঙ্গলে এক জটাধারী সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে কয়েকজন স্থানীয় কৃষক তাদের দুঃখের কাহিনি শোনাতে লাগলো। কাহিনি শুনে সেই সন্ন্যাসী তাদের অভয় দিয়ে শ্মশানের ধারে যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসীর পরামর্শে তৈরি হল এক বিশাল যজ্ঞকুন্ড। সেদিন সন্ন্যাসী সারারাত্রি যজ্ঞ করার পর, সপ্তমীর ব্রাহ্মমুহূর্তে জঙ্গলের বায়ুকোণে একটি ঘট প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামবাসীদের ওই ঘটটি পূজা করতে বলেন চিরকাল এবং পর মুহূর্তে সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে যান। গ্রামবাসীরা মনে করেন, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব সন্ন্যাসীর বেশে এসে

দেবীর পূজার প্রচলন করে গেছেন। সেই থেকে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা সেখানে দেবীর পূজা হয়। দেবীর নাম ফুল্লরা এবং ভৈরব বিল্বেশ বা বিল্বেশ্বর। দক্ষিণ দুয়ারী মায়ের মন্দিরটি গ্রামের ভক্তগণ দ্বারা নির্মিত হয়েছে।

মন্দিরটি বিভিন্ন সময়ে সংস্কার করা হয়েছে, সর্বশেষ সংস্করণটি ১৩৪২সনে হয়েছিল। বর্তমান মন্দিরের উপরের দৃশ্য, হাতির মস্তকে সিংহের থাবা। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনুসারে, সত্ত্বগুণের কাছে রজগুণ পদানত। মন্দিরের ভেতরে গর্ভমন্দির রয়েছে। বর্তমান মন্দিরের যে রূপ তা, ১৯৮৫খ্রিঃ প্রাচীনত্ব ঢেকে সেরামিক টালি বসানো হয়েছে। প্রবাদ রয়েছে যে, ঐ গর্ভমন্দিরের ভেতরে যে বেদী আছে, ওই বেদীর নীচেই প্রস্তর খণ্ড রূপে সতীর অধঃওষ্ঠটি রয়েছে। বেদীর ওপরেই মায়ের দুর্গামূর্তিটি রয়েছে। গর্ভমন্দিরের সম্মুখে উর্ধ্বে অবস্থিত বিরল প্রকৃতির গণেশের মূর্তি।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

দালানরীতির এই মন্দিরটির গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বার একটি। মন্দিরের সম্মুখে রয়েছে ভৈরব মন্দির এবং পশ্চাতে রয়েছে ভোগমন্দির। ভোগমন্দিরের পাশে রয়েছে মহোৎসব ক্ষেত্র এবং তার সামনে শিবা ভোগের স্থান। পুরাতন ঘাট এবং বাঁধা ঘাটের বামপার্শ্বে রয়েছে ভজন কুটির। এই মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে একটি পুরাতন যাত্রীনিবাস রয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমতি না মেলায় পরিমাপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিগ্রহ :

এখানে দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি পূজিতা হন।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

বর্তমান দেবীমূর্তিটি পেতল নির্মিত। পূর্বের অষ্টধাতু নির্মিত লুণ্ঠিত হওয়ায়, বর্তমান মূর্তিটি দেবীজ্ঞানে পূজিত হয়ে থাকেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিগ্রহ স্পর্শের অনুমতি না মেলায় পরিমাপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – এই মন্দিরটি বর্তমানে একটি ট্রাস্ট'এর পরিচালনাধীন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরটি সকাল ৬টায় খোলে এবং সন্ধ্যারতির পর দেবীর শয়ন হয়ে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরের প্রায় ৯একর জঙ্গলাকীর্ণ সম্পত্তি রয়েছে। যার মধ্যে একটি পুষ্করিণী বিদ্যমান। তেমন কোন আয়ের উৎসের তথ্য পাওয়া যায়নি।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা –শিবরাত্রীএবং চৈত্রমাসে গাজনের সময় বিশেষ পূজার আয়োজন হয়ে থাকে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – দোল পূর্ণিমা তিথিতে এই মন্দিরে সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠান হয়।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে দোল পূর্ণিমায় মেলা বসে। তিনদিন ব্যাপী এই মহোৎসব চালু থাকে। ভক্তদের দানের অর্থে সেবামূলক কর্ম এবং মন্দিরের যাবতীয় পরিচালনা কর্ম নিষ্পন্ন হয়।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য অন্নভোগ ও সন্ধ্যায় ফল- মিষ্টান্ন সহযোগে ভোগ নিবেদন করা হয়ে থাকে।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরের পুরোহিতে বেতন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব ট্রাস্ট বোর্ড পালন করে। নির্দিষ্ট কোন তথ্য এই বিষয়ে পাওয়া যায়নি।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – এই মন্দিরে নিত্য খুব বেশি লোক সমাগম হয় না। তবে বিশেষ তিথির পূজার সময়গুলিতে অজস্র ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরটিতে কোন ভাস্কর্য নেই। মন্দিরটি বহু প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীনত্বের কোন ছাপই নেই।

তথ্যঋণ :

[১] ভট্টাচার্য্য হরনারায়ণ, ঈশানীর বাঁকে মহাতীর্থ অট্টহাসের কথা; শ্রীরামপুর; ৫ই নভেম্বর ২০১১।

[২] মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উপস্থিত ভক্ত দ্বারা প্রাপ্ত।

****

[৮] গড়ের জঙ্গলের শ্যামরুপা মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অজয় নদের তীরে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের অদূরে বিষ্ণুপুর ও খেড়োবাড়ি মাঝামাঝি শ্যামরুপা গড়, সুক্ষ্মগড় বা ঢেকুর গড়। পূর্বে এখানে দূর্ভেদ্য জঙ্গল ছিল, যা আজও সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। চতুর্দিক বেষ্টিত এগারো মাইল (স্থান বিশেষ)। প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় ভরপুর।

গড় জঙ্গলের মধ্যে বহু প্রাচীন মায়ের মন্দিরের কাহিনি বিচিত্র। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের এক তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করে জানা গিয়েছে যে, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ অজয় তীরে, পশ্চিম সীমায় ঢেক্করী অঞ্চলের প্রতাপশালী সামন্তরাজ ছিলেন। এর বর্তমান ব্যাখ্যায় অনেক ঐতিহাসিক ইছাই ঘোষ আর ঈশ্বর ঘোষকে অভিন্ন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ঢেকুর গড় নামকরণ নিয়ে বহুমত প্রচলিত। একদা সেখানে ঢেকারু নামে এক উপজাতির বাস ছিল। ঢেকারুরা লোহার অস্ত্র- শস্ত্র নির্মাণে দক্ষ ছিল। এই ঢেকারুদের উপস্থিতি থেকেই জায়গাটির নাম ঢেকুর গড় হয়েছে। জঙ্গলমহল ও সেনপাহাড়ি বলতে ঐ জায়গাটিকেই বোঝায়। প্রায় হাজার বছর আগে ঐ ঢেকুর গড়েই ছিল মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষের রাজধানী। ইছাই ঘোষের পিতা ধবল ঘোষ এবং তাঁর পিতা ধৃত ঘোষ। প্রত্যেকেই বীরযোদ্ধা ও অস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে ইছাই ঘোষ ও তাঁর পিতা সোম ঘোষই ইতিহাসের ঈশ্বর ঘোষ এবং ধবল ঘোষ। একাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক কাহিনি কয়েকশো বছর লোকগাথা হয়ে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরার পর ধর্মমঙ্গল কাব্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আরও ঐতিহাসিক তথ্য হল যে সুক্ষ্ম অঞ্চলের সামন্তরাজা কর্ণসেন ছিলেন নিঃসন্তান। প্রজারা তাঁকে আঁটকুড়ো রাজা বলত। একদিন প্রজারা এই আঁটকুড়ো রাজার মুখদর্শন করবে না বলে বিদ্রোহ করেছিল। অপরদিকে ইছাই আরো ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং পাল রাজশক্তির ক্রমশ দুর্বলতার সুযোগে ও কর্ণ সেনের প্রতি প্রজাদের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে, একদিন ইছাই ঘোষ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে ঢেকুর গড় বা শ্যামরুপা গড়। পরবর্তীকালে সেই গড় দখল করে গড়ে তোলেন তাঁর রাজত্ব এবং রাজধানী হয় রাঢ়পুরী। অন্যদিকে পলাতক রাজা কর্ণ সেন রাজ্যপাট হারিয়ে স্ত্রী রঞ্জাবতীকে নিয়ে ময়নাগড়ে (মেদিনীপুর) আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং স্বীয়রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এরপর রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের তপস্যা করে পুত্রলাভ করলেন, তাঁর নাম হল লাউসেন। লাউসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পিতার অপমানের প্রতিশোধের জন্য এবং নিজ রাজ্য উদ্ধারের জন্য মহীপালের দরবারে উপস্থিত হলেন।

ইছাই ঘোষের পিতা মহাশক্তি দেবী দুর্গা বা চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। মাতা পার্বতীর ইচ্ছায় পুত্র লাভ করেন বলেই মান রাখেন 'ইছাই'। অল্প বয়সে ইছাই'এর গর্ভধারিনী মা দেহ রেখেছিলেন। ইছাই তারপর থেকে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং মহামাতৃকা দেবী চণ্ডী স্বরুপিনী দেবী দুর্গার আরাধনায় রত হলেন। মাতৃভক্ত ইছাই'এর কাহিনি লোকমুখে প্রচলিত আছে। কালক্রমে একদিন মাতৃসাধক ইছাই'এর সাথে শিবস্বরুপ ধর্মঠাকুরের সাধক লাউসেনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। লাউসেন তিক্ত ভাষায় ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে আহ্বান জানাল এবং ইছাই মাতৃআজ্ঞা অমান্য করে তাঁর পূজা অসম্পূর্ণ রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা দিলেন। যুদ্ধের নেশায় উন্মাদ ইছাই মাতৃআজ্ঞা ভুলে গেলেন, ফলে লাউসেনের হাতে তাঁর মৃত্যু হল।

ইছাই'এর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর প্রজাগণ এবং তাঁর পুরোহিত প্রচণ্ড মর্মাহত হয়ে মায়ের আসল স্বর্ণবিগ্রহটি ক্ষোভে দুঃখে মন্দিরের পাশে দীপ সায়রের জলে ঐদিন ভাসান দিয়ে দেন। কিন্তু ইছাই'এর মানস কন্যা তাঁর পিতার আরাধ্যা স্বর্ণবিগ্রহটি উদ্ধার করেন এবং ঘোড়ায় চেপে কাশীপুরের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু নিজ রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় বরাকর নদী পার হতে গিয়ে সেই মূর্তিটি জলে পড়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মূর্তিটির

কোন হদিস মেলেনি। রাজা কল্যাণ শেখর এবং ইছাই'এর মানস কন্যাটি সেই রাত্রে স্বপ্নাদেশ পান যে, প্রতিদিন সকাল থেকে ১২টা পর্যন্ত গড় জঙ্গলে শ্যামরুপা মন্দিরে পূজা নেব, তারপর কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পূজা হবে। এখানে আমায় মন্দির ও মূর্তি স্থাপন কর। কল্যাণ শেখর মায়ের স্বপ্নাদেশ মতো একটি নির্দিষ্ট পাথরের দেবীমূর্তি এবং মায়ের মূর্তি নির্মাণ করান। কল্যাণ শেখরের নামানুসারে দেবীর নাম কল্যাণেশ্বরী হলেও তিনি মূলত দুর্গা। কল্যাণেশ্বরী 'মায়ের স্থান' থেকে জায়গাটির বর্তমান পরিচয় মাইথন।

বর্তমানে ইছাই ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের পশ্চিমে একটি ঢিবির উপর শ্যামরুপা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরটি কম বেশি হাজার বছরের পুরানো বলে দাবি করা হয়। বর্তমান মন্দিরটি বর্ধমান রাজাদের তৈরি।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

শ্যামরুপা মায়ের বর্তমান মন্দিরটি একটি দালানরীতির ছোট মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার একটি। গর্ভগৃহের বাইরে একটি ঢাকা বারান্দা রয়েছে।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের আয়তন- ১৭′ × ১৭′

বহিঃদ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫′ বহিঃদ্বারের প্রস্থ- ৩′

মুখ্যদ্বারের উচ্চতা- ৬′ মুখ্যদ্বারের প্রস্থ- ৩′

বিগ্রহ :

শ্যমরুপা মায়ের মন্দিরে বিগ্রহ হিসেবে দেবী দুর্গা নিত্য সেবিত হন। ইছাই ঘোষের আমলে আদি মন্দিরে দেবী পার্বতীর দুটি মূর্তি ছিল। একটি পাথরের, অন্যটি সোনার।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের জগৎগৌরী দেবী দুর্গার মূর্তিটি শ্বেতপাথরে নির্মিত। বিগ্রহটির আনুমানিক উচ্চতা হল, ১′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – বর্ধমান রাজা বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বর্ধমান রাজা হেতমপুরের রাজাকে এই গড় হস্তান্তর করেন। হেতমপুরের রাজা বিষ্ণুপুর গ্রামের হরিপদ রায় মহাশয়কে পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ করেন। রায় পরিবারই মন্দিরের দায়িত্ব নিয়ে রয়েছেন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – জঙ্গলাবৃত এই মন্দিরের দ্বার পূজার্চনার জন্য সকাল ৯টার সময় উন্মুক্ত হয়। ভোগ নিবেদনের পর কিছুক্ষণ মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে সন্ধ্যারতির জন্য দ্বার উন্মুক্ত হয়ে বিকেল ৫টার মধ্যে পুরোহিত মন্দির দ্বার রুদ্ধ করে মন্দির প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে চলে যান।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরের পূর্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, এখন আর নেই। মধ্যসত্ত্ব বিলোপের আইনের আওতায় সেই সমস্ত সম্পত্তি সরকারের হাতে চলে যায়। বর্ধমান রাজা এই মন্দিরের খরচা কিছুদিন চালিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে হেতমপুরের রাজার হাতে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। বর্তমানে মন্দিরের যাবতীয় ব্যয় ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারাই চলে।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – নিত্যপূজা ছাড়াও এই মন্দিরে দুর্গা পূজা, বাসন্তী পূজা এবং অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। মঙ্গলবার ও শনিবার মানসিক পূজার বলি হয়। এছাড়া দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী তিথিতে বলি হয়ে থাকে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরে সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠান কিছু হয় না।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – এই মন্দিরের সে অর্থে কোন উৎসব অনুষ্ঠানের আয় ব্যয় নেই। দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভক্তদের দক্ষিণা দ্বারা আয় মন্দিরের সেবায় খরচ করা হয়।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্যভোগে পরমান্ন ও লুচি পূর্ব হতে আজ পর্যন্ত হয়ে আসছে। এছাড়া ফল, মিষ্টান্ন দেওয়া হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরে হরিপদ রায় মহাশয় এবং তাঁর বংশধর শ্যামসুন্দর রায়, তারপর ভূতনাথ রায় এবং বর্তমানে দিলীপ রায় সেবা করছেন। এখানে পুরোহিতের কোন বেতনের প্রচলন নেই।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – এই মন্দিরে নিত্য লোক সমাগম হয় না। তবে দুর্গাপূজায় অজস্র ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেরামতির কাজ চলছে। ভবিষ্যতে মন্দির প্রাঙ্গণকে আরও সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করবেন বলে পুরোহিত দিলীপ রায় জানিয়েছেন।

(ড) প্রকাশনা – তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, গড়ের মা, গ্রাম- ডানজোনা,পোঃ রামপুর, বীরভূম- ৭৩১১২৭

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরটিতে কোন ভাস্কর্য নেই। মন্দিরটি বহু প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীনত্বের কোন ছাপই নেই।

তথ্যঋণ :

[১] বন্দ্যোপাধ্যায় তাপস, গড়ের মা; মল্লারপুর, বীরভূম; ১৪০৯।

[২] পরিমাপ সম্পর্কিত তথ্য নিজস্ব সংগ্রহ।

[৩] মন্দিরের সেবাইত।

****

[৯] নারকেলডাঙা গ্রামের শ্রীশ্রীজগৎগৌরী মাতা মন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

কালনা মহকুমার বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ একটি গ্রাম হল নারকেলডাঙা। এই গ্রামের গ্রামদেবী হল শ্রীশ্রী মাতা জগৎগৌরী। পূর্বে বৈদ্যপুর গ্রামটি পশ্চিমে নারকেলডাঙা পূর্বে পাতিলপাড়া এবং উত্তরে মিরহাট নিয়ে ছিল । এখানকার রাজা ছিলেন কিঙ্করমাধব সেন। জগৎগৌরী মাতা ছিলেন রাজার গৃহদেবতা। কিংবদন্তি আছে কালাপাহাড় এই অঞ্চল আক্রমণ করে মন্দির বিদ্ধস্ত করে দেবীকে বেহুলা নদীর জলে নিক্ষেপ করে। পরবর্তী সময় এক জেলের জালে নদীগর্ভ থেকে বিগ্রহটি উঠে আসে। নারকেলডাঙার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের পূর্বপুরুষ দেবীকে নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান মন্দিরটি ১২৯৯খ্রিঃ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন্দিরের গঠনশৈলী :

মন্দিরটির গঠনশৈলী খুবই সাধারণ। দালানরীতির মন্দিরটিতে লাগোয়া ঢাকা বারান্দা রয়েছে। সম্মুখে টিনের ছাউনি দেওয়া একটি নাটমন্দির। তারপর একটি ঘেরা স্থানে হাঁড়িকাঠ রয়েছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী।

মন্দিরের পরিমাপ : (আনুমানিক)

দ্বারের দৈর্ঘ্য- ৫′ দ্বারের প্রস্থ- ৩′

সম্পূর্ণ মন্দিরটির পরিমাপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিগ্রহ :

এই মন্দিরের আরাধ্যা দেবী মনসাকে স্বপ্নতত্ত্বের মাধ্যমেই পাওয়া গেছে বলেই পুরোহিত শ্রী মুক্ত চক্রবর্তী জানিয়েছেন। দেবী মনসার প্রতিষ্ঠার নানা কিংবদন্তি কাহিনি গ্রামের নানা প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে।

বর্তমানে একমাত্র দেবী জগৎগৌরীর মূর্তিকেই মা জগদ্ধাত্রী, দেবী মনসা এবং দেবী দুর্গা ধ্যানে পূজা করা হয়। ত্রিনেত্র বিশিষ্ট দেবী সিংহপৃষ্ঠে স্থাপিত পদ্মাসনে আসীন। বাম হাঁটু মোড়া ও ডান পা ঝোলানো দ্বিভুজা দেবী সপ্তসর্পবিধৃত ফনাছত্র তলে আসীন। বামাঙ্কে ক্ষুদ্র শিশু আস্তিক। অন্য সিংহাসনে একটি থান ইঁটের মতো চতুষ্কৌণিক আয়তাকার আকৃতি বিশিষ্ট মনসার সঙ্গী নেতার মূর্তি রয়েছে। এর একটি অংশ মুখ হয়ে ঝুলে আছে, তাতে কড়ির মতো সাদা দুটি চোখ। দেবী জগৎগৌরী বেনারসি শাড়ি এবং রূপোর তৈরি অলংকারে ভূষিতা। শিরে রূপোর মুকুট এবং কণ্ঠে রূপোর কয়েকটি হার রয়েছে।

বিগ্রহের নির্মাণ ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

মন্দিরের জগৎগৌরী দেবী মূর্তিটি কষ্টিপাথর নির্মিত ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। নেতার মূর্তিটিও কষ্টিপাথর নির্মিত। বিগ্রহটির আনুমানিক পরিমাপ হল, ১$\frac{১}{২}$′

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব – বর্তমানে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠাতা শ্রী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধরদের পারিবারিক মালিকানাসত্ত্বে রয়েছে।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার সকাল ১০টায় উন্মুক্ত হয়। দেবীর স্নান, ফলাহারের পর বেলা ১২টায় দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। মঙ্গল ও শনিবার দুপুর ১টা নাগাদ বন্ধ হয়। পুনরায় বিকেলে দ্বার উন্মুক্ত হয়ে সন্ধ্যারতি হওয়ার পর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – মন্দিরটির কোন আইনগত সমস্যা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। ভক্তদের দক্ষিণা দিয়েই পূজার আয়োজন হয় এবং বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরাই মন্দিরের আয়- ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – নিত্যপূজা ছাড়াও এই মন্দিরের বাৎসরিক পূজা হয় দশহরার পরে আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে। ঐদিন দেবী জগৎগৌরী বিগ্রহটিকে মূল মন্দির থেকে কিছু দূরে কচুদহে পরিত্যক্ত মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। রাত্রে পুনরায় মূল মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। দশহরার দিন নারকেলডাঙা গ্রামের উত্তরে মীরহাটের পশ্চিমে রামনগর ও হাসনহাটির দক্ষিণে 'ঝাপানতলা' নামে বিখ্যাত জায়গাতে জগৎগৌরী মাতার ঝাপান হয়। এছাড়াও গঙ্গাপূজার দশদিন পরে পঞ্চমী তিথিতে দেবীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরের বার্ষিক পূজাকে কেন্দ্র করে পুরো গ্রামে ঝাপান উৎসব পালিত হয়। ঐ সময় অনেক বড়ো মেলা বসে মন্দিরকে কেন্দ্র করে। ফাল্গুন মাস থেকে বিগ্রহটিকে গ্রামবাসীদের কাঁধে ফুল দিয়ে সাজানো পাল্কী করে সিঙ্গারকোণ, কুলটি, বহরকুলি, আনুখাল, তেহাটা, কুতুবপুর, আটকেটে ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার মনোনিত সদস্যগণ নিয়ে কমিটি তৈরি হয়। তাঁরাই মেলার দিন ঠিক করেন। সেই দিনই মেলা বসে। তার সঙ্গে চলে মদ্যপান ও গান বাজনার তালে উদোম নৃত্য। এই পূজার দুদিন সহস্র ছাগ বলি হয়।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – যে সকল গ্রাম ঝাপান উৎসব পালন করে এবং দেবীকে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করে, সেই সকল গ্রামের অধিবাসীগণ উৎসব ও অনুষ্ঠানের ব্যয় বহন করেন। আর এই উৎসব উপলক্ষে মন্দির কর্তৃপক্ষ কিছু অর্থ উপার্জন করে থাকে, যা মন্দিরের সেবায় ব্যয় করা হয়।

(জ) ভোগ – এই মন্দিরে নিত্য অন্নভোগ হয় বিভিন্ন সবজী সহকারে। সন্ধ্যায় ফল, মিষ্টি দিয়েই সন্ধ্যারতি হয়ে থাকে। এছাড়া দেবীর প্রধান উপাচার হল দুধ, কলা, চিড়া।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – এই মন্দিরে ৮জন সেবাইত আছেন। মন্দিরের মূল পুরোহিত একজন। মন্দিরের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ সেবাইতদের মধ্যে ভাগ করা হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – এই মন্দিরে নিত্য লোক সমাগম হয়। তবে বার্ষিক পূজার তিনদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও শহর থেকে অজস্র ভক্ত সমাগম হয়।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। মন্দিরটিতে কোন প্রাচীনত্বের ছাপ নেই।

(ড) প্রকাশনা – মন্দিরের কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

এই মন্দিরটিতে কোন ভাস্কর্য নেই।

তথ্যঋণ :

[১] মন্দিরের সেবাইত।

[২] পরিমাপ সম্পর্কিত তথ্য নিজস্ব সংগ্রহ।

****

॥ বর্ধমান জেলার দেউল ॥

[১] বৈদ্যপুর গ্রামের জোড়া দেউল

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

বৈদ্যপুর গ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রত্ননিদর্শন হচ্ছে বৈদ্যপুরের জোড়া দেউল। এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন টেরাকোটা সমৃদ্ধ এই জোড়া দেউল মন্দিরটি দর্শনীয়। এই মন্দির সম্পর্কে শ্রী অনুকূল চন্দ্র সেন ও শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী বলেছেন যে, বৈদ্যপুরের পোড়ামাটির মন্দির অনেকের মতে বৌদ্ধদের দেহারা। তবে তাঁরা দেউল নির্মাণের সময়কাল নির্ণয় করতে পারেন নি। তাঁরা বলেছেন যে, এখানে যেটুকু লেখা মন্দিরের দ্বারের ঊর্ধ্বে পড়া গেছে, তাতে "শুভানন্দ পালেন...চম্পকে ভগবৎ পাদসেবার্থং দেবকুল বিনির্মিতং" এটুকু উদ্ধার করা গেছে। তবে তাঁরা মন্দিরের নির্মাণের সময়কাল উদ্ধার করতে পারেননি। স্থানীয় লোকেদের মতে, এটি পালযুগের নির্মাণ। কিন্তু মন্দিরটি যদি পাল অথবা সেন যুগের নির্মিতি হতো, তবে তা অমন অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। এক্ষেত্রে শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণীয়। তিনি পাহাড়পুর মহাস্থানগড় প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইঁটের মন্দির দীর্ঘস্থায়ী নয় বলে চার পাঁচশ' বছরের বেশী পুরাতন এই জাতীয় সৌধ বাংলায় আর আছে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয়তঃ লিপিটি বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই মন্দিরটি যদি পাল বা সেন যুগে নির্মিত হতো, তবে সেই বাংলা হরফ সহজে পাঠ করা সম্ভব হতো না। আর এই লিপি ইঁটের মধ্যে যেভাবে খোদিত, তাতে যে পরবর্তীকালে সংস্কারের সময় স্থাপিত হয়েছিল, তা বলা যায় না। তৃতীয়তঃ লক্ষণ মিস্ত্রীর নিচে একটি সাল রয়েছে। তার প্রথম সংখ্যাটি স্পষ্টই ১, অন্যগুলি অস্পষ্ট। এখানে ১ সংখ্যাটি খ্রিস্টীয় খ্রিঃর নয়। কারন কোন মন্দিরেই খ্রিস্টীয় সাল থাকে না। বিশেষ করে প্রাচীন মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে সাঙ্কেতিক ভাষায় শকাব্দের উল্লেখ থাকে, আর শেষে থাকে বাংলা সন। এই দেউলেও তাই রয়েছে। দেউলে যে প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে, তার যেটুকু উদ্ধার করা গেছে, তা হল-

" শ্রী শুভমস্তু...... ফ শকে
শ্রীকৃষ্ণপাদসেবার্থং...... লক্ষণ মিস্ত্রী
১ ..... "

প্রতিষ্ঠালিপিতে এখনও যা অবশিষ্ট আছে তার নির্ভুল পাঠ উদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি। 'শ্রীকৃষ্ণপাদসেবার্থং' শব্দটি থেকে স্পষ্টই বলা যায়, সেটি ছিল কৃষ্ণ মন্দির। তবে অনেকের মতে, এই দেউল বর্ধমানে বৌদ্ধবাদের স্মৃতিচিহ্ন। এই দেউল মন্দিরটি বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল দ্বারা অধিগৃহীত। পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী দেউল মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন। দেউলটিকে ফুলগাছ দিয়ে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে দেউলটির ইঁটের ফাঁকে বড় বড় গাছ জন্মে দেউলটিকে ক্ষতি করছে। তাই এই জোড়া দেউলটিকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষ সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে।

দেউলের স্থাপত্যশৈলী :

বৈদ্যপুরের জোড়া দেউল সম্বন্ধে সমীরণ চৌধুরীর সম্পাদিত 'বর্ধমান চর্চা'র ৫নং চিত্রের চিত্র পরিচিতি অংশে বলা হয়েছে, এটি সপ্তরথ পদ্ধতিতে তৈরি একটি রেখ দেউল। দেউলটি শিখর স্থাপত্যের নিদর্শন। পাতলা পোড়া ইঁটের

তৈরি। পূর্বমুখী এই দেউলটির গর্ভগৃহের প্রবেশের জন্য রয়েছে দক্ষিণমুখী দরজা এবং জগমোহনে প্রবেশের দক্ষিণমুখী দরজা আর এমন জগমোহন বিশিষ্ট মন্দির কালনা মহকুমায় একেবারেই বিরল। এর পশ্চিম ও উত্তর দিকে রয়েছে দুটি নকল দরজা। মন্দিরের খিলানগুলিকে ক্রমশঃ পরিধি কমিয়ে শিখর রচনা করা হয়েছে। মূল মন্দিরের দরজার বেশ কিছু উর্ধ্বে এবং প্যানেলের বেশ কিছু নিম্নে রয়েছে প্রতিষ্ঠালিপি।

দেউলের পরিমাপ : (আনুমানিক)

দেউলের উচ্চতা- ৭০′ জগমোহনটির উচ্চতা- ৫০′

বিগ্রহ :

এই দেউল মন্দিরটি পূর্বে কৃষ্ণ মন্দির ছিল। অর্থাৎ দেউল মন্দিরে মূল বিগ্রহ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবা হতো। কিন্তু বহু বছর পূর্ব থেকেই এই মন্দিরে আর শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয় না, কারণ মন্দিরে কোন বিগ্রহের অধিষ্ঠান নেই। বর্তমানেও একই অবস্থা বিরাজমান। মন্দিরের গর্ভগৃহ শূন্যই পড়ে রয়েছে।

ভাস্কর্য :

এই দেউলের অলঙ্করণের শৈলী প্রধানত ইসলামিক রীতির। এই জোড়া দেউল যখন নির্মিত হয়, তখন মন্দিরগাত্রে ফুলকারি নকসা ও জ্যামিতিক অলঙ্করণেরই প্রচলন ছিল। মানব মূর্তির প্রচলন বিশেষ ছিল না। কিন্তু এই দেউলে মানব মূর্তি চোখে পড়ে। বৈদ্যপুরের জোড়া দেউল মন্দিরটিতে সামান্য কিছু টেরাকোটার ভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণমুখী দরজার বেশ কিছুটা উর্ধ্বে একটিমাত্র প্যানেলে টেরাকোটার কাজ রয়েছে। যেমন- যুদ্ধরথে দশানন রাবণ; রামচন্দ্র; নৃসিংহদেব; তিরন্দাজ; ঢালি যোদ্ধা ইত্যাদি। তাছাড়া মূল মন্দির ও জগমোহনের দরজার দুপাশে ও মাথায় ফুলকারি কারুকার্য রয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] দাশ বিবেকানন্দ, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি.; ১৯৯৯।

[২] বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫।

[৩] প্রতিবিম্ব; কালনা; ১৬ই জুলাই ২০১০।

[৪] পরিমাপ সম্পর্কিয় তথ্য নিজস্ব সংগ্রহ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্তৃক প্রাপ্ত।

****

[২] ইছাই ঘোষের দেউল (কাঁকসা)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

পশ্চিম রাঢ়ে অজয় নদের তীরে ঢেকুর নামক রাজ্যের অধিপতি সোম ঘোষ ছিলেন, গোপ নরপতি। তাঁর পুত্র বীর ঈশ্বরী ঘোষ বা ইছাই ঘোষ সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে স্বাধীন নরপতি বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন এবং গৌড়ের অধীনতা অস্বীকার করলেন। তাঁর রাজধানী হল, শ্যামরূপার গড়। দেবী শ্যামরূপা ঐ স্থানে এখনও পূজিতা হচ্ছেন। ঘোষ বংশোদ্ভূত সদ্‌গোপ রাজা ছিলেন ইছাই ঘোষ। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, গৌড়াধিপতি কর্ণসেনের পুত্র লাউসেনকে পাঠালেন ইছাইকে দমন করবার জন্য। ইছাই ঘোষ ছিলেন বৈদিক ধর্মে বিশ্বাসী মাতৃসাধক এবং লাউসেন ছিলেন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের যুদ্ধ, দুই ধর্মমতের সংঘর্ষ। ইছাই ঘোষের সেনাপতি কালু ও লক্ষ্মী ডোম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহিদ হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইছাই ঘোষের পতন হয়। গোপভূমি সমসাময়িক কালে বর্ধমানের সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। একখানি তাম্রশাসনে ইছাই ঘোষের নাম পাওয়া যায়। এই গোপভূমেই নির্মিত হয় এক বিরাট গগনচুম্বী দেউল, যার নাম ইছাই ঘোষের দেউল। গহন অরণ্যের মধ্যে যা আজও মাথা উঁচু করে দন্ডায়মান।

অনেকের মতে এটি প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ দেউল। এর গর্ভগৃহে কোন বেদী বা রত্নবেদী নেই। এটি শৈব, শাক্ত বা বিষ্ণু মন্দির হলে, দেবতার একটি প্রতিষ্ঠাবেদী অবশ্যই থাকত। কিন্তু শূন্যমূর্তি বুদ্ধেরও কোন রত্নবেদী নেই। এই দেউল লাউসেন যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসেবে নির্মাণ করেন।

স্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, ঘন শাল বনের মধ্যে জীর্ণ দেহে গগনচুম্বী এই দেউলটি ইছাই ঘোষের বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত। তিনি নিজেকে চিরদিনের জন্য তাঁর অবর্তমানে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করার জন্য নির্মাণ করেছিলেন। আবার কেউ বলেন, ইছাই ঘোষের দেউলটিকে যুদ্ধে মিনার বা টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন ও শত্রুপক্ষের গতিবিধির খবর এই উচ্চ মিনার মারফৎ পেতেন। আর ইছাই'এর কেল্লা থেকে সুড়ঙ্গ পথে দেউল পর্যন্ত স্ব-সৈন্য হাজির হয়ে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করতেন। দেউলের চূড়ায় এমনকিছু ধাতু ছিল, যার দ্বারা ঐ এলাকার সমস্ত খবর পেতেন ইছাই। আবার কারও মতে, সুড়ঙ্গ পথের স্টেশন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (CO_2) নির্গমের পথ এবং অক্সিজেনের (O_2) প্রবেশ পথ।

মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, দেউলটি ইছাই ঘোষের দেউল। কিন্তু দেউলটির গঠনশৈলী ও ইঁটের ব্যবহার প্রমাণ করে যে, সেটি কোনভাবেই একাদশ শতাব্দীর আগের নির্মাণ নয়।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, এই দেউলটি ইছাই ঘোষের মৃত্যুর বহুকাল পরে তৈরি। সম্ভবতঃ তাঁর কোন বংশধর ইছাই'এর কৃতীত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে দেউলটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল দ্বারা অধিগৃহীত। পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী দেউল মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন।

দেউলের স্থাপত্যশৈলী :

প্রাচীর ঘেরা এই দেউলটি রেখ রীতির। এই দেউলে প্রবেশ দ্বার একটি।

দেউলের পরিমাপ : (আনুমানিক)

দেউলের উচ্চতা- ৭০′

দ্বারের দৈর্ঘ্য - ৭.৬′ দ্বারের প্রস্থ - ৩.৬′

বিগ্রহ :

দেউলের মধ্যে একটি ভগ্ন শিবলিঙ্গ রয়েছে। তবে নিত্যসেবা হয় বলে মনে হয় না।

বিগ্রহের নির্মিতি ও পরিমাপ : (আনুমানিক)

দেউলের মধ্যে অবস্থিত শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত।

শিবলিঙ্গের উচ্চতা- ২′ গৌরীপট্টের দৈর্ঘ্য- ২.৬′

ভাস্কর্য :

এই দেউলে ইঁটের মাঝে খোদাই করে কিছু কারুকার্য করা হয়েছে। দেউলের সম্মুখে দ্বারের অনেকখানি ঊর্ধ্বে ভাস্কর্য করা রয়েছে। এছাড়া দেউলের পশ্চাৎ অংশে একই প্রকার কারুকার্য দেখা যায়। কতকগুলি দেবদেবী মূর্তি খোদাই করে কারুকার্য করা হয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] পরিমাপ সম্পর্কিয় তথ্য নিজস্ব সংগ্রহ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্তৃক প্রাপ্ত।

[২] দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২।

****

[৩] দেউলিয়া গ্রামের দেউল (মেমারী)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

মেমারী ১নং ব্লকের নিমো গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত সুন্দর একটি গ্রাম হল দেউলিয়া। এই গ্রামের আকর্ষণ প্রায় এক হাজার বছরের পুরাতন দেউল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক দুর্লভ সম্পদ হল এই দেউল। ঐতিহাসিক এবং গবেষকদের

অনুমান এটি খ্রিস্টীয় নবম শতকের। এবং এর সাথে জৈন ভাস্কর্যের অনেকাংশে মিল রয়েছে। এখানে একটি প্রাচীন বিদ্যালয় ছিল, যেখানে দেশ বিদেশ থেকে ছাত্ররা জৈন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসতেন। দামোদর তখন এই দেউলের কোল ছুঁয়ে বয়ে যেত, বাণিজ্যপোত এসে এখানে নোঙর করত। এটি ছিল একটি অন্যতম পোতাশ্রয়। বর্তমানে এই গ্রামে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু এই মন্দিরটি তাঁদের কাছেও বড় শ্রদ্ধার বস্তু।

বর্তমানে এই দেউলটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল দ্বারা অধিগৃহীত। পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী দেউল মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন। তারা দেউলটিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রেখে, বিভিন্ন প্রকার ফুলগাছ রোপন করে, স্থানটিকে বড়ই মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছেন।

দেউলের স্থাপত্যশৈলী :

দেউলিয়া গ্রামের প্রাচীর ঘেরা এই দেউলটি শিখর দেউল রীতির। প্রবেশদ্বারে ক্রমবর্দ্ধমান খিলান রয়েছে। দেউলটি দৃঢ় গঠনযুক্ত। উদ্গাত রথপগগুলি দৃঢ় এবং ভারী; এদের ধারগুলো কোণাল এবং বলিষ্ঠ। মন্দির দুটোরই আসন পঞ্চরথ। তবে এই দেউলে অনুরথ- পগ ও রাহা- পগর মধ্যে রয়েছে গভীর নিম্নায়ত অংশ; দৈর্ঘ্যে এটা প্রায় অনুরথ- পগর সমান। আসনের বিন্যাস অনুসারে দেউলটির দেহেও রাহা- পগর দুই দিকে দেখা যাবে গভীর নিম্নায়ত অংশের সমাবেশ। দেউলটির দেওয়ালের নীচে কোনও মোলডিং *(Moulding)* নেই। তবে মাঝখানে উল্টো কাটনির এক সার অনুভূমিক বন্ধনী বেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু কোন অলংকার এখানে নেই, পগ বিভক্ত দেওয়াল পলেস্তারা করা। সুপ্রচুর অলংকরণে সমৃদ্ধ গণ্ডির নিচেই এইরকম দেওয়াল দেখে মনে হয় দেউলটির নিম্নাংশ ঘিরে ছিল ঢাকা প্রদক্ষিণ পথ এবং দেওয়ালে ওপরে রয়েছে কয়েক সার উল্টো কাটনি। তার ওপর গণ্ডির অবস্থান। গণ্ডির ওপর মস্তক অংশটিও সাধারণ শিখর মন্দিরের মতো নয়। বেকি ও আমলক প্রভৃতির পরিবর্তে যোজিত হয়েছে গোলাকার একটি স্তম্ভ। এর মাঝখানে একটি লোহার দণ্ড পোঁতা।

দেউলের পরিমাপ : (আনুমানিক)

দ্বারের দৈর্ঘ্য - ৭′ দ্বারের প্রস্থ - ৩′

বিগ্রহ :

দেউলের মধ্যে কোন বিগ্রহ নেই।

ভাস্কর্য :

দেউলটির খিলানের গাত্রে পোড়ামাটি ও ইঁটের কারুকাজ রয়েছে। বাইরের দেওয়ালে চৈত্য, জানালায় মনোরম কারুকার্য করা রয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] পরিমাপ সম্পর্কিয় তথ্য নিজস্ব সংগ্রহ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্তৃক প্রাপ্ত।

[২] সাঁতরা তারাপদ সম্পাদিত কৌশিকী- ১, ১৯৭১- ১৯৮৮; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

****

[৪] বরাকর বেগুনিয়ার দেউল (আসানসোল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল :

বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের প্রান্তদেশে বরাকর অঞ্চলটি অবস্থিত। বরাকর রেলস্টেশন থেকে মাত্র দেড় কি.মি দূরে বেগুনিয়া বাজারের দক্ষিণদিকে চারটি শিখর দেউল বর্তমান। মন্দিরগুলিকে বেগুনিয়া ধারার মন্দির বলা হয়। কারন, এই মন্দিরগুলির চূড়ার চেহারার সাথে বাংলার বহুল উৎপাদিত ফসল বেগুনের আকৃতির অনেক মিল খুঁজে পেয়েছিলেন বিদেশী ঐতিহাসিকগণ। শহরের দক্ষিণ- পশ্চিম অঞ্চলে এই মন্দিরগুলির অবস্থান একটি ছোট ঢিবির উপরে। পাশের বরাকর নদীর জলে যাতে ভেসে না যায়, সেই জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থান বিবেচনা করে মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

চারটি অতি প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে চতুর্থ মন্দিরটির নাম সিদ্ধেশ্বর মন্দির, এটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এর নির্মাণশৈলী বিবেচনা করলে মনে হয়, এটি নবম শতাব্দীর কাছাকাছি কোন এক সময়ে নির্মিত। অবশিষ্ট তিনটি মন্দিরের নির্মাণ শৈলী লক্ষ্য করলে, বোধ হয় সেগুলি মুসলমান নবাবদের আগমনের আগে নির্মিত হয়েছিল।

এর মধ্যে একটি মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর একটি প্রস্তরলিপি, যেটি বাংলাতে খোদিত, সেখানে লিখিত আছে যে, জনৈকা হরিপ্রিয়া দেবী, যিনি রাজা হরিচন্দ্র মুকুন্দদেভ নামে যে উড়িষ্যার রাজা এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী, তিনি এই মন্দিরগুলির একটিকে শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন। ১৪৬১খ্রিঃর কাছাকাছি সময়ে এটি নির্মিত। দ্বিতীয় আরেকটি মন্দির জনৈক নন্দ নামে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা সংরক্ষিত, যা মন্দিরগাত্রের ফলকের নিদর্শন থেকে জানা যায়। এই মন্দিরটি ১৫৪৬খ্রিঃ নির্মিত। চতুর্থ মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এটির নির্মাণকাল নবম শতাব্দীর কোন এক সময়ে।

দেউলের স্থাপত্যশৈলী :

বরাকরের চারটি মন্দির একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জমিতে অবস্থিত। জমিটির পূর্বদিকে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দির দুটি পূর্বমুখী অবস্থানে রয়েছে। জমিটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তৃতীয় এবং চতুর্থ মন্দির দুটি অবস্থান করছে। তৃতীয় মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং চতুর্থ মন্দিরটি পূর্বমুখী।

মন্দিরগুলির মধ্যে চতুর্থ মন্দিরটি ব্যতীত অন্য সব মন্দিরগুলি এক বিশেষ শৈলীর অন্তর্গত এবং সবগুলিই সংরক্ষিত। প্রথম তিনটি মন্দিরের প্রত্যেকটি এক একটি শিখরযুক্ত সম্পূর্ণ মন্দির। সাড়ে চার মিটার বাহুযুক্ত বর্গাকৃতির গর্ভগৃহের উপর খিচিং ধারার মন্দিরের মতো শিখর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মন্দির এক একটি সম্পূর্ণ মন্দির, যা মণ্ডপ ইত্যাদি কাঠামো যুক্ত নয়। এই মন্দিরগুলির শিখর উড়িষ্যার শিখর মন্দিরের থেকে ভিন্ন ধরনের। শিখরগুলি গর্ভগৃহের উপর থেকে অনেকটা সোজাসুজি উঠে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে শীর্ষে পৌঁছেছে। এই ধরনের প্রত্যেকটি মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহের অংশটি অনেকটা নীচে অবস্থান করছে। সাধারণ ভাবে হিন্দু মন্দিরে শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালার একটি প্রথা থাকার জন্য, এর জলটি যাতে সহজেই মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে, সেই কারনে গর্ভগৃহের তলটি একধাপ নিচু করা হতো।

চতুর্থ মন্দিরটি অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় আকারে ছোট। এটি দেখতে প্রাচীন উড়িষ্যার শিখর মন্দিরের মতো। এই মন্দিরটিকে বেগুনিয়া শ্রেণি থেকে আলাদা বিভাগ করা যেতে পারত। কিন্তু এটি একই ভাবে নির্মিত। এই মন্দিরটি প্রায় নবম-দশম শতাব্দী নাগাদ নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য হল, এই মন্দিরের সামনে একটি মণ্ডপ রয়েছে এবং মন্দিরের চূড়ার আমলক অংশটি রয়েছে, কিন্তু কলস অংশটি ভেঙে গিয়েছে। মন্দিরটির গর্ভগৃহটি একটি চতুষ্কোণ গৃহ, যার উপরে শিখরটি নির্মাণ করা হয়েছে। গর্ভগৃহের সামনের মণ্ডপটি পরবর্তী সময়ের নির্মাণ বলে মনে করা হয়।

দেউলের পরিমাপ : (আনুমানিক)

পাশাপাশি দুটি দেউলের উচ্চতা প্রায়- ৬০′

অন্য দুটি মন্দিরের পরিমাপ পাওয়া যায়নি।

বিগ্রহ :

মন্দিরগুলির শিলালেখ, যা মন্দিরের দরজার উপর অবস্থান করছে, তা থেকে জানা যায় যে, মন্দিরগুলি আদি দেবতা শিবের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। চতুর্থ মন্দিরটি সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দিরের উপরিভাগে চৈত্য গবাক্ষে জটাজূটধারী ধ্যানমগ্ন এক ঋষির মূর্তি রয়েছে। মন্দিরের প্রবেশ পথে দুদিকে দুটি বৃষ রয়েছে। তৃতীয় দেউল মন্দিরের মধ্যে প্রায় ৬ফুট উচ্চ একটি পাথরের উপর, একটি মৎস্যের উপরে পাঁচটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এখানে মৎস্যের মূর্তিটিকে প্রকৃতির স্ত্রীশক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি দুই দেউল মন্দিরের বামদিকের মন্দিরগাত্রে বিরাট গণেশ মূর্তি ও দক্ষিণ দিকের মন্দিরের গাত্রে মহিষমর্দিনী মূর্তি রয়েছে।

এই অঞ্চলে শৈবধর্ম বা পাশুপাত ধর্ম এবং শাক্ত ধর্মের প্রসার ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে মন্দির সংলগ্ন স্থানে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি হিরু অধিকারী দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, মন্দিরগুলির মধ্যে কেবলমাত্র মূল মন্দিরে অর্থাৎ সিদ্ধেশ্বর মন্দিরেই শিবপূজা হয়। বাকী মন্দিরগুলিতে দেবী কালিকার পূজা হয়।

বিগ্রহের নির্মিতি ও পরিমাপ :

সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরে প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গের পূজা হয়। অন্যান্য মন্দিরের দেবী কালিকাও শিলারূপেই পূজিতা হন। ভক্তদের ভিড় থাকায়, কোন মন্দিরেই বিগ্রহের পরিমাপ নেওয়া সম্ভবপর হয় নি।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য :

(ক) মন্দিরের মালিকানা সত্ত্ব –মন্দিরগুলি 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল' দ্বারা অধিগৃহীত। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা, সুরক্ষা বজায় রাখা সমস্ত কিছুরই দায়িত্বভার এই বিভাগের কর্মচারীরাই নিয়ে থাকেন।

(খ) মন্দিরটির দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ার সময় – মন্দিরের দ্বার খোলা বা বন্ধ হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। সকালে মন্দিরের দ্বার খোলা হয়, সন্ধ্যের পর বন্ধ করে দেওয়া হয়।

(গ) মন্দিরের আইনগত জটিলতা – এই মন্দিরের কোন আইনগত জটিলতা নেই।

(ঘ) মন্দিরের সম্পত্তির আয় ও ব্যয় – মন্দিরের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই।

(ঙ) বিশেষ তিথিতে পূজা – এই মন্দিরে শ্রাবণ মাসে বিশেষ পূজা হয়। শিবরাত্রিতেও নিত্যদিনের মতোই পূজা হয়ে থাকে, কোন বিশেষ পূজা হয় না। দোল পূর্ণিমায় হরিনাম সংকীর্তন হয়।

(চ) সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠান – এই মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে শ্রাবণ মাসে মেলা বসে। এছাড়া দোল পূর্ণিমার দিন বড় উৎসব হয়।

(ছ) উৎসব ও অনুষ্ঠানে আয় ও ব্যয় – দোল পূর্ণিমার সময় পুরোহিতগণ ব্যক্তিগত ভাবে মন্দিরের বিশেষ পূজার জন্য অর্থ ব্যয় করেন। এছাড়া ভক্তগণের দক্ষিণা দ্বারাও আয় হয়।

(জ) ভোগ – প্রত্যহ এই মন্দিরে পরমান্ন ভোগ হয়। এছাড়া ফল, বাতাসা দিয়েও ভোগ নিবেদন করা হয়।

(ঝ) পুরোহিতের বেতন – শ্রী হিরু অধিকারী দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, এই মন্দিরে পুরোহিতগণের তিনটি পরিবার পালা করে পূজা করেন। এদের কোন বেতনের ব্যবস্থা নেই। ভক্তদের দানের মাধ্যমেই এদের আয় হয়।

(ঞ) ভক্ত সমাগম – এই মন্দিরে নিত্য সামান্যই ভক্ত সমাগম হয়। তবে শ্রাবণ মাসে ও দোল পূর্ণিমার মেলার সময় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে।

(ট) মন্দিরের বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা – এই মন্দিরে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ঠ) মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা – বর্তমানে এই মন্দিরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলে কিছু নেই।

(ড) প্রকাশনা- এই দেউলের নিজস্ব কোন প্রকাশনা নেই।

ভাস্কর্য :

মন্দিরগুলির শিখরগাত্র সূক্ষ্ম পাথরের কারুকার্যমন্ডিত। মন্দিরের বাইরের দিকের গাত্রের নিচের দিকে যথেষ্ট সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রকাশ দেখা যায়, যার মধ্যে হিন্দু দেবদেবীদের চেহারা এবং জন্তু জানোয়ারদের চেহারাই প্রাধান্য পেয়েছে। এই সমস্ত ভাস্কর্যগুলি আয়তনে, সৌন্দর্যে এবং শিল্পের সম্পূর্ণতায় উৎকর্ষমণ্ডিত।

তথ্যঋণ :

[১] স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্তৃক প্রাপ্ত।

[২] হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩।

****

॥ বর্ধমান জেলার ভরতপুরের স্তূপ ॥

স্তূপটির প্রতিষ্ঠাকাল :

স্তূপ প্রাক্- বৌদ্ধযুগের; বৈদিক আমলেও দেহাস্থি প্রোথিত করবার জন্য শ্মশানের উপর মাটির স্তূপ তৈরি করা হত। কিন্তু এই স্থাপত্যরূপকে বিশেষভাবে বৌদ্ধরাই গ্রহন করেছিলেন। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে স্তূপকে তিনটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথাক্রমে, **[ক] শারীর ধাতু স্তূপ-** এই শ্রেণির স্তূপে বুদ্ধদেবের এবং তাঁর অনুচর ও শিষ্যদের দেহাবশেষ সংরক্ষিত ও পূজিত হত। **[খ] পরিভোগিক ধাতু স্তূপ-** এই শ্রেণির স্তূপে বুদ্ধদেব কর্তৃক ব্যবহৃত দ্রব্যাদি রক্ষিত ও পূজিত হতো। **[গ] নির্দেশিক বা উদ্দেশিক স্তূপ-** বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের জীবনের ইতিহাসের সাথে জড়িত কোন স্থান বা ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে অথবা তাকে নির্দেশ বা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় স্তূপ নির্মাণ করা হত। পরবর্তীকালে স্তূপমাত্রই, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতীক হয়ে ওঠে এবং সেইভাবেই সমগ্র বৌদ্ধসমাজের পূজা লাভ করে। এছাড়াও বৌদ্ধতীর্থ গুলিতে পূজা দিতে এসে নৈবেদ্য স্বরূপ ছোট- বড় স্তূপ নির্মাণ করা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার একটি সাধারণ কৌশল হয়ে উঠেছিল। এই স্তূপ গুলিকে বলা হতো 'নিবেদন স্তূপ'। কিন্তু যে শ্রেণিরই স্তূপ হোক না কেন অথবা যে উদ্দেশ্যেই গঠিত করা হোক, সেগুলি গঠনগত কোন পার্থক্য ছিলনা, আকৃতি- প্রকৃতি ও গঠনপদ্ধতি প্রায় একই ছিল।

বর্ধমানের গলসী ব্লকের সন্নিকটে, বুদবুদ থানার অন্তর্গত দামোদর নদের তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম ভরতপুর। ১৯৭১খ্রিঃ থেকে ১৮৭৪খ্রিঃ পর্যন্ত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যুগ্মভাবে ভরতপুরের ঢিবি খনন করে এই প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনটির সন্ধান পাওয়া যায়। এটাই বাংলায় আবিষ্কৃত প্রথম বৌদ্ধস্তূপ। এর নির্মাণকাল সম্ভবতঃ খ্রিস্টীয় নবম- দশম শতাব্দীতে।

আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি ও ইষ্টক নির্মিত স্তূপের ধ্বংসাবশেষ থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ- ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চলে যে জনবসতি ছিল, তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও এখানে নব্যপ্রস্তর তাম্রশ্মীয় যুগ থেকে খ্রিস্টীয় নবম- দশম শতাব্দী পর্যন্ত যে, প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রাপ্ত প্রত্নরাজিই প্রমাণ করে যে, ঐ সময়কার মানুষের জীবিকা ছিল কৃষিকার্য, পশুপক্ষী ও মৎস্য শিকার এবং অধিবাসীরা পাথর, অনুশিলার অস্ত্রশস্ত্র, তামা ও জীবজন্তুর হাড়ের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। ভরতপুরের প্রাচীন জনবসতির সঙ্গে দুর্গাপুরের পার্শ্ববর্তী বীরভানপুরের যাযাবর মানুষের সঙ্গে একটা যোগসূত্র ছিলবলে অনুমান করা হয়। বীরভানপুরের মধ্যবর্তী প্রস্তরযুগের অধিবাসীরা ভরতপুরের নব্যপ্রস্তর- তাম্রযুগের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ ছিল। উভয়ের জীবনযাপন প্রণালীও প্রায় একই রকমের ছিল। ভরতপুরে আবিষ্কৃত নকশাকাটা মৃৎপাত্র ও মহিষদল (কোপাই নদ উপত্যকা) অঞ্চলে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র প্রায় সমগোত্রীয়। এই সময়কার অধিবাসীরা মাটির ঘরে বসবাস করত। খ্রিঃপূঃ দুহাজার বছর আগের সভ্যতার সঙ্গে ভরতপুরের আবিষ্কৃত সভ্যতার একটি মিল পেয়েছেন ঐতিহাসিকগণ।

তাম্র- প্রস্তরযুগের পরবর্তী যুগ হল লৌহ যুগ। উভয় সভ্যতা এখানে পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই যুগের পোড়ামাটির নিদর্শনগুলি খুব উন্নতমানের নয়। যদিও লৌহ ব্যবহারকারী জনবসতি পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে ভারতের মসৃণ কৃষ্ণবর্ণের কৌলাল সভ্যতার *(Culture of North Indian Black Polished Pottery)* সংস্পর্শে এসেছিল। তার প্রমাণ সাম্প্রতিককালে খননের ফলে প্রাপ্ত আবিষ্কৃত ভাঙা মসৃণ কৃষ্ণবর্ণের কৌলালের টুকরোগুলি। ঐতিহাসিকদের অনুমান, এই সভ্যতা খ্রিঃপূঃ কালে অল্পক্ষণের জন্য ভরতপুরে অনুপ্রবেশ করেছিল।

পরবর্তী কয়েক শতক পরে এখানে যে নূতন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা গুপ্তযুগ থেকে শুরু করে পালযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই যুগই ইতিহাসে স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিকাশের ক্ষেত্রে ছিল সুবর্ণযুগ। বর্তমানে ভরতপুরের এই স্তূপটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ, কলকাতা মণ্ডল দ্বারা অধিগৃহীত এবং সংরক্ষিত।

স্তূপের স্থাপত্যশৈলী :

ভরতপুরের স্তূপটি পঞ্চরথের উপর ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে ভিত্তি গড়ে নির্মাণ করা হয়। স্তূপটির নির্মাণকার্যে নিকটবর্তী বিভিন্ন প্রাচীন মন্দির ও বিহারের ইঁট ব্যবহৃত হয়েছে। ভূগর্ভে নির্মিত ৩৩টি সোপান সম্বলিত স্তূপটি তারই সাক্ষ্য বহন

করছে। স্তূপের ভিত্তি সুদৃঢ় এবং সেটি প্রায় দুই ইঞ্চি পাথরকুচি ও ঘুটিং মিশ্রিত কাদামাটির মসলার ঢালাই দ্বারা নির্মিত। স্তূপটি ১২.৭০ × ১২.৬৫ বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্র বিশিষ্ট।

ভাস্কর্য :

পঞ্চকৌণিক এই স্তূপটির গাত্রে খুব সামান্য ভাস্কর্য রয়েছে। এই স্তূপের উর্দ্ধাংশে বিভিন্ন স্থানে পোড়ামাটির কাজ করা নকল চৈত্যে পরিপূর্ণ। স্তূপটির গাত্রে যে কুলুঙ্গী গুলি রয়েছে, তার মধ্যে বজ্রপদ্মাসনোপবিষ্ট অপূর্ব ভাবমন্ডিত ধ্যানস্থ তথাগত বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২।

[২] রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; ফাল্গুন ১৪১৬।

****

॥ বর্ধমান শহরের মহন্ত- অস্থল ॥

বর্ধমান শহরের একেবারে পশ্চিমে রাজগঞ্জ নামক মহল্লায় আনুমানিক ১৭৩০খ্রিঃ মহারাজ কীর্তিচাঁদ 'মহন্ত- অস্থল' নির্মাণ করান। এই অস্থলটি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবীয় মঠ। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। রাজ বংশানুচরিতে আছে-

"যখন কীর্তিচাঁদ বিষ্ণুপুরাধিপতির সহিত সংগ্রামার্থে গমন করেন, কাঞ্চননগরস্থিত বারোদ্বারী নামক আম্রকাননে একজন সন্ন্যাসী, রঘুনাথ জীউ বিগ্রহ লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। কীর্তিচন্দ তথায় গমন করতঃ ভক্তি সহকারে রঘুনাথ জীউ ও সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী তাঁহাকে কহিলেন, 'আপনি যে সংগ্রামার্থে গমন করিতেছেন, তাহাতে নিশ্চয় জয়লাভ করিবেন'। কীর্তিচন্দ্ কহিলেনঃ 'প্রভো! যদি এই যুদ্ধে আমি জয়লাভ করি, তাহা হইলে এখানে প্রত্যাগমন করিয়াই, আমি আপনার রঘুনাথ জীউ ও সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবার্থে যথোপযুক্ত সম্পত্তি প্রদান করিব'। দৈবানুগ্রহে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন এবং বর্ধমানে প্রত্যাগমন করিয়াই, রাজগঞ্জে উক্ত দেবতার জন্য একটি উৎকৃষ্ট বাটী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং দেবতা ও অতিথিদিগের সেবার্থে কয়েকটি নিষ্কর মহল ও দেবত্র ভূমি প্রদান করিলেন। উক্ত মোহন্তের আশ্রমে যে নিত্য শতশত সাধু সন্ন্যাসী প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইত, তাহাও কীর্তিচাঁদের একটি অতুল কীর্ত্তি।"

চন্দ্রকোণা এবং ঘাটালে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কয়েকজন সাধু তাঁকে আশীর্ব্বাদ করেন। বিজয়ী হয়ে ফিরে এসে মহারাজা তাঁর কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা স্বরূপ রাজগঞ্জে একটি প্রাসাদ সমেত অস্থল নির্মাণ করান। এখানে বহু কক্ষ আছে এবং রঘুনাথ কৃষ্ণমূর্তির মন্দির রয়েছে। কিন্তু এখন আর বিগ্রহ সেই স্থানে নেই। রাজা দেবপূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচশত বিঘা জমিও দান করেছিলেন।

বর্তমানে এই মহন্ত- অস্থল বর্ধমানে ঐতিহাসিক পুরাকীর্তির নিদর্শন। এর একান্তই সংস্কার প্রয়োজন। দীর্ঘদিনের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্থানটি পরিত্যক্ত হয়ে উঠেছে। এখানে একটি হোমিওপ্যাথি কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তথ্যঋণ :

[১] সরকার নীরদবরণ, বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত; কলকাতা; কল্যাণ বুক এজেন্সি; ২৪শে আগস্ট ২০০৮।

****

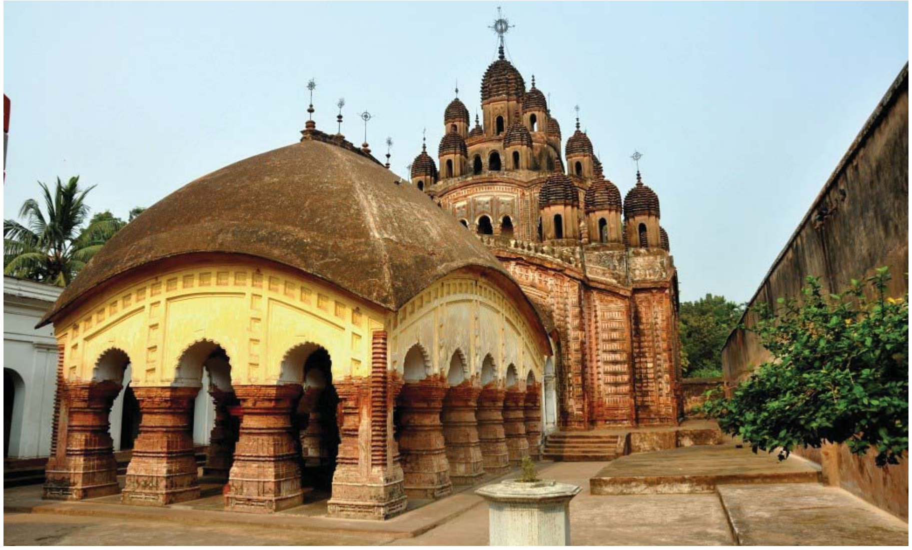

লালজী মন্দির, রাজবাড়ি চত্বর, কালনা (১৭৫৬ খ্রিঃ)

লালজী ও রাধারানি

কৃষ্ণচন্দ্রজীউ মন্দির, রাজবাড়ি চত্বর,কালনা (১৭৫১খ্রিঃ)

কৃষ্ণচন্দ্রজীউ ও রাধারানি

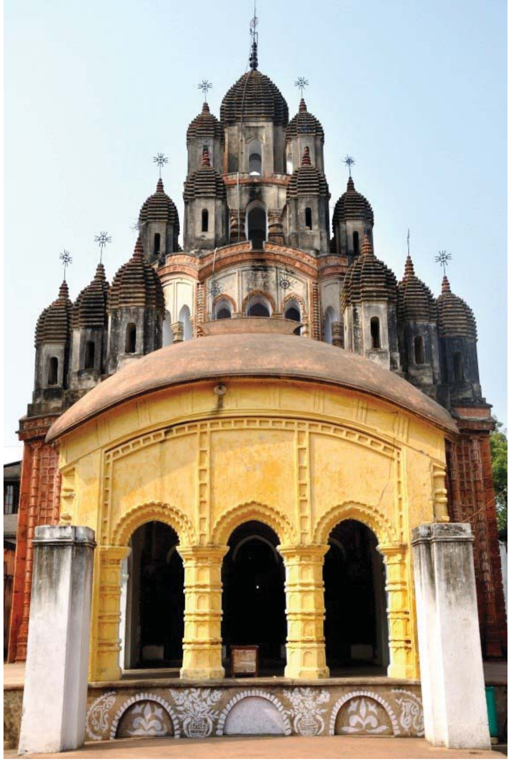

গোপালজীউ মন্দির, কালনা (১৭৬৬খ্রিঃ)
এবং নাড়ুগোপাল ও দু'পাশে রাধাকৃষ্ণ

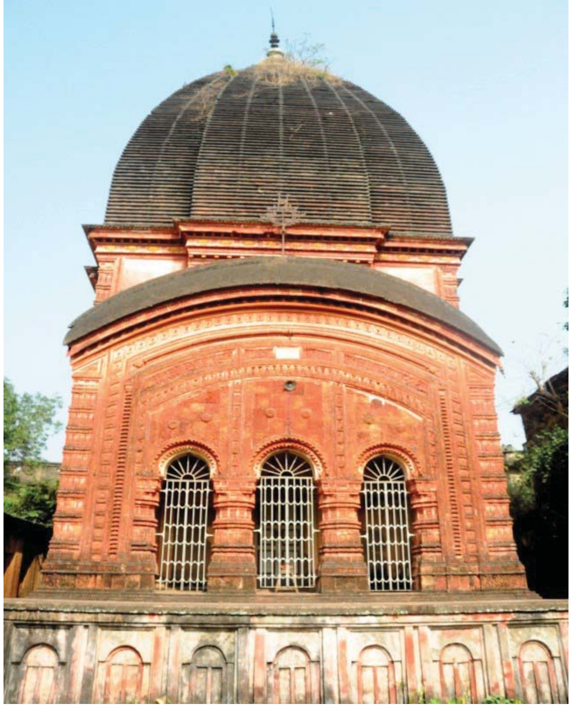

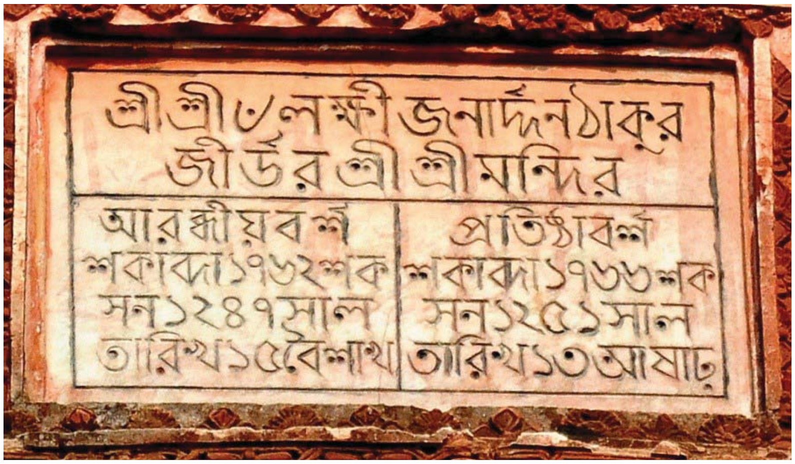

লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির, দেবীপুর (১৮৪৪খ্রিঃ)
এবং মন্দিরস্থিত প্রতিষ্ঠা ফলকের চিত্র

মদনগোপাল মন্দির, কুলিনগ্রাম (শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী)

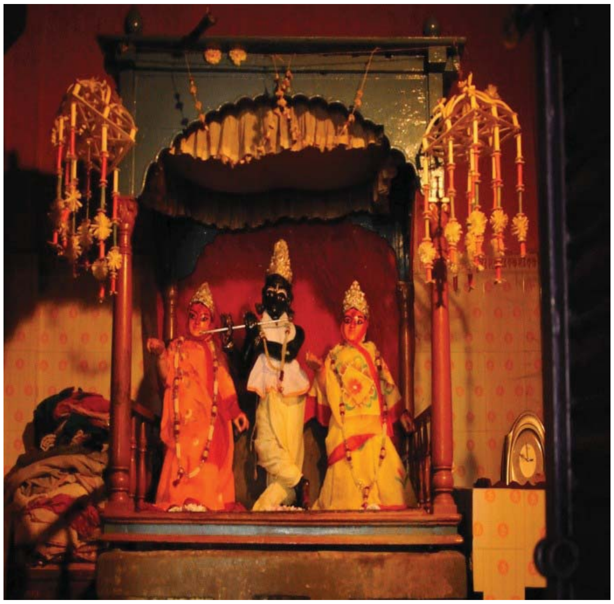

মদনগোপাল ও দু'পাশে রাধিকা এবং ললিতা

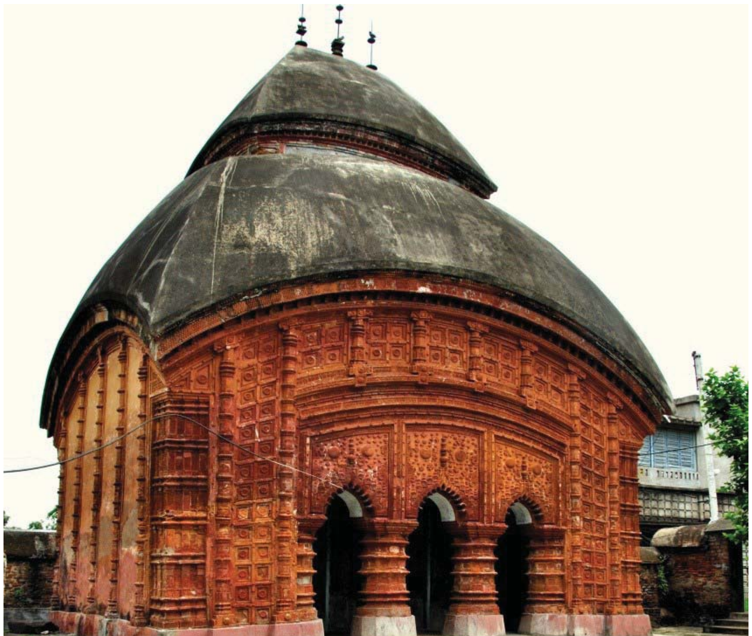

গোপীনাথ মন্দির, রায় দোগাছিয়া (১৬৫৪খ্রিঃ)

গোপীনাথ বিগ্রহ

অনন্ত বাসুদেব মন্দির, কালনা (১৭৫৪খ্রিঃ)

অনন্ত বাসুদেব

শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউ মন্দির ও দোলমঞ্চ, সিঙ্গারকোণ (আনুঃ ১৫৪০খ্রিঃ)

শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউ

রাখালরাজা মন্দির ও ইনসেটে জোড়বাংলা রীতি, গোপালদাসপুর (আনুঃ ১৮০০খ্রিঃ)

রাখালরাজা

বরাহ বিষ্ণুদেব মন্দির, কাইগ্রাম (১৬০৫ খ্রিঃ)

বরাহ বিষ্ণুদেব

বিষ্ণু মন্দির ও মন্দিরটির সময়কাল সম্পর্কিত সরকারি তথ্য, গারুই

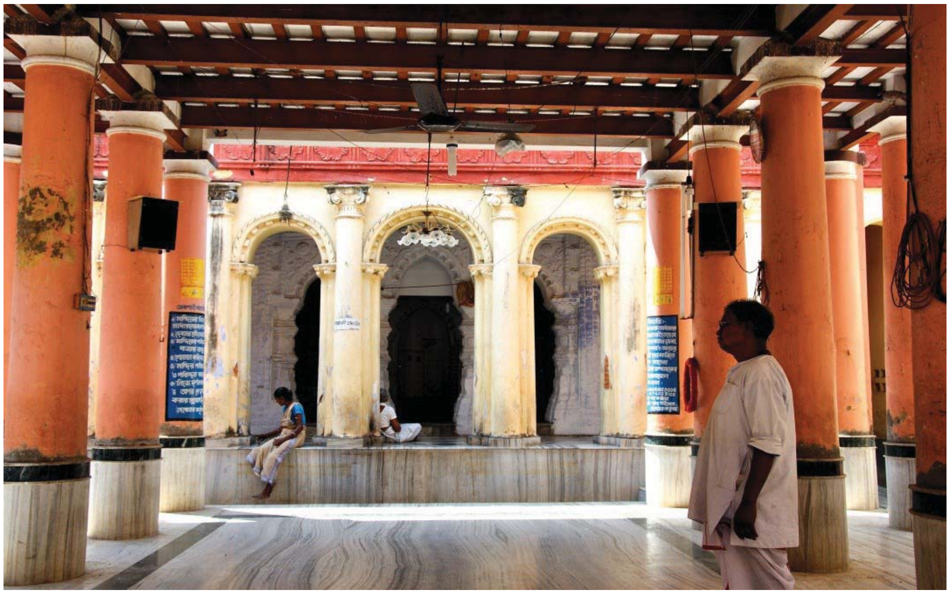

বলরাম ও কৃষ্ণ দালান মন্দির, বাঘনাপাড়া (১৬১৬ খ্রিঃ)

(এই মন্দিরের অন্য কোন ছবি তোলার অনুমতি না পাওয়ায় বাকি ছবি দেওয়া সম্ভব হল না।)

লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ মন্দির, বর্ধমান সদর (১৮৩২খ্রিঃ)

লক্ষ্মীনারায়ণ ও অন্যান্য বিগ্রহ

রাধাবল্লভ জীউ মন্দির, বর্ধমান সদর (১৮২০ খ্রিঃ)

রাধাবল্লভ ও রাধারানি বিগ্রহ

১০৮ শিবমন্দির, রাজবাড়ি চত্বর, কালনা (১৮০৯ খ্রিঃ)

প্রতাপেশ্বর শিবলিঙ্গ

প্রতাপেশ্বর মন্দির, রাজবাড়ি চত্বর, কালনা (১৮৪৯খ্রিঃ)

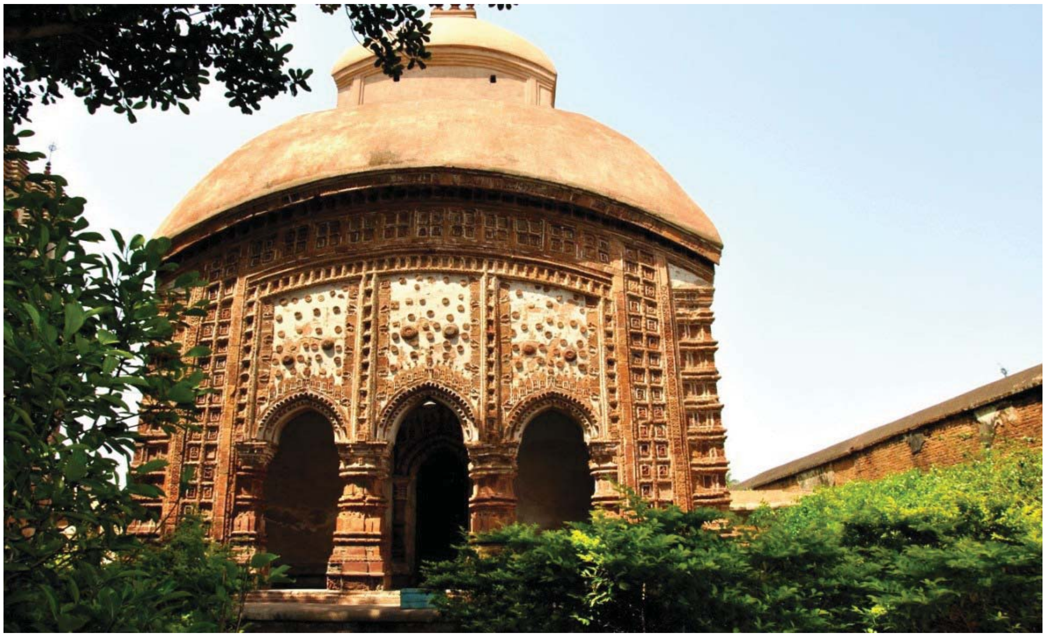

বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দির, রাজবাড়ি চত্বর, কালনা (১৭৫২খ্রিঃ)

রূপেশ্বর মন্দির, রাজবাড়ি চত্বর, কালনা (১৭৬১খ্রিঃ)

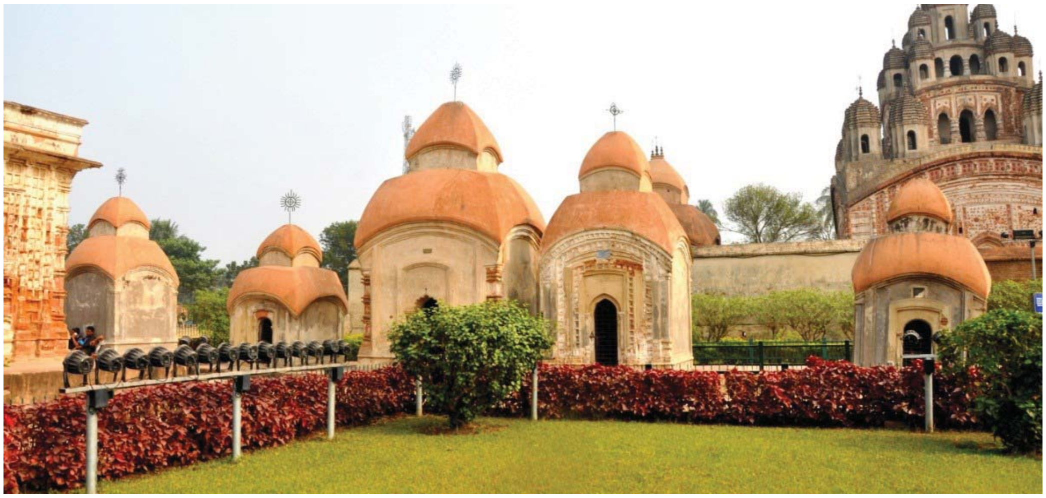

পঞ্চশিব মন্দির, রাজবাড়ি চত্বর, কালনা (১৭৬৭খ্রিঃ)

জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দির,কালনা (১৭৫৩খ্রিঃ)

জোড়া শিবমন্দির, পুটশুড়ী (আনুঃ ১৭০০খ্রিঃ)

রায় পরিবারেরতিনটি শিবমন্দির,বনকাটি(১৭৫৬খ্রিঃ)

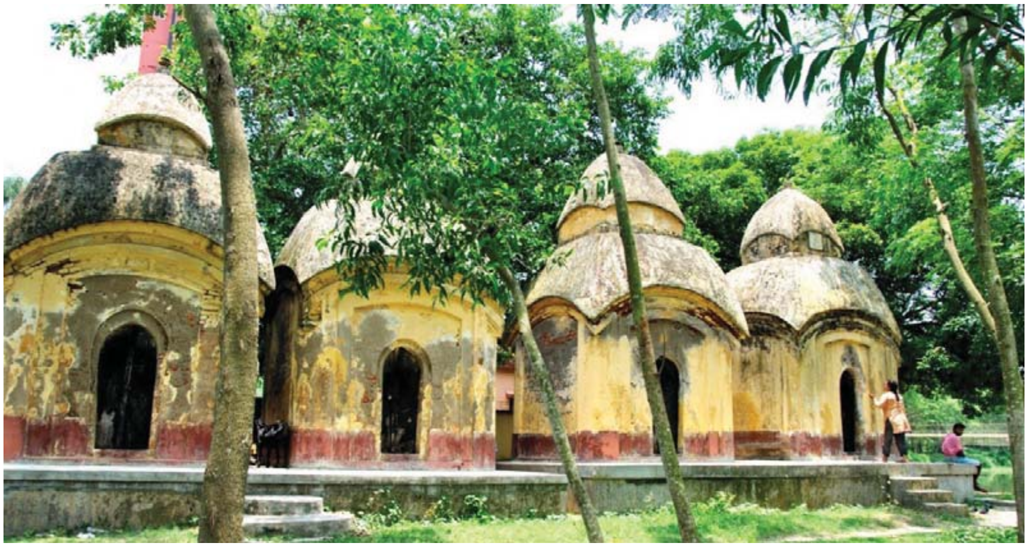

দু’জোড়া শিবমন্দির, রায় দোগাছিয়া(আনুঃ ১৭০০-১৭৫০খ্রিঃ)

রায়পাড়ার দু’জোড়া শিবমন্দির, বনপাস (১৭৮২-১৮৩৪খ্রিঃ)

চট্টরাজ পরিবারের তিনটি শিবমন্দির, রক্ষিতপুর (আনুঃ ১৭০০খ্রিঃ)

রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির, কাঁকসা (১১০০-১১৯৯খ্রিঃ) এবং
রাঢ়েশ্বর শিবলিঙ্গ

চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির, চম্পাই কসবা (সময়কাল অজানা)

চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ

১০৮ শিবমন্দির, নবাবহাট, বর্ধমান সদর (১৭৯০খ্রিঃ)

একটি মন্দিরের শিবলিঙ্গ

চন্দ্র'পরিবারের তিনটি শিবমন্দির, শ্রীবাটি, কাটোয়া (১৮৩৬খ্রিঃ)

দেউলেশ্বর মন্দির, মানকর (আনুঃ ১৮০০খ্রিঃ)

দেউলেশ্বর মন্দির, বনপাস (১৭৪৮খ্রিঃ)

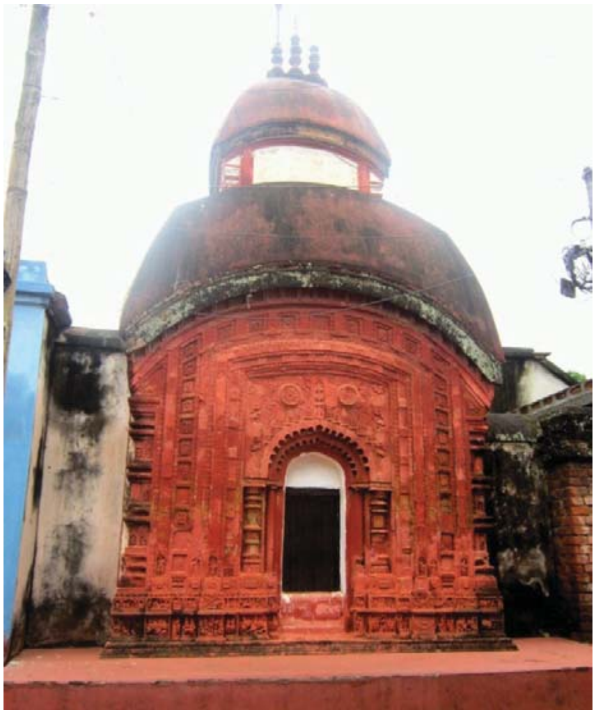

ভোলানাথ মন্দির, কাইগ্রাম (আনুঃ ১৫০০খ্রিঃ)

নন্দী পরিবারের শিবমন্দির, কুলটি (১৭৭১খ্রিঃ)

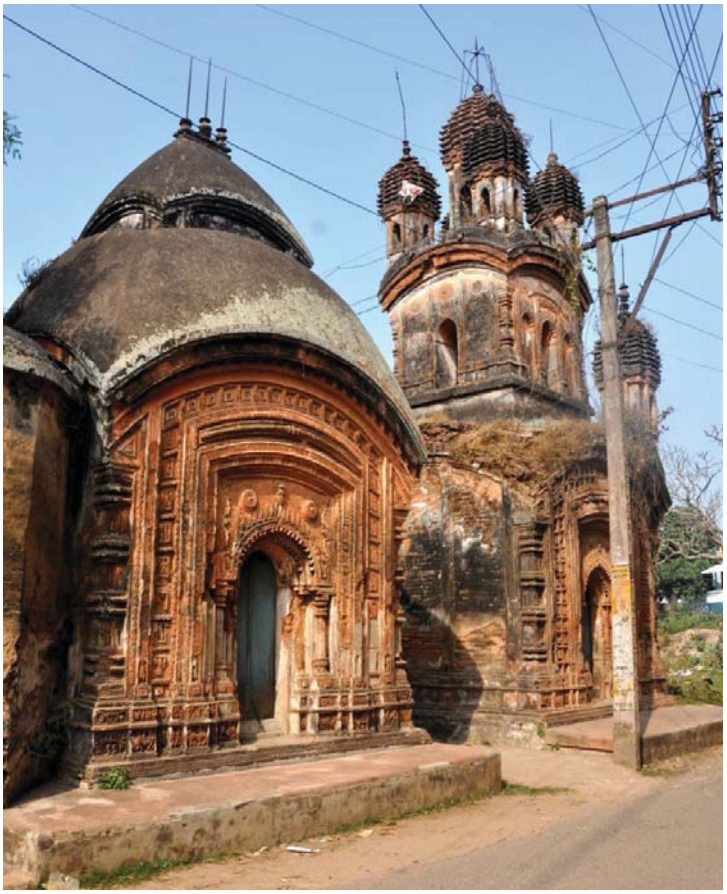

জোড়া শিবমন্দির, বৈদ্যপুর (আনুঃ ১৭৫০খ্রিঃ) এবং উক্ত মন্দিরদ্বয়ের একটি মন্দিরের শিবলিঙ্গ

সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির, বর্ধমান সদর (১৭৪০খ্রিঃ)

দেবী সর্ব্বমঙ্গলা বিগ্রহ

বিদ্যাসুন্দর মন্দির, তেজগঞ্জ (আনুঃ ১৭০০খ্রিঃ)

দেবী দক্ষিণাকালী বিগ্রহ

দেবী ত্রৈলোক্যতারিণী মন্দির, কয়রাপুর (দ্বাদশ- চতুর্দশ শতক)

দেবী ত্রৈলোক্যতারিণী বিগ্রহ

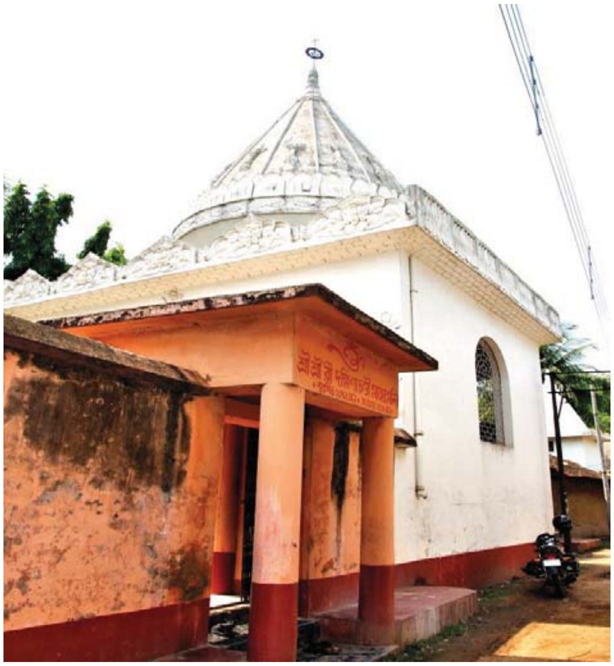

দক্ষিণাচণ্ডী মাতা মন্দির, কুসুমগ্রাম (১৭৭২ খ্রিঃ)

দেবী দক্ষিণাচণ্ডী

জগৎগৌরী মন্দির, নারকেলডাঙা (১৮৯২ খ্রিঃ)

দেবী জগৎগৌরী

শ্যামরূপা মন্দির, গড় জঙ্গল, কাঁকসা (প্রতিষ্ঠাকাল অজানা)

দেবী শ্যামরূপা

দেবী যোগাদ্যা মন্দির (পুরাতন মন্দির), ক্ষীরগ্রাম (আনুঃ ১০০০- ১০৯৯ খ্রিঃ)   দেবী যোগাদ্যা (রূপক মূর্তি)

দেবী যোগাদ্যা মন্দির (নব নির্মিত)

দেবীপীঠ অট্টহাস মন্দির, কেতুগ্রাম (প্রতিষ্ঠাকাল অজানা)   দেবী অট্টহাস

শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী

সিদ্ধেশ্বরী দেবী মন্দির, কালনা (১৭৪১ খ্রিঃ)

জোড়া দেউল, বৈদ্যপুর (সময়কাল অজানা)

ইছাই ঘোষের দেউল, কাঁকসা (আনুঃ ১১০০ খ্রিঃ)

দেউল, সাতদেউলিয়া, মেমারী (আনুঃ নবম শতক)

সিদ্ধেশ্বর মন্দির, বেগুনিয়া, আসানসোল (নবম শতাব্দী)

তিনটি দেউল, বেগুনিয়া, আসানসোল (১৪৬১খ্রিঃ- ১৫৪৬খ্রিঃ)

ভরতপুরের স্তূপ, বুদবুদ (আনুঃ নবম- দশম শতাব্দী)

মহন্ত অস্থল, বর্ধমান সদর (আনুঃ ১৭৩০খ্রিঃ)

তৃতীয় অধ্যায়

॥ মন্দির সজ্জার বিষয়বস্তু ভিত্তিক আলোচনা ॥

ইতিহাসের দিক থেকে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, আমাদের সৌন্দর্যবোধকে উন্নত ও মার্জিত করাই শিল্পকলার কর্ম। মানুষের শিল্পকলা তার একেকটি বিশেষ রূপের দ্বারা সৌন্দর্যবোধের সুপ্ত শক্তিকেই ক্রমশ জাগ্রত ও উন্নত করে তোলে। যখন কিছু খোদিত বা চিত্রিত হয় অথবা কোন খোদিত বা চিত্রিত পদার্থকে নিরীক্ষণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে এই অনন্ত সৃষ্টিরূপের দুর্ভেদ্য রহস্যকেই পাঠ করা হয় মাত্র। শিল্পকলার ধর্মই হল বিহ্বলকর বিচিত্র বহুর মধ্যে থেকে একেকটি বস্তুকে পৃথক করে দেখানো। জনসাধারণের নিজস্ব গভীরতর অনুভূতিটিকে উপভোগ্য করার উদ্দেশ্যেই শিল্পী তাঁর আপনকালে এবং সমাজে প্রচলিত প্রণালী ও উপকরণের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই রূপে শিল্পকলার পুরাতনের মধ্যে দিয়েই নূতনের আবির্ভাব হয়। বর্তমান যুগধর্মকে শিল্পী যে পরিমাণে উপলব্ধি করেন এবং তাঁর কর্মের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত করে তোলেন, ঠিক সেই পরিমাণেই তা আমাদের নিকট মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। মানুষের চিত্র ও ভাস্কর্য অনন্ত সৌন্দর্য প্রকাশেরই একটি ক্ষীণ প্রয়াস মাত্র। চিত্রে যেমন বর্ণ সৌন্দর্য, ভাস্কর্যেও তেমনি মানব রূপের গঠন মাহাত্ম্যই ফুটে ওঠে। বস্তু বিশেষের ক্ষণিক শ্রেষ্ঠতাকে নির্দিষ্ট করবার শক্তিই চিত্রকর ও ভাস্কর বর্ণে ও পাষাণে আমাদের নিকট প্রকাশিত করেন।[১]

শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর শিল্পের 'ক' ও 'খ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "পাথর কেটে, কাঠ কুঁদে ছবি বার করলে ভাস্কর- কাটার এবং কোঁদার বাহাদুরি খানিকটা জড়িয়ে রইলো ছবিতে, মূর্তির সঙ্গে মূর্তি যে মানুষটা গড়লে, সে-ও রইলো জড়ানো, কাজেই মূর্তিকে বলা গেলনা অমানুষই কিছু।"[২] অর্থাৎ মানুষের ছোঁয়া, মানুষের গন্ধ, খোদিত মূর্তিকে জীবন্ত করে তোলে। চিত্রকর বা ভাস্করের এই কৃতিত্ব আপনা হতেই দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করে এবং দর্শক সেই মনোরম ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হন, কিন্তু চিত্রকর বা ভাস্করকে কেউ হৃদয়ে স্থান দেননা। তাঁরা কালস্রোতে মিলিয়ে যান।

শিল্পকলা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর উক্ত অধ্যায়ে আমাদের গবেষণার মূল বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করা যাক। আমাদের গবেষণাকার্যের কেন্দ্র ভূমি বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ক্ষুদ্র- বৃহৎ টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি সমীক্ষা এবং অনুসন্ধান করে মন্দিরগাত্রে মূল্যবান কারুকার্য এবং ভাস্কর্যগুলি নথিভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ভাস্কর্যগুলিকে বিষয় অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলার বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে যে টেরাকোটার কারুকার্যে সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে, তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মধ্যযুগের শেষ দুই শতক ও উনিশ শতকে সমগ্র বাংলা জুড়ে যে মন্দিরগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র লক্ষ করা যায়। দুই বাংলার দেশ- কাল- অর্থনীতি- সংস্কৃতি এবং স্থাপত্য শিল্পরীতির প্রেক্ষাপটেই মন্দির নির্মাণ হয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে মন্দির নির্মাণে যে ঐতিহ্য প্রবহমান ছিল, তার সঙ্গে বাংলায় যে পোড়ামাটির মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল, সেগুলিকে নানা দিক থেকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন- এদের রীতি, নির্মাণকাল সবই বাংলার নিজস্ব। আয়তনের বিশালতার দিক থেকেও সর্বভারতীয় মন্দিরের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও, অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও স্থাপত্যের বৈচিত্র্যের জন্য মন্দিরগুলি গুরুত্বপূর্ণ।[৩]

মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির অলংকরণ বাংলার কারিগরদের একেবারে নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ। পোড়ামাটির অলংকরণ কখনও মন্দিরের চার দেওয়ালে, কখনও তিনদিকের দেওয়ালে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মন্দিরের সম্মুখ দেওয়ালে দেখতে পাওয়া যায়। কিছু মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালেও অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়। পোড়ামাটির ভাস্কর্যের এইরকম স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বাংলা ব্যতীত অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।[৪]

ইতিপূর্বে বাংলার মন্দিরসজ্জা সম্পর্কিত নানান বর্ণনামূলক আলোচনা দেশি- বিদেশি সমালোচকগণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা মন্দিরসজ্জা সম্পর্কিত কোন ভাষ্য দেন নি। উক্ত অধ্যায়ে মন্দিরসজ্জার বর্ণনামূলক আলোচনার পাশাপাশি

তার ভাষ্যও তুলে ধরাই হবে আমাদের প্রধান কাজ। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির আলোকে উক্ত বিষয়টি উপস্থাপিত করা হবে।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন শহর এবং গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে টেরাকোটার কারুকার্য সমন্বিত মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্যের যে বিষয়গুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেই সকল বিষয়গুলিকে সজ্জিত করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি সমীক্ষা করে প্রধানত দু'ধরনের মোটিফ লক্ষ করা গেছে, **(১) পৌরাণিক** এবং **(২) সামাজিক** । মন্দির নির্মাতাদের কাছে ধর্মই ছিল প্রধান বিষয়, তাই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক মোটিফের আধিক্য লক্ষ করা যায়, কিন্তু উনবিংশ শতকে এসে মন্দির গাত্রে পৌরাণিক মোটিফের প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে সামাজিক মোটিফের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়, এছাড়া উক্ত সময়সীমায় মন্দির অলংকরণে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী সময়ে যে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল সেই মন্দিরগুলির মধ্যে অধিকাংশ মন্দিরেই শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তিফলক, নামসংকীর্তনের দৃশ্য ফলক বিরল নয়। অর্থাৎ একথা বলাই বাহুল্য যে, মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্যের ও সামাজিক মোটিফের পাশাপাশি চৈতন্যদেব সম্পর্কিত বিভিন্ন মোটিফ এবং তাঁর প্রচলিত ধর্মের মূল উপাস্য দেবতার চিত্রফলক একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে রয়েছে, তাই এই বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচনার দাবি রাখে, অতএব মন্দির অলংকরণে প্রাচীন ঐতিহ্য ও সামাজিক মোটিফ সংক্রান্ত আলচনার পর শ্রীচৈতন্য বিষয়ক আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয় হল 'মন্দির অলংকরণে পৌরাণিক দৃশ্যাবলি ও দেবদেবী প্রসঙ্গ'।

(১) মন্দির অলংকরণে পৌরাণিক দৃশ্যাবলি ও দেবদেবী প্রসঙ্গ :

মধ্যযুগে বাংলায় পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য পোড়ামাটির ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়ে, ফলে পাথরের তুলনায় পোড়ামাটি নির্মিত মন্দিরের আধিক্য লক্ষ করা যায়। এই পোড়ামাটির দ্বারা নির্মিত মন্দিরগুলি জনগণের জন্য নির্মিত হত না, সেগুলি নির্মিত হতো উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির ফরমায়েশ অনুযায়ী শুধুমাত্র তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই। তবে এই মন্দিরগুলিতে অবারিত দেবদর্শন করা যেত এবং দেব-দেবী সংক্রান্ত বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করা যেত। মন্দির গাত্রে অলংকরণের ধরনগুলি নিয়মাবদ্ধ ছিল। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থপ্রদানকারী বা পৃষ্ঠপোষকের মতানুযায়ী ছকের পরিবর্তন ঘটিয়ে বৈচিত্র্য আনা হত। যেমন, মন্দিরের পা-ভাগ অংশে ঐহিক দৃশ্যাবলি, উপরে কৃষ্ণলীলা বা কদাচিৎ রামলীলা বিষয়ক দৃশ্য; অবতারগণ ও অন্যান্য দেবতা পাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলক গুলিতে উল্লম্ব সারিতে সজ্জিত হত। এই সব নিয়ম সর্বত্রই প্রযোজ্য ছিল না, তার ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়।[৫]

মন্দির অলংকরণে প্রাচীন ঐতিহ্য বলতে, মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা দ্বারা সজ্জিত বিভিন্ন পুরাণের অংশবিশেষ, রামায়ণ, মহাভারত, রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, কৃষ্ণের বাল্যলীলার বিভিন্ন দৃশ্য যেগুলি বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রের শোভাবর্ধন করছে সেইসব দৃশ্যগুলির কথাই বলা হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, রাধাকৃষ্ণলীলা প্রভৃতি মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। ফলে তারই প্রভাব যে বাংলার মন্দিরগাত্রে পড়বে এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। শুধু তাই নয়, পুরাণের নানা দেব-দেবীগণকেও মন্দিরগাত্রের সজ্জায় লক্ষ করা যায়। মন্দির শিল্পীগণ তাঁদের নিপুণ হাতের স্পর্শে প্রতিটি ঘটনাকে এবং পৃথকভাবে খোদিত ফলকগুলিকে জীবন্ত রূপদানের চেষ্টা করেছিলেন, তাই মন্দিরগুলি দর্শকের কাছে আজও সমানভাবে আকর্ষণীয় এবং মনমুগ্ধকর হয়ে রয়েছে। এরপর মন্দিরগাত্রে যে পুরাণ সম্পর্কিত বিশেষ দৃশ্যাবলি লক্ষ করা হয়েছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক।

মন্দির ভাস্কর্যে রামায়ণ প্রসঙ্গ -

মন্দিরগাত্রে দেব-দেবীর উপাখ্যান নিঃসন্দেহে পোড়ামাটির অলংকরণের মুখ্য বিষয় ছিল। মন্দিরের দেবতা রূপে যিনিই অধিষ্ঠিত হন না কেন, রামায়ণ ও মহাভারত নামক পুরাণ দু'টির জনপ্রিয়তার কারণে মন্দির সজ্জার ক্ষেত্রে এ দু'টি পুরাণের বিভিন্ন ঘটনা সমূহ দৃশ্যায়িত হয়েছে। তবে মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ অধিক জনপ্রিয় ছিল। বাঙালি কবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহুল প্রচারিত হওয়াই ছিল এর মূল কারণ।[৬] বর্ধমান জেলার

মন্দির গাত্রে রামায়ণেরই বিভিন্ন কাহিনির চিত্রায়ণ লক্ষ করা গেছে। মন্দির স্থপতিগণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপরেই মুখ্যত নির্ভর করায় সেগুলি কেবলমাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ কাহিনিরই অলংকরণ হয়ে উঠেছে। একদিকে এটি যেমন বাঙালি মনে প্রভাব বিস্তার করেছে, অন্যদিকে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নব বৈষ্ণবধর্মের প্লাবনে রামচন্দ্র আবার শ্রীবিষ্ণুর অবতার হিসেবেও কল্পিত হয়েছেন। সুতরাং, বাঙালি জীবন কোনদিন যে শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীরাম ও শ্রীবিষ্ণুতে কোন প্রভেদ করতে পারেনি, তার প্রমাণ বাংলার মন্দির ভাস্কর্যে দেখতে পাওয়া যায়।[৭]

রাম-সীতার যুগলাসন মূর্তিকে চলতিভাবে 'রামরাজা' মোটিফ বলা হয়। উনিশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে রামসীতার উপবিষ্ট মূর্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বারের শীর্ষভাগে কিংবা কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষভাগে একেবারে কেন্দ্রস্থলে স্থান পেয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দির, বনকাটি গ্রামের গোপালেশ্বর মন্দির, মানকরের দেউলেশ্বর শিব মন্দির, বনপাস গ্রামের রায়পাড়ার রায় পরিবারের মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত চারটি শিব মন্দিরের মধ্যে বামদিক থেকে দেখলে প্রথম দেউল রীতির শিব মন্দির ইত্যাদি মন্দিরগুলির নাম করা যায়। তবে এর একটি ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় গ্রামদেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরটিতে। উক্ত মন্দির সংলগ্ন উন্মুক্ত বারান্দার সম্মুখস্থিত মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে সজ্জিত, তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের মধ্যবর্তী ফলকটিতে একটি ছত্রতলে যুগল উপবিষ্ট মূর্তি ফলকের মধ্যে ধনুর্ধারী রামের দক্ষিণপার্শ্বে লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান রয়েছেন। এবং সম্মুখ ভূমিতে নত মস্তকে প্রণামরত রয়েছেন হনুমান।

বর্ধমান জেলার বনপাস, শ্রীবাটি, কালনা, বনকাটি, মানকর প্রভৃতি অঞ্চলের রামসীতার মূর্তির গঠনে সাদৃশ্য রয়েছে, ফলে মূর্তি নির্মাণ শৈলীতে গতানুগতিকতা লক্ষ করা যায়। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, হয়ত একটি নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের বা গ্রামের কারিগরগণ বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছিলেন বা হতেন। রামায়ণ কাহিনিতে যুগল মূর্তিতে রাম-সীতা সিংহাসনে বেশি দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন না, কিন্তু উনিশ শতকের কারিগরগণ বা স্থপতিগণ রামসীতার বিয়োগান্ত পরিণতির কথা স্মরণে না রেখে রামসীতার সুখী-দাম্পত্য জীবনের দৃশ্যটিই বারংবার ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

'রামরাজা' মোটিফের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল কালনার প্রতাপেশ্বর শিব মন্দিরের রাম-সীতার প্যানেল। উক্ত মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের শীর্ষে রাম-সীতার সভার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। রাম-সীতা এখানে কোন সিংহাসনে উপবিষ্ট নন, দেশিয় প্রথায় চৌকি জাতীয় কোন আসবাবে তাঁরা অবস্থান করছেন, যার তলদেশ হাড়ি, গাড়ু প্রভৃতি তৈজসপত্র দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। রামের বাম ও দক্ষিণ হস্তে যথাক্রমে ধনুক ও শর রয়েছে। পর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট দেবী সীতার বামদিকে দণ্ডায়মান একজন সেবক পাখা হাতে ব্যজন করছেন এবং রামচন্দ্রের দক্ষিণপার্শ্বে রয়েছেন ছত্রধারী সেবক। এছাড়াও রয়েছেন প্রণামরত হনুমান ও জাম্বুবান। রাম-সীতার উভয়পার্শ্বে প্রজাগণ দণ্ডায়মান। এই দৃশ্যে রামচন্দ্রকে অযোধ্যার রাজার তুলনায় গ্রামের জমিদারের রূপেই সাজিয়েছেন স্থপতিগণ।

'রামরাজা' মোটিফের পাশাপাশি রামায়ণের আর একটি জনপ্রিয় মোটিফ মন্দির গাত্রে লক্ষ করা যায়, সেটি হল রাম-রাবণের যুদ্ধ। কয়েকটি মন্দিরের ভাস্কর্যে যুদ্ধরত রাম-রাবণের দুপক্ষের মাঝে রয়েছেন দেবী দুর্গা। এই দৃশ্যটি বলাবাহুল্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ দ্বারা প্রভাবিত। লঙ্কাযুদ্ধের পূর্বে রামের দুর্গাপূজার কোন ঘটনা বাল্মীকি রামায়ণে নেই। কৃত্তিবাস রামায়ণে রাম ব্রহ্মার কাছে নিয়মবিধি জেনে শরৎকালে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। কৃত্তিবাসের সময় শরৎকালীন দুর্গাপূজার ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা এর একটি কারণ বলা যেতে পারে।

বাংলার মন্দিরে রামকথার চিত্রণ মূলত বৈষ্ণব ভাবধারার সূত্রেই ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। সপ্তদশ শতকের পূর্বে নির্মিত মন্দির গাত্রে মানব মূর্তির প্রচলন বেশি ছিল না। কিন্তু বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুর গ্রামে আনুমানিক ১৫৫০খ্রিঃ নির্মিত জোড়া দেউলে মানব মূর্তি লক্ষ করা যায়।[৮] এই জোড়া দেউলে রামায়ণের চমৎকার যুদ্ধদৃশ্য লক্ষ করা যায়। জোড়া দেউলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেউলটির দক্ষিণ দেওয়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকের মধ্যে তির-ধনুর্ধারী রথারূঢ় রামের সঙ্গে রাবণকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়। রাবণের দশটি শির এবং কুড়িটি হাত স্পষ্ট ভাবে লক্ষ করা যায়। এদের আশেপাশে রয়েছে হনুমানের সঙ্গে রাক্ষসদের ধস্তাধস্তির চিত্র।

দেবী মহামায়াকে মধ্যে রেখে লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্যটি দৃশ্যায়িত হয়েছে কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত প্যানেলে। দেবীর দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান দরবারি পোশাক পরিহিত দশানন রাবণের কুড়িটি হস্তের মধ্যে বামহস্ত গুলিতে ধনুক এবং দক্ষিণহস্ত গুলিতে শর ব্যতীত ঢাল, তরোয়াল, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র রয়েছে। দেবীর বামপার্শ্বে রামচন্দ্র তির- ধনুক সহযোগে যুদ্ধরত। রামের সঙ্গে রয়েছে সৈন্যদল ও বানর সেনা; রাবণের সঙ্গে খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান দিগম্বরী মুক্তকেশী রাক্ষসী বা যক্ষী।

কাটোয়ার সীতাহাটি গ্রামের দেউল শিবমন্দিরটির (১৬৮২ শকাব্দ বা ১৭৬০ খ্রিঃ) মুখ্যদ্বারের শীর্ষ জুড়ে উল্লম্ব ভাবে রাম- রাবণের যুদ্ধদৃশ্য দৃশ্যায়িত হয়েছে। প্রথম অংশে দেখা যায়, লক্ষ্মণ হনুমানের পিঠে আরোহণ করে তিরধনুক নিয়ে রথারূঢ় একজন তিরধনুর্ধারী যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধরত। এবং এই অংশটির ঊর্ধ্বে রথারূঢ় দশানন রাবণ হস্তে বর্শা ধারণ করে দণ্ডায়মান। তাঁর কটিতে লম্বা তরোয়াল রয়েছে এবং বামপার্শ্বে একটি ধনুক রয়েছে। রাবণের উল্টোদিকে রথারূঢ় রামচন্দ্র তিরধনুক নিয়ে যুদ্ধরত। এই দুটি অংশের মধ্যবর্তী স্থানটি পূর্ণ করা হয়েছে বানর এবং রাক্ষস সেনাদের যুদ্ধদৃশ্যের ফলক দ্বারা।

বর্ধমান সদর (দক্ষিণ) মহকুমার খন্ডঘোষ ব্লকের শাঁকাড়ি উত্তরপাড়ায় অবস্থিত মজুমদার পরিবারের রাধা- গোবিন্দ মন্দিরের ত্রিখিলান বিশিষ্ট মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের শীর্ষাংশে লঙ্কাযুদ্ধ দৃশ্যায়িত হয়েছে। এখানে দশানন রাবণ ঘোড়ায় টানা রথের উপর বর্শা হাতে দণ্ডায়মান, সঙ্গে তির- ধনুকও রয়েছে। উল্টোদিকে ঘোড়ায় টানা মকর রথে দণ্ডায়মান রামচন্দ্র তির- ধনুক সহকারে যুদ্ধরত।

বর্ধমান সদর (উত্তর) মহকুমার বনপাস গ্রামের কামারপাড়ায় অবস্থিত দেউলেশ্বর শিব মন্দিরের মুখ্য প্রবেশ দ্বারের বামপার্শ্বের প্রথম কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষাংশে বৃহৎ অংশ জুড়ে অনুভূমিক সারিতে সজ্জিত ফলকে লঙ্কাযুদ্ধের কাহিনিই দৃশ্যায়িত হয়েছে। ফলকের বামপার্শ্বে তিরধনুর্ধারী রাম- লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান রয়েছেন একটি পা ঊর্ধে তুলে এবং উল্টোদিকে, কুড়িটি হস্ত নিয়ে দণ্ডায়মান দশানন রাবণ সম্মুখের দুটি হস্তে তরোয়াল ধরে রয়েছেন। রাবণের পদতলে বানরের দল রয়েছে এবং তাঁর চরণ যুগল ধরে নিম্নে আকর্ষণ করছে। রাবণের বামপার্শ্বে ঢাল- তরোয়ালধারী সৈনিক দণ্ডায়মান।

‘রামরাজা’ মোটিফ ও ‘লঙ্কাযুদ্ধ’ ব্যতীত রামায়ণের কিছু খণ্ডদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে কৃত্রিম দ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে স্তম্ভের তলদেশে ভিত্তিতলের উপর একটিই ফলক রয়েছে যেখানে বনবাসী রাম- লক্ষ্মণ পাশাপাশি দণ্ডায়মান। পরনে ধুতি এবং উর্ধাঙ্গে ধুতিরই একটি বস্ত্রখণ্ড রয়েছে। দু’জনের হস্তেই ধনুক রয়েছে।

নৌকা করে নদী পারাপারের জন্য রামচন্দ্র গুহক চন্ডালের স্মরণ নিচ্ছেন, এই দৃশ্যটি রয়েছে কাটোয়ার শ্রীবাটি গ্রামের মন্দির প্রাঙ্গণের বামদিকের দেউল মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের উপরে, ডানদিক থেকে প্রথম গ্রন্থিফাঁদ নকশার তলদেশে উৎকীর্ণ ফলকে। এই প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের ‘জয়ন্ত কাকের নেত্র বিদ্ধকরণ’ অংশে বলা হয়েছে-

“গুহকের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম
চিত্রকূট শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম।।
দেখিয়া আতঙ্ক হয় গঙ্গার তরঙ্গ
ত্বরা পার কর যেন নহে সত্য ভঙ্গ।।”[৯]

আবার কৃত্তিবাস বিরচিত ‘শ্রীরাম পাঁচালি’তে রামচন্দ্র বনবাসে যাওয়ার সময় অযোধ্যা থেকে দূরে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নদী পেরিয়ে চিত্রকূট যেতে চান। নৌকা পারাপারের জন্য তিনি গুহকের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে বলেন-

“এত ভাবিয়া গুহার তরে বলিলা শ্রীরাম।
চিত্রকূট গিয়া আমি করিব বিশ্রাম।।
গঙ্গার গভীর জল বিষম তরঙ্গ।
ঝাট পার করে মোরে সত্য না হয় ভঙ্গ।।”[১০]

কালনার লালজী মন্দিরের বারান্দার সম্মুখস্থিত মধ্যবর্তী দ্বারের খিলান শীর্ষে দক্ষিণপার্শ্বে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে চতুর্থ সারিতে বানর সেনার সেতুবন্ধনের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। বনপাসের দেউলেশ্বর

শিবমন্দিরের মুখ্যদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলটির তলদেশ থেকে চতুর্দ্দশ ফলকে হনুমান দু'হাতে রাম ও লক্ষ্মণ কে নিয়ে উপবিষ্ট রয়েছেন। কাটোয়ার শ্রীবাটি গ্রামের শঙ্কর মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের প্রথম অনুভূমিক সারির ডানদিক থেকে লক্ষ করলে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, দণ্ডায়মান রামচন্দ্রের সম্মুখে প্রণামরত হনুমান।

মন্দির গাত্রে রামায়ণের যে দৃশ্যগুলির উল্লেখ করা হল, সেগুলি সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে নির্মিত মন্দির গুলিতে লক্ষ করা যায়। তবে উনিশ শতকে এসে রামকথার চিত্রণে বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে। রাম-সীতার উপবিষ্ট মূর্তি এবং রাম-রাবণের যুদ্ধের ফলক পুনরাবৃত্ত হয়েছে বারংবার। রামায়ণ, শিল্পে যথেষ্ট গুরুত্ব পেলেও, যে সব শিল্পকীর্তির সামান্য নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার সম্পূর্ণটাই ক্ল্যাসিকাল শিল্পকীর্তি। হাজার বছর আগে রামায়ণ কাহিনি আবদ্ধ ছিল সংস্কৃত ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই। কিন্তু খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে রামায়ণের প্রাদেশিক অনুবাদ শুরু হয়। মধ্যযুগে রামভক্তি সাধনার টানে বহু প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ হতে শুরু করে। প্রভাবের দিক থেকে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস'এর অবদানই বেশি। মধ্যযুগে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালি অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভের ফলে, ক্রমশ বাঙালির কাছে পৌরাণিক সংস্কৃতি, লৌকিক হয়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু কৃত্তিবাসের কাহিনি বাঙালির সংস্কৃতিতে বিস্তৃত প্রভাব ফেললেও, রামভক্তি সাধনার ধারা বাংলায় তেমন গুরুত্ব পায়নি। তাই মন্দির গাত্রে রামকথার প্রাধান্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়। কারণ বাংলায় ইষ্টদেবতা রূপে মন্দিরে রামের পূজার প্রচলন কমই ছিল। গুপ্তিপাড়ায় সপ্তদশ শতকে নির্মিত রামচন্দ্র মন্দির এর ব্যতিক্রম তবে বর্ধমান রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পাশে রামচন্দ্রের একটি দালান মন্দির নির্মিত হয়েছিল।[১১]

বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচাঁদ বহু অর্থ ব্যয়ে মূল বাল্মীকি রামায়ণ, ব্যস বিরচিত মহাভারত, হরিবংশ ইত্যাদি বই অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। তবে মহারাজ রামায়ণ ও মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ দেখে যেতে পারেননি। ১৮৫৫খ্রিঃ জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে, রামায়ণের আদিকান্ডের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদের ১০০টি সৌজন্য সংখ্যা তিনি বিতরণ করিয়েছিলেন।[১২] এছাড়াও বটতলার ছাপাখানার দৌলতে বাংলা বইয়ের মূল্য অসম্ভব রকম হ্রাস পেয়েছিল। কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ কাব্যটির শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা সংস্করণের মূল্য ছিল মাত্র চব্বিশ টাকা। কৃত্তিবাসের আদিপর্ব রামকৃষ্ণ মল্লিকের প্রেসে (১৮৩১খ্রিঃ) তিন টাকা এবং সুধাসিন্ধু প্রেসে (১৮৫৬খ্রিঃ) ছাপা দুই আনা মাত্র।[১৩] অর্থাৎ বটতলার বইগুলি মুদ্রিত মূল্যের তুলনায় অনেক কম দামে বিক্রয় হওয়ার জন্য এই বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে বাংলার ঘরে ঘরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

কাব্য হিসেবে রামায়ণের রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে ভারতীয় শিল্পে রামায়ণ কাহিনির রূপায়ণ হয়েছিল সম্ভবত গুপ্তযুগে। প্রাক্-গুপ্তযুগে রাম শ্রীবিষ্ণুর অবতার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।[১৪] ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকারের সময় থেকেই দানব দলন রাম-নামের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে। সেন রাজাদের আমল থেকেই মন্দিরচিত্রে রামকথা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রামের মূর্তিপূজা রামায়েত সাধুদের দ্বারা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে প্রচারিত হয়েছিল। ষোড়শ শতকের শেষ পর্যন্ত কোন শ্রীরামপাঞ্চালীর রচয়িতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু চৈতন্য সমকালে রামচরিত নাটগানের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কৃত্তিবাসের নামে যে রচনা আমাদের কাছে অতি জনপ্রিয়, তা আদ্যন্ত ভক্তিরসাপ্লুত। সে ভক্তিরস চৈতন্যের ধর্ম প্রভাবিত।[১৫]

কৃত্তিবাসের কাব্যে করুণ রসের আধিক্য থাকলেও, বাংলার মন্দিরগাত্রে কিন্তু বীররসেরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। রামায়ণের সুন্দর কান্ড থেকে শুরু করে উত্তর কান্ড পর্যন্ত আক্রমণ প্রতি আক্রমণের উত্তেজক কাহিনিই বাঙালিকে সর্বাধিক আকর্ষণ করেছে। কিন্তু চৈতন্য আন্দোলনের ফলে কৃষ্ণকথার বিপুল প্রভাবে রাম মাহাত্ম্য ক্রমশ আড়ালে পড়ে যায়, ফলে বাংলায় রামভক্তি সাধনায় ভাটা পড়ে।[১৬] কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে রামায়ণের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। চৈতন্য পরবর্তী সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলিতে রামায়ণের দৃশ্যায়ণ, পটচিত্রে বা কালীঘাটের পটে রামকথার উপাদান এই কথাই প্রমাণ করে। তবে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে ধর্মের অনুষঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য উনিশ শতকের মন্দির গাত্রে রামকথার বৈচিত্র্য খানিকটা হ্রাস পেয়েছে বলা যায়।

মন্দির ভাস্কর্যে শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ -

মন্দির টেরাকোটার মধ্যে রামায়ণের কাহিনি যতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, মহাভারতের কাহিনি ততটা প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাদৃশ্য বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে যত্ন সহকারে উৎকীর্ণ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের জনপ্রিয়তাই এর একমাত্র কারণ বলে ধরা যেতে পারে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ আপামর জনসাধারণের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের অবতার রূপে স্বীকৃত হওয়ায়, বাংলার ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণ উপাসনা এবং অবতার শ্রীচৈতন্যের পূজা প্রবর্তিত হয়। ফলে সেই সময়কার শিল্প ও সাহিত্যে এই ঘটনা বিশেষভাবে প্রেরণা দান করে।[১৭] রাজা হুসেন শাহের রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫১৯খ্রিঃ) থেকে হিন্দু পুনরভ্যুদয় দেখা দিলে, তার পরিণতি স্বরূপ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক মন্দির নির্মাণ হতে শুরু করে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলির অধিকাংশই নানান নামধারী ও প্রায়শই রাধানুষঙ্গযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। অষ্টাদশ শতকের ভাস্কর্য মণ্ডিত মন্দির সমূহ প্রধানত শ্রীকৃষ্ণের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। যেমন- গোপীনাথ, লালজী, দামোদর, কৃষ্ণচন্দ্র, বৃন্দাবনচন্দ্র, রাধাগোবিন্দ, রাধাবল্লভ, গোপালজীউ ইত্যাদি। এই সময় যে সমস্ত মন্দির গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সমস্ত মন্দির গুলির অলংকরণের মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণলীলা। পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকবর্গের উৎসাহে রামায়ণ, ভাগবত, পুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত রচনার অনুবাদ কার্যের জন্য জনসাধারণের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটে, ফলে সেই সময় নির্মিত মন্দিরগুলির পুরোভাগের বহির্গাত্রে কৃষ্ণলীলার রূপায়ণ সর্বাধিক যত্নসহকারে করা হয়েছিল।[১৮] মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত নানারূপ ভাস্কর্যের আর একটি কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে বটতলার বই বাজার। এই বাজারে চলতি এবং বহু বিক্রি হওয়া গ্রন্থের মধ্যে প্রধান ছিল বৈষ্ণব গ্রন্থ। ১৮২০খ্রিঃ মুদ্রিত বাংলা বইয়ের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাতে উনিশটি কাব্য নিবন্ধের মধ্যে বৈষ্ণব গ্রন্থই ছিল আটটি। যেমন- গীতগোবিন্দ, চৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তম বিলাস, নারদ সংবাদ, বিল্বমঙ্গল, পদাঙ্কদূত, রসপদাবলি এবং করুণানিধান বিলাস। সেই সময় বাংলা সাহিত্যের খাঁটি খরিদ্দার ছিলেন বৈষ্ণব ঘরের মানুষ। বৈষ্ণব গৃহস্থের মহিলারাও তখন বাংলা লেখাপড়ায় দুরন্ত ছিলেন।[১৯] অর্থাৎ কৃষ্ণকথা বাংলার ঘরে ঘরে কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্ধমান জেলার মন্দিরগুলিতে কৃষ্ণলীলা কাহিনির যে দৃশ্যগুলি আবশ্যিক ভাবে স্থান পেয়েছিল, সেগুলি হল- কৃষ্ণের জন্মদৃশ্য, মাতা যশোদা ও ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা,বিভিন্ন অসুর ও রাক্ষসগণের বধের কাহিনি, রাধাকৃষ্ণলীলা, রাসলীলা, গোপিনিদের বস্ত্রহরণ ইত্যাদি। এই দৃশ্যগুলি মন্দিরগাত্রে বহিঃরঙ্গ সজ্জায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

কৃষ্ণের জন্মদৃশ্যের একটি চিত্তাকর্ষক প্যানেল দেখা যায় কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরে। এই মন্দিরের পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তটি দৃশ্যায়িত হয়েছে। প্যানেলটির দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, মাতা দেবকী বুকে ধামা আঁকড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছেন। এই ভঙ্গিতে সেইকালে প্রসব করানো হতো। তারপরে দেখা যায়, বাসুদেব সদ্যজাত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে নিয়ে দণ্ডায়মান। এবং এর পরের ফলকে বাসুদেব যমুনার জল স্পর্শ করাচ্ছেন। সম্মুখে একটি শৃগাল তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং যমুনায় নাগ ফনা বিস্তার করে রয়েছে। উক্ত ফলকটি বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে দৃশ্যায়িত হতে দেখা গেছে। যেমন- কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামদিকের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলে; বৈদ্যপুর গ্রামের রাস্তার ধারে অবস্থিত পঞ্চরত্ন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামদিকের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত, তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে ইত্যাদি। মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

"সকল দুআর মুক্ত প্রহরি নিদ্রা গেল।
কোলে করি বসুদেব গোকুল চলিল।।
শৃকালির রূপে আগে জাএ মহামাএ।
ফনা ছত্র ধরিএ্যা বাসুকি পাছু জাএ।।"[২০]

দেবীপুর গ্রামের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরগাত্রে, মাতা যশোদা ও নন্দরায় শিশু কৃষ্ণকে ক্রোড়ে নিয়ে উপবিষ্ট রয়েছেন এমন একটি দৃশ্য দৃশ্যায়িত হয়েছে। উক্ত মন্দির সংলগ্ন উন্মুক্ত বারান্দার দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপরে সজ্জিত দ্বিতীয় অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে দৃশ্যটি লক্ষ করা যায়।

কালনার লালজী মন্দির সংলগ্ন উন্মুক্ত বারান্দার সম্মুখস্থিত মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে শিশু কৃষ্ণের বাল্যলীলার দু'টি ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। এই প্যানেলের শেষ ফলকটির দু'টি অংশের প্রথমটিতে দেখা যায় মাতা যশোদা শিশু কৃষ্ণের পায়ে নূপুর পড়িয়ে দিচ্ছেন, এবং পরবর্তী অংশে কৃষ্ণের কেশগুচ্ছ বন্ধন করে দিচ্ছেন। বৈষ্ণব পদাবলি কার যাদবেন্দ্র দাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সংক্রান্ত একটি পদে বলেছেন-

"চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট
চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখি
সাধ করিয়া মায় নূপুর দেছে রাঙ্গা পায়
নাচিয়া নাচিয়া আইস দেখি।।"[২১]

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে নবম ফলকে দেখা যায়, মাতা যশোদা বালক কৃষ্ণের মাথায় শিখিপাখা পড়িয়ে দিচ্ছেন।

কৃষ্ণের বাল্যলীলার বিভিন্ন দৃশ্য লক্ষ করা যায় কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরে। মন্দিরটির পশ্চিমমুখী প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ফলকে যথাক্রমে, ধেনুকাসুর বধ, পুতনা বধ, বকাসুর বধ, অঘাসুর বধের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। 'ধেনুকাসুর বধ' দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণ, বলরাম এবং তাঁদের দু'জন সখা একটি গাধাকে উল্টোমুখ করে প্রহার করছেন। এই ধেনুকাসুর ছিল গাধারূপী অসুর। বৃন্দাবনের তালবনের পাহারায় ছিল ধেনুক নামে এই অসুরটি। কৃষ্ণ, বলরাম এবং তাঁদের সখাগণ তাল পাড়তে গিয়ে ধেনুকাসুর'এর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন; এক দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ধেনুকাসুর নিহত হয়।

পুতনা বধের দৃশ্যে দেখা যায়, পুতনা দানবী তার বিশাল কায়া নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে রয়েছে এবং কৃষ্ণ তার বক্ষের উপর শায়িত রয়েছেন। আশেপাশে দণ্ডায়মান কিছু ব্যক্তি দৃশ্যটি দেখে বিলাপ করছেন। পুতনা বধের নেপথ্যে যে কাহিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তা হল- মায়াবিনী দানবী পুতনা হল বকাসুরের ভগ্নী, যার পূর্বনাম ছিল রত্নমালা। মহারাজ কংস তাকে কৃষ্ণ নিধনের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। সবার অলক্ষে তিনি সুন্দরী নারীর রূপ নিয়ে নন্দগৃহে শিশু কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাতে উপস্থিত হলেন। স্তনে বিষ মাখানো ছিল, যাতে কৃষ্ণ স্তন্যপানের সাথে সাথে মৃত্যবরণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণ স্তন্য পান না করে, পুতনার জীবনীশক্তি শোষণ করে নেন, ফলে পুতনা বিকৃত বিরাট আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে মৃত্যবরণ করে। দানখন্ডে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে বলেছেন- 'পুতনার প্রাণে লৈলোঁ অতি শিশুকালে।'[২২]

পরবর্তী ফলকটির বিষয় হল, বকাসুর বধ। এই ফলকে শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপী বকাসুরের দু'টি লম্বা ঠোঁট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে বকাসুরের প্রাণ প্রায় নির্গত, এই রকম একটি জমাটি দৃশ্য শিল্পী মন্দিরগাত্রে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কবি মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যে 'বকাসুর বধ' অংশে বলেছেন-

"গিলিলেক বক কৃষ্ণকে দেখে সর্ব্বজনে।
না মইলা কৃষ্ণ হৈল বকের মরনে।।"[২৩]

পরবর্তী ফলকটিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ ফলকে 'অঘাসুর বধ' দৃশ্যে দেখা যায়- সর্পরূপী অঘাসুর কৃষ্ণকে নিধন করতে আসে। একটি স্থূলাকার বৃহৎ সর্পের সম্মুখে ক্ষুদ্র বালক, কৃষ্ণকে তাঁর বাহুবল প্রদর্শন করতে দেখা যায়। কুণ্ডলী পাঁকানো সর্পটিকে বালক কৃষ্ণ পদাঘাত করছেন এবং তাঁর পশ্চাতে হলধারী বলরাম দণ্ডায়মান। এই অঘাসুর হল, বকাসুর এবং

পুতনা রাক্ষসীর ভ্রাতা। উক্ত মন্দিরের পূর্বমুখী প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপরিভাগে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ ফলকে পুতনা বধের একটি সুন্দর দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের প্রবেশ পথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে এবং স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলে পরপর বকাসুর, ধেনুকাসুর, অঘাসুর এবং কুবলয়া পীড়ের সঙ্গে যুদ্ধরত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার দৃশ্যগুলি লক্ষ করা যায়। কুবলয়া পীড় বধ দৃশ্যে কৃষ্ণ একটি বৃহৎ হস্তীর শুড় ধরে রয়েছেন। হস্তীটির পিঠে একটি রথ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুবলয় হস্তী বধের নেপথ্যে কাহিনিটি হল- মহারাজ কংস কৃষ্ণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে মল্লক্রীড়ার আয়োজন করেছিলেন। মল্লভূমির প্রবেশদ্বারে কংস দুর্ধর্ষ বিশালাকার কুবলয়া হস্তীকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। এরপর কৃষ্ণের সঙ্গে সংঘর্ষে কুবলয়া হস্তী নিহত হয়।

কৃষ্ণের তাল ভক্ষণের একটি সুন্দর দৃশ্য দৃশ্যায়িত হয়েছে কালনার লালজী মন্দিরের পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের পূর্বমুখী দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম ফলকে। এই দৃশ্যে কৃষ্ণ সখাদের নিয়ে একসারি তালবনের মধ্যে তালগাছে চড়ার প্রয়াস করছেন, কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছের তলায়। এবং ফলকের শেষদিকে একটি দানব দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখা যায়, এটিই ধেনুকাসুর।

পূর্বোক্ত কৃষ্ণের বাল্যলীলা সংক্রান্ত এই দৃশ্যগুলির খণ্ড চিত্র বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে দৃশ্যায়িত হয়েছে স্বল্পাধিক পরিমাণে। যেমন- কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে বামপার্শ্বের শিব মন্দিরটির ত্রিখিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভ লাগোয়া দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে লক্ষ করলে প্রথম ফলকে পুতনা বধ'এর দৃশ্যটি দৃশ্যায়িত হয়েছে।

কালনার ২নং ব্লকের পাঁচরখী গ্রামের রঘুনাথ দাস দে কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের (১৬৮১শকাব্দ বা ১৭৫৯খ্রিঃ) প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপরে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে চতুর্থ ফলকে সর্পরূপী অঘাসুর বধের দৃশ্য এবং ষষ্ঠ ফলকে কুবলয় হস্তী বধের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। বনপাসের দেউল মন্দিরে মুখ্য প্রবেশদ্বারের ডানদিকের তৃতীয় কৃত্রিম দ্বারের ডানদিকের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফিগারেটিভ ব্লকের মাঝে কৃষ্ণের বাল্যলীলার চিত্র লক্ষ করা যায়। ষোড়শতম ফলকে বকাসুরের ঠোঁটের মাঝে বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। সপ্তদশতম ফলকে পুতনা দানবী কৃষ্ণকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন এবং অষ্টাদশতম ফলকে পুতনা কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাচ্ছেন।

মন্দিরগাত্রে দধিমন্থনের দৃশ্য একটি অতি পরিচিত মোটিফ। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে বাল্যলীলার পদে এর বিবরণ পাওয়া যায়। ঘনরাম দাস রচিত একটি পদে, কবি দধিমন্থনের একটি অপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

"দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চাঁদ-বয়ান।।
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর-ননী
খাইয়া নাহে মোর আগে।
নবনী-লোভিত হর মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে।।"[২৪]

দধিমন্থনের দৃশ্য ফলক বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়। দেবীপুর গ্রামের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দির সংলগ্ন ত্রিখিলান যুক্ত বারান্দার সম্মুখস্থিত বামপার্শ্বের প্রবেশদ্বার লাগোয়া স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, মাতা যশোদা দণ্ডায়মান হয়ে দধিমন্থনে ব্যস্ত এবং বালক কৃষ্ণ দধির হাঁড়ি থেকে দধি তুলতে উদ্যত হয়েছেন।

কাটোয়ার শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের মুখ্যদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে কোণের স্থানটিতে, ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে দ্বিতীয় ফলকে দধিমন্থনের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই দৃশ্যে মাতা যশোদা দধির হাঁড়ি নিয়ে পা'দুটি পেছনে মুড়ে উপবিষ্ট এবং সম্মুখে শিশু কৃষ্ণ দণ্ডায়মান হয়ে দধির হাঁড়ি থেকে দধি তুলতে উদ্যত।

কালনার লালজী মন্দিরের উন্মুক্ত বারান্দার সম্মুখস্থিত মধ্যবর্তী দ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে প্রথম ফলকে দধিমন্থনের দৃশ্য অবলোকন করা যায়। দধিমন্থন দৃশ্যের একটি ক্ষুদ্র ফলক লক্ষ করা যায়, বনপাসের দেউলেশ্বর শিব মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের প্রথম কৃত্রিম দ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে পঞ্চদশতম ব্লকে। গোষ্ঠলীলা, কৃষ্ণ বলরামের যুগল মূর্তি অথবা কৃষ্ণ বলরাম সাথে মাতা যশোদা ইত্যাদি বিভিন্ন মূর্তি ফলকে সখ্য- বাৎসল্য নির্ভর দৃশ্যগুলি সপ্তদশ- অষ্টাদশ- ঊনবিংশ শতকের মন্দিরগুলিতে প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতি দেউলেশ্বর মন্দিরটির মূল প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে অবস্থিত দ্বিতীয় কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম অংশে গোষ্ঠলীলার দৃশ্যটিতে দেখা যাচ্ছে, গরুর পালের পশ্চাতে ধাবমান দণ্ড হাতে গোপ- বালকগণ। এবং পরবর্তী অংশে, মাতা যশোদা বলরামের হাত কৃষ্ণের মস্তকে রেখে, নিজের ডানহাতটিও কৃষ্ণের মস্তকে স্পর্শ করে রয়েছেন। বলরাম কৃষ্ণের ডানহাতটি ধরে রয়েছেন এবং মাতা যশোদাও কৃষ্ণের বামহাতটি তাঁর নিজের বামহাত দিয়ে ধরে রয়েছেন। যশোদার পশ্চাতে আরও একজন নারী দণ্ডায়মান। উক্ত মন্দিরের মূলদ্বারের বামপার্শ্বের তৃতীয় কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষাংশে গোষ্ঠের একটি সুন্দর দৃশ্য দৃশ্যায়িত হয়েছে দু'টি প্যানেল জুড়ে।

মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যে এমন বাৎসল্যরসের প্রভাব সাধারণত পদাবলি সাহিত্যেরই অবদান বলা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি যাদবেন্দ্র, কিশোর কৃষ্ণের গোষ্ঠে যাওয়ার পূর্বে মাতা যশোদার মনের আশঙ্কাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন এইভাবে-

"আমার শপতি লাগে   না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমনি।
নিকটে রাখিও ধেনু   পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি।।
বলাই ধাইবে আগে   আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও   সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু–ভয় আছে।।"[২৫]

কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন নিয়ে মাতা যশোদা চিন্তান্বিত, তাই গোষ্ঠে যাওয়ার পূর্বে কৃষ্ণকে বারংবার সতর্ক করছেন এবং বলরামকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিচ্ছেন যে, তিনি যেন সর্বদা কৃষ্ণের সঙ্গেই থাকেন।

পূর্বোক্ত দৃশ্যের অনুরূপ আর একটি দৃশ্য লক্ষ করা যায়, বনকাটি গ্রামের গোপালেশ্বর মন্দিরের পূর্ব দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম ফলকে। এখানে গোষ্ঠের দৃশ্যটি নেই, শুধু যশোদা এবং হলধারী বলরাম দুজনেই কৃষ্ণের মাথায় হাত রেখে দণ্ডায়মান। গোষ্ঠের আর একটি সুন্দর দৃশ্য রয়েছে, দেবীপুর গ্রামের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের বারান্দার মধ্যবর্তী দ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলে। ফলকটিতে দেখা যায়, কদমতলায় দণ্ডায়মান কৃষ্ণ বলরাম, তাঁদের দু'দিকে গোপ বালকগণ এবং গরুর পাল।

দেবীপুর গ্রামের এই মন্দিরটির বারান্দার সম্মুখস্থিত মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভে ভিত্তিতলের উপর থেকে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে তৃতীয় ফলকে মাতা যশোদা দু'হাতে দু'দিক থেকে দণ্ডায়মান কৃষ্ণ এবং বলরামের হাত ধরে রেখেছেন। কৃষ্ণের বামহাতে বাঁশি রয়েছে, বলরামের হাতে শিঙা রয়েছে। এই ফলকটির দু'পাশের দু'টি করে ফলকে গরু নিয়ে দণ্ডায়মান গোপবালকদের দেখা যায়, এদের হাতেও শিঙা রয়েছে।। অর্থাৎ এই প্যানেলটি জুড়ে গোষ্ঠলীলা দৃশ্যায়িত হয়েছে। গোষ্ঠলীলা দৃশ্যের মধ্যে যেন স্থপতিগণ মাতা যশোদার সন্তানকে নিয়ে বিপদের আশঙ্কার মধ্যে দিয়ে গ্রামবাংলার প্রতি ঘরে মায়েদের সন্তানকে গৃহে ধরে রাখার প্রবণতাকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর কালীন বয়সের দাবানল ভক্ষণ দৃশ্য মন্দিরের গাত্রে দৃশ্যায়িত হয়েছে। ভাগবতের দশম সর্গের পূর্বার্ধে অর্থাৎ বৃন্দাবন পর্বে দু'টি ঘটনায় বালক কৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসীদের বিপদ থেকে রক্ষা করছেন। প্রথমটি হল

গোবর্ধন পর্বত ধারণ এবং দ্বিতীয়টি হল দাবানল ভক্ষণ। গোবর্ধন পর্বত ধারণের কোন দৃশ্য ফলক বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে পাওয়া যায়নি। কিন্তু কালনার লালজী মন্দির প্রাঙ্গণে গিরিগোবর্ধন মন্দিরটিতে কিছু কারুকার্য লক্ষ করা যায়। গোবর্ধন পাহাড়ের ধাঁচে মন্দিরটি নির্মিত এবং পাহাড়ের মধ্যে বিভিন্ন চতুষ্পদ জন্তু, মাছ, হনুমান, বাঘ, মানুষ ইত্যাদি সকলে এসে আশ্রয় নিয়েছে, এটি বোঝানো হয়েছে।

দাবানল ভক্ষণের দৃশ্যটি লক্ষ করা যায়, কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পূর্বমুখী প্রবেশ পথের দক্ষিণপার্শ্বের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের দ্বিতীয় ফলকে। এখানে দেখা যাচ্ছে, আগুন জ্বলছে এবং আগুনের বামপাশে চারজন ব্যক্তি ও আগুনের ডানপাশে দু'জন অর্থাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম দণ্ডায়মান। দাবানল ভক্ষণ লীলায় কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের দাবানলের তীব্র দাবদাহ থেকে রক্ষা করেছিলেন। ভাগবতে আছে যে, আরও একবার কৃষ্ণ গরুর পালসহ গোপবালকদের দাবানলের আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন দাবানল পান করে।' শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে কবি 'দাবানল ভক্ষণ' অংশে বলেছেন-

"এতেক কাকুতি কৃষ্ণ সভাকার যুনী।
বিশ্বরূপে অগ্নি পিল প্রভু চক্রপানী।।"[২৬]

কৃষ্ণের বাল্যকালীন ঐশ্বর্যলীলার মধ্যে একটি জনপ্রিয় মোটিফ হল শ্রীকৃষ্ণের 'কালীয় দমন'। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে কালীয় দমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এই লীলার নেপথ্যে কাহিনিটি হল- সহস্র ফনাধারী কালীয় নাগ গরুড়ের কাছে পরাজিত হয়ে, সমুদ্র ছেড়ে কোন হ্রদে আশ্রয় নেয়। সপরিবারে সেখানে থাকার ফলে হ্রদের জল বিষাক্ত হয়ে ওঠে, এবং ঐ জল ব্যবহারকারীদের মৃত্যু ঘটতে থাকে। এমতাবস্থায় কৃষ্ণ কালীয় নাগ দমনে উদ্যত হলে, নাগ তাঁকে দংশন করে। কৃষ্ণ তখন তাকে হত্যা করতে মনস্থ করলে, কালীয় নাগের স্ত্রীগণ কালীয় নাগের প্রাণ ভিক্ষা চায়। কৃষ্ণ তখন তাকে প্রাণদান করে এবং রম্যক দ্বীপে চলে যেতে আদেশ দেয় এবং তাকে আশ্বাস দেন যে, তাঁর পদচিহ্ন কালীয়'র মাথায় থাকবে, যা দেখে গরুড় আর শত্রুতা করবে না।

কালীয় নাগকে দমন করে, কৃষ্ণ কালীয় নাগের ফনার উপর নৃত্য করছেন, এমন একটি দৃশ্য ফলক দেবীপুর গ্রামের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরগাত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই মন্দিরের সম্মুখস্থিত উন্মুক্ত বারান্দার মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের তলদেশ থেকে চতুর্থ ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে তৃতীয় ফলকে কালীয়'র ফনার উপর নৃত্যরত কৃষ্ণকে দেখা যায়। দুপাশে দণ্ডায়মান কালীয় নাগের স্ত্রীগণ।

কালীয় দমন দৃশ্যটি কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার ত্রিখিলান বিশিষ্ট অন্তর্বর্তী দ্বারগুলির মধ্যে মধ্যবর্তী দ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের তৃতীয় ফলকে চিত্রায়িত হয়েছে।

মেমারীর ২নং ব্লকের কুচুট গ্রামের মাঝেরপাড়ার নবরত্ন নারায়ণ মন্দিরে ফলকগুলিতে কৃষ্ণের জন্ম থেকে তাঁর বাল্যলীলার বিভিন্ন দৃশ্য লক্ষ করা যায়। মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর দু'টি উল্লম্ব সারি পাশাপাশি উৎকীর্ণ হয়েছে। বামপার্শ্ব থেকে প্রথম উল্লম্ব সারির তলদেশ থেকে লক্ষ করলে, পঞ্চম ফলকে দেখা যাচ্ছে দেবী মহামায়া কংসকে দর্শন দিচ্ছেন। এই ফলকটির বামপাশের কোণের স্থানে ঊর্ধ্বে দেবী মহামায়ার ক্ষুদ্রমূর্তি লক্ষ করা যায়। সম্মুখে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে কংস এবং অন্য একজন সৈনিক রয়েছে, এদের মুখমণ্ডল অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ষষ্ঠ ফলকে শিশু কৃষ্ণকে একটি চৌকির মতো দেখতে আসনের উপর উপবিষ্ট হয়ে পুতনা স্তন্যপান করাচ্ছে। সপ্তম ফলকে দধিমন্থনের দৃশ্য দেখা যায়। অষ্টম ফলকে পায়ে নূপুর পরিয়ে দিচ্ছেন মাতা যশোদা। দশম ফলকে গরুর পাল লক্ষ করা যায়। একাদশ ফলকে কৃষ্ণ ও বলরাম ক্রীড়ারত।

এরপর দ্বিতীয় উল্লম্ব প্যানেলটির তলদেশ থেকে লক্ষ করলে, চতুর্থ ফলকে বাসুদেব কৃষ্ণকে ক্রোড়ে নিয়ে যমুনা পার হয়ার উদ্দেশ্যে জলে দণ্ডায়মান, তাঁদের মাথার উপর ছত্রের ন্যায় নাগফণা দেখা যায়। তবে বাসুদেবের মুখমণ্ডল অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পঞ্চম ফলকে বাসুদেব যশোদা মাতার শয্যায় কৃষ্ণকে শুইয়ে দিয়ে, যশোদা মাতার সন্তানটি ক্রোড়ে নিয়ে দণ্ডায়মান। সপ্তম ফলকে যশোদা কৃষ্ণকে স্নান করাচ্ছেন। যশোদা একটি উঁচু চৌকির উপর হাঁটু

মুড়ে উপবিষ্ট এবং তাঁর হাতে একটি পাত্র রয়েছে, অনুমান করা যায়। সম্মুখে বালক কৃষ্ণ মাথায় হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মন্দিরটির দ্বারের শীর্ষভাগে দুটি অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেল রয়েছে। তলদেশ থেকে লক্ষ করলে, দ্বিতীয় প্যানেলের প্রথম ফলকটিতে কৃষ্ণের বকাসুর বধ দৃশ্যটি উৎকীর্ণ হয়েছে। কৃষ্ণ বকাসুরের দু'টি বিশাল আকৃতির ঠোঁট ধরে তাকে হত্যা করতে উদ্যত।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম দ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলটির ডানদিক থেকে দেখলে প্রথম ফলকে কৃষ্ণের দধিমন্থন দৃশ্য লক্ষ করা যায়। উক্ত দ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের তলদেশ থেকে তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে গোচারণরত কৃষ্ণের মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে।

অর্থাৎ বিভিন্ন কাব্য সাহিত্যে বর্ণিত কৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রায় অধিকাংশ ঘটনাই অল্পাধিক পরিমাণে ঘুরেফিরে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়। তবে সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে বাল্যলীলা দৃশ্যের আধিক্য রয়েছে, পরবর্তী সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলিতে কৃষ্ণের বাল্যলীলার তুলনায় মধুর লীলার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। আবার কোন কোন মন্দিরে বাল্যলীলার পাশাপাশি মধুরলীলাও প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন কৃষ্ণের দ্বারা গোপিনিদের 'বস্ত্রহরণ'। তিনটি শতক জুড়েই বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে 'বস্ত্রহরণ' দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ভাগবতের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে- বৃন্দাবনের গোপকুমারীরা অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার প্রার্থনা করে একমাস ব্যাপী কাত্যায়নী ব্রত পালন করেছিলেন। ব্রত সমাপ্তির দিন তারা নিজেদের পোশাক তীরে রেখে জলক্রীড়া করার সময় কৃষ্ণ সেই বস্ত্রগুলি হরণ করে নেন। তখন গোপকুমারীরা অনেক সাধ্যসাধনার দ্বারা কৃষ্ণের নিকট তাদের বস্ত্র প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ তাদের বস্ত্র ফিরিয়ে দেন এবং আগামী শারদ রাত্রিতে তিনি গোপকুমারীদের সাথে বিহারে লিপ্ত হবেন, এই প্রতিশ্রুতিও দেন। যার ফল হল 'রাসলীলা'।[২৭] মালাধর বসু বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যে গোপিনিদের চণ্ডীপূজার কথা বলা হয়েছে। কবি 'বস্ত্রহরণ' প্রসঙ্গে বলেছেন-

"জমুনার কুলে বস্ত্র অলংকার এড়ি।
বিবস্ত্রেত স্নান করি পুজে দেবি চন্ডি।।
মাঁটির প্রতিমা করি দেন্ত ফুলপানি।
বর মাগে স্মাঁমি হউক প্রভু চক্রপানি।।"[২৮]

গোপনারীগণ জলক্রীড়া করার পর যখন দেখলেন নদীকূলে তাদের বস্ত্র- অলংকার কিছুই নেই, তখন তারা হঠাৎই কদমগাছে কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। তাদের বস্ত্র- অলংকার নিয়ে কৃষ্ণ কদমগাছে বসে রয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যে এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

"অচম্বিতে কৃষ্ণকে দেখিল কদমগাছে।।
কান্ধে বস্ত্র করি হাথে লঞা অলংকার।
গাছে থাকি নাচে হরি নন্দের কুমার।।"[২৯]

এরপর কূলে উঠে গোপনারীদের একে একে বস্ত্র নিয়ে যেতে বলায় তারা অত্যন্ত লজ্জা পান, কিন্তু নিরুপায় হয়ে তারা একে একে কৃষ্ণের নিকট হতে বস্ত্র অলংকার নিয়ে যান। মন্দিরগাত্রের অলংকরণে এই 'বস্ত্রহরণ' দৃশ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের উন্মুক্ত বারান্দার অন্তর্বর্তী দ্বারগুলির মধ্যে মধ্যবর্তী দ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়- বংশীবাদনরত কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষে উপবিষ্ট। বৃক্ষের দু'পাশে ময়ূর বসে রয়েছে। নগ্না গোপিনিরা জলের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে বস্ত্র প্রার্থনা করছেন। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ বস্ত্র উদ্ধারের জন্য কদমগাছে উঠতে উদ্যত হয়েছেন।

অনুরূপ আর একটি দৃশ্য লক্ষ করা যায়, কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দির দু'টির মধ্যে বামপার্শ্বের শিবমন্দিরটির প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ

প্যানেলের ডানদিক থেকে তৃতীয় ফলকে। তবে এই দৃশ্য ফলকটি পূর্বোক্ত মন্দিরের ফলকের ন্যায় সুন্দর ভাবে দৃশ্যায়িত হয়নি। উক্ত জোড়া মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণপার্শ্বের মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের বামদিক থেকে প্রথম উল্লম্ব সারির তৃতীয় ফলকে দেখা যায়, কদম্ব বৃক্ষে বংশীবাদনরত কৃষ্ণ এবং বৃক্ষতলে বস্ত্রের জন্য প্রার্থনারত গোপিনিগণ, কেউ হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট, আবার কেউ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করছেন। মেমারীর ২নং ব্লকের করন্দা গ্রামের বারোয়ারিতলা গোস্বামী পরিবারের পঞ্চরত্নশৈলীর শিবমন্দিরে বস্ত্রহরণ দৃশ্যটি উৎকীর্ণ হয়েছে, মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালের উল্লম্ব সারিটির সপ্তম ফলকে। কাইগ্রামের বরাহগোপাল মন্দিরের প্রবেশ পথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে লক্ষ করলে উল্লম্বভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের দ্বিতীয় ফলকে বস্ত্রহরণ দৃশ্যের একটি ফলক রয়েছে। এই ফলকে কদম্ববৃক্ষে বংশীবাদনরত কৃষ্ণ উপবিষ্ট এবং বৃক্ষের দু'পাশে দু'জন গোপিনি নগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান এবং একজন গোপিনি বৃক্ষে উঠতে উদ্যত হয়েছেন।

কৃষ্ণের 'বস্ত্রহরণ' দৃশ্যের মতোই 'রাসলীলা' দৃশ্যও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই রাসলীলা মোটিফটি বাংলার মন্দির ভাস্কর্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে গোপীপ্রেমের মাহাত্ম্য বোঝা যায়, বিভিন্ন মন্দিরের রাসমণ্ডল দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে।

বর্ধমান জেলার কয়েকটি মন্দিরে রাসলীলা মণ্ডল লক্ষ করা যায়। বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউল মন্দিরটির গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের বাম পাশ থেকে চতুর্থ কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষে রাসমন্ডলের একটি অপূর্ব দৃশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে। রাসমন্ডলের কেন্দ্রে বংশীবদন কৃষ্ণ দু'পাশে রাধা ও চন্দ্রাবলীকে নিয়ে স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। এদের কেন্দ্র করে আর একটি মণ্ডল গঠিত হয়েছে, যেখানে গোপী এবং কৃষ্ণ পরস্পরের হস্ত ধারণ করে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত হয়ে বৃত্তাকার মণ্ডলটি গঠন করেছে। দুপাশে গোপী এবং মাঝে নৃত্যরত কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যায় এই মণ্ডলটিতে। বৃত্তের বাইরে অন্যান্য সখীগণ হাতে বীণা, খঞ্জনী, বেহালা, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে দণ্ডায়মান। একজনের হাতে চামর রয়েছে।

মেমারী ২নং ব্লকের কুচুট গ্রামের মাঝেরপাড়ার নবরত্ন রঘুনাথজীউ মন্দিরটির মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের শীর্ষে রাসমন্ডলের একটি সুন্দর ফলক লক্ষ করা যায়। ফলকটির চারপাশে চারটি ময়ূরের অলংকরণ রয়েছে। এই ফলকটিতে স্থপতি শিল্পীর হস্ত নৈপুণ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ধমান সদর (দক্ষিণ) মহকুমার খণ্ডঘোষ ব্লকের উত্তরপাড়ায় নারায়ণ মন্দির (পরিত্যক্ত) সংলগ্ন বারান্দার মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের শীর্ষে রাসমন্ডলের একটি অপূর্ব ফলক, দর্শনীয়। রাসলীলার ফলকগুলির রূপারোপই আমাদের আবহমানকালের বাংলার সমৃদ্ধ নৃত্যগীতের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়, যা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃতির পথে ধাবিত হয়েছে।

রাধাকৃষ্ণ লীলার একটি বিশেষ পর্ব হল 'নৌকালীলা'। বড়ুচণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যে 'নৌকাখণ্ড'তে নৌকালীলার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দানখন্ডে রাধা দুধ-দইয়ের পসরা নিয়ে যমুনার ঘাটে এসে উপস্থিত হলে, কৃষ্ণ তাঁর কাছে পসরার শুল্ক হিসেবে নয় লক্ষ কড়ি চাইলেন। কিন্তু রাধা তাঁকে শুল্ক বা দান দিতে অসম্মত হন। এরপর নৌকাখন্ডে কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে খেয়া নিয়ে মহাদানী সেজে বসে থাকেন। বড়াই, রাধা এবং অন্যান্য গোপাঙ্গনা তাদের পসরা নিয়ে খেয়া পার হয়ে মথুরা হাটে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ সকল গোপিনিদেরকে একে একে পার করে শেষে রাধাকে পার করার সময় তাঁর মহাদান শোধ করবার কথা পুনয়ায় স্মরণ করিয়ে দিলেন। ভীত রাধা কিছুতেই কৃষ্ণকে নিরস্ত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধার আলিঙ্গন পেলেন।

বর্ধমান জেলার কয়েকটি মন্দিরে নৌকালীলার দৃশ্য ফলক উৎকীর্ণ হয়েছে। কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দক্ষিণমুখী ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের তৃতীয় ফলকে দেখা যায়, কৃষ্ণ নৌকা করে গোপীদের খেয়া পারাপার করাচ্ছেন এবং পরবর্তী ফলকে গোপীরা মাথায় দধি-দুগ্ধের পসরা নিয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

নৌকালীলার একটি চমৎকার দৃশ্য ফলক রয়েছে, মানকরের পঞ্চরত্ন শিব মন্দিরের সম্মুখাংশের ত্রিখিলানযুক্ত উন্মুক্ত বারান্দার ডানদিকের দ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তৃতীয় সারিতে মাঝের

ফলকটিতে। এই ফলকে রয়েছে, কৃষ্ণ জলের উপর ভাসমান নৌকার একেবারে কিনারায় একটি বৃহৎ বৈঠা নিয়ে রয়েছেন, এবং গোপীরা দধি- দুগ্ধের পসরা মাথায় নিয়ে নৌকায় দণ্ডায়মান হয়ে আছেন।

কালনার লালজী মন্দিরের পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, জলের উপর ভাসমান নৌকার মধ্যে গোপীগণ মাথায় দধি- দুগ্ধের পসরা নিয়ে বসে রয়েছেন এবং কৃষ্ণ নৌকার কিনারায় বসে বৈঠা বাইছেন। নৌকাটির সম্মুখে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দড়ি দিয়ে নোঙর করছেন। তবে ফলকটি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার দরুন স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে না।

কৃষ্ণলীলার মধ্যে কৃষ্ণের পারিজাত হরণ দৃশ্য মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়। ইন্দ্রের পারিজাত ফুল লাভের জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের তুমুল যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়, 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যে। কৃষ্ণ পারিজাত লাভের আশায় ইন্দ্রের নিকট নারদ মুনিকে পাঠান। কিন্তু ইন্দ্র যুদ্ধ না করে পারিজাত ফুল দিতে সম্মত হলেন না। ফলে পারিজাত হরণ করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ গরুড় পিঠে আরোহণ করে ইন্দ্রের পারিজাত কাননে এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণকে দেখে ইন্দ্র ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশ করে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন, তাঁর বাহন ঐরাবতকে সঙ্গে নিয়ে। শেষে কৃষ্ণ যুদ্ধে জয়লাভ করলেন এবং পারিজাত এনে সত্যভামা'কে উপহার দিলেন।

'পারিজাত হরণ' দৃশ্যটি চিত্রায়িত হয়েছে দেবীপুর গ্রামের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের ত্রিখিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারের শীর্ষে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠা ফলকের বাম পাশের ফিগারেটিভ প্যানেলে। প্যানেলটির বামপার্শ্বে ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণরত ইন্দ্র, মাঝে পারিজাত ফুলের বৃক্ষ রয়েছে। তারপরে দেখা যায় গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করে কৃষ্ণ ইন্দ্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। কৃষ্ণের কোমরে ঢাল- তরোয়াল রয়েছে। এই মন্দির ব্যতীত বর্ধমান জেলার অন্য কোন মন্দিরগাত্রে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায় নি।

এই মন্দিরগাত্রে শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করা গেছে। পদাবলি সাহিত্যে মান হল একটি বিশেষ পর্যায়। জয়দেবের সমকাল থেকে খণ্ডিতা নায়িকা শ্রীরাধিকার মান, বাংলা সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। মানভঞ্জনের চূড়ান্ত মুহূর্ত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের দশম সর্গে (মুগ্ধ- মাধবঃ) বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ এই অংশে শ্রীমতি রাধিকার পদধারণ করে মানভিক্ষা চেয়ে বলছেন-

"স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।"[৩০]

দেবীপুরের এই মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্যানেলের মধ্যবর্তী ফলকটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি উচ্চ চৌকির মতো আসবাবের উপর শ্রীরাধিকা তাঁর মুখটি সম্মুখে ঘুরিয়ে, হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট। তাঁকে ঘিরে রয়েছে সখীগণ। কৃষ্ণ বামহাতের বাহুমূলে বাঁশি এবং গলায় বস্ত্র দিয়ে ভূমিতে হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। তাঁর মুখমণ্ডলে অনুশোচনার ভাব'টি শিল্পী স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সম্পূর্ণ দৃশ্যটি ভাস্করের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় অসাধারণ শিল্পরূপ নিয়েছে। এই মন্দিরটি ব্যতীত অন্য কোন মন্দিরে মান পর্যায়ের দৃশ্য ফলক পাওয়া যায়নি।

মন্দির ভাস্কর্যে কৃষ্ণের মথুরা গমনের দৃশ্য ফলক কয়েকটি মন্দিরে প্রত্যক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে মাথুর পর্যায়ের পদগুলিতে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রার করুণ দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন কবিগণ। এমন একটি পদে, কবি বিদ্যাপতির উক্তি-

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মানিক কো হরি নেল।।
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়ন জলে দেখ বহয়ে হিলোল।।
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিন শূন ভেল সগরি।।"[৩১]

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরগাত্রে দ্বারের শীর্ষে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠা ফলকের দক্ষিণপার্শ্বের অর্ধবৃত্তাকার ফিগারেটিভ প্যানেলের শেষ অংশটিতে কৃষ্ণের মথুরা গমনের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। অক্রূর ঘোড়ায় টানা রথটি নিয়ে সম্মুখে যাত্রা করেছেন। রথের মধ্যে উপবিষ্ট রয়েছেন কৃষ্ণ ও বলরাম। গোপীরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে, পথ অবরোধের

চেষ্টা করছেন। তবে পদাবলি তে এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মনে হয়, কৃষ্ণের মথুরা গমনে বৃন্দাবনবাসীর মনের গভীর আর্তিকে শিল্পী, স্বমহিমায় মন্দিরগাত্রে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

উক্ত দৃশ্যের অনুরূপ আর একটি দৃশ্য লক্ষ করা যায়, বনপাসের রায়পাড়ার রায় পরিবারের মন্দির প্রাঙ্গণের বামদিক থেকে, দ্বিতীয় দেউল শিবমন্দিরটির মুখ্যদ্বারের শীর্ষাংশে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত পঞ্চম ফিগারেটিভ প্যানেলের মধ্যবর্তী অংশে। বনপাসের অষ্টকোণাকৃতি দেউল মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের পঞ্চম কৃত্রিম দ্বারের অলিন্দ শীর্ষে, অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত পঞ্চম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় বা শেষ অংশে কৃষ্ণের মথুরা গমনের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

কৃষ্ণের মথুরা গমনের পথে দাসী ত্রিবক্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ দৃশ্যও মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়। এই ত্রিবক্রা কুঁজের ভারে নত; তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য কুঁজের জন্য লক্ষ করা যায় না। এই ত্রিবক্রা কৃষ্ণকে গন্ধদ্রব্য দানার্থে, কৃষ্ণের সম্মুখীন হয়। কৃষ্ণের কৃপায় তাঁর দৈহিক বৈকল্য ঘোচে এবং তিনি পূর্ব রূপ- যৌবন ফিরে পান।

ত্রিবক্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ দৃশ্যটি দেবীপুরের ঁলক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরে লক্ষ করা যায়। মন্দির সংলগ্ন উন্মুক্ত বারান্দার মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে সজ্জিত ফলকগুলির তলদেশ থেকে চতুর্থ অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে তৃতীয় ফলকে দেখা যায়, ত্রিবক্রার সম্মুখে বৃক্ষতলে হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিবক্রার পশ্চাতে দণ্ডায়মান নারীরা মাথায় দ্রব্যের পসরা নিয়ে দণ্ডায়মান। কৃষ্ণের কেশগুচ্ছ চূড়া করে বন্ধন করা রয়েছে; ললাটে হরিমন্দির তিলক কাটা এবং কণ্ঠে মালা রয়েছে। পরনে রয়েছে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। কৃষ্ণের বামপার্শ্বে পায়ের কাছে একটি কলস রয়েছে।

কংস বধের দৃশ্য লক্ষ করা যায় একটি মাত্র মন্দিরে। বর্ধমান সদর (দক্ষিণ) মহকুমার খণ্ডঘোষ ব্লকের উত্তরপাড়ার নারায়ণ মন্দিরের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) সংলগ্ন বারান্দার মধ্যবর্তী দ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের উপর, কংস বধের ফলকটি দৃশ্যমান। কংস এখানে ভূমিতে হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট এবং কৃষ্ণ দক্ষিণহস্তে তরোয়াল নিয়ে কংস'কে বধ করতে উদ্যত। কৃষ্ণের বামহস্তে ঢাল রয়েছে। কংসের সম্মুখে দু'জন সৈনিক এবং কৃষ্ণের পশ্চাতে একজন সৈনিক দণ্ডায়মান।

মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণের বাল্যলীলা, মধুরলীলা অধিক মাত্রায় লক্ষ করা গেছে, সেই তুলনায় কংসবধ বা মাথুরালীলা খুব সামান্যই লক্ষ করা গেছে। অর্থাৎ শিল্পীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বংশীবদন হিসেবেই অধিক পছন্দ করেছিলেন, ঢাল- তরোয়ালধারী যোদ্ধা হিসেবে নয়। বর্ধমান জেলার টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরগুলিতে কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলির পাশাপাশি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ফলক অথবা একাকী বংশীবদন কৃষ্ণের মূর্তি, কখনও বা সখী সঙ্গে দণ্ডায়মান কৃষ্ণের মূর্তি ফলক মন্দিরগাত্রের অলংকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এই মূর্তিগুলি কোথাও কার্নিশের তলদেশে, থামের গায়ে, ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত অথবা কোথাও দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফলকে লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ থেকে কৃষ্ণ প্যানেল মন্দির অলংকরণে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

রাধাকৃষ্ণ এবং বংশীবদন কৃষ্ণের মূর্তি ফলকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল- কালনার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরে সর্বাধিক রাধাকৃষ্ণ প্যানেল লক্ষ করা যায়, অন্যান্য মন্দিরগুলির তুলনায়। এই মন্দিরের চারটি দেওয়াল কারুকার্য সমন্বিত। ফলে প্রতিটি দেওয়ালে অসংখ্য রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন ভঙ্গিমার মূর্তি ফলক লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের প্রতিটি দেওয়ালে মুখ্যদ্বার এবং কৃত্রিম দ্বারগুলির শীর্ষাংশে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দু'টি রাধাকৃষ্ণের প্যানেল লক্ষ করা যায়। এই প্যানেলগুলিতে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় রাধাকৃষ্ণ বিরাজমান। কৃষ্ণ স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান হলেও, রাধা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানরত। উক্ত মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের অলিন্দশীর্ষে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের মধ্যবর্তী অংশে বংশীবদন কৃষ্ণ স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান, বামপার্শ্বে রাধা বিরাজমান এবং এদের দু'জনের দুপাশে রয়েছেন দণ্ডায়মান সেবিকা। কৃষ্ণের দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান সেবিকাদের হাতে রয়েছে ছত্র, পাখা এবং রাধার বামপার্শ্বের সেবিকাদের মধ্যে একজনের হাতে রয়েছে চামর; অন্যান্যরা ভিন্ন ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। উক্ত দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে, সপ্তম ফলকে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ফলক রয়েছে। বংশীবদন কৃষ্ণ স্বস্তিক ভঙ্গিমায় পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। পরনে কোঁচা

দেওয়া ধুতি রয়েছে। ধুতির উপর আর একটি বস্ত্রখণ্ড কটিতে বাঁধা। গলায় মালা, হাতে চুড়ি ইত্যাদি অলংকারে বিভূষিত; কেশগুচ্ছ চূড়া করে বন্ধন করা রয়েছে। বামপার্শ্বের রাধার পরনে ঘাগরা এবং মাথায় ওড়না রয়েছে; ওড়নাটি দিয়ে মস্তক আবৃত করা রয়েছে। রাধার মাথায় মুকুট রয়েছে এবং তিনিও বিভিন্ন অলংকারে বিভূষিতা। এই ফলকটির দু'পাশে দু'জন সখী দণ্ডায়মান। উক্ত মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে একাদশতম ফলকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ফলক দেখা যায়।

উক্ত মন্দিরেরই পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে প্রথম ফলকে দেখা যায়, স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান কৃষ্ণ; দুহাতে বাঁশি ধরে রয়েছেন; বামে দণ্ডায়মান রাধা এবং দু'জন সখী। কৃষ্ণের দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান রয়েছে দু'জন সখী। এই সম্পূর্ণ ফলকটিতে মূর্তিগুলির শীর্ষে রঙ্গমঞ্চের পর্দার ন্যায় নকশা করা রয়েছে।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের উন্মুক্ত বারান্দার সম্মুখস্থিত মধ্যবর্তী দ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দেখলে, তৃতীয় ফলকে স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর দু'পাশে রয়েছেন গোপিনিরা।

বনকাটি গ্রামের গোপালেশ্বর শিবমন্দিরটির দু'পাশের দেওয়ালের প্রান্তভাগ অলংকরণ করা হয়েছে, তিনটি করে ফলক উল্লম্বভাবে সজ্জিত করে। এই তিনটি ফলকেরই মাঝের ফলকটিতে রয়েছে বংশীধারী কৃষ্ণ, দু'পাশের ফলকে রয়েছে রাধা ও চন্দ্রাবলী। পূর্বোক্ত ফলকগুলি ব্যতীত মন্দিরগাত্রে রাধাকৃষ্ণের অসংখ্য ফলক রয়েছে, কিন্তু সীমিত পরিসরের মধ্যে সমস্ত ফলকগুলির বিবরণ উল্লেখ করা সম্ভব হল না, তাই এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হল।

রাধাকৃষ্ণ লীলা বা কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে আলোচিত বিষয়বস্তু ব্যতীত আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। সেই দু'টি হল দোল এবং ঝুলন উৎসব। কৃষ্ণলীলার ক্ষেত্রে এই দু'টি বিষয় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কিন্তু মন্দিরগাত্রে কোথাও এই দু'টি বিষয় নির্ভর কোন দৃশ্য ফলক লক্ষ করা যায় নি। তবে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন কৃষ্ণ সংক্রান্ত মন্দিরগুলিতে বা বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে পৃথকভাবে দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ তৈরি করা রয়েছে। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বাঘনাপাড়ার বলরাম মন্দিরের বাইরে দোলমঞ্চ রয়েছে। কালনায় রাজবাটি চত্বরে রাসমঞ্চ রয়েছে। সিঙ্গারকোণ গ্রামে রাধাকান্তদেবের মন্দির চত্বরে দোলমঞ্চ রয়েছে এবং এখানে খুব ধুমধামের সাথে দোল উৎসব পালিত হয়ে থাকে। পূর্বস্থলীর রায় দোগাছিয়া গ্রামের গোপীনাথ মন্দিরের দোলমঞ্চটি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত রয়েছে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, পূর্বোক্ত বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণের দোল ও রাস উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। কিন্তু মন্দির শিল্পীদের কাছে, দোল বা ঝুলন উৎসব প্রাধান্য পায়নি, ফলে মন্দিরগাত্রে এই উৎসব দু'টির কোন চিত্র ফলক বর্ধমান জেলার মন্দির সমীক্ষা করে পাওয়া যায়নি।

মন্দির ভাস্কর্যে শ্রীবিষ্ণু ও দশ- অবতার প্রসঙ্গ -

'অবতার' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবতরণ। 'আদ্য অবতার মহাপুরুষ ভগবান'। শ্রী ভগবান যখন আপন রূপ পরিত্যাগ করে মানবীয়, অতিমানবীয় বা পশুরূপ নিয়ে উর্ধ্বলোক ছেড়ে ত্রাতারূপে নরলোকে আসেন, তখন ভগবানের সেই কান্তি বা রূপটিই অবতার নামে পরিচিত হয়। অর্থাৎ অবতার মানে ঈশ্বর অবতার, ভগবানের অংশ বা কলা অবতার। এক অর্থে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বা ঈশ্বরের দূত। যিনি মানবলীলায় মর্ত্যে অবতীর্ন হন এবং অলৌকিক কাজকর্ম করেন। একদিকে সংহার করেন এবং অপর দিকে সৃজন করেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই অবতার রূপই হল শ্রী ভগবানের প্রকৃত রূপ।[৩২]

মন্দির অলংকরণে রামায়ণ কাহিনি, কৃষ্ণলীলা দৃশ্য ব্যতীত বিশাল ব্যাপ্তির সঙ্গে বিবিধ পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তিফলক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ পৌরাণিক দেব- দেবীর মধ্যে বিষ্ণু, বিষ্ণুর দশাবতার, শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্ত্তিক, কালী, দশ মহাবিদ্যার বিভিন্ন রূপভেদ প্রভৃতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রীয় দেবতা বা পৌরাণিক বিষ্ণুদেবের পূর্ণাঙ্গ রূপকল্পনাকে প্রতিমার মাধ্যমে উপস্থাপনার সূচনা হয়, তৃতীয়- চতুর্থ

শতকে। গুপ্তযুগ (৩০০-৬০০খ্রিঃ) থেকে শুরু করে বাসুদেব বিষ্ণুর যত প্রতিমা তৈরি হয়েছে, সেগুলিকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- **(ক)** ধ্রুববের বা মন্দিরে স্থাপনযোগ্য স্থাবর মূর্তি, **(খ)** ব্যূহ বা উদ্গত রূপের মূর্তি এবং **(গ)** বিভাব বা অবতার রূপের মূর্তি।

(ক) ধ্রুববের বা মন্দিরে স্থাপনযোগ্য স্থাবর মূর্তি-

প্রথম শ্রেণিভুক্ত বিষ্ণুর ধ্রুববের রূপের বিস্তৃত বর্ণনা মেলে অষ্টম-নবম শতকের দক্ষিণ ভারতীয় গ্রন্থ 'বৈখানসাগম'তে। এখানে বলা হয়েছে, যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ, কামনা-বাসনার চরিতার্থতা, শৌর্যবীর্য লাভ এবং শত্রুর বিনাশ; ভক্তদের এই চতুর্বিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই যথাক্রমে যোগ, ভোগ, বীর এবং অভিচারিক, এই চার শ্রেণির মূর্তির সৃষ্টি। যোগ এবং ভোগ শ্রেণির মধ্যে, ভোগ শ্রেণির মূর্তির সংখ্যাই বেশি। শাস্ত্রানুযায়ী, ভোগ মূর্তিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী থাকবেন, শয়ান বা অনন্তশয়ন মূর্তিতে লক্ষ্মী থাকবেনই। শাস্ত্রসম্মত এই ধরনের নিদর্শন অজস্র পাওয়া যায়। ভোগাসনে বিষ্ণু দু'ভাবে প্রদর্শিত হন। আদিশেষ নাগের কুন্ডলীতে তৈরি আসনের উপর অথবা গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণরত। কখনও লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ, কখনও বা শুধু লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে।[৩৩] গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণরত ভোগাসন পর্যায়ের অন্তর্গত বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে, কালনার অনন্তবাসুদেব মন্দিরে এবং কালনার রাজবাটি চত্বরে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত বদ্রীনারায়ণ মন্দিরে। এই মন্দির দু'টিতে মূল বিগ্রহ রূপে এই বিষ্ণুমূর্তিই পূজিত হয়। দু'টি মূর্তিতেই লক্ষ্মী ও সরস্বতী রয়েছেন। বদ্রীনারায়ণ মন্দিরের মূর্তির পৃষ্ঠফলকের উর্ধ্বাংশে দু'প্রান্তে মাল্যহস্ত বিদ্যাধর এবং শীর্ষাংশে নরসিংহ রয়েছেন। চারটি হাতের মধ্যে একটি বামহাতে রয়েছে চক্র, আর একটি বামহাত জানুর উপর স্থাপিত। আর ডানহাত গুলির মধ্যে একটি ডানহাতে রয়েছে গদা এবং অপর ডানহাতটিতে রয়েছে অভয়মুদ্রা। দু'টি মন্দিরের মূর্তিই সমপাদস্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান।

পাল রাজত্বের অবসানের ফলে বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারালো। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তার করায় রাজসভায় কৃষ্ণলীলা আখ্যান মান্যতা পেতে আরম্ভ করল। ফলে মধ্যযুগে এসে বাংলায় বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণের প্রাচীন ঐতিহ্য লোপ পেতে থাকল, তার একটা কারণ অবশ্যই কৃষ্ণকথার বহুল প্রচার। বাংলার মন্দিরে কৃষ্ণকথার প্রাচুর্য অনেকটাই এসেছে ভাগবত চর্চার সূত্র ধরে এবং পৌরাণিক বিষ্ণুমূর্তির চিত্রায়ণ হয়েছে ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের ঐতিহ্য অনুসরণ করে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে একটি বহুল প্রচারিত মোটিফ হল অনন্তশয্যায় বিষ্ণুমূর্তি।[৩৪] এই মোটিফটি বাংলার মন্দির সজ্জার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ধমান জেলার কয়েকটি মন্দিরগাত্রে এই মোটিফটি লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়- খণ্ডঘোষ ব্লকের উত্তরপাড়ার পঞ্চরত্ন নারায়ণ মন্দিরের (পরিত্যক্ত) সম্মুখস্থিত ত্রিখিলান বিশিষ্ট উন্মুক্ত বারান্দার বামদিকের প্রথম বহিঃদ্বারের শীর্ষে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর একটি অপূর্ব মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। মহাসমুদ্রে অনন্তনাগের উপর শায়িত বিষ্ণুমূর্তি ও নাভিপদ্মে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অবস্থানের কথা নানা পুরাণে পাওয়া যায়। যার মূল রয়েছে ঋগ্বেদে। জলের গর্ভ হয়েছিল; এই গর্ভ আসলে ব্রহ্মান্ড। এই জলেই ছিলেন অজাত পুরুষ। তার নাভিতেই ব্রহ্মার অধিষ্ঠান। অনন্তনাগ হচ্ছেন, সূর্যের অয়নপথ। তার গতির অন্ত নেই বলেই, তার নাম অনন্ত।[৩৫] পূর্বোক্ত ফলকে দেখা যায়, বিষ্ণু অনন্তনাগের কুন্ডলীর উপর অর্ধপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট, মাথার উপর নাগদেবতার সাতটি ফনা, লক্ষ্মী তার দক্ষিণ পদসেবনে ব্যাপৃতা, তার নাভি থেকে উদ্গত পদ্মের উপর সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত। এছাড়া এই ফলকের বামপার্শ্বে শিবের বাহন নন্দী রয়েছেন এবং ফলক শীর্ষে চতুর্ভুজ গণেশ পদ্মাসনে পদ্মের উপর উপবিষ্ট। ফলকটির বামপাশে একজন নারী এবং দক্ষিণপাশে একজন পুরুষ হাত জোড় করে প্রণামরত ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান।

অনন্তশয্যায় বিষ্ণুর আর একটি ক্ষুদ্র ফলক দেখা যায়, কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দার সম্মুখ দেওয়ালের মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের শীর্ষাংশে। এই ফলকে বিষ্ণু অনন্তনাগের উপর অর্ধপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট। মাথায় নাগের ফনা নেই। লক্ষ্মী তাঁর দক্ষিণ পদসেবনে ব্যাপৃতা। কালনার গোপালজী মন্দিরের বারান্দার অন্তঃদ্বারের শীর্ষে অনুরূপ একটি ফলক লক্ষ করা যায়।

অনন্তশয্যায় বিষ্ণুমূর্তি ব্যতীত গরুড় বাহন নিয়ে বিষ্ণুমূর্তিও মন্দিরগাত্রে পরিলক্ষিত হয়। কাটোয়ার শ্রীবাটির পঞ্চরত্ন মন্দিরের প্রবেশ পথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলে বামদিক থেকে

দেখলে তৃতীয় উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে চতুর্থ স্থানে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণরত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির একটি অপূর্ব ফলক লক্ষ করা যায়। উক্ত দেওয়ালেরই ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে চতুর্থ স্থানে অনুরূপ একটি মূর্তি ফলক রয়েছে। তবে এই ফলকটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রথমে উল্লিখিত ফলকটিতে গরুড় হাত জোড় করে বাম পদ পশ্চাতে মুড়ে উপবিষ্ট। তার দুটি পাখনা দু'দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণরত বিষ্ণুর হাতে কোন আয়ুধ নেই। শিরে মুকুট, কণ্ঠে মালা, কানে কুণ্ডল, হাতে অনেকগুলি বালা এবং পায়ে নূপুর রয়েছে। পরনে রয়েছে নকশা করা ধুতি।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখস্থিত উন্মুক্ত বারান্দার মধ্যবর্তী অন্তঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের তলদেশ থেকে লক্ষ করলে চতুর্থ ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে ষষ্ঠ ফলকে দেখা যায়, গরুড় চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে কাঁধে নিয়ে দণ্ডায়মান। বিষ্ণুর ঊর্ধ্বের দু'টি হস্তে আয়ুধ বর্তমান, যদিও সেগুলি অস্পষ্ট। অনুরূপ আর একটি মূর্তি রয়েছে কুচুট গ্রামের নবরত্ন রঘুনাথজীউ মন্দিরের শীর্ষে রাসলীলা মন্ডলের দক্ষিণপার্শ্বে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ঊর্ধ্বের ফিগারেটিভ প্যানেলটির বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে।

(খ) ব্যূহ বা উদ্গত রূপের মূর্তি-

ব্যূহ ভাবনার উৎপত্তি প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় তথ্য, ধর্মতাত্ত্বিকদের চিন্তায় বীর-ভাবনা অর্থাৎ বাসুদেব-সংকর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-সাম্ব-অনিরুদ্ধ, এই পঞ্চবীরের ভাবনা যখন রূপান্তরিত হচ্ছিল, তখন সাম্ব বাদ পড়ে যান; সম্ভবত বাসুদেব-কৃষ্ণের অনার্যবংশীয়া স্ত্রী'এর গর্ভজাত বলে। খ্রিঃ প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে বীর-ভাবনা ব্যূহ-ভাবনায় পরিণতি লাভ করে, সৃষ্টি হয় ভগবান-বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহ রূপের। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরেই চতুর্ব্যূহ মূর্তি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং বিষ্ণুর বিশিষ্ট রূপভেদ হিসেবে জনপ্রিয় হয়। কাশ্মীর ছাড়াও চতুর্ব্যূহ মূর্তি হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানায় পাওয়া গেছে। অধিকাংশই দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর এবং ছয়, আট বা তারও বেশি হস্তবিশিষ্ট। এই বহুভূজ ব্যূহ-বিষ্ণুর বর্ণনাও আছে শাস্ত্রগ্রন্থে। কালক্রমে ভগবান বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহ মূর্তি থেকে উদ্ভব হয় চতুর্বিংশতি ব্যূহের বা মূর্তির।[৩৬] যদিও বর্ধমানের কোন মন্দিরে এই রূপ কোন ভাস্কর্য দেখা যায়নি।

(গ) বিভাব বা অবতার রূপের মূর্তি-

বাংলার মন্দির ভাস্কর্যে দশাবতার মূর্তির বহুল প্রচলন রয়েছে, এর একটি কারণ হল জয়দেবের কাব্যের প্রভাব। তবে উৎস আরও পুরানো এবং সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে জটিলও বটে। গীতায় কৃষ্ণের অবতার গ্রহণের কথা উচ্চারিত হওয়ার পর থেকে নানা পুরাণে অবতারের কথা পাওয়া যায়।[৩৭] এই অবতার প্রসঙ্গে বলা হয় যে, দেবতারা সময়ে সময়ে মনুষ্য মূর্তি পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আগমন করেন, অথবা আবির্ভূত হন। স্বয়ং ভগবান বা তাঁর অংশে জীবদেহে পূর্ণাবতার বা অংশাবতার রূপে ধরাধামে অবতরণ করেন এবং অধর্মের নাশ, ধর্ম সংস্থাপন এবং জীবোদ্ধার করেন।[৩৮]

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় (৪.৭-৮) অবতারবাদের অর্থ ও তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, অর্থাৎ মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হই; সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতীদের বিনাস ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে প্রকট হই। পাঞ্চরাত্র পরম সংহিতাতে (৪.৭৯ : ৮৩খ) বিষ্ণু বলেছেন, লোকোপচার সিদ্ধির জন্য আমি অনেক রূপ গ্রহণ করি। মহাভারত, পুরাণ ও পাঞ্চরাত্র সাহিত্যে ভগবান বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে বিভিন্ন পুরাণে ও পাঞ্চরাত্র সাহিত্যে বিবৃত অবতারের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দশই দাঁড়িয়েছে এবং বিষ্ণুর অবতার রূপের কথা বললে তাঁর দশাবতার রূপই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় এই দশাবতার হলেন- মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন-ত্রিবিক্রম, পরশুরাম, দাশরথি-রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। কখনও কখনও বলরাম ও বুদ্ধ স্থানচ্যুত হয়ে সেই স্থানে এসেছেন কৃষ্ণ ও বুদ্ধ, কিংবা বলরাম ও কৃষ্ণ।[৩৯]

বর্ধমান জেলার মন্দিরগুলিতে দশাবতারের মধ্যে 'বুদ্ধ' অবতারের বদলে জগন্নাথ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এই প্রথাই প্রায় সারা বাংলার মন্দিরে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। মন্দিরগাত্রে অবতার-প্রতিমা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে অবতারবাদের নেপথ্যে কাহিনিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

মৎস্য অবতার- জলপ্লাবন থেকে মনুকে রক্ষা করার জন্য ভগবান বিষ্ণু মৎস্য অবতার রূপ গ্রহণ করেন। এই মৎস্য মানব জাতির জন্মদাতা। একদিন একটি ক্ষুদ্র মৎস্য মনুর নিকটে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি এই মৎস্যকে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে লাগলেন; পরে সে এত দ্রুত বর্ধিত হতে লাগল যে, সমুদ্রে তাকে স্থাপন করতে হল। মনু এঁর ঈশ্বরত্ব বুঝতে পেরে ভগবানের অবতার বিষ্ণু বলে পূজা করলেন। ভগবান তখন মনুকে আসন্ন প্লাবনের কথা জানালেন। প্লাবন উপস্থিত হলে মনু ও অন্যান্য ঋষিগণ একটি নৌকায় উঠলেন। বিষ্ণু তখন মৎস্য রূপে প্রকান্ড শিঙধারী হয়ে উপস্থিত হলেন। এই নৌকাকে সর্পরজ্জু দিয়ে শিঙ এর সঙ্গে বাঁধা হল। পরে প্লাবনের জল ক্রমশ কমে গেল এবং নৌকাটিও রক্ষা পেল। এই অবতারে বিষ্ণু হয়গ্রীবকে বধ করে বেদ উদ্ধার করেছিলেন।

কূর্ম অবতার- প্লাবনে যে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য নিমজ্জিত হয়েছিল, তা উদ্ধারের জন্য সত্যযুগে বিষ্ণু কূর্ম অবতার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন। দুগ্ধ সাগরের নীচে তিনি নিজেকে স্থাপন করে তাঁর পিঠের উপর মন্দার পর্বতকে স্থাপন করলেন। সর্পরাজ বাসুকীকে পর্বতের চারিদিকে বেষ্টন করে, অসুর ও দেবগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে সর্পের দুই অংশ রজ্জুরূপে ধারণ করে সমুদ্র মন্থনকালে ঈপ্সিত দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত হন।

বরাহ অবতার- দানব হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রের নীচে পৃথিবীকে নিয়ে যায়। বিস্তৃত পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করেন। এক হাজার বছর যুদ্ধ করে ঐ দানবকে হত্যা করে তিনি পৃথিবীকে উত্তোলন করেন।

নৃসিংহ অবতার- দানব হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য বিষ্ণু নৃসিংহ অবতার গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মার বরে অজেয় হিরণ্যকশিপু দেবতা, মানুষ ও জন্তুর দ্বারা অবধ্য ছিল। তার পুত্র প্রহ্লাদ অত্যন্ত বিষ্ণু ভক্ত হওয়ায়, তাকে হত্যা করার নানা চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হিরণ্যকশিপু, পুত্র প্রহ্লাদের কাছ থেকে জানলেন যে, বিষ্ণু সর্বস্থানে বিদ্যমান। এমনকি তার সম্মুখের প্রস্তর স্তম্ভের মধ্যেও বিষ্ণু বিদ্যমান। তখন হিরণ্যকশিপু সেই স্তম্ভে পদাঘাত করেন। তৎক্ষণাৎ হরিভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করার জন্য শ্রীবিষ্ণু নৃসিংহ অবতার রূপে ঐ স্তম্ভ থেকে বাইরে এসে হিরণ্যকশিপুকে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে নয়; না দিবসে, না রাত্রে; সন্ধ্যাকালে, নৃসিংহ তাঁকে আপন জানুতে স্থাপন করে নখরাঘাতে উদর বিদীর্ণ করে দেন। নৃসিংহ না মানব ছিল, না জন্তু; এই দুই এর সংমিশ্রণে তাঁর রূপ কল্পিত হয়েছে।

বামন অবতার- ত্রেতাযুগে দৈত্যরাজ বলি, কঠোর তপস্যায় স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই তিনটি স্থানেই নিজের আধিপত্য বিস্তার করলেন। ফলে দেবতারা ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তাই দেবতাদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিষ্ণু বামন অবতার রূপে কাশ্যপ ও অদিতির পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এই বামন বলির নিকট তিনবার পদক্ষেপ করার জন্য যে পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন, তা প্রার্থনা করলেন। বলি তথাস্তু বলায়, বিষ্ণুরূপী বামন এক পদ মর্ত্যে এবং আর এক পদ স্বর্গে স্থাপন করলেন। তৃতীয় পদ স্থাপন করার জন্য বলি তার নিজ মস্তক পেতে দিলেন। বামন তার মস্তকে পদক্ষেপ করে তাকে পাতালে প্রেরণ করলেন। সেই কারণে, পাতাল রাজ্য বলির অধিকারে থেকে যায়।

পরশুরাম অবতার- পরশুরাম ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ জমদগ্নী ও রেণুকার পুত্র। উদ্ধত ক্ষত্রিয়দের হস্ত থেকে, ব্রাহ্মণদের রক্ষার উদ্দেশ্যে তার জন্ম হয়েছিল।

রামচন্দ্র অবতার- সূর্যবংশের রাজা দশরথের পুত্র ছিলেন রামচন্দ্র। বিষ্ণু রামচন্দ্র রূপে রাক্ষসরাজ রাবণ'কে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কৃষ্ণ অবতার- কৃষ্ণকে বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার রূপে স্বীকার করা হয়। ইনি দ্বাপরযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বুদ্ধ অবতার- বুদ্ধাবতারে ভগবান শ্রীবিষ্ণু জীবক্ষয়কর হিংসা নিরোধ করেছিলেন। ইনি ছিলেন নবম অবতার। খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ শতকে নেপালের কপিলাবস্তু নগরীতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন শাক্যবংশীয় শুদ্ধোদন এবং মাতা ছিলেন মায়াদেবী। তাঁর স্ত্রী'র নাম ছিল যশোধরা বা গোপা। বুদ্ধের পিতৃদত্ত নাম ছিল সিদ্ধার্থ। খ্রিঃপূঃ ৪৮৭অব্দে আশি বছর বয়সে অধুনা গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে তাঁর 'নির্বাণ' লাভ হয়।

কল্কি অবতার- কলিযুগের অন্তে বিষ্ণু সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের স্ত্রী সুমতীর গর্ভে অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। শ্বেত অশ্বের উপর আরোহণ করে, উন্মুক্ত জ্বলন্ত তরোয়াল হস্তে দুষ্কৃতদের দমন করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।[৪০]

বিষ্ণুর দারুময় বিগ্রহরূপে পূজিত হন জগন্নাথ। স্কন্দপুরাণে জগন্নাথের বর্ণনায় বলা হয়েছে- নীল মেঘের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট, দারুময়, শঙ্খ-চক্রধারী বলভদ্র ও সুভদ্রার সমভিব্যাহারে অবস্থিত। উৎকলখন্ডে জগন্নাথ শঙ্খ ও চক্রধর, অর্থাৎ দ্বিভুজ। কিন্তু জগন্নাথ বিগ্রহ অসম্পূর্ণ হস্তপদহীন অবস্থায় দেখা যায়। প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে, বিশ্বকর্মার বিগ্রহ নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ধৈর্যহারা হয়ে রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করে দেওয়ার ফলে, বিগ্রহটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অনেকের মতে, জগন্নাথ বিগ্রহ বুদ্ধদেবের রূপান্তর। আবার শাক্তদের মতে, উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ শক্তিদেবী বিমলা, মহাশক্তিরূপা ভৈরবী এবং জগন্নাথ তাঁর ভৈরব। জগন্নাথের নিত্যপূজায় বৈদিক ও তান্ত্রিক প্রক্রিয়া মিলিত ভাবে অনুসৃত হয়। উড়িষ্যার অনেক বৈষ্ণব কবি, জগন্নাথ'কে বুদ্ধের মূর্তি বা অবতার বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ'ই বুদ্ধ রূপে জগন্নাথ নামে অধিষ্ঠিত। জগন্নাথ দাস বিরচিত 'দারুব্রহ্ম' এবং অচ্যুতানন্দ দাস বিরচিত 'শূণ্য সংহিতা'এ এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঈশ্বর দাস ও অচ্যুতানন্দ, জগন্নাথ'কে বুদ্ধের রূপান্তর এবং চৈতন্য'কেও বুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। উড়িষ্যায় একসময় বৌদ্ধ প্রভাব প্রচুর ছিল। কালক্রমে এই ধর্মের বিলুপ্তি ও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য হওয়া সত্ত্বেও, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব উড়িষ্যা থেকে কখনও অন্তর্হিত হয়নি। জগন্নাথ দেবকে বুদ্ধ, রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ বলে গ্রহণ করা হয়। ডঃ মায়াধর মানসিংহ অনুমান করেছেন যে, বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ বুদ্ধ ও বিষ্ণুকে একত্রিত করেছেন, জগন্নাথ বিগ্রহে।[৪১]

বিষ্ণুর দশাবতার সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর, বর্ধমান জেলার মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এই দশাবতার মোটিফ'এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের অলিন্দ শীর্ষে 'রামরাজা'মোটিফের উপরিভাগে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের পৃথক পৃথক ব্লকে বিষ্ণুর দশ-অবতারের মধ্যে কয়েকটি অবতারের মূর্তি ফলক উৎকীর্ণ হয়েছে। প্যানেলটির বামদিক থেকে লক্ষ করলে চতুর্থ ফলকে স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ অবতার; পঞ্চম ফলকে হিরণ্যকশিপু'কে জানুর উপর রেখে হত্যা করছেন চতুর্ভুজ নৃসিংহ; ষষ্ঠ ফলকে চতুর্ভুজ কূর্ম অবতার, যাঁর দেহের ঊর্ধাঙ্গে মানবরূপ এবং নিম্নাঙ্গ কচ্ছপের ন্যায়। সপ্তম ফলকে দণ্ডায়মান জগন্নাথ; অষ্টম ফলকে চতুর্ভুজ মৎস্য অবতার, যাঁর দেহের ঊর্ধাঙ্গে মানবরূপ এবং নিম্নাঙ্গ মৎস্যের ন্যায় লেজবিশিষ্ট। নবম ফলকে রয়েছেন বিষ্ণুর বরাহ অবতার। চতুর্ভুজ এই অবতারের দেহের মুখমণ্ডলটি বরাহের ন্যায় এবং নিম্নাঙ্গ মানব দেহ সদৃশ। দশম ফলকে দেখা যায়, ছত্রধারী বামন, রাজা বলির মস্তকে পাদস্পর্শ করতে উদ্যত এবং সম্মুখে রাজা হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট।

মেমারী ২নং ব্লকের কুচুট গ্রামের নবরত্ন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্ব সারিতে সজ্জিত ফলকে রয়েছে দশ অবতারের মূর্তি। ফলকগুলি পৃথক পৃথক ভাবে দু'টি উল্লম্ব সারিতে বিভক্ত। বামদিক থেকে প্রথম উল্লম্ব সারিটির তলদেশ থেকে লক্ষ করলে, দ্বিতীয় ফলকটিতে চতুর্ভুজ মৎস্য অবতার উৎকীর্ণ হয়েছে, হস্তে কোন আয়ুধ নেই। শুধুমাত্র নিম্নের বামহস্তে একটি পদ্মকলি রয়েছে। তৃতীয় ফলকে দেখা যায়, চতুর্ভুজ নৃসিংহ অবতারের মূর্তি। তাঁর উর্দ্ধে ধাবিত দুটি হস্তের মধ্যে বামহস্তে রয়েছে শঙ্খ এবং দক্ষিণহস্তে রয়েছে চক্র। চতুর্থ ফলকে রয়েছে বামন অবতার, যেটি পূর্বোক্ত প্রতাপেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ। যদিও এই ফলকটি কালের প্রভাবে প্রায় অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। পঞ্চম ফলকে রয়েছে, দণ্ডায়মান হলধারী বলরাম। ষষ্ঠ ফলকে রয়েছেন দণ্ডায়মান জগন্নাথ।

এরপর দ্বিতীয় উল্লম্ব সারিটির তলদেশ থেকে লক্ষ করলে দেখা যায়, দ্বিতীয় ফলকে রয়েছেন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণকারী চতুর্ভুজ কূর্ম অবতার। তৃতীয় ফলকে রয়েছেন চতুর্ভুজ বরাহ অবতার। এর হস্তেও পূর্ব ফলকটির ন্যায় আয়ুধ বর্তমান। চতুর্থ ফলকে পরশুরাম, বামহস্তে কুঠার নিয়ে দণ্ডায়মান। পঞ্চম ফলকে দণ্ডায়মান রামচন্দ্রের মূর্তি দেখা যায়। তাঁর সম্মুখে নতমস্তকে প্রণামরত হনুমান। ষষ্ঠ ফলকে তরোয়ালধারী অশ্বপৃষ্ঠে কল্কি অবতার রয়েছে।

কাটোয়ার শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণে, বামদিকের দেউল শিব মন্দিরটিতে প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে, ডানদিক থেকে দেখলে প্রথম উল্লম্ব সারির, প্রথম ফিগারেটিভ ফলকটি হল মৎস্যাবতারের মূর্তি, দ্বিতীয়টি বরাহ অবতার, তৃতীয়টি জগন্নাথদেব, চতুর্থটিতে বামহস্তে তরোয়াল নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে কল্কি অবতার এবং পঞ্চম ফলকটিতে ছত্রধারী বামন অবতারের মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের বামদিক থেকে প্রথম

উল্লম্বসারির প্রথম ফিগারেটিভ ফলকটিতে কূর্ম অবতার, দ্বিতীয়টিতে নৃসিংহ অবতার, তৃতীয়টিতে দণ্ডায়মান ধনুর্ধারী রামচন্দ্র, চতুর্থটিতে হলধারী বলরাম এবং পঞ্চম ফলকটিতে কুঠারধারী পরশুরাম'এর মূর্তি লক্ষ করা যায়।

উক্ত মন্দিরের প্রাঙ্গণে শঙ্কর মন্দিরের প্রবেশ পথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে দেখলে তৃতীয় উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফলকে মৎস্যাবতার মূর্তি রয়েছে। এর তিনটি হাত দেখা যাচ্ছে, একটি হাত ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে তিনটি হাতেই আয়ুধ রয়েছে। উর্দ্ধের ডানহাতে রয়েছে চক্র এবং বামহাতে গদা। নিম্নের বামহাতে একটি ফুল রয়েছে অনুমান করা যায়। তৃতীয় ফলকে কূর্মাবতারের মূর্তি ফলক রয়েছে। চতুর্থ ফলকে রয়েছে দণ্ডায়মান বরাহ, পঞ্চম ফলকটির দেহের উর্দ্ধাঙ্গ ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে নিম্নাঙ্গ দেখে অনুমিত হয় যে এটি নৃসিংহ অবতারের মূর্তি। ষষ্ঠ ফলকে রয়েছে বামন অবতারের মূর্তি। সপ্তম ফলকটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং অষ্টম ফলকে ধনুক হাতে রামচন্দ্রের মূর্তি রয়েছে। নবম ফলকে হলধারী বলরাম'কে লক্ষ করা যায়। দশম ফলকটিতে রয়েছেন জগন্নাথদেব এবং একাদশতম ফলকে রয়েছেন কল্কি অবতার। এছাড়াও দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দণ্ডায়মান তলদেশ থেকে দশ অবতারের মূর্তি ফলক লক্ষ করা যায়। তবে ফলকগুলিতে শ্যাওলা পড়ে যাওয়ার ফলে, গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করায়, প্রায় অনুমানের অযোগ্য হয়ে গেছে।

এই দৃষ্টান্ত গুলি থেকে সহজেই অনুমেয় যে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে দশ অবতারের মূর্তি ফলক মন্দিরগাত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। বর্ধমানের মন্দির সমূহে দশাবতারের এই বিপুল দৃশ্যণ, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে বৈষ্ণব সমাজের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করার নিদর্শন বলেই ধরা যেতে পারে।

মন্দির ভাস্কর্যে ব্রহ্মা প্রসঙ্গ -

ত্রিমূর্তির অন্যতম সৃষ্টিকর্তা হলেন বিধাতা ব্রহ্মা। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্মলাভ হয়েছিল বলে, ইনি বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উপবিষ্ট থাকেন এবং তাই ইনি পদ্মযোনি। ব্রহ্মার জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় পৌরাণিক উপাখ্যান রয়েছে। যেমন, মনুসংহিতায় (১ম অধ্যায়) আলোচিত সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, মহাসলিলে ভাসমান হিরণ্ময় অণ্ডের অভ্যন্তরে জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্ম হয়; আবার বরাহপুরাণ মতে, জলাশয়ী নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়, ইত্যাদি। ব্রহ্মা হলেন চতুরানন অর্থাৎ তাঁর চারটি মুখ, যা চতুর্দিকের প্রতীক। ব্রহ্মাও শিবের মতো পঞ্চানন ছিলেন। কিন্তু শিব ব্রহ্মার আর একটি মুণ্ড ছেদ করেছিলেন। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান রচিত হয়েছে। ব্রহ্মার বাহন হল হংস। ব্রহ্মার দুই পত্নী- সাবিত্রী ও গায়ত্রী। প্রথম পত্নী সাবিত্রী থাকেন ব্রহ্মার বামপার্শ্বে এবং গায়ত্রী থাকেন দক্ষিণপার্শ্বে।[৪২]

মর্ত্যধামে ব্রহ্মাপূজা প্রচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, বিভিন্ন পুরাণে। সেগুলির মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উপাখ্যান অনুসারে, স্বর্গবারাঙ্গনা মোহিনী, মদন'কে সঙ্গে নিয়ে নানা কৌশলে ব্রহ্মাকে মিলোনৎসুক করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মার অত্যদ্ভুত সংযমে রুষ্ট হয়ে মোহিনী অভিশাপ দিয়েছিলেন-

> "যতো হাসসি সর্বেণ অতোহপূজ্যো ভবাচিরম্।
> অচিরাদ্দর্পভঙ্গং তে করিষ্যসি হরিঃ স্বয়ম্।।
> ভবিতা বার্ষিকী পূজা দেবতানাং যুগে যুগে।
> তব মাঘ্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং ন ভবিষ্যতি না পুনঃ।।"[৪৩]

যেহেতু তুমি হেসেছ, সেই হেতু তুমি অচিরে সকলের অপূজ্য হও। হরি স্বয়ং তোমার দর্প ভঙ্গ করবেন। দেবতাদের বার্ষিকী পূজা যুগে যুগে হবে। তোমার পূজা হবে মাঘী সংক্রান্তিতে; পরে তাও হবে না। বিভিন্ন পুরাণে ব্রহ্মার প্রতি অভিশাপগুলির অন্তরালে বিভিন্ন কাহিনি রয়েছে। এর থেকে মনে হয় যে, পুরাণ রচনাকালেই ব্রহ্মা তাঁর প্রতিপত্তি হারিয়েছিলেন, বিষ্ণু ও শিব ব্রহ্মাকে অতিক্রম করে প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। পূর্বে মাঘী সংক্রান্তিতে ব্রহ্মার পূজা হলেও তা খুব অল্প সংখ্যায় হতো বলে মনে করা হয়। বর্তমানে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় নদীয়া জেলার শান্তিপুরে সাড়ম্বরে ব্রহ্মা পুজা হয়। হুগলি জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে শ্রাবণ মাসে, চব্বিশ পরগনা জেলার বাজপুর গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় এবং নদীয়া জেলার নবদ্বীপে ঝুলন পূর্ণিমায় ব্রহ্মা পূজা হয়।[৪৪]

বৌদ্ধধর্মে ব্রহ্মার স্থান রয়েছে। ইনি হংসারূঢ়, পীতবর্ণ, চতুর্ভুজ; যার দু'ই হস্তে জপমালা ও পদ্মধারী অঞ্জলিমুদ্রায় আবদ্ধ- অপর দু'ই হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। বৌদ্ধ জাতকে বুদ্ধদেব একবার ব্রহ্মা রূপে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন। ত্রিপিটকে ব্রহ্মবিহারকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মা বুদ্ধের সমকক্ষতা লাভ করতে পারেন নি, তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে বুদ্ধের পরিচায়ক। গান্ধার ভাস্কর্যে এবং মথুরা ভাস্কর্যে ব্রহ্মা বুদ্ধকে চামর ব্যজন করছেন।[৪৫]

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ব্রহ্মার মহিমা কীর্তন প্রায় হয়নি বলা যায়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে কবিগণ ব্রহ্মা সম্পর্কিত দু'একটি মন্তব্যই করেছেন। যেমন- কবি ভারতচন্দ্র 'শিব বিবাহ যাত্রা' প্রসঙ্গে বলেছেন-

"ব্রহ্মা পুরোহিত চলিলা ত্বরিত
বরকর্ত্তা নারায়ণ।"[৪৬]

আবার 'ব্রহ্মাদির তপ' অংশে বলেছেন-

"শিবের দেখিয়া তপ করিতে অন্নদাজপ
ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মাচারী।"[৪৭]

এছাড়া কবি রামেশ্বর রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে 'সৃষ্টির দেবতা', 'সৃষ্টি প্রকরণ' অংশে ব্রহ্মার উল্লেখ রয়েছে।

বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মার নিদর্শনও পাওয়া যায়। তবে ব্রহ্মার খুব বেশি ফলক দেখা যায় না। মন্দির সজ্জার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লকে কখনো উল্লম্বসারিতে কখনো বা অনুভূমিক সারিতে লক্ষ করা যায়। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল- কুচুট গ্রামের নবরত্ন মন্দিরের সম্মুখ দেওয়ালে দ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দেখলে, দ্বিতীয় সারির বামদিক থেকে নবম ফলকে হংসপৃষ্ঠে হাত জোড় করে চতুর্মুখ ব্রহ্মার একটি মূর্তি রয়েছে। দেবীপুর গ্রামের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দির সংলগ্ন স্তম্ভের শীর্ষে সজ্জিত অন্তিম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে চতুর্মুখ ব্রহ্মা পদ্মাসনে জোড়হস্তে উপবিষ্ট।

মন্দিরগাত্রে এই সামান্য ব্রহ্মার মূর্তি ফলকগুলি লক্ষ করা যায়। এবং এই ফলকগুলি দেখে অনুমান করা যায় যে, মন্দির শিল্পীগণ কৃষ্ণ অথবা পৌরাণিক দেব- দেবীর মূর্তি নির্মাণে যতটা যত্নবান ছিলেন, ব্রহ্মার মূর্তি নির্মাণে ততটা যত্নবান হননি। ব্রহ্মা মন্দিরগাত্রে গুরুত্বহীন ভাবে অবস্থান করছেন।

মন্দির ভাস্কর্যে শিব প্রসঙ্গ -

আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয় হল মন্দির ভাস্কর্যে মহেশ্বর বা শিব প্রসঙ্গ। বাঙালির জনপ্রিয়তম দুই উপাস্য দেবতা হলেন কৃষ্ণ এবং শিব। কৃষ্ণ এবং রাধা আমেদের সাহিত্যকে যে ভাবে প্রভাবিত করেছেন, শিব অথবা শক্তি অবশ্য সেইভাবে করতে পারেননি। শিব এবং মহাশক্তি প্রভাবিত করেছেন বাংলার সাংস্কৃতিক বলয়ের অন্তর্গত লৌকিক, গ্রামীণ দেব- দেবী সম্পর্কিত কল্পনাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখা যাবে, গ্রামদেবতা- গ্রামদেবী'ই কোন এক প্রকরণে শিব অথবা মহাশক্তির ভাব রূপান্তর বলে গণ্য হন। অথচ আশ্চর্যকর ব্যাপার হল, বাংলায় শাক্তদের তুলনায় শৈব কাল্ট প্রায় নিরস্তিত্ব।[৪৮]

বাংলা সাহিত্যে যেমন 'কানু ছাড়া গীত নাই' বলে একটি প্রবাদ আছে, তেমনই 'ধান ভানতে শিবের গীত' নামেও আর একটি অতি জনপ্রিয় প্রবাদ বাংলার জনচিত্তে লালিত হয়েছে। এই প্রবাদ থেকে শিব- কাহিনির জনপ্রিয়তা অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শিব একজন অতি বিচিত্র চরিত্রের দেবতারূপে চিহ্নিত। একদিকে তিনি ভস্মভূষিতকায়, শ্মশানচারী যোগীরাজ আবার একদিকে তিনি উমাকান্ত। তিনি কখনও রুদ্ররূপে, কখনও মঙ্গলময় অশিব নাশন শিব রূপে ভারতীয় ধর্মসাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি হয়ে রয়েছেন।[৪৯] বেদের রুদ্রদেব বজ্র ও ধনুর্বাণধারী। এই হিংসক রুদ্রের তুষ্টি বিধান করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ঋষিগণ। রুদ্রের নিকট সুখ- সমৃদ্ধি আর সন্তান সন্ততি ও পশু প্রভৃতির মঙ্গল এবং রোগমুক্তি প্রার্থনা করেছিলেন। রুদ্রের অপর পৃষ্ঠে শিবের যে শিবত্ব, তা সূচনা এখান থেকেই।

বৈদিক যুগের প্রথমদিকে শিবকে দেবতা রূপে পাওয়া না গেলেও, ঋকবেদের কয়েকটি সূক্তে তাঁর প্রতিরূপ রুদ্রের উল্লেখ রয়েছে। শিব শব্দ এই সময় কোন কোন বৈদিক দেবতার বিশেষণ হিসেবে মঙ্গলদায়ক অর্থে ব্যবহৃত হত। তবে যজুর্বেদেই শিব পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হয়েছেন। এই বেদে রুদ্রস্তুতিতে যেমন তাঁকে সূর্য,অগ্নি,ইন্দ্র,বিষ্ণু- কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখা যায়, আবার তাঁকে জগৎপতি,দিকপতি ও চোর- ডাকাতদেরও অধিপতি বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ'এ তাঁকে পরমেশ্বর ও ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়েছে। যিনি বিশ্ব স্রষ্টা,পালনকর্তা ও সংহারকর্তা এবং তিনি'ই সর্বভূতে স্থিত শিব। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর

বিশ্লেষণে বলেছেন; 'এই প্রকারেই ক্রমশ শিব নামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আর্যেতর জাতির দ্বারা পূজিত অনুরূপ দেবতার যখন বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলন ঘটে তখন মিশ্র দেবতা শিব নামেই পরিচিত হন।' খ্রিঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীর বৈয়াকরণ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে রুদ্র ও শিবের উল্লেখ আছে। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে শিব'কে লৌকিক দেবতা বলেছেন। রামায়ণ ও মহাভারতেও শিবের উল্লেখ রয়েছে। এরপর থেকে ধ্রুপদী সাহিত্যে শিব- শক্তি'র বন্দনা- স্তুতি স্থান পেতে লাগল এবং ক্রমশ শিব মানুষের মনেও স্থান করে নিলেন।[৫০]

ভারতে, যে সকল প্রাকবৈদিক দেবতা, পরবর্তী হিন্দুসমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিব সর্বপ্রধান। বাংলায় যে শিবধর্মের প্রচার হয়েছিল, তার সঙ্গে আর্যেতর সমাজের উপাদান আগে থেকেই মিশ্রিত ছিল। অনার্য দেবতা শিব, আর্যসমাজে ক্রমশ একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে, স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[৫১]

শিব দেবতার ব্যাপকভাবে প্রচলিত প্রতীকী মূর্তিটি, শিবলিঙ্গ নামে বাংলাতে এবং ভারতের অন্যত্রও গৃহীত। 'শিশ্নদেবাঃ' তথা যৌনপ্রতীক উপাসকদের সম্পর্কে ঋগ্বৈদিক আর্যভাষীরা যে সকল কটু বক্তব্য রেখেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নগরে বিপুল পরিমাণে পাওয়া বর্তুলাকার প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো নাতিদীর্ঘ মসৃণ আরেকটি পাথর- সংবলিত প্রতীকী মূর্তিকে, ঐ সংস্কৃতিতে শিশ্নদেবতার সার্বজনিক ভাবে গৃহীত রূপ বলেই গণ্য করা চলে। পিতৃদেবতা এবং মাতৃকাদেবী দুইয়েরই বিপুল প্রচলন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঐ সভ্যতায় বজায় ছিল এবং যেখানে প্রাপ্ত পিতৃদেবতার প্রতীক পুরুষ চিহ্ন দ্যোতক নাতিদীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড এবং মাতৃদেবতার প্রতীক চিহ্ন আরেকটি প্রস্তরখণ্ড নির্মিত বর্তুলাকার আঙটির সংলগ্ন রূপটির মাধ্যমে ঐ দুই ধর্মধারার সমন্বয় যে ঘটেছিল সেখানে, সেটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাংলায় ঘরোয়াভাবে এবং বহু ক্ষেত্রে মন্দিরে যে শিবের অর্চনা হয়, অধিকাংশ সময় তিনি ঐ বিশিষ্ট প্রতীকী মূর্তিতেই উপাসিত হন।[৫২]

দক্ষিণ রাঢ়ের তিনজন জনপ্রিয় এবং বিশিষ্ট কবি, মুকুন্দ চক্রবর্তী'র 'চণ্ডীমঙ্গল', ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' এবং কবি রামেশ্বর বিরচিত 'শিবায়ন', প্রভৃতি কাব্যে শিবকাহিনি বাংলায় বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এছাড়া শিবায়ন গান হয়ে উঠেছিল লোকশিক্ষার অন্যতম বাহন। বহুকাল থেকেই মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলের গায়কদের কণ্ঠে শিবায়ন গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে এসেছিল। এই সকল গায়কগণ কৈলাসের মহাদেব ও পার্বতীর কাহিনি ঘরের মানুষের মতো করে তাঁদের দারিদ্র- বেদনার অংশীদার করে, আবার তাঁদের আনন্দে উল্লাসিত হয়ে কাব্যের সঙ্গে স্বরচিত অন্য সমধর্মী প্রসঙ্গযুক্ত অংশ সংযোজিত করে মানুষের মনোরঞ্জন করতেন।[৫৩]

শিব কাহিনির জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যে মানুষের মনেই সীমাবদ্ধ রইল না, ক্রমশ তা বাংলার মন্দিরের ভাস্কর্য শিল্পে বিস্তার লাভ করল। পৌরাণিক বিষ্ণুর মতো পৌরাণিক শিবও মানবমূর্তিতে পূজিত হচ্ছেন প্রায় খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে, তবে শিবের মানব মূর্তির থেকে তার অমূর্ত শিশ্ন বা লিঙ্গ প্রতীক ভক্তদের কাছে পূজ্যবস্তু হিসেবে অনেকবেশি তাৎপর্যময়, কারণ এই দৃশ্যমান শিবলিঙ্গই প্রকৃতিগত ভাবে আদি পিতা ও আদি মাতার মিলন প্রতীক। গৌরীপট্ট সহ শিবলিঙ্গের আবির্ভাবকাল গুপ্তোত্তর যুগে অর্থাৎ প্রায় ৬০০খ্রিঃ পরবর্তী কোন সময়ে বলে ধরা হয়। কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যা দেখে গবেষকগণ অনুমান করেছেন যে, গৌরীপট্টের রূপ কল্পনা অন্তত এর পাঁচশ বছর আগেই হয়েছিল। ওদুম্বর নামে পাঞ্জাবের একটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর একটি রজত মুদ্রার মুখ্য দিকে বৃষ মূর্তির উর্ধ্বে গৌরীপট্টের চিত্র দেখা যায়, বৃষটির ঠিক কুঁজের উপরিভাগে। শিবের বাহন হল নন্দী নামক বৃষ। লিঙ্গ প্রতীক ও বৃষরূপ ব্যতীত মহাদেবের তৃতীয় রূপ মনুষ্যদেহী। তাঁর এই মনুষ্যরূপ সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে হিন্দুপ্রতিমা শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। এই দেবতার প্রধান লক্ষণ চিহ্ন বৈশিষ্ট্য হল- জটা মুকুট, নাগোপবীত, সর্পরচিত অলংকার, পরনে ব্যাঘ্রচর্ম এবং অভয়- বরদ মুদ্রাদি ব্যতীত ত্রিশূল, ডমরু, শূল ইত্যাদি কয়েকটি আক্রমণাত্মক আয়ুধ।[৫৪] এর বিপরীতে মধ্যযুগের বাংলার মন্দির সমূহে স্থূলকায়, গেঁজেল, কামুক ও দরিদ্র শিব'কে পাই, যার সঙ্গে পৌরাণিক শিবচরিত্রের কোন তুলনা হয়না। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে শিবকে প্রধানত কৃষক রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু মন্দিরগাত্রে কৃষিজীবী শিবের কোন মূর্তি ফলক দেখা যায়নি। এরপর শিব আলস্যের কারণে ক্রমশ ভিক্ষোপজীবী

হয়ে ওঠার কাহিনি পাওয়া যায়। এই ভিক্ষোপজীবী শিবের মূর্তি মন্দিরগাত্রে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু শিব যে দেবতা, মন্দির শিল্পীরা মহাদেবের পৌরাণিক মহিমাও পুরোপুরি ভুলতে পারেন নি। ঋগ্বেদে শিবের সঙ্গীত প্রতিভা স্বীকার করা হয়েছে। মন্দিরগাত্রে এর প্রভাব লক্ষণীয়।

বর্ধমান জেলার টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরগুলিতে শিবের বিভিন্ন রূপ চিত্রায়িত করেছেন মন্দির শিল্পীরা। কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম সারিটির বামদিক থেকে লক্ষ করলে দশম ফলকে ত্রিশূলধারী, নিম্নাঙ্গে বাঘছাল আবৃত দণ্ডায়মান মহাদেবের মূর্তি রয়েছে। তাঁর মাথায় জটা, গলায় মালা এবং কপালে অর্ধচন্দ্র আঁকা রয়েছে। বৈদিক রুদ্রের যুগের অস্ত্র ছিল ধনুর্বাণ। পৌরাণিক শিব ধনুর্বাণ ত্যাগ করে, ত্রিশূল ধারণ করেছেন। উক্ত মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে পঞ্চদশ ফলকে শিবের গাত্রমর্দনের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই ফলকে স্থূলকায় শিব হাঁটু মুড়ে ডানহাতের উপর ভর দিয়ে একটু হেলে বসে রয়েছেন এবং তাঁর এক অনুচর তাঁর বামহাত ধরে মর্দন করছেন, এমন একটি দৃশ্য দেখা যায়। সম্পূর্ণ ফলকটির ঊর্ধ্বাংশে রঙ্গমঞ্চে ব্যবহৃত পর্দার অলংকরণ করা রয়েছে। এই ফলকটির অনেকাংশই অস্বচ্ছ হয়ে গেছে।

মানকরের পঞ্চরত্ন শিব মন্দিরটির প্রবেশ পথের শীর্ষে অর্ধবৃত্তাকার ভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলটির মধ্যবর্তী অংশে তানপুরা হাতে শিবের সঙ্গীত সভার অপূর্ব দৃশ্য লক্ষ করা যায়। শিব একটি আসনের উপর দুটি পায়ের হাঁটু মুড়ে তানপুরা হাতে নিয়ে উপবিষ্ট। তাঁর বামপাশে দণ্ডায়মান নন্দী ষাঁড় এবং ডানপাশে দণ্ডায়মান শ্রোতাগণ রয়েছেন। শিবের মাথায় জটাবদ্ধ চুল এবং গলায় সর্প রয়েছে।

মন্দির ভাস্কর্যের মধ্যে শিব সংক্রান্ত আরেকটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হল হরগৌরীর বিবাহসভা। বর্ধমান জেলার দু'একটি মন্দিরে হরগৌরীর বিবাহ সংক্রান্ত মৃৎফলক লক্ষ করা যায়। হরগৌরীর বিবাহ ব্যতীত অন্যকোন দেব-দেবীর বিবাহসভার দৃশ্যফলক মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ হয়নি বললেই চলে। কারণ হিসেবে বলা যায়, দেবকূলে শিব'ই একমাত্র দেবতা যিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন। অন্য সকল দেবতাগণ পত্নীদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ করেননি। ইন্দ্রের ইন্দ্রানী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী এঁরা প্রত্যেকেই সঙ্গিনী, *Consort* বা শক্তি। রীতি নিয়ম পালন করে তাঁদেরকে ঘরণী করেনি দেবতাগণ। তাই শিবের বিবাহ নিয়ে বিশেষ কৌতূহল তৈরি হয়েছে পৌরাণিক উপাখ্যানে, লোকসাহিত্যে এবং মূর্তিতত্ত্বে। কালিদাস'ই প্রথম তাঁর কাব্যে শিবপার্বতীর বিয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য এবং কবি রামেশ্বর বিরচিত 'শিবায়ন' কাব্যে হরগৌরীর বিবাহসভার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে-

"বৃষ আরোহন করে দেব পঞ্চানন
মধ্যে কান্ডার পট্ট ধরে কোন জন।
শিবে প্রদক্ষিণ গৌরী কইল সাতবার
নিছিয়া পেলিল পান কইল নমস্কার।
মহেশের কণ্ঠে গৌরী দিল রত্নমাল
দেখি দেবতার সুখ বাড়িল বিশাল।
হরিষে পুলকতনু দুজনে ছামনি
হুলাহুলি দিল জত দেবতারমণী।
ব্রহ্মা পুরোহিত কৈল বাক্যের বিধান
হিমালয় আনন্দে করেন কন্যাদান।
হরগৌরী একাসনে বসি দুই জনে
গ্রন্থচুড়া পিতামহ করিল বন্ধনে।" [৫৫]

এদেশের বিভিন্ন পুরাণে, ধ্রুপদী সাহিত্যে শিবপার্বতীর বিবাহ উপাখ্যান রচিত হয়েছে নানা যুগে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিবপার্বতীর বিবাহ প্রসঙ্গে 'শিবায়ন' কাব্যের কবি রামেশ্বর ভূতপ্রেত সহ শিবের বিবাহ শোভাযাত্রার বিবরণ তুলে ধরেছেন এইভাবে-

"চলে কোটী যোগীনী ডাকিনীগণ লৈয়া।
সর্ব্বভূত শীঘ্র আইল সমাচার পায়্যা।।
দীপ্ত করে দিগান্তরে দেউটী ধরে দানা।
ভূত গুলা মারে ঢেলা নাহি শুনে মানা।।
খোসাল হইয়া পেতি মশাল যোগায়।
কৌতুকে কুষ্মাণ্ডগণ গড়াগড়ি যায়।।
দিব্য দিব্য দীপক জ্বালিছে ধুনামড়া।
হাজার হাজার চলে হইয়া হাতী ঘোড়া।।
চরকি হইয়া কেহ চলে সাথে সাথে।
হাউই হইয়া কেহ ধায় শূণ্য পথে।।
অনেক আতস বাজি করিলেক ভূত।
শঙ্কর সাবাসি দেন বটে মোর পুত।।
বরযাত্রশব্দ শুন্যা স্তব্ধ হিমালয়।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে শুনে মহাশয়।।" [৫৬]

শিব-পার্বতীর পরিণয় আসলে বহুজন ও গিরিজনের জৈবমিলন কথা। ভিন্ন কৌম রক্ত সম্পর্কের আদান-প্রদান। ভারতের নানা প্রদেশে কৃষি উৎসবে শিববিবাহ প্রধানতম অঙ্গ হয়ে ওঠে। মাটির মূর্তি গড়ে শিব-পার্বতীর মিলন অনুষ্ঠানও হয় কোথাও কোথাও। বাংলার গাজন-গম্ভীরায় শিব-পার্বতীর পরিণয় আজও কেন্দ্রবস্তু। তত্ত্বকথা ধরলে শিব ও শক্তির মিলন হল শৈব এবং শাক্ত ধর্মমতের সমন্বয় চিন্তা। কল্যাণ সুন্দর শিবের বৈবাহিক মূর্তি কৃষিজীবী মানুষের জন্য প্রসারিত করে কল্যাণের হাত, সামাজিক বিরোধ ও মৈত্রীকে ভুলিয়ে দেয় আর মানুষে মানুষে মিলনের বাণী প্রচার করে বিবাহ আসরের এক রূপকল্প রচনা করে।[৫৭] সাহিত্যে শিব-পার্বতীর বিবাহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর মন্দির ভাস্কর্যে শিব-পার্বতীর বিবাহসভার দৃশ্যফলক যে মন্দিরগুলিতে লক্ষ করা গেছে এবার সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

শিবের বিবাহসভার একটি খুব সুন্দর ফলক দেখা যায় দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সম্মুখ দেওয়ালে প্রতিষ্ঠা ফলকের দক্ষিণপার্শ্বে। এই ফলকে দেখা যায়, গৌরী বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়েছেন সুন্দর বেশভূষায় এবং অলংকারে সজ্জিত হয়ে। তাঁর পাশে বিবাহের বিভিন্ন উপাচার, যেমন বরণডালা, কমণ্ডলু ইত্যাদি নিয়ে দণ্ডায়মান নারীগণ রয়েছে। এর পাশেই দেখা যাচ্ছে শিব বামহাতে ত্রিশূল নিয়ে দণ্ডায়মান এবং তাঁর পাশেও অন্যান্য দেবতা বিরাজমান।

শিবের বিবাহ সভার আর একটি ফলক লক্ষ করা যায়, কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে। এই ফলকে গৌরীকে একটি আসনে বসিয়ে দু'দিক থেকে দু'জন উঁচু করে ধরে রয়েছে, সম্মুখে যজ্ঞের উপকরণ দেখা যাচ্ছে; সেই স্থানে উপস্থিত রয়েছেন মহাদেব, তাঁর গলায় সর্প এবং বামহাতে শিঙা এবং পাশে বীণা হাতে নারদ সহ আরও কয়েকজন পুরুষ দণ্ডায়মান। ফলকটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাই পরিস্কার করে কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়নি।

শিবের দাম্পত্য জীবনের কয়েকটি দৃশ্য মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়। যেমন- গলসি ১নং ব্লকের সারুল গ্রামের চ্যাটার্জী পরিবারের পরিত্যক্ত দেউল মন্দিরের প্রবেশ পথের শীর্ষে, সজ্জিত বৃষের উপর উপবিষ্ট হরগৌরী'র একটি অপূর্ব সুন্দর ফলক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁদের বামপার্শ্বে একটি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট একজন দেবতা রয়েছেন এবং পদ্মের উপর বীণা নিয়ে দেবী সরস্বতী দণ্ডায়মান। হরগৌরী'র দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মের উপর উপবিষ্ট একজন দেবতা রয়েছেন এবং পদ্মের উপর দেবী লক্ষ্মী দণ্ডায়মান। এঁদের প্রত্যেকের দু'পাশে দু'জন করে সেবক-সেবিকা রয়েছে।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের খিলানশীর্ষে সজ্জিত তৃতীয় অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে তৃতীয় সারির মাঝে সেতারবাদনরত শিব উপবিষ্ট। শিবের বামপার্শ্বে দেবী গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী উপবিষ্ট রয়েছেন।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে শিব-পার্বতীর পুত্র গণেশ'কে নিয়ে একটি ফলক রয়েছে। মন্দিরের সম্মুখস্থিত উন্মুক্ত বারান্দা সংলগ্ন মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের শীর্ষে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে দেখা যায়, হরগৌরী মধ্যেখানে শিশু গণেশ'কে নিয়ে উপবিষ্ট। শিবের মাথা জটাবদ্ধ এবং কণ্ঠে সর্প বিদ্যমান। তাঁর পাশে বৃষ নন্দী শুয়ে রয়েছে এবং বাকি অনুচরবর্গকে হাতে কক্কে নিয়ে দেখা যাচ্ছে। গৌরীর পরনে কাপড়, বিবিধ অলংকার এবং মস্তকে মুকুট রয়েছে। এবং তাঁর পশ্চাতে একজন সেবিকা দণ্ডায়মান।

বনপাশের অষ্টকোণাকৃতি মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের পঞ্চম কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষে সজ্জিত অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের তৃতীয় সারিতে শিব-গৌরী বৃষ পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রয়েছেন এবং দু'পাশে শিবের অনুচরবর্গের বাজনা, ধ্বজ ইত্যাদি সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। এছাড়াও মেমারী ২নং ব্লকের করন্দা গ্রামের বারোয়ারি তলার গোস্বামী পরিবারের পঞ্চরত্ন শিব মন্দিরের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) দ্বারের শীর্ষাংশে সজ্জিত অনুভূমিক ফিগারেটিভ ব্লকগুলির বামদিক থেকে চতুর্থ ব্লকে বৃষ'র উপর উপবিষ্ট হরগৌরীর দৃশ্যটি লক্ষ করা যায়। দু'পাশে শিবের অনুচরগণ নৃত্যরত। শিবের ডানহাতে ডমরু এবং বামহাতে শিঙা রয়েছে; তাঁর দেহটি সর্পালঙ্কারে ভূষিত।

উপরোক্ত ফলকগুলি ব্যতীত শিবের একাকী অবস্থানরত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক- কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির সংলগ্ন উন্মুক্ত বারান্দার মধ্যবর্তী অন্তঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের তলদেশ থেকে লক্ষ করলে চতুর্থ অনুভূমিক সারিতে সজ্জিত প্যানেলটির বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে বৃষারূঢ় মহাদেব'কে বামহাতে শিঙা এবং ডানহাতে ডমরু নিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়।

বনকাটির গোপালেশ্বর শিব মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিক সারির উপর উল্লম্ব ভাবে সজ্জিত ডানদিক থেকে প্রথম সারির তলদেশ থেকে সপ্তম ফলকে দেখা যায়, শিব হাতে গড়গড়া নিয়ে দু'টি পায়ের হাঁটু পশ্চাতে মুড়ে বামদিকে সামান্য হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দার বামপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের শীর্ষে উৎকীর্ণ ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায় মহাদেব পদ্মাসনে উপবিষ্ট। মাথায় জটাবদ্ধ কেশ, দু'দিক থেকে দু'টি সাপ তাঁর কাঁধের উপর ফণা তুলে রয়েছে। বাম কানে ধুতুরা ফুল এবং বামহাতে ত্রিশূল রয়েছে।

শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের প্রবেশ পথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে অষ্টম ফলকে দণ্ডায়মান শিবের মূর্তি রয়েছে। তাঁর দেহ সর্পাবৃত। মাথায় জটাবদ্ধ চুল। যদিও ফলকটির মুখমণ্ডল ও দেহের সম্মুখাংশের কিছুটা অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত অন্তিম ফিগারেটিভ প্যানেলটির বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে তানপুরা বাদনরত উপবিষ্ট শিবের মূর্তি লক্ষ করা যায়। শিবের পরনে বাঘছাল, মাথার চুল জটাবদ্ধ এবং তাঁর ডান হাঁটু স্পর্শ করে একটি সর্প রয়েছে।

লিঙ্গরূপী শিবের ফলক মন্দিরগাত্রে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- কালনার অনন্ত বাসুদেব মন্দির, বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, গোপালজী মন্দির, জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিব মন্দির, কুলটির নন্দীবাড়ির শিব মন্দির, সারুলের চ্যাটার্জী পরিবারের শিব মন্দির প্রভৃতি। উল্লেখিত এই প্রত্যেকটি মন্দিরের বহিঃগাত্রে দ্বারের শীর্ষাংশে ধ্বজ বিশিষ্ট দেবালয়ের মাঝে, একটি করে শিবলিঙ্গ স্থাপিত রয়েছে। এছাড়া প্রতাপেশ্বর মন্দিরের মুখ্যদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর উল্লম্ব ভাবে সজ্জিত বামদিক থেকে লক্ষ করলে দ্বিতীয় সারির তলদেশ থেকে অষ্টম ফলকে শিবলিঙ্গ পূজারত একজন ব্যক্তিকে লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দেখলে ফুলকারি নকশার মাঝে শিবলিঙ্গ পূজারত একজন পুরুষ কে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ধুতি ও পৈতে পরিহিত ও হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সাহিত্যে যেমন লৌকিক শিবের জনপ্রিয়তার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তেমনই মন্দির শিল্পের ক্ষেত্রেও পৌরাণিক শিবের তুলনায়, লৌকিক শিবের চরিত্রই অধিক

জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মধ্যযুগে বাংলায় তুর্কি আগমনের ফলে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্থানচ্যুত হয়ে জনসভায় নেমে আসার ফলে অভিজাত লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাথমিকভাবে সংঘাত ও তারপর সমন্বয় হয়ে উঠল অনিবার্য। মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক ধর্মীয় চরিত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের উপর। ফলে ক্রমশ শিব হয়ে উঠলেন লৌকিক দেবতা। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে শিবের প্রতিপত্তিকে লঘু করে তাঁর অবনমন ঘটানোর প্রয়াস করা হয়েছে। মানিক দত্তের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য, মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে শিবের তুলনায় শক্তির মহিমাই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে শিব ভক্ত চাঁদ সদাগর শেষ পর্যন্ত দেবী মনসার কাছে পরাজিত হয়ে, তাঁর পূজা করলেন। রামায়ণে শৈব রাবণ, পরাজিত হলেন রামচন্দ্রের কাছে। কিন্তু অধিকাংশ কাব্যের মুখবন্ধের বন্দনা অংশে কবিগণ শিবের প্রতি তাঁদের ভক্তি প্রদর্শন করেছেন।[৫৮]

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শিব চরিত্রের প্রতিফলনই বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরের অলংকার সজ্জায় দেখা যায়। শিব চরিত্রের অবনমনকেই মন্দিরগাত্রে শিল্পীগণ চিত্রায়িত করেছেন যত্ন সহকারে। মন্দিরগাত্রে শিব সংক্রান্ত বিভিন্ন মোটিফ পুনরাবৃত্ত হয়েছে বারংবার। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে দ্বারের শীর্ষে শিবলিঙ্গ ফলকের আধিক্য লক্ষ করলে, বাংলায় শিবপূজার জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। শিবের চারিত্রিক দুর্বলতা থাকার সত্ত্বেও মেয়েদের শিবলিঙ্গ পূজার দ্বারা শিবের ন্যায় স্বামী লাভের আকাঙ্খা, এই বৈপরীত্যটাই মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে। পূর্বোক্ত এই তিন দেবতা, যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের একত্রে একটি ফলক লক্ষ করা যায়, কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তর দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে লক্ষ করলে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ফলকে। তিনটি ফলক একত্রে লক্ষ করলে, বামদিকে প্রথমে রয়েছেন চতুর্ভুজ বিষ্ণু, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, পরনে ধুতি ও গলায় মালা রয়েছে; দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তানপুরা বাদনরত মহাদেব। ইনিও পদ্মাসনে আসীন। পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, মাথায় জটা, গলায় সর্প, কপালে অর্ধচন্দ্র আঁকা রয়েছে; এর পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় ফলকে রয়েছেন ভগবান ব্রহ্মা, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ডানহাতটি ডানপায়ের উপর স্থাপন করা এবং বামহাতটি উর্ধ্বে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। চতুর্মুখ ব্রহ্মার একটি মুখ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। পরনে রয়েছে ধুতি ও চাদর। এই ত্রিদেবের মূর্তিগুলি ফুলকারি নকশার মাঝে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, আমরা জানি যে শিব থাকেন কৈলাসে এবং বিষ্ণু বা নারায়ণ সমুদ্রতলে অনন্ত শয্যায় শায়িত থাকেন। কিন্তু মধ্যযুগীয় কবিগণ পুরাণ কাহিনি থেকে রৈখিক বস্তুমাত্র সংগ্রহ করে এই দুই দেবতাকেই, শ্বশুর গৃহামোদী কলঙ্কী জামাতার ছাঁচে ফেলেছেন। কিন্তু এই রসিকতার পরেও হরি ও হর, কারোর সম্মানই বিশেষ লঘু হয়নি বলেই, মন্দিরগাত্রে এঁদের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মন্দির ভাস্কর্যে গণেশ ও কার্তিক এবং অন্যান্য দেবতা প্রসঙ্গ -

ব্রহ্মা- বিষ্ণু- মহেশ্বর এই তিনজন প্রধান পৌরাণিক দেবতার মন্দিরগাত্রে অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনার পর, অন্যান্য পৌরাণিক দেবতাদের অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলেন পৌরাণিক দেবতা শিব- পার্বতী পুত্র গজানন গণেশ।

মধ্যযুগের বাংলায় মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা শিল্পের নতুন ধারার সূচনা পর্বে পৌরাণিক দেবতা গণেশ মন্দির সজ্জায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর দেবত্বের চেয়ে লৌকিক বৈশিষ্ট্যই অধিক মাত্রায় প্রকাশিত।[৫৯]

গণপতি বা গণেশ অর্থাৎ সংখ্যাতীত বিচিত্ররূপী রুদ্রগণের যিনি অধিপতি। কালক্রমে গণাধিপতি রুদ্র শিবগণের অধিপতি হয়ে থাকতে পারলেন না। যেমন করে এক দেবসত্তা থেকে বহু দেবতার উদ্ভব, ঠিক তেমনই করেই গণপতি রুদ্র শিব থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে শিব নন্দন গজানন গণেশ শিব পুত্র রূপে পরিগণিত হলেন। সুতরাং গণেশের জন্ম সম্বন্ধে বহুবিধ বৈচিত্র্যময় কাহিনি গড়ে উঠল এবং পুরাণ গুলিতে স্থান পেল। বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শিবপুরাণ ইত্যাদি বিবিধ পুরাণে গণেশের জন্মের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।[৬০] কোন কোন পুরাণমতে শিবের অভিশাপেই গণেশের ওইরকম ভুড়ি, স্থূলকায় দেহ এবং মুখমণ্ডল হস্তি সদৃশ হয়ে গেছে। অপেক্ষাকৃত লোকায়ত

সাহিত্যে কোন দেবতার শারীরিক বিকৃতির জন্য অভিশাপের কথা স্মরণ থাকে না। কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথমখন্ডে বর্ণিত 'হরগৌরীর কন্দল' অংশে, গৌরীর উক্তি-

"বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সব গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান।।
ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর।।"[৬১]

এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, সময়ে অসময়ে প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করে গণেশ পিতা শিবের মতো স্থূলকায় হয়ে যাচ্ছেন। আসলে গণেশ নামের সঙ্গে অকর্মণ্যতার আভাসটুকু জড়িয়ে আছে এবং প্রচুর খাদ্যগ্রহণ ও সেটি কর্মের ক্ষেত্রে অনুপযোগী হওয়ার একটা অনুষঙ্গ গণেশ নামের সমর্থক হয়ে গেছে।[৬২] এভাবেই পৌরাণিক দেবতা গণেশ সহজেই মানব চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন।

পুরাণের ধ্যানমন্ত্রে গণেশের যে রূপ কল্পিত হয়েছে, সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যে নির্মিত বর্ধমান জেলার বিভিন্ন টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরগুলিতে তারই প্রভাব লক্ষ করা যায়। বেশিরভাগ মন্দিরের ফলকে লম্বোদর, হস্তিমুখ ও চতুর্ভুজ গণেশকেই লক্ষ করা যায়। মাতা গৌরীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট গণেশ মূর্তি, কার্তিকের পাশে দণ্ডায়মান গণেশমূর্তিও দু'একটি লক্ষ করা যায়। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ গণেশমূর্তির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

কাটোয়ার শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের দেউল মন্দিরটির গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে বামদিক থেকে প্রথম উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে লক্ষ করলে দশম ফলকে মূষিক পৃষ্ঠে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ লম্বোদর মূর্তি দেখা যায়। গণেশের শিরে মুকুট রয়েছে। তবে কোন হাতে আয়ুধ নেই। উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণেরই শঙ্কর মন্দিরের শীর্ষস্থানে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলটির বামদিক থেকে পঞ্চম ফলকে পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ গণেশের মূর্তি দেখা যায়।

দেবীপুর গ্রামের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সংলগ্ন উন্মুক্ত বারান্দার সম্মুখস্থিত বামপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের শীর্ষাংশে সজ্জিত অনুভূমিক সারির বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ গণেশের মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে প্রথম উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে লক্ষ করলে দ্বিতীয় ফলকে পদ্মাসনে উপবিষ্ট লম্বোদরের মূর্তি লক্ষ করা যায়। চতুর্ভুজ মূর্তিটির ঊর্দ্ধের বামহস্তে একটি ক্ষুদ্র দণ্ড রয়েছে। পরনে রয়েছে ধুতি এবং কণ্ঠে মালা।

এছাড়াও শিবগৌরীর সাথে শিশু গণেশের মূর্তির প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এর পরেও গণেশকে নানাভাবে ভিন্ন বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে পাওয়া যাবে। অবশেষে বলা যায় যে, পৌরাণিক কাহিনি দৃশ্য ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মধ্যে গণেশের অবস্থান যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ করা গেলেও, তাঁর স্থান নিতান্ত গৌন বলেই মনে হয়। কারণ গণেশ বাঙালি মানসে কখনওই প্রধান দেবতার মর্যাদা পাননি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এক জনপ্রিয় দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রমশ শিল্প সাহিত্যে তাঁর প্রকাশ ঘটে। বাংলায় পাল যুগে কিছু কিছু গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলি মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল এবং এই সময়কার অধিকাংশ গণেশ মূর্তি মূষিকের উপর নৃত্যরত অবস্থায় লক্ষ করা গেছে। বাংলার বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে সিদ্ধি ফলদাতা গণেশের পূজার প্রচলন ছিল।[৬৩] মধ্যযুগে নির্মিত বর্ধমান জেলার যেসব মন্দিরগাত্রে গণেশ মূর্তি দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা শিল্পীর নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্ট, যদিও পুরাণের কাহিনি বা বর্ণনা তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন নি।

বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে কার্তিকের মূর্তি ফলকও লক্ষ করা যায় এবং তার পরিমাণও খুব কম নয়। স্কন্দ কার্তিকেয়'কে ময়ূর পৃষ্ঠে আরোহণরত অবস্থাতেই লক্ষ করা যায়। হর- পার্বতীর পুত্র হলেন কার্তিক। বিভিন্ন পুরাণে, যেমন- বরাহ পুরাণ, পদ্মপুরাণ, শিবপুরাণ, এমনকি মহাভারতে'ও কার্তিকের বিচিত্র উপাখ্যান রয়েছে। কার্তিক তারকাসুর'কে বধ করেছিলেন। পুরাণ গুলির বর্ণিত উপাখ্যানে পাওয়া যায় যে, স্কন্দ কার্তিকেয় রুদ্র রূপী অগ্নির পুত্র। তিনি স্কন্দ, কার্তিকেয়, কুকুটধ্বজ, কুমারেশ প্রভৃতি বহু নামে ভূষিত হন।[৬৪] জন্মলগ্নে ছয় কৃত্তিকা মাতা তাঁকে স্তন্যদান

করেছিলেন বলে, তিনি যেমন ‘ষণ্মাতুর’ বলে খ্যাত, তেমনই নিজেও ‘ষণ্মুখ’ অর্থাৎ ছয়’মুখী।[৬৫] ভারতচন্দ্র রচিত ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে কার্তিক সম্পর্কে গৌরী যে উক্তি করেছেন, তা হল-

“ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়।।”[৬৬]

তবে পুরাণে কার্তিকের ময়ূর বিলাসী নববাবু রূপটি কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু মন্দিরগাত্রে সর্বত্র কার্তিক’কে ময়ূরে উপবিষ্টই দেখা যায়। কখনও তাঁকে গণেশের পাশে, কখনও একাকী অথবা কখনও সপরিবারে দেবী দুর্গার ফলকে লক্ষ করা যায়।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে চতুর্দশ ফলকে পদ্মের উপর উপবিষ্ট চতুর্ভুজ গণেশ এবং পঞ্চদশ ফলকে ময়ূরের পৃষ্ঠে আসীন কার্তিকের মূর্তি লক্ষ করা যায়। গণেশের শিরে মুকুট এবং কার্তিকের শিরে আধুনিক কায়দার গোলাকৃতির টুপি রয়েছে। উক্ত মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে বামদিক থেকে দ্বিতীয় উল্লম্ব ফিগারেটিভ সারিতে শীর্ষ ফলকে ময়ূর পৃষ্ঠে আসীন কার্তিকের মূর্তি রয়েছে।

বনকাটি গ্রামের গোপালেশ্বর শিব মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে বামদিক থেকে দ্বিতীয় উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে চতুর্থ ফলকে ময়ূর পৃষ্ঠে আসীন কার্তিকের মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। কুচুট গ্রামের নবরত্ন মন্দিরটির সম্মুখ দেওয়ালের শীর্ষাংশে রাসলীলা মন্ডলের দক্ষিণপার্শ্বে তলদেশ থেকে প্রথম অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে অষ্টম ফলকে ময়ূর পৃষ্ঠে আসীন কার্তিকের বামহস্তে ধনুক এবং দক্ষিণহস্তে তির রয়েছে। দেবীপুর গ্রামের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সম্মুখস্থিত মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের শীর্ষে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলটির ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে ষড়ানন কার্তিক হাত জোড় করে পদ্মাসনে উপবিষ্ট।

মন্দিরগাত্রে টেরাকোটার ফলকে কোথাও কোথাও কিছু অপ্রধান দেবতার মূর্তি ফলক উৎকীর্ণ হয়েছে। যেমন- দেবরাজ ইন্দ্র, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি। সমাজে এদের পূজার প্রচলন হয়নি, ফলে মন্দিরগাত্রে এদের প্রভাব লক্ষ করা যায় না। তবে সাহিত্যে মুখ্য চরিত্রগুলির পাশাপাশি, এই অপ্রধান চরিত্রগুলিও বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছিল।

বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের মূর্তি প্রসঙ্গটি কৃষ্ণের পারিজাত হরণ দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও কুচুট গ্রামের নবরত্ন মন্দিরের সম্মুখ দেওয়ালে উৎকীর্ণ রাসলীলা ফলকটির দক্ষিণপার্শ্বে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের তৃতীয় ফলকে ঐরাবত পৃষ্ঠে উপবিষ্ট দেবরাজ ইন্দ্রের ভাস্কর্য রয়েছে। যদিও ফলকটির উপর কালের প্রভাবে শ্যাওলার আস্তরণ পরে গেছে।

উক্ত মন্দিরেরই প্রবেশ পথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্ব ভাবে সজ্জিত, বামদিক থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের একেবারে শীর্ষ ফলকে ঢেঁকির উপর উপবিষ্ট বীণাবাদনরত দেবর্ষি নারদ’এর একটি সুদৃশ্য মূর্তি রয়েছে। দেবীপুর গ্রামের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের শীর্ষে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে ঢেঁকির উপর উপবিষ্ট দেবর্ষি নারদ’এর মূর্তি লক্ষ করা যায়। তাঁর ডানহাতে একটি পাত্র দেখা যাচ্ছে।

নারদ চরিত্রটি বাংলার মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। ‘শিবায়ন’ কাব্যে, ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে, নারদকে শিব- গৌরীর বিবাহের সম্বন্ধ করতে দেখা যায়। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে‘শিব বিবাহের মন্ত্রণা’ অংশে বলা হয়েছে-

“আকাশবাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ।
নারদেরে ডাকিয়া কহিলা হৃষীকেশ।।
ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও।
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও।।”[৬৭]

এরপর ‘শিব বিবাহের সম্বন্ধ’ অংশে বলা হয়েছে- “এরূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
উওরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া।।”[৬৮]

সাহিত্য এবং মন্দির শিল্পকে পাশাপাশি রেখে দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগীয় কাব্যধারায় নারদমুনি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিরাজমান হলেও মন্দিরগাত্রে তার কোন প্রভাব পড়েনি, তিনি মন্দিরের উপরের কিংবা স্তম্ভের মাঝে কোন গৌণ ফলকেই স্থান পেয়েছেন।

মন্দির ভাস্কর্যে পৌরাণিক দেবীকূলের চিত্রভাষ্য -

পৌরাণিক দেবতাদের নিয়ে আলোচনার পর, এইবার আমাদের আলোচনার বিষয় হল হিন্দু দেবীগণ। মন্দিরগাত্রে অলংকরণের ক্ষেত্রে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে উঠে আসা বিভিন্ন লৌকিক ও পৌরাণিক দেবীমূর্তির কতটা প্রতিফলন ঘটেছিল, এবার এই বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করা হবে।

বিভিন্ন দেবসত্তার নারীরূপই শক্তি। ব্যাপক অর্থে তাই সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি সকল স্ত্রী দেবতাই শক্তি দেবতা। কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুসারে, শিব শক্তি শিবানী এবং তাঁর রূপভেদ দুর্গা, কালী, চণ্ডী ও চামুন্ডা প্রভৃতি মহাশক্তি মহামায়া রূপে সুপ্রসিদ্ধা। এঁদের উদ্ভব বৈদিক যুগে প্রত্যক্ষ হয় না, এঁদের উদ্ভব পুরাণ তন্ত্রের যুগে।[৬৯] উত্তর বৈদিক সাহিত্যে দেবীনামের প্রসঙ্গ এলেও শক্তিপূজার কোন ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু মহাভারতের পরিশিষ্টে হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের আর্যাস্তব দেবী পরিচিতি এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদে ঊষা, অদিতি ও সরস্বতী স্ত্রীদেবতা হিসেবে প্রসিদ্ধা, কিন্তু এঁদেরকে নির্ভর করে শাক্তসাধনার ধারা বিকশিত হয়নি। শাক্তসাধনার ধর্মাচরণ বিকশিত হয়েছে অম্বিকা উমা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীকে কেন্দ্র করে, যাঁদের নাম উত্তর বৈদিক যুগে পাওয়া যায়।[৭০] মহাশক্তির যে বহু বিচিত্ররূপ পুরাণে, তন্ত্রে সুলভ, সেগুলির সমন্বয় কীভাবে এবং কোন সময় হয়েছে, তা সহজে বলা সম্ভব নয়। ঊষা, অদিতি, সরস্বতী এবং লক্ষ্মী একীভূতা হয়ে দানবদলনী জগদ্ধাত্রী রুদ্র শিব জায়া শিবানী চণ্ডী'তে পরিণত হয়েছেন। কিছু কিছু আর্যেতর সংস্কৃতির ছাপও পড়েছে দেবীর চরিত্রে এবং পূজার রীতিতে। দেবীর চরিত্রের ও রূপের পরিণতি ঋগ্বেদ থেকে ধীরে ধীরে যজুর্বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশের পথে পৌরাণিক যুগে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দেবী শিবজায়া রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দেবী চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমীকরণ ও দেবীর বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।[৭১]

পৌরাণিক যুগে মার্কন্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য খণ্ডটি ভারতবর্ষে শক্তিসাধনার প্রসারের ক্ষেত্রে একটি দিকচিহ্ন। এই পুরাণ অনুসারে দেবী চণ্ডী'র জন্ম হয়েছিল দেবতাদের তেজ থেকে মহিষাসুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে।[৭২] মহাভারতের বিরাট পর্বের অন্তর্গত দেবী স্তবে কালী, কপালী, চণ্ডী, কালান্তরবাসিনী প্রভৃতি দেবীর নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ কিন্তু দশমহাবিদ্যার সকলকেই বৌদ্ধতন্ত্রের উত্তরাধিকার রূপে পাওয়া অবরকালীন দেবতা বলে মনে করেছেন। মার্কন্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর প্রায় তিরিশ'টি টীকা পাওয়া যায়। চণ্ডীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শারদীয়া পূজার বিধান। চণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্বাদশতম শ্লোকে দেবীর উক্তি-

> "শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
> তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তি সমন্বিতন।।"

অর্থাৎ শরৎকালে যে বাৎসরিক দুর্গাপূজা হয়, তাতে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করলে মানুষ ধন- ধান্য ও পুত্র লাভ করবে। দেবী ভাগবতেও দুর্গাপূজা এবং বাসন্তী পূজায় চণ্ডীপাঠের ও দেবী ভাগবত পাঠের বিধান পাওয়া যায়।[৭৩] পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণে দুর্গার পারিবারিক ইতিবৃত্ত এবং মার্কন্ডেয় পুরাণে দেবীর দৈত্যনিধনের কাহিনি, পুরাণের এই দুই ধারা পরে কখনও একসঙ্গে জুড়ে গিয়েছে।[৭৪] বৈদিক যুগের বহু পূর্ব থেকেই ভারতে মাতৃপূজা বা দেবীপূজার প্রসার ছিল। সম্ভবত শিবলিঙ্গের নিম্নকার গৌরীপট্টে এবং নগ্না মূর্তিতে সিন্ধু সভ্যতার যুগে মাতৃপূজা হতো।[৭৫]

পৌরাণিক যুগে দেবীপূজার যে ধারাবাহিক ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল, তার প্রদর্শন হয়েছে বহুবিধ দেবীমূর্তির মধ্যে। সাহিত্যের পাশাপাশি দেবীমূর্তির প্রভাব মন্দিরগাত্রেও লক্ষ করা যায়। বর্তমানে মন্দির ভাস্কর্যে বিভিন্ন পৌরাণিক দেবীমূর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃশ্যাবলি ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

মন্দির ভাস্কর্যে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গামূর্তি প্রসঙ্গ -

বিভিন্ন পৌরাণিক দেবীমূর্তিগুলির মধ্যে মন্দিরগাত্রে সবথেকে আকর্ষণীয় ও প্রচলিত মূর্তি হল মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গামূর্তি। এই মূর্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দশভুজা। কোন কোন ক্ষেত্রবিশেষে অষ্টভুজা বা চতুর্ভুজা দুর্গা মূর্তিও লক্ষ করা যায়। দশভুজা দুর্গা মূর্তিই অধিক জনপ্রিয় হওয়ায়, মন্দিরগাত্রে এর সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তবে মন্দিরে দেবী বা অন্যান্য পৌরাণিক প্রসঙ্গ কৃষ্ণ বা রামকথার মতো আখ্যানের আকারে চিত্রিত হয়নি। অর্থাৎ নানা দেব- দেবীর কিছু ফলকের মধ্যে বৈচিত্র্যহীন ভাবে আবদ্ধ থেকে গেছেন, কাহিনিসূত্রে তাঁদের ধারাবাহিক চিত্রণ ঘটেনি। সপ্তদশ শতকে নির্মিত মন্দিরে কিছু শাক্তদেবী মূর্তি থাকলেও, অষ্টাদশ উনিশ শতকে এসে এঁদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

মহিষমর্দিনীর একটা চরম রূপশ্রী উদঘাটিত হয়েছে ভারতের নানা স্থানে চিত্রে ও বিগ্রহে। প্রত্যেক ভারতীয় দেবতা একটি অভিনব তত্ত্বকে প্রকট করে তোলে। শিবের নানা মূর্তি যেমন শিবতত্ত্বকে উদঘাটিত করে, তেমনি দশপ্রহরণধারিণীর রূপবৈচিত্র্য এক অখণ্ড তত্ত্বই উদ্ভাসিত করে। বহু বিচিত্র সৃষ্টিতে শ্রীদুর্গার প্রামান্য তত্ত্ব ও ঐশ্বর্য দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে। নীলকণ্ঠী মূর্তি, বিন্ধ্যবাসিনী মূর্তি, রিপুমারী মূর্তি, ক্ষেমঙ্করী মূর্তি, হরসিদ্ধি মূর্তি, রুদ্রাংশু মূর্তি, অগ্নিমূর্তি, জয়মূর্তি, নবদুর্গা মূর্তি প্রভৃতির বিকশিত প্রাচুর্যে আছে জাতীয় সাধনার অমূল্য সম্পদ ও বহুমুখী রস- শ্রী। বাংলার শ্রীদুর্গা দশভুজমন্ডিতা; দশটি মাংসজ হাতমাত্র এক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য নয়। দশদিক যেমন তাঁর ভুবনমোহিনী রূপে দীপ্ত হয় তেমনি রুদ্রস্পর্শেও শিহরিত হয়ে ওঠে। কালিকাপুরাণে আছে, আদি সৃষ্টিতে দেবী অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে এবং পরবর্তীযুগে দশভুজা দুর্গারূপে অবতীর্ণ হন। বাংলায় দশভুজাকেই বরণ করে নেওয়া হয়েছে। সমগ্র দেবতামণ্ডলীর তেজ আহরণ করে দেবী দশভুজার আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলার প্রতিমায় শ্রীদুর্গার চারিদিকে আছে সমগ্র দেবতাগণ, সে সব দেবীর'ই অংশ, দেবীর ছায়ায় দীপ্ত। বস্তুত বাংলায় শ্রীদুর্গা মূর্তি একটা দেব- প্রদর্শনীই রচনা করেছিল। যেখানে সকল দেবতারা এক মিলন যজ্ঞে এসে উপস্থিত হয়েছেন মহাশক্তির আকর্ষণে। বাংলায় এই বিশ্বজননির চারিদিকে এমনি করে দেবতাদেরও এক মিলনমেলা হয়। শরৎকালে বাংলার থেকে এসে নরনারীরা এই মিলন মহোৎসব সূচিত করেন। দেবলোক এবং নরলোক একাত্মক হয়ে যায় এই সময়। এই সৃষ্টিশক্তি বাঙালিজাতির কৌলীন্যকেই সূচিত করে; যতদিন এ রকমের শক্তি অব্যাহত থাকবে, বাঙালিজাতি ততদিন জগৎ থেকে বিলুপ্ত হবে না আশা করা যায়।[৭৬]

পুরাণ মতে দেবী দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র নিজেই বোধন ও আরাধনা করেছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'রাবণ- বধের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক অকাল বোধনের পরামর্শদান' অংশটিতে বলা হয়েছে-

"রাবণ-বধের জন্য বিধাতা তখন।
আর শ্রীরামের অনুগ্রহের কারণ।।
এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন।
অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন।।"[৭৭]

এরপর 'শ্রীরামচন্দ্রের অকাল দুর্গোৎসব' অংশটিতে বলা হয়েছে-

"চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব।
গীত-নাট্য করে, জয় দেয় কপি সব।।
প্রেমানন্দ নাচে আর দেবীগুণ গায়।
চণ্ডীর অর্চ্চনে দিবাকর অস্ত যায়।।
সায়াহ্ন কালেতে রাম করিল বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ার বিল্বাধিবসান।।
আপনি গড়িল রাম মুরতি মৃন্ময়ী।
হইতে সংগ্রামে দুষ্ট রাবণ-বিজয়ী।।"[৭৮]

মন্দির শিল্পীগণ হয়ত কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লঙ্কার রণক্ষেত্রে রামচন্দ্রের অকালবোধনের বিভিন্ন দৃশ্য মন্দিরগাত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। এমনই একটি অপূর্ব দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে, কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে বহিঃকৃত্রিমদ্বারের অলিন্দ শীর্ষে। রামচন্দ্র প্রসঙ্গে এই দৃশ্যটির উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। তবে

পূর্বোল্লেখিত বর্ণনার মধ্যে দেবী মহামায়ার কোন বিবরণ দেওয়া হয়নি। বর্তমানে দেবী মহামায়ার বিবরণ দেওয়া হল। দেবী মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী হয়ে দণ্ডায়মান। দশভুজা দেবীর বামহস্তগুলিতে ঢাল, ধনুক, এবং অসুরের কেশ আকর্ষণ করে রয়েছেন। দক্ষিণ হস্তগুলিতে তরোয়াল, ত্রিশূল, তির ইত্যাদি রয়েছে। দেবীর একটি পদ সিংহের উপর এবং অপর পদ মহিষাসুরের স্কন্ধে। মহিষাসুরের হাতে তরোয়াল রয়েছে। ইনি মহিষের গর্ভ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। তাঁর কণ্ঠ সর্প দ্বারা আবৃত। সিংহের সম্মুখের দুটি পা মহিষের মস্তকে স্থাপিত। দেবীর পরনে রয়েছে কোঁচা দেওয়া শাড়ি। টেরাকোটার ফলকে এমন ভাস্কর্যকে শিল্পী তাঁর নিখুঁত শিল্পকাজের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন, যে তা না দেখলে বিশ্বাস হয়না। বর্ধমান জেলার অন্য কোন মন্দিরে এইরকম দৃশ্য ফলক দেখা যায়নি।

সপরিবার দেবীদুর্গার মোটিফ বাংলার মানুষের কাছে অতি জনপ্রিয় এবং অতিপরিচিত। দেবী মহামায়ার দশভুজা রূপের পর এই সপরিবারে দুর্গার মূর্তিই বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়েছে। তাই মন্দির ভাস্কর্যেও এই মোটিফটি মন্দির শিল্পীগণ ব্যবহার করতে ভোলেননি। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে এই সপরিবার দেবীদুর্গার মোটিফটি লক্ষ করা যায়, তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বনপাস মিস্ত্রীপাড়ার অষ্টকোণাকৃতির মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দ্বিতীয় কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষাংশে সপরিবার মহিষাসুরমর্দিনী দেবীদুর্গার একটি অতিসুন্দর ভাস্কর্য রয়েছে। দেবীর বামপার্শ্বে স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান দেবী সরস্বতী এবং ময়ূর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট কার্তিক রয়েছেন। দেবীর দক্ষিণপার্শ্বে রয়েছেন স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান দেবী লক্ষ্মী এবং একটি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ গণেশ।

দুর্গাপুরের বীরভানপুর গ্রামের আচার্য পরিবারের দেউল মন্দির প্রাঙ্গণে যে পৃথক দেউল মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত, সেই মন্দিরের প্রবেশদ্বারের শীর্ষের ফলকে সপরিবার দেবীদুর্গা উপস্থিত রয়েছেন। ইনি মহিষাসুরমর্দিনী, সিংহবাহিনী এবং দশভুজা। দেবীর দু'পাশে লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক ও সরস্বতীর অবস্থান পূর্বোক্ত মন্দিরের সপরিবার দেবীদুর্গার ভাস্কর্যের অনুরূপ। বর্ধমান সদর মহকুমার সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির চত্বরের প্রবেশ পথের বামপার্শ্বের শিবমন্দিরটির বারান্দার মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের খিলানশীর্ষে সপরিবার দেবীদুর্গার ভাস্কর্য দৃশ্যায়িত হয়েছে।

মেমারী ২নং ব্লকের করন্দা গ্রামের পঞ্চরত্ন (প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত) মন্দিরটির দ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ ব্লকগুলির বামদিক থেকে পঞ্চম ব্লকে সপরিবার দুর্গামূর্তি পরিলক্ষিত হয়। এখানেও দেবী দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী রূপে আসীনা। বনকাটি গ্রামের রায় পরিবারের মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী দেউল মন্দিরটির দ্বারের শীর্ষে দেবী দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি ফলক রয়েছে।

কালনার লালজী মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত দ্বিতীয় অনুভূমিক সারিতে সপরিবার দেবীদুর্গার দৃশ্য লক্ষ করা যায় পৃথক পৃথক ফলকে। কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার বামদিক থেকে দ্বিতীয় অন্তঃদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভে ভিত্তিতলের উপর থেকে সজ্জিত তৃতীয় অনুভূমিক সারিতে পৃথক পৃথক ফলকে পূর্বে উল্লেখিত দৃশ্যের ন্যায় সপরিবার দুর্গামূর্তি লক্ষ করা যায়। কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের মুখ্যদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা দুর্গার একটি ভাস্কর্য রয়েছে। তবে বর্তমানে এটি ক্ষয় হয়ে গেছে, ফলে মূর্তিটির দেহাবয়ব ব্যতীত, আর কিছুই বোঝার উপক্রম নেই।

অর্থাৎ সপরিবার দুর্গা মূর্তির ফলক বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ হয়েছে। কোথাও দ্বারের শীর্ষে, কখনও স্তম্ভের গাত্রে আবার কখনও অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্যানেলের মাঝে। অষ্টাদশ-উনিশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে দেবীদুর্গা কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। বাংলার দুর্গাপূজাগুলিতে এখনও এ ধাঁচ ব্যবহৃত হয়। দুর্গার চিত্রায়ণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায়, মন্দিরের উপরের প্রশস্ত স্থানটি সপরিবার দুর্গার প্যানেলের জন্য ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এই মোটিফের পরিকল্পনাটি অর্বাচীন। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত কিছু ভাস্কর্যে দেবীকে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর সঙ্গে দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেখানে দেবী মহিষাসুরমর্দিনী নন। দুর্গার পারিবারিক বৃত্তান্ত ও অসুরদমন বৃত্তান্ত দুটি আলাদা পৌরাণিক উৎস থেকে উঠে এলেও, অবশেষে এই দুই বৃত্তান্ত মিলেমিশে দেবীদুর্গা হয়ে উঠেছেন বাঙালির ঘরের কন্যা।[৭৯]

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিবিধ মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে শক্তির বিবিধ রূপের সঙ্গে বাংলার মানুষের পরিচয় হয়েছে। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, দেবীদুর্গাকে নিয়ে বাংলার মানুষের ঝোঁক রয়েছে মধুর রসের দিকে। বাংলার প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দূর্গোৎসবকে পণ্ডিত মহলে বা উচ্চকোটির মহলে যতই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সঙ্গে যুক্ত করে অসুরনাশিনী দেবীর পূজাটিকে মহোৎসব করে তোলার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙালি জনগণ প্রতিমায় দেবীকে অসুরনাশিনী মূর্তিতেই দেখেন- কিন্তু তারপরেই স্থির নিশ্চিত রূপে জানেন যে, আসলে উমা মায়ের স্বামীগৃহ কৈলাস ত্যাগ করে বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে পুত্রকন্যাদি সহ বাপের বাড়ি আগমন করে, তিনদিনের বাপের বাড়ির উৎসব আনন্দ করেই আবার চোখের জলে বিজয়া দশমীতে স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সত্যকে অবলম্বন করেই আমাদের 'আগমনী- বিজয়া' সঙ্গীতের উদ্ভব। দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালিতে বললেন, মেনকা দশভুজা রণরঙ্গিণী দেবীকে কন্যা বলে গ্রহণ করতে চাইলেন না, মা স্পষ্টই বললেন-

"কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী!
সঙ্গে তব অঙ্গণে, কে এল রণরঙ্গিণী?"[৮০]

বাংলার শাক্ত সাহিত্যে কালী প্রসঙ্গ থাকলেও কিন্তু তার জনপ্রিয়তার কারণ পার্বতীর পারিবারিক জীবন- আগমনী বিজয়ার গান। মন্দিরগাত্রে দাম্পত্য সাধারণত চিহ্নিত হয়েছে শিবের সঙ্গে গণেশ জননির যুগলমূর্তি, শিশু গণেশ ক্রোড়ে মাতা পার্বতী ইত্যাদি মূর্তি ফলকগুলির মাধ্যমে। গণেশ'কে ক্রোড়ে নিয়ে শিব- পার্বতীর যুগলমূর্তির উল্লেখ পূর্বেই গণেশ প্রসঙ্গে করা হয়েছে। শুধুমাত্র গণেশ'কে ক্রোড়ে নিয়ে মাতা পার্বতীর একটি দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের বামপার্শ্বের দেউল মন্দিরটিতে। মন্দিরটির মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকের ঊর্দ্ধে উৎকীর্ণ একটি পৃথক ফলকে।

সপ্তদশ থেকে উনিশ শতক জুড়ে বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে অলংকরণের ক্ষেত্রে দেবীদুর্গা ও তাঁর পুত্রকন্যাদের বিন্যাস লক্ষ করা যায়। আবার পুত্রকন্যা বর্জিত দুর্গার চিরকালীন মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিও লক্ষ করা যায়। যেমন, শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের দেউল মন্দিরটির বামপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে পুত্রকন্যা বর্জিত দেবীদুর্গার মূর্তি ফলক রয়েছে। এখানে দেবী ত্রিনয়না এবং দশভুজা। হস্তগুলিতে আয়ুধ রয়েছে। তবে প্রত্যেকটি আয়ুধ শিল্পী স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। দেবীর দক্ষিণহস্ত গুলিতে ত্রিশূল, খড়্গ, বজ্র, তির ইত্যাদি আয়ুধ এবং বামহস্ত গুলিতে পাশ, অঙ্কুশ, ধনুক ইত্যাদি আয়ুধ রয়েছে। দেবী ত্রিশূল দ্বারা মহিষাসুর'কে বধ করছেন। মহিষাসুরের দক্ষিণহস্তে তরোয়াল এবং বামহস্তে রয়েছে ঢাল। দেবী সিংহবাহিনী। সিংহটি দেবীর পদতলে বিরাজমান।

মন্দির ভাস্কর্যে দশমহাবিদ্যা প্রসঙ্গ -

দেবী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা ব্যতীত পৌরাণিক যুগে নানা নামের এবং নানা রূপের বিচিত্র দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তন্ত্রের প্রভাবে দেবী কল্পনায় এসেছে বৈচিত্র্য। দক্ষকন্যা সতীর আখ্যানের সঙ্গে শক্তিপীঠের আখ্যানটি যুক্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু কাহিনিটি প্রচলিত হয়েছিল অনেক পরে।

বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল দশমহাবিদ্যা। শক্তিদেবতার বহুবিধ মূর্তির মধ্যে দশমহাবিদ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কোন কোন অর্বাচীন পুরাণে ও তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্ভব সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। দক্ষযক্ষ যজ্ঞে শিব- সতী নিমন্ত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও, পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছায় পতির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হলে, শিবের অনুমতি আদায়ের উদ্দেশ্যে সতী শিবকে দশটি ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়েছিলেন। দেবীর এই দশটি রূপ যথাক্রমে, কালী; তারা; ষোড়শী; ভুবনেশ্বরী; ভৈরবী; ছিন্নমস্তা; ধূমাবতী; বগলা; মাতঙ্গী; কমলা; যেগুলি একত্রে দশমহাবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ।[৮১]

মধ্যযুগেই এই দশমহাবিদ্যার ধারণা তৈরি হয়। মুণ্ডমালাতন্ত্র ও চামুন্ডাতন্ত্রে মহাবিদ্যাদের দশাবতার ধারণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু প্রকৃতি রূপে এবং শিব পুরুষ রূপে কল্পিত হয়েছেন। আর বিষ্ণুরূপ প্রকৃতির দশটি ভেদ তার দশাবতার। যেমন- কালী কৃষ্ণরূপা, তারা রাম, বগলা কূর্ম, ধূমাবতী মীন, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভৈরবী বরাহ, ষোড়শী পরশুরাম, ভুবনেশ্বরী বামন, কমলা বুদ্ধ, মাতঙ্গী কল্কি। সপ্তদশ শতকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার গ্রন্থে দ্বাদশমহাবিদ্যার স্তব আছে।[৮২]

মধ্যযুগের শেষপর্বে রচিত ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যগ্রন্থে ‘সতীর দক্ষালয়ে গমনোদযোগ’ অংশে দশমহাবিদ্যার প্রত্যেকটি রূপের বর্ণনা রয়েছে।

মধ্যযুগে যখন দশমহাবিদ্যার কল্পনা হয়েছে, তখন পাথরের মূর্তি শুধুমাত্র মন্দিরের ইষ্টদেবতা হিসেবে নির্মিত হতো। পরবর্তী সময়ে এর রূপায়ণ ঘটেছে মন্দিরগাত্রের অলংকরণে। বর্ধমান জেলার মন্দির গুলিতে দশমহাবিদ্যার প্রভাব লক্ষণীয়। এখানে কয়েকটি মন্দিরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

কাটোয়ার শ্রীবাটির পঞ্চরত্ন শঙ্কর মন্দিরটির গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে বামদিক থেকে লক্ষ করলে তৃতীয় উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দশম ফলকে চৌকো ব্লকের মধ্যে ষোড়শী মহাবিদ্যার মূর্তি লক্ষ করা যায়। চতুর্ভুজা দেবী ষোড়শী উদয় হয়েছেন শিবের নাভিপদ্ম থেকে। হস্তগুলি আয়ুধ বিহীন। দেবীর পরনে কাপড় এবং দেহ অলংকার ভূষিত। দেবী শায়িত শিবের উপর কমলাসনে আসীন। উক্ত প্যানেলের তলদেশ থেকে প্রথম ফলকে হংস পৃষ্ঠে আসীনা দেবী বগলার একটি মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। এই দেবীর দক্ষিণহস্তে তরোয়াল রয়েছে। উক্ত মন্দির চত্বরের বামপার্শ্বে অবস্থিত দেউল শিব মন্দিরটির গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে বামদিক থেকে লক্ষ করলে দ্বিতীয় উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে ষষ্ঠ ফলকে দেবী ষোড়শীর মূর্তি লক্ষ করা যায়। স্থান সংক্ষেপের জন্য মূর্তিটির আসনধারী দেবতারা ছিন্নমুণ্ডমাত্র হয়ে বিরাজ করছেন। দেবী ষোড়শীকে শ্রীবিদ্যা’ও বলা হয়। তাঁর আসন ধারণ করে থাকেন বিষ্ণু মহেশ রুদ্র ও ব্রহ্মা। দুর্বাশা মুনি তাঁর পরম সাধক ছিলেন। পূর্বোক্ত প্যানেলের পঞ্চম ফলকে রয়েছেন চতুর্ভুজ কালী। ইনি শায়িত শিবের উপর দণ্ডায়মান। তাঁর ঊর্ধ্ব বামহস্তে তরোয়াল আর দু’পাশে রয়েছে তরোয়ালধারী অসুর।

উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণের শঙ্কর মন্দিরটির গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকটিতে দেবী কমলার মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। জোড়া হস্তীমুন্ডের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজা দেবী কমলা। এরপর ষষ্ঠ ফলকে শায়িত শিবের উপর দণ্ডায়মান দেবী চতুর্ভুজা কালীর মূর্তি লক্ষ করা যায়।

দশমহাবিদ্যার দেবী কমলার আর একটি সুন্দর মূর্তি লক্ষ করা যায়, কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরগাত্রে। এই মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের প্রথম অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে লক্ষ করা যায়, জোড়া হস্তীমুন্ডের উপর উপবিষ্ট চতুর্ভুজা দেবী কমলা দু’হাতে আরও দুটি হস্তীর শুড় ধরে রয়েছেন। দেবীর শিরে মুকুট ও কণ্ঠে মালা রয়েছে এবং পরনে রয়েছে কাপড়।

দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন দেবী তারা। ইনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সিদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে সজ্জিত বামদিক থেকে প্রথম উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে চতুর্থ ফলকে শবরূপী শিবের উপর প্রত্যালীঢ় মুদ্রায় দণ্ডায়মান চতুর্ভুজা দেবী তারা। ঊর্ধ্বের বামহস্তে তরোয়াল এবং নিম্নহস্তে ঢাল রয়েছে। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে কোন আয়ুধ নেই। দেবী দিগম্বরী, ত্রিনেত্রা এবং উন্মুক্ত কেশিনী। কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির সংলগ্ন বারান্দার পূর্বমুখী প্রবেশদ্বার লাগোয়া স্তম্ভের তলদেশ থেকে চতুর্থ ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে শবরূপী শিবের উপর প্রত্যালীঢ় মুদ্রায় দণ্ডায়মান দেবী চতুর্ভুজা কালী। তাঁর নিম্নের বামহস্তে রয়েছে অসুর মুণ্ড।

বনকাটি গ্রামের রায় পরিবারের মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ পথের বামদিকে অবস্থিত প্রথম দেউল মন্দিরটির গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের শীর্ষে শায়িত শিবের উপর দণ্ডায়মান দিগম্বরী চতুর্ভুজা কালী মূর্তির ফলক লক্ষ করা যায়। দেবীর ঊর্ধ্ব বামহস্তে রয়েছে তরোয়াল এবং নিম্নের বামহস্তে রয়েছে অসুরের ছিন্নমুণ্ড। দক্ষিণহস্তদ্বয়ে কোন আয়ুধ নেই। ঊর্ধ্ব দক্ষিণ হস্ত অভয় মুদ্রায় রয়েছে। কণ্ঠে মুণ্ডমালা শোভা পাচ্ছে এবং তাঁর দু’পাশে তরোয়াল হস্তে ডাকিনী ও যোগীনী দণ্ডায়মান রয়েছে। এরপর প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় দেউল মন্দিরটির দ্বারের শীর্ষে দেবী ষোড়শীর অবস্থান লক্ষ করা যায়। দেবী মহাদেবের নাভিপদ্ম দ্বারা উদয় হয়ে, পদ্মাসনে উপবিষ্ট। চতুর্ভুজা দেবীর কণ্ঠে মুণ্ডমালা, মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল রয়েছে। বামহস্ত যুগলে রয়েছে খড়্গ এবং অসুরের ছিন্নমুণ্ড। দক্ষিণহস্ত অভয় মুদ্রায় রয়েছে।

বনকাটি গ্রামের গোপালেশ্বর মন্দিরে প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দ্বিতীয় কৃত্রিম দ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে দেবী ছিন্নমস্তা, দ্বিতীয় ফলকে দেবী ষোড়শী, তৃতীয় ফলকে দেবী কমলা, চতুর্থ ফলকে দেবী বগলা এবং ষষ্ঠ ফলকে দেবী কালীর মূর্তি লক্ষ করা যায়। দেবী ছিন্নমস্তা তাঁর নিজ মুণ্ডটি বামহস্তে ধারণ করে রয়েছেন, এবং তাঁর দক্ষিণহস্তে একটি খড়্গ রয়েছে। দেবীর দু'পাশে দু'জন সখী জয়া ও বিজয়া দণ্ডায়মান। দেবীর মস্তকের কাটা স্থানটি থেকে তিনধারায় রক্তপ্রবাহ হচ্ছে। পরবর্তী ফলকে চতুর্ভুজা দেবী ষোড়শী শায়িত মহাদেবের নাভিপদ্ম থেকে উদয় হয়েছেন। এখানে আসনধারী দেবতাগণ শায়িত শিবের নিম্নাংশে উপবিষ্ট রয়েছেন। পরবর্তী ফলকটিতে দেবী কমলা জোড়া গজপৃষ্ঠে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। এর পরবর্তী ফলকে কমলাসনে উপবিষ্ট ষড়ভুজা দেবী বগলা। দেবীর কোন হস্তেই আয়ুধ নেই। ষষ্ঠ ফলকে রয়েছেন দেবী কালী। শায়িত শিবের বক্ষে দণ্ডায়মান দেবীর বামহস্তে রয়েছে খড়্গ। এই মূর্তিটি ক্ষয় হয়ে অস্বচ্ছ হয়ে গেছে।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সম্মুখস্থিত বামপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় অনুভূমিক সারির বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে জোড়া গজপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দেবী কমলার মূর্তি লক্ষ করা যায়। প্রতাপেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে বহিঃদ্বারের শীর্ষে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত চৌকো ব্লকের বামদিক থেকে দেখলে সপ্তম ফলকে ষোড়শী মূর্তি দেখা যায়। স্থান সংরক্ষণের জন্য এখানে আসন ধারণকারী দেবতাদের লক্ষ করা যায় না।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালের উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে ত্রয়োদশ ফলকে দেবী কমলার মূর্তি লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে দেওয়ালে উৎকীর্ণ পঞ্চম কৃত্রিমদ্বারের বামপার্শ্বের উল্লম্ব সারির তলদেশ থেকে চতুর্দশ ফলকে ষোড়শী মূর্তি রয়েছে। উক্ত মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালের তৃতীয় কৃত্রিমদ্বারের বামপার্শ্বে সজ্জিত উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে ষোড়শতম ফলকে শায়িত শিবের উপর দণ্ডায়মান উন্মুক্ত কেশ বিশিষ্ট দেবী তারা'র মূর্তি রয়েছে। বনপাসের রায় পরিবারের শিব মন্দির প্রাঙ্গণের বামদিক থেকে তৃতীয় দেউল মন্দিরটির দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে অষ্টম ফলকে দেবী কমলার মূর্তি রয়েছে। দেবী জোড়া হস্তীর মস্তকে উপবিষ্ট এবং দেবীর দু'পাশে দুটি হস্তী দণ্ডায়মান।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে দশমহাবিদ্যার প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে রয়েছে। কোন মন্দিরে অনেকগুলি মহাবিদ্যার মূর্তি, আবার কোন মন্দিরে একটি করে মূর্তি ফলক দেখা যায়। দশমহাবিদ্যার বিভিন্ন রূপের মধ্যে দেবী ষোড়শী, দেবী কালী, দেবী কমলা'র মূর্তির প্রতিফলনই মন্দিরগাত্রে অধিকমাত্রায় দেখা যায়। দেবী কমলাকে ভারতচন্দ্র গজলক্ষ্মী হিসেবে প্রতিস্থাপন করেছেন। সমুদ্রমন্থনে উত্থিত লক্ষ্মীকে স্নান করিয়ে অভিষিক্ত করে দেয় চারটি হস্তী। গজলক্ষ্মী'র এই মূর্তি সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যে বহুল প্রচলিত। এই গজলক্ষ্মী মূর্তি বাংলার মন্দিরে এসেছে দশমহাবিদ্যা সিরিজের মধ্যেই।[৮৩]

মন্দিরগাত্রে এই সকল দেবীর আধিক্য দেখে মনে হয়, বর্ধমান তন্ত্রসাধনার কেন্দ্র বলেই হয়তো এমন হয়েছে। বৈষ্ণব ও শৈব, উভয় ধর্মেরই ভিত্তি তন্ত্র।[৮৪] তন্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ তান্ত্রিক গ্রন্থই মধ্য ও শেষ মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল। তবে এই গ্রন্থগুলিতে প্রচুর বাড়তি ব্রাহ্মণ্য ও বৈদিক উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যার ফলে তন্ত্রের মূল বক্তব্যসমূহ বিপর্যস্ত হয়েছে।[৮৫] বৈষ্ণব ধর্মের একটা প্রাচীন, তান্ত্রিকতা মিশ্রিত স্তর ছিল। সহজিয়া কবি চণ্ডীদাস এই স্তরের বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্মান্দোলনের ফলে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে যায়; এক সময় বণিক ও বৈশ্যরা তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু পরে তাঁরা বৈষ্ণব হলেন, তার ফলে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বৌদ্ধ নেড়া- নেড়ীদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যতই জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেন, ততই এসব বৈষ্ণব 'উপসম্প্রদায়'গুলি তৈরি হতে থাকল। এইসব সম্প্রদায়ের মূলকথা ছিল গুরুপূজা।[৮৬]

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকেই বঙ্গদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক অনুপ্রবেশের ফলে যে গুণগত রূপান্তর হয়, তার ফলে দুটি বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতির উদ্ভব হয়- মন্ত্রযান ও পরিমিতযান। মন্ত্রযান হচ্ছে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক স্তর যেখানে মন্ত্র, ধারণা, মুদ্রা, মণ্ডল, অভিষেক প্রভৃতির প্রচলন ঘটে। বজ্রযান মন্ত্রযানেরই বিবর্তিত রূপ। সেখানে শূণ্যতার স্থানে বজ্র শব্দটির ব্যবহার হয়।[৮৭] অধিকাংশ পণ্ডিত এই বিষয়ে একমত যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম কৌলধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হতে হতে তার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে বৌদ্ধধর্মের আর কোন বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে যেমন- সহজিয়া, অবধূত, নাথ, বাউল প্রভৃতি এইসব নব উদ্ভূত সম্প্রদায়গুলির প্রভাব বর্ধমান জেলায় একেবারে পড়েনি, তা বলা যায় না। কারণ পূর্বেই, কবি বড়ুচণ্ডীদাসের কথা বলা হয়েছে। সুকুমার সেন বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম নিবাসী কবীন্দ্র চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে চণ্ডীদাসের আদি বাসভূমি যদি বীরভূম জেলার নানুরে হয়ে থাকে, তাহলে সেখান থেকে বর্ধমানের কেতুগ্রামের দূরত্ব অধিক নয়। রামী চণ্ডীদাসের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সহজিয়া ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন অনেকেই লক্ষ করেছিলেন। নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত যারা ছিলেন, তারা যোগে বিশ্বাস করতেন। কালক্রমে তারা 'যুগী' নামে পরিচিত হন। তবে বর্ধমান জেলায় 'যুগী' সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল কিনা, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। যাই হোক, বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের অশেষ রূপে যেসব ধর্মবিশ্বাস এসেছিল, তার প্রভাব বর্ধমান জেলাতেও অল্পাধিক পরিমাণে থাকা সম্ভব।[৮৮]

মন্দির ভাস্কর্যে দেবী জগদ্ধাত্রী ও অন্যান্য দেবী প্রসঙ্গ -

মন্দিরগাত্রে দশমহাবিদ্যার দেবীমূর্তি ব্যতীত অন্যান্য দেবীমূর্তির ফলকও লক্ষ করা যায়। যেমন জগদ্ধাত্রী দেবী, গঙ্গা দেবী, সরস্বতী দেবী প্রভৃতি। উক্ত দেবীমূর্তিগুলির মধ্যে জগদ্ধাত্রী দেবী মূর্তির প্রাচুর্য মন্দিরগাত্রে অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্গে জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা প্রচলনের জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষ্ণচন্দ্রের পূজা প্রচলন সংক্রান্ত একটি কিংবদন্তি রয়েছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদ থেকে দুর্গাপূজার দশমীর দিন জলপথে কৃষ্ণনগর ফিরছিলেন। সেই বছর দেবীর পূজা করতে না পারার জন্য মনোকষ্টে পীড়িত রাজা কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে দুর্গারই আর এক রূপ জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা পালনের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন।[৮৯] এই কিংবদন্তি সত্য হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন একসময়ে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন হয়েছিল। প্রায় দু'শত বৎসর পূর্বে লিখিত রঘুনন্দনের 'কালবিবেক' গ্রন্থে কার্তিক মাসে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ রয়েছে। শূলপাণির পরবর্তীকালে রচিত স্মৃতিসাগরে কার্তিক মাসে উমাপূজার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

জগদ্ধাত্রী পূজা দুর্গাপূজার'ই সংক্ষিপ্তরূপ। দেবীমূর্তি দুর্গা প্রতিমার আদলেই নির্মিত। পার্থক্য হল, দেবীমূর্তির পাশে কোন সন্তান নেই, মহিষাসুর নেই এবং দেবীর দু'পাশে জয়া ও বিজয়া বর্তমান এবং দেবী এই প্রতিমায় দশভুজার পরিবর্তে চতুর্ভুজা। দেবীর বাহন সিংহের পদতলে একটি হস্তীমুণ্ড থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস যে, এই দেবী করীন্দ্রাসুরকে বধ করেছিলেন।[৯০]

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে জগদ্ধাত্রী বা সিংহবাহিনীর মন্দির রয়েছে। কালনা ২নং ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রামে রাসতলায় রাসমঞ্চের উল্টোদিকে প্রায় দুশ বছর ধরে পারিবারিক জগদ্ধাত্রী (বর্তমানে বারোয়ারি) পূজা হয়ে আসছে। বর্ধমান সদর (দক্ষিণ) মহকুমায় অবস্থিত মেমারী ২নং ব্লকের সাতগাছিয়া গ্রামের দে'পাড়ার সিংহবাহিনীর মন্দিরটি প্রায় তিনশ বছরের পুরনো। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সিংহবাহিনী দেবী জগদ্ধাত্রীর মন্দির রয়েছে। এই জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তির রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাক।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত রাধাকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর ফিগারেটিভ প্যানেলটির বামদিক থেকে একটি পৃথক ফলকের পর চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি লক্ষ করা যায়। কাটোয়ার শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের বামদিকের দেউল মন্দিরটির পশ্চাৎ দেওয়ালে কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে জোড়া সিংহ পৃষ্ঠে পদ্মাসন ভঙ্গিতে আসীনা দেবী। ইনি ষড়ভুজা এবং ত্রিনয়নী। দেবীর বামহস্ত যুগলে কমল রয়েছে এবং দক্ষিণহস্তের একটি ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। বাকি হস্তদ্বয়ে রয়েছে ঘণ্টা এবং কুঠার। উক্ত মন্দিরের প্রবেশদ্বারের

দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে দেখলে উল্লম্ব ভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় গ্রন্থি খাঁদের প্যানেলের তলদেশের ফলকটিতে দেবী জোড়া সিংহের উপর উপবিষ্ট এবং দু'পাশে জয়া বিজয়া দণ্ডায়মান।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউল মন্দিরে গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দ্বিতীয় কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বাদশ ফলকে সিংহপৃষ্ঠে আসীন চতুর্ভুজা দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তি লক্ষ করা যায়। জগদ্ধাত্রী মূর্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জোড়া সিংহের উপর আসীনা। সম্ভবত কলোনিয়াল স্থাপত্যে ব্রিটিশ সিংহের প্রভাবে জগদ্ধাত্রীর রূপান্তর ঘটেছে।

মন্দিরগাত্রে মকরবাহিনী গঙ্গার মূর্তিও লক্ষ করা যায়। তবে সংখ্যায়, পূর্বে উল্লেখিত দেবীমূর্তির তুলনায় নগণ্য। মকরবাহন গঙ্গার একটি আকর্ষণীয় মূর্তি ফলক লক্ষ করা যায় দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরে। মন্দির লাগোয়া উন্মুক্ত বারান্দার প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের একেবারে শীর্ষে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে চতুর্ভুজা দেবী গঙ্গা মকরের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। কাটোয়ার শ্রীবাটি গ্রামের মন্দির প্রাঙ্গণের বামপার্শ্বের দেউল মন্দিরটির গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় উল্লম্ব সারির তলদেশ থেকে প্রথম ফলকে মকর পৃষ্ঠে দেবী গঙ্গা আসীনা রয়েছেন। প্রথম ফলকে দেবীর সম্মুখে ভক্ত করজোড়ে প্রণামরত। কালনার বৈদ্যপুর গ্রামের রাস্তার পাশে জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে চালা মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত দ্বিতীয় অনুভূমিক সারির ডানদিক থেকে লক্ষ করলে তৃতীয় ফলকে মকরপৃষ্ঠে আসীনা দেবী গঙ্গার মূর্তি ফলক রয়েছে।

অবশেষে বলা যায়, যখন বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইঁটের মন্দির তৈরি হয়েছিল, তখন সমাজজীবন মন্থরগতিতেই প্রবাহিত হতো। শুদ্ধজ্ঞানের চর্চা থাকলেও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের সরস ভাবোদ্দীপক কাহিনিগুলি কথক ঠাকুরদের মধ্যস্থতায় অনেক পরিমাণে ভাবে-ইঙ্গিতে, উপমা-অলংকারে জনতাকে প্রভাবিত করেছিল, যার প্রমাণ মন্দির ভাস্কর্যে লক্ষণীয়।[৭১]

বর্ধমান জেলার মন্দিরগুলির সমীক্ষা করে দেখা যায় যে, মন্দির ভাস্কর্যে পৌরাণিক দেব-দেবীদের মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়েছে এবং তাঁরাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল মধ্যযুগীয় সমাজে লৌকিক দেব-দেবী, যেমন- মনসা, চণ্ডী, বাসুলী, ধর্মঠাকুর, শীতলা, ষষ্ঠী, যক্ষ ইত্যাদি প্রচুর দেবতাদের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, মন্দিরগাত্রে কোথাও এঁদের গৌণ স্থানেও লক্ষ করা যায়নি। সর্বক্ষেত্রে পৌরাণিক দেব-দেবীদেরই জয়জয়কার হয়েছে।

(২) মন্দির ভাস্কর্যে সমকালীন সামাজিক ভাষ্যের চিত্রিত রূপ :

মন্দির অলংকরণে পৌরাণিক দৃশ্যাবলি সংক্রান্ত একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনার পর আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তু হল 'মন্দির ভাস্কর্যে সমকালীন সামাজিক ভাষ্যের চিত্রিত রূপ'।

সপ্তদশ শতকের পূর্বে নির্মিত মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক মোটিফের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। ঊনবিংশ শতকের মধ্যে নির্মিত মন্দিরগুলিতে পুরাণের প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে ক্রমশ সামাজিক মোটিফের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে; অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের মন্দিরগুলিতে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত অনুভূমিক সারিতে অভিজাত সম্প্রদায়েরই জীবনযাত্রার চিত্র দেখা যায়, কিন্তু পরবর্তী সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলিতে চিত্রগুলি শুধুমাত্র অভিজাত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকগুলিও চিত্রিত হতে শুরু করেছিল। যেগুলি দেখে তৎকালীন সমাজের আর্থসামাজিক রূপের একটি ধারণা পাওয়া যায়।

বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন সময়ে নির্মিত টেরাকোটার কারুকার্য সমৃদ্ধ মন্দিরগুলিতে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি স্বল্পাধিক পরিমাণে রূপায়িত হয়েছে, সেগুলি হল- অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাসবহুল জীবনচিত্র, দেশি ও বিদেশি মানুষের বৃত্তি, অবসরকালীন কার্যকলাপ, প্রসাধন, পোশাক, অলংকার, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, গীতিবাদ্য, নৃত্যচর্চা, যুদ্ধদৃশ্য, বিদেশি বণিক ইত্যাদি। এছাড়া মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ও বাসস্থানের দৃশ্যও চিত্রায়িত হয়েছে। পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যে মিশ্রজীব, উপদেবতা, ফ্লোরা-ফনা (উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ) এবং দু'একটি প্রতীকী নিদর্শন লক্ষ করা যায়। এগুলি অধিকাংশই মন্দিরগাত্রের সৌন্দর্য

বৃদ্ধিতে এবং মুখ্য বিষয়গুলিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। কিছু কিছু মন্দিরে স্বল্প সংখ্যক মিথুন দৃশ্যও চিত্রায়িত হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, মন্দির ভাস্কর্যে নারী'কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে। তাই আমাদের আলোচনায় 'নারী' বা 'রমণী' বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তবে 'মন্দির ভাস্কর্যে সমকালীন সামাজিক ভাষ্যের চিত্রিত রূপ' বিষয়টি আলোচনার পূর্বে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এমন কয়েকটি বিষয় নিয়ে এই পর্বে আলোচনা করা হবে, যে বিষয়গুলি পৌরাণিক ও সামাজিক দুই বিভাগেই বিদ্যমান; তাই পৃথকভাবে আলোচনার পরিবর্তে সামাজিক বিভাগেই সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলি হল- বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, অলংকার, অস্ত্র সহযোগে যুদ্ধদৃশ্য বর্ণনা, যানবাহন ইত্যাদি।

মন্দির ভাস্কর্যে অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা প্রসঙ্গ -

প্রথমেই মন্দিরগাত্রের অলংকরণে অভিজাত সমাজের জীবনযাপনের উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। মন্দিরগাত্রে সবথেকে বেশি সংখ্যক ফলক নির্মিত হয়েছে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রাকে স্মরণে রেখে। তাই বিভিন্ন মন্দিরে উক্ত বিষয়ে নির্মিত ফলকগুলির বর্ণনা দেওয়ার পূর্বে তৎকালীন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

নবাব আমলে মুর্শিদকুলি খাঁ'র সময় ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। পুরনো মুসলমান ইজারাদার'রা রাজস্বের অনেকখানি আত্মসাৎ করে নিয়েছে দেখে, মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দুদের মধ্যে থেকেই প্রচুর ইজারাদার রাজস্ব আদায় করার জন্য নিযুক্ত করলেন। এই হিন্দু ইজারাদার'রা বাংলার এক নতুন হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্ম দিলেন, যারা নবাবের কাছ থেকে রাজা বা মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নিয়মের ফলে আঠারো শতকে এসে এই সমস্ত ইজারাদার'দের বংশধর'রা উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদার বলে গণ্য হলেন।[৯২] বর্ধমান রাজাদের পূর্বপুরুষ পাঞ্জাব থেকে এসে বর্ধমান শহরের নিকটস্থ বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে বাস করতে শুরু করেছিলেন, ১৫৯৮খ্রিঃ থেকে। তিনি এসেছিলেন একজন মহাজন বা কুসীদজীবী হিসেবে, মোগলদের হাত ধরে। তখন রাজস্থান, পাঞ্জাব, গুজরাট থেকে অনেকেই বঙ্গদেশে আসত শুধুমাত্র এই কারণেই। তারা মোগলদের ঋণ দিত এবং তার বিনিময়ে তাদের সুবিধামত স্থানে জমিদারি নিত। এই সূত্রেই সঙ্গম রায়ের পৌত্র, আর আবু রায় সুবাদার যুবরাজ মুহম্মদ সুজার দ্বারা বর্ধমানের চৌধুরী নিযুক্ত হন ১৬৫৭খ্রিঃ। বর্ধমান রাজাদের ভূমিকাও তাই ছিল। তবে তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ধর্মপ্রাণ উদারব্যক্তি জেলার উন্নতি সাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। বসতি নির্মাণ তথা নতুন নতুন গ্রাম পত্তনের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন বর্ধমানের চৌধুরী অর্থাৎ জমিদার ও রাজারা।

বঙ্গের শাসক ও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের কোন সম্পর্ক থাকতো না, রাজস্ব বা কর সংক্রান্ত ব্যাপার ব্যতীত। মোগল শাসনের পূর্বে এখানে স্বাধীন শাসন বর্তমান থাকায় জনসাধারণ সুখেই দিনযাপন করতেন। কিন্তু মোগল শাসনে সর্বপ্রথম তারা নতুন শাসনতন্ত্রের আওতায় পড়ে সরকারি রাজস্ব আদায়কারীদের অন্যায় ও জোরজুলুমের শিকার হয়।[৯৩] কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর বেদনাতুর চোখে সমকালীন সমাজব্যবস্থার যে রূঢ়তা দেখেছিলেন, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পশুগণের গোহারি অংশে তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে দেশের সামগ্রিক জীবনযাত্রা এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সমাজে যারা রাজা জমিদার প্রভৃতির বদান্যতার ফলে বৃত্তি ভোগাদি দ্বারা জীবননির্বাহ করতেন, তাঁদেরও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য কৃষিকর্মের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কবি রামেশ্বর, তাঁর রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবি তখনকার রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার সকল খুঁটিনাটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁর কাব্যে।

শক্তিহীন কেন্দ্রীয় শাসন শক্তির ফলে রাষ্ট্রও দুর্বল হয়ে পড়ে, তার সঙ্গে চলতে থাকে রাজকর্মচারীদের যথেচ্ছাচার এবং পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিদেশি বণিকদের লোলুপতা। বঙ্গদেশের রাষ্ট্রজীবনে, সমাজজীবনে এই ত্রিবিধ অভিশাপ মানুষকে আশাহীন, আকাঙ্খাহীন; কিছুটা জড় শক্তিতে পরিণত করেছিল। ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনে সমাজজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব এসে পড়ে। পুরাতন জমিদারদের পরিবর্তে নবপ্রতিষ্ঠিত ইজারাদারগণ অর্থের জন্য শুধুমাত্র কৃষির উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভশীল হয়ে পড়ল। ফলে সাধারণ রায়তের জীবনে

দুর্ভাগ্যের বোঝা নেমে এল এবং নবভূস্বামীগণ মোগল বিলাসব্যসনকেই জীবনের আদর্শ ধরে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অধঃপতনের স্রোতে বাহিত হল।[৯৪] বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যে বলেছেন, যে ধনীদের কোন উচ্চআদর্শ ছিলনা, তারা কেবলমাত্র বিলাসব্যসনে অর্থব্যয় করতেন।

"পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন।।
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।"[৯৫]

এই বক্তব্যের মধ্যে থেকে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বর্ধমানের স্থানীয় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অধিকাংশ শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব দেব-দেবীদের দেবালয় ও মূর্তি নির্মিত হয়েছিল, যার মধ্যে অভিজাত সম্প্রদায়ের নানা বিলাসব্যসনের চিত্র এবং তাদের জীবনযাত্রার পাশাপাশি রাজস্ব আদায়কারীদের অত্যাচারের দৃশ্য, নবাব এবং হিন্দুরাজাদের জীবনযাত্রা, সমানভাবে মন্দিরগাত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীরা। যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল-

কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে বামদিকের শিবমন্দিরটির গাত্রে পূর্বোক্ত দু'রকম দৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরটির সম্মুখে ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দার মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, ছত্রধারী নবাব একটি আসনের উপর দুটি পায়ের হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট। তার সম্মুখে রাখা হুকোর নলটি ডানহাত দিয়ে ধরে রয়েছেন এবং তার সম্মুখে রয়েছে ঢোলবাজনরত ও নৃত্যরত নারীগণ। এরপর দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে লক্ষ করলে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, রাজকর্মচারীদের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের দৃশ্য। একজন ব্যক্তি রাজকর্মচারীদের পায়ে ধরছেন, কিন্তু তারা এর কেশ আকর্ষণ করে পদাঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। জোড়া মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণপার্শ্বের মন্দিরটির ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দার প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম সারির বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে পূর্বোল্লিখিত দৃশ্যের অনুরূপ নিপীড়নের দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে।

কাটোয়ার শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী শঙ্কর মন্দিরের বামদিকের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম ফলকে দেখা যায়, একজন রাজা উঁচু চৌকির মতো আসবাবের উপর উপবিষ্ট। তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে একজন ঢাল-তোলয়ারধারী সৈনিক এবং রাজকর্মচারী দণ্ডায়মান রয়েছেন। বামপার্শ্বে ছত্রধরে একজন সেবিকা এবং অন্য একজন নারীও দণ্ডায়মান রয়েছেন। অনুরূপ আরেকটি দৃশ্য লক্ষ করা যায়, উক্ত মন্দিরেরই প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম অনুভূমিক সারির ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে। তবে এই ফলকটিতে রাজার বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান নারীদুটির মূর্তি ক্ষয় হয়ে গেছে।

শ্রীবাটির ষড়কোণাকৃতি ভোলানাথ মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের অলিন্দ শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে একটি উচ্চ চৌকির মতো আসবাবের উপর পাঁচজন রাজকর্মচারী উপবিষ্ট। প্রত্যেকের শিরে পাগড়ি এবং দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গে ছোট হাতাযুক্ত জামা রয়েছে। চৌকির তলদেশে রয়েছে পিকদানি, পানপাত্র ও অন্যান্য তৈজসপত্র। দ্বিতীয় ফলকে দেখা যাচ্ছে, তিনজন রাজপুরুষ একটি দীর্ঘায়িত উচ্চচৌকির উপর উপবিষ্ট। প্রথম জনের হাতে রয়েছে ফরসির নল, সেটি খুব দীর্ঘ এবং পাকানো। তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান পাখা হাতে ব্যজনকারী। তৃতীয় ব্যক্তির ডানহাতের তলদেশে একটি তাকিয়া রয়েছে। প্রত্যেকের দেহে পূর্বে উল্লেখিত ফলকে বর্ণিত ব্যক্তিদের ন্যায় পোশাক এবং পাগড়ি রয়েছে। চৌকির তলায় পিকদানি, পানপাত্র এবং দুটি ঢাকনা দেওয়া পাত্র রয়েছে।

শ্রীবাটির উক্ত মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিম প্রবেশদ্বারের শীর্ষে সজ্জিত অনুভূমিক প্রথম সারির বামদিক থেকে প্রথম ফলকে দেখা যায়, একজন রাজকর্মচারী অন্য একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হাতে দড়ি পড়িয়ে দণ্ডায়মান এবং অপরাধী ব্যক্তির পাশে একজন নারী ও একজন পুরুষ দণ্ডায়মান। পুরুষটি সান্ত্বনা দিচ্ছেন নারীটিকে। মধ্যবর্তী ফলকে দেখা যায়, একজন রাজা দীর্ঘায়িত একটি চৌকির উপর আর একটি উচ্চ আসনে পদ্মাসন ভঙ্গিতে উপবিষ্ট হয়ে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন তাঁর পারিষদবর্গকে। তার দু'দিকে দণ্ডায়মান রয়েছেন ব্যজনী এবং হাঁটু মুড়ে

উপবিষ্ট রাজার পারিষদগণ। প্রত্যেকের শিরে পাগড়ি রয়েছে। শুধুমাত্র রাজার শিরের পাগড়ির সম্মুখে একটি গোলাকৃতির মন্ড রয়েছে। আসনতলে রয়েছে পিকদানি ও দুটি পানপাত্র। পরবর্তী ফলকে দেখা যাচ্ছে একজন শোকাতুরা নারী শোকে প্রায় ভূমিতে অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে। তাঁকে অন্যান্য নারীগণ সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং পাখা দিয়ে বাতাস করছেন।

কালনার বিজয়বৈদ্যনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম ফলক থেকেই দেখা যায়, ঘোড়ায় টানা রথ, হাতির পিঠের উপর উপবিষ্ট ধ্বজধারী রাজকর্মচারী এবং সম্মুখে দোলা বা সুখাসন করে অভিজাতদের বিলাসবহুল যাত্রার দৃশ্য। দোলার তলদেশে দণ্ডায়মান একজন সেবিকার হাতে হুকো এবং নলটি রয়েছে দোলায় বসে থাকা ব্যক্তিটির হাতে। দোলার দু'পাশে রাজকর্মচারীরা দণ্ডায়মান।

জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের বামদিকের মন্দিরটির সম্মুখস্থিত উন্মুক্ত ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দার দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে পূর্বোক্ত ফলকের অনুরূপ দোলায় নবাবের বিলাসবহুল যাত্রার দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

বৈদ্যপুরের রাস্তার ধারে অবস্থিত চালা শিবমন্দিরটির প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে দেখা যায়, একজন অভিজাত পুরুষ কেদারায় বসে রয়েছেন, তাঁর সম্মুখে নৃত্যরত নারী উপবিষ্ট এবং পাশে দণ্ডায়মান ঢোলবাজনরত পুরুষ ও অন্যান্য পারিষদবর্গ। উক্ত মন্দিরের ডানপার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত অনুভূমিক সারির প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে দেখা যায়, ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে অভিজাতদের ভ্রমণদৃশ্য। এরপর তৃতীয় ফলকে রয়েছে ফিটন গাড়ি। গাড়ির সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে দণ্ডায়মান প্রহরীদ্বয়।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখস্থিত উন্মুক্ত বারান্দার প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত অনুভূমিক দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে গড়গড়ার নল হাতে ধরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট পুরুষ, সম্মুখে দণ্ডায়মান দু'জন নগ্না নারীমূর্তি।

কালনার পাঁচরখী গ্রামের রাস্তার ধারে রঘুনাথদাস দে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে দেখা যায় বিদেশিদের বিলাসব্যসনের দৃশ্য এবং দ্বিতীয় ফলকে দোলায় অভিজাতদের বিলাসবহুল যাত্রার দৃশ্য রয়েছে।

কালনার গোপালজী মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে দেখা যায়, হাতির পিঠে স্থাপিত রথে একজন পুরুষ এবং একজন নারী উপবিষ্ট; হাতির সম্মুখে ঘোড়ার পিঠে অবতরণরত সৈনিক ও লোকলস্কর রয়েছে।

কালনার লালজী মন্দিরের সম্মুখস্থিত মধ্যবর্তী বহিঃপ্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে নৌকার উপর অভিজাতদের বিলাসবহুল যাত্রার দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

উক্ত মন্দিরের বারান্দার পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত প্যানেলের প্রথম ফলকে অভিজাতদের বাইজিদের নিয়ে ঘোড়ায় টানা রথে করে বিলাসযাত্রার দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সম্মুখ দেওয়ালে প্রতিষ্ঠা ফলকের দক্ষিণপার্শ্বের অর্ধবৃত্তাকার ভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের একটি অংশে দেখা যায়, পদ্মাসনে ছত্রতলে উপবিষ্ট একজন দেশিয় রাজা। তার মাথায় টুপি রয়েছে এবং হাতে ফারসির নল। পশ্চাতে পাখা নিয়ে ব্যজনকারী দণ্ডায়মান। অন্যপাশে পরিবারবর্গ দণ্ডায়মান।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে বামদিক থেকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বাদশ, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ ফলকে ফারসির নল হাতে করে দেশি নিয়মে আদুল দেহে ইউরোপীয় ভিক্টোরিয়ান চেয়ারে উপবিষ্ট পুরুষ লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত সম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীদের মূর্তি ফলক পরিলক্ষিত হয়।

মন্দির ভাস্কর্যে শিকার দৃশ্য প্রসঙ্গ -

মধ্যযুগের বাংলায় নিম্নবর্গের মানুষের জীবনধারণের একটি প্রধান উপায় ছিল শিকার করা। কিন্তু অভিজাতবর্গের মানুষজন তাঁদের বিলাসিতার জন্য শিকার করতেন। মন্দিরগাত্রে সাধারণ মানুষের শিকার দৃশ্যের তুলনায়, অভিজাতদের শিকারের দৃশ্যই অধিকমাত্রায় দৃশ্যায়িত হয়েছে। মন্দিরগাত্রে তাদের এই শিকারের দৃশ্যগুলি অভিজাতবর্গের বিলাসিতার একটি অঙ্গ হিসেবেই ধরা দিয়েছে। শিকার দৃশ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কালনার গোপালজী মন্দিরের বামপার্শ্বের দক্ষিণমুখী দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে উৎকীর্ণ প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে তৃতীয় ফলকে ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট হয়ে অভিজাত পুরুষের শিকার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। ইনি বল্লম দিয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান একটি চতুষ্পদ প্রাণীকে হত্যা করছেন। ঘোড়াটির পায়ের কাছে একটি শিকারি কুকুর এবং অশ্বারোহীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান বন্দুকধারী পুরুষ রয়েছে।

কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দায় প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে পূর্বোক্ত ফলকের অনুরূপ শিকার দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে বামদিকের মন্দিরটির প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, হাতির পিঠে উপবিষ্ট দু'জন সম্ভ্রান্ত পুরুষ; তাদের মধ্যে প্রথমজন একটি বর্শা দিয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান একটি ব্যাঘ্র শিকারে উদ্যত এবং পশ্চাতে উপবিষ্ট পুরুষের বামহাতে ঢাল ও ডানহাতে ছোট তরোয়াল রয়েছে।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে অশ্বারোহী শিকারি রাজপুরুষকে বর্শা দ্বারা একটি শৃগালকে শিকার করতে দেখা যায়। পশ্চাতে আর একটি শৃগালকে সম্মুখের দু'পা তুলে পুরুষটিকে আক্রমণ করতে দেখা যায়। অশ্বের সম্মুখের দু'পা ঊর্ধ্বমুখী।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখাংশে উন্মুক্ত বারান্দার মধ্যবর্তী বহিঃপ্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের তলদেশ থেকে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে দেখা যায়, দণ্ডায়মান শিকারির দল তরোয়াল, বন্দুক, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র সহযোগে একটি জন্তুকে হত্যা করতে উদ্যত।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত মন্দিরগুলিতে শিকারের দৃশ্যের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, ঊনবিংশ শতকে এসে শিকার দৃশ্যের সংখ্যা হ্রাস পায়। শিকার প্রসঙ্গে, মধ্যযুগে রচিত মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কালকেতু ব্যাধের কথা আমাদের স্মরণে আসে। এই কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র কালকেতু, একসময় বন্যপশুদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকায়, বনের পশুগণ বিপদে পড়ে মাতা চণ্ডীর শরণ নেয়, কবি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন-

"পশুর শুনিঞা কথা হৃদয়ে ভাবিআ ব্যাথা
চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।
লাজে করি হেট মাথা কহে পশু দুঃখ কথা
একে একে চণ্ডীর চরণে।।"[৯৬]

এই আখ্যানটি প্রকৃতপক্ষে, ব্যাধের কবল থেকে পশুদের বাঁচানোর আখ্যান। দেবী এখানে শস্যনির্ভর, বননির্ভর সভ্যতাকে অযাচিত ধ্বংস করার হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য জনসাধারণের নিকট অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও, মন্দিরগাত্রে এর কোন প্রভাব লক্ষ করা যায়নি। তার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে

মন্দিরগাত্রে সাধারণ মানুষের শিকার দৃশ্যর তুলনায়, অভিজাতদের শিকার বিলাসিতার দৃশ্যই অধিকমাত্রায় দৃশ্যায়িত হয়েছে। শিল্পীরা ছিলেন গ্রামের মানুষ, বনজঙ্গল- বড়জন্তু দেখার অভিজ্ঞতা তাদের অধিকাংশেরই ছিল না। কিন্তু এখানে আর একটি কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ সতেরো- আঠারো শতকে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলগুলি পরিষ্কার করেই, নতুন জনবসতি গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন জায়গায়। যেমন, বর্ধমানের রাজা জমিদারগণ জঙ্গলমহলের বিরাট জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে, সেখানে জমি উদ্ধার করে গ্রামের পত্তন ঘটিয়েছিলেন। বর্তমানেও স্থানটি অনেকাংশে জঙ্গলাবৃত রয়েছে। অর্থাৎ মন্দির নির্মাণ শিল্পী বা ভাস্করগণ একেবারেই যে বাঘ, হরিণ, হাতি, বুনো শূয়র ইত্যাদি বন্য জন্তুদের দেখেননি, এটা ভেবে নেওয়া ভুল হবে। কিন্তু অনেকাংশে পশুদের দেহাবয়াব চিত্রায়ণে অসংগতি লক্ষ করা যায়।

মন্দির ভাস্কর্যে মানুষের অবসরকালীন ক্রিয়াকলাপ-

বর্ধমান জেলার মন্দির ভাস্কর্যে সামাজিক মানুষের কিছু অবসরকালীন ক্রিয়াকলাপের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন- ক্রীড়া দৃশ্য, শরীরচর্চা, মহিলা- পুরুষের আড্ডা অথবা প্রেমালাপ, পোষ্য নিয়ে সময় কাটানো, মহিলাদের প্রসাধন ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল-

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালে গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে প্রথম উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে ষষ্ঠ ফলকে ব্যায়াম করার দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের বামপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে পঞ্চম ফিগারেটিভ প্যানেলে নকশা করা ফলকগুলির মধ্যে বামদিক থেকে ষষ্ঠ ফলকে শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। এর পরবর্তী দুটি ফলকে মল্লক্রীড়ার দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বের মন্দিরটির বারান্দার দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে মল্লক্রীড়ার দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

মল্লক্রীড়ার আরেকটি দৃশ্য লক্ষ করা যায়, কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের বারান্দার প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে। কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দার সম্মুখস্থিত প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় দৃশ্যে, দুটি শিশুর সঙ্গে ক্রীড়ারত একজন দণ্ডায়মান নারী। পরবর্তী ষষ্ঠ ফলকে দু'জন নারীর কথোপকথনের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের বারান্দায় সম্মুখস্থিত মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে ক্রীড়ার দৃশ্য লক্ষ করা যায়, যা অনেকটা আধুনিক যুগের সার্কাসের প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে একটি বৃত্তের মধ্যে দু'জন মানুষ খেলা দেখাচ্ছেন। বৃত্তটির নীচে দু'জন মানুষ উপবিষ্ট এবং পাশে একজন পুরুষ ও একজন নারী দণ্ডায়মান। এই প্যানেলেরই ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে দেখা যায়, তিনজন নারী দু'জন শিশুকে নিয়ে দণ্ডায়মান। পূর্বোক্ত সার্কাসের মতো দৃশ্যফলকের অনুরূপ ফলক লক্ষ করা যায়, কাইগ্রামের বরাহ গোপাল মন্দিরের বারান্দার মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে।

কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে বামদিকের মন্দিরটির বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে, অনেকজন সাধারণ মানুষের একত্রে জমায়েত হওয়ার দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কেউ বা বসে হুঁকোর নল ধরে রয়েছেন এবং নিজেদের মধ্যে বার্তালাপে লিপ্ত রয়েছেন।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দার প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে মেয়েলি আড্ডার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। চারজন মহিলা সারিবেঁধে দণ্ডায়মান।

অনুরূপ আরেকটি দৃশ্য লক্ষ করা যায়, কাটোয়ার শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের অলিন্দশীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম ফলকে মেয়েলি আড্ডার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে একজন মহিলার হাতে একটি পাত্র রয়েছে। দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, দু'জন মহিলা একটি উচ্চ চৌকির উপর উপবিষ্ট। একজন অন্যজনের কেশসজ্জা করছেন এবং অন্য আরেকজন মহিলাও সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ও পঞ্চম ফলকে দণ্ডায়মান তিনজন পুরুষ খঞ্জরি ও একতারা বাজিয়ে গানবাজনা করে সময় অতিবাহিত করছেন।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউলেশ্বর মন্দিরের মুখ্যদ্বারের বামপার্শ্বের তৃতীয় কৃত্রিমদ্বারের বামপার্শ্বের উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের দ্বাদশতম ফলকে আয়না নিয়ে উপবিষ্ট নারীর প্রসাধনের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই মন্দিরেরই বামপার্শ্বের দ্বিতীয় কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের চতুর্থ ফলকে একটি বালিকা একটি ছাগশিশু নিয়ে দণ্ডায়মান এবং ষষ্ঠ ফলকে গড়গড়ার নল মুখে নিয়ে মোড়ার উপর উপবিষ্ট পুরুষ।

এই গ্রামেরই রায়পাড়া'র রায় পরিবারের শিবমন্দির প্রাঙ্গণের বামদিক থেকে তৃতীয় মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের অলিন্দশীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে দ্বিতীয় সারির বামদিক থেকে প্রথম ফলকে একজন মহিলা হাতে একটি তৈলপাত্র নিয়ে দণ্ডায়মান এবং তার পাশে একটি উচ্চ চৌকির উপর দু'জন মহিলা উপবিষ্ট। একজন অপরজনের কেশে তৈলমর্দন করছেন। তারপাশে আর একজন মহিলা চামর হাতে দণ্ডায়মান।

কাটোয়ার শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর ডানদিক থেকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত প্যানেলের তলদেশের প্রথম ফলকটিতে নারী পুরুষের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে প্রেমালাপের দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দার পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফলকে নারীপুরুষের প্রেমালাপের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। একজন পুরুষ ও একজন নারী পরস্পরের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুরুষটি নারীর মুখ নিজ হাতের দ্বারা স্পর্শ করে রয়েছে। এই ফলকে মূর্তি দুটির মুখমণ্ডল স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছেনা।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে অনুমান করা যায়, মন্দিরগাত্রে তৎকালীন সমাজে যে ক্রীড়াগুলির প্রচলন ছিল, তার প্রায় কিছুই স্থান পায়নি। শুধুমাত্র মল্লক্রীড়া ও আধুনিক সার্কাসের ন্যায় কিছু ক্রীড়ার ফলক লক্ষ করা গেছে। মধ্যযুগীয় কাব্যসাহিত্যে যে ক্রীড়াগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে পূর্বোক্ত তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে মল্লক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। একমাত্র এই ক্রীড়াটিই গুরুত্ব সহকারে মন্দিরগাত্রে স্থান পেয়েছে বলা যায়। এছাড়া পূর্বোক্ত ফলকগুলির দৃষ্টান্ত দ্বারা তৎকালীন সমাজে মানুষের অবসরকালীন ক্রিয়াকলাপের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যেতে পারে।

মন্দির ভাস্কর্যে ব্যভিচার দৃশ্যাবলি-

সমাজে যেমন ধর্মপরায়ণ মানুষের বাস ছিল, তেমনই ব্যভিচারী মানুষজনেরও সমাজে অভাব ছিলনা। সমাজের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর, দেশি বা বিদেশি, সকল জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে, সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই ব্যভিচারময় জীবনযাপনের আভাস পাওয়া যায়, তৎকালীন সময়ে রচিত সাহিত্যগুলিতে। বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয়, 'মন্দির ভাস্কর্যে ব্যভিচার দৃশ্যাবলি'।

মন্দির ভাস্কর্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ব্যভিচারী কার্যকলাপের নানা দৃশ্য চিত্রায়িত হওয়ায় সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রটি জীবন্তরূপে ধরা দিয়েছে। মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন কাব্যসাহিত্যে সমাজে ব্যভিচারী মানুষদের কার্যকলাপের উল্লেখ রয়েছে। মধ্যযুগীয় বাংলায় তন্ত্রকে কেন্দ্র করে মানুষের ব্যভিচারের একটি দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে শ্রীবৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন-

“রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনি।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিধি বসন।
খাইয়া করে সবাসঙ্গে বিবিধ রমণ।”[৯৭]

বৈষ্ণব ধর্মের নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা কদাচার ব্যভিচার সমাজকে কলুষিত করে দিয়েছিল। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে তৃতীয় খন্ডের ‘ভবানন্দের উভয় রানি সম্ভোগ’ অংশে ভবানন্দের দুই স্ত্রীর সঙ্গে ভবানন্দের কার্যকলাপ, তার চরিত্রের ব্যভিচারী রূপটি ফুটিয়ে তোলে।

সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলার মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যেও সমাজে বিভিন্ন জাতির মানুষের ব্যভিচারের দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক- কালনার গোপালজী মন্দিরের দক্ষিণমুখী প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের উত্তরমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত প্যানেলের তলদেশে উৎকীর্ণ প্রথম ফলকে বিদেশিদের ব্যভিচারের দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। এই ফলকে দেখা যায়, একটি কেদারায় উপবিষ্ট বিদেশি পুরুষ, একজন দেশিয় মহিলার সঙ্গে ব্যভিচারে মত্ত। তার সম্মুখে দণ্ডায়মান আর একজন বিদেশি পুরুষ ও একজন দেশিয় মহিলা। এদের সামনে একজন নিরাপত্তারক্ষী বন্দুক হাতে দণ্ডায়মান।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দার সম্মুখস্থিত প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে একজন বিদেশি পুরুষ ভিক্টোরিয়ান চেয়ারে উপবিষ্ট হয়ে একজন দেশিয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার একটি দৃশ্য লক্ষ করা যায়। তার চেয়ারের পশ্চাতে একজন দেশিয় মহিলা পানপাত্র নিয়ে দণ্ডায়মান এবং চেয়ারের তলদেশে একটি বৃহৎ পানপাত্র রয়েছে।

কাটোয়ার শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের ভোলানাথ মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিমদ্বারের নিম্নাংশে একটি দীর্ঘ ফলকে দেশিয় অভিজাত সম্প্রদায়ের পুরুষগণের ব্যভিচারের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। বামদিক থেকে দেখলে দেখা যায়, একজন দেশিয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে একজন স্ত্রীলোকের কেশ আকর্ষণ করছে এবং আরেকজন পুরুষ, উক্ত স্ত্রীলোকটির বামহাতটি ধরে আকর্ষণ করছে। উক্ত পুরুষটির পশ্চাতে আরেকজন পুরুষ দণ্ডায়মান। এরপরে আরও একজন মহিলা ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করে দণ্ডায়মান। পুরুষটির হাতে একটি দণ্ড রয়েছে। তারপরে দেখা যায়, একজন মহিলাকে দু’দিক থেকে দু’জন পুরুষ স্পর্শ করে দণ্ডায়মান। এবং আর একটি পুরুষ আর একজন মহিলাকে আলিঙ্গন বদ্ধ করতে উদ্যত।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে সমাজের অধঃপতনের চেহারাটি অতিমাত্রায় স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। মন্দির শিল্পীগণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনালেখ্য চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে সমাজের অবক্ষয়ের রূপটিও তুলে ধরতে চেয়েছেন।

মন্দিরসজ্জায় অস্ত্রাদি সহযোগে যুদ্ধদৃশ্য চিত্রায়ণ-

বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে দেশি- বিদেশি মানুষের যুদ্ধরত দৃশ্য ফলক লক্ষ করা যায়। মৃৎশিল্পীগণ তৎকালীন সময়ে বাংলায় যে যুদ্ধগুলি হয়েছিল, সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মন্দিরগাত্রে সেইসব দৃশ্যগুলিকে শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। যেমন শাহজাহান ও ঔরংজেবের শাসনকালে বাংলায় পর্তুগিজদের সঙ্গে যুদ্ধ, ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মোগল সৈন্যদের সংঘর্ষ ইত্যাদি। মন্দির ভাস্কর্যে যে সকল অস্ত্রধারী সৈন্যদের মূর্তি ফলক মন্দিরগাত্রে দেখা যায়, তারা নিম্নবর্গের মানুষ হিসেবেই সমাজে পরিচিত ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়, দেশিবিদেশি বণিকগণ এইসব সৈন্যদের, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োগ করতেন। তাই মন্দির ফলকে কখনও দোলা, কখনও ঘোড়ার গারির সম্মুখে, অথবা কখনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পাশে অস্ত্রধারী সৈন্যদের লক্ষ করা যায়। এছাড়া মহাসমারোহে সৈন্য, হাতি, ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধযাত্রার দৃশ্যও লক্ষ করা যায়। পূর্বোক্ত যুদ্ধগুলি ব্যতীত তৎকালীন বাংলায় রচিত বিভিন্ন কাব্যগুলিতে কবিগণ যুদ্ধ বর্ণনা যত্নসহকারেই করেছিলেন। সেখানে অবশ্য বীররসের সঙ্গে বীভৎস রসেরও পরিবেশন করেছেন কবিগণ। রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে যুদ্ধদৃশ্যের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। তবে মঙ্গলকাব্য গুলিতে যেভাবে যুদ্ধদৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুকরণেই হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির

মধ্যে একমাত্র 'মনসামঙ্গল কাব্য' ব্যতীত সকল মঙ্গলকাব্যেই বিস্তৃত যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৯৮] কবিকঙ্কণ রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখেটিক খন্ডে কালকেতু ও কলিঙ্গ নৃপতির যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

"সাজ সাজ পড়ে ডাক দামা দরমসা ঢাক
কলিঙ্গে উঠিল গন্ডোগোল।
শত শত মত্ত হাতি লইআ আইসে সেনাপতি
শুন্ডে বাজে লোহার মুদ্গর
মাহুত হাতির পিঠে শেল শাবল জাঠে
গগনে পরয়ে আড়ম্বর।
চারি চারু মহাশয় রথে জুড়িআ হয়
মহারথি জায় সারি সারি
ভিন্দিপাল খরসান তবল বেলক বাণ
ভুষন্ডি ডাবুস গদা ধরি।"[৯৯]

যুদ্ধের সঙ্গে অস্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অস্ত্রব্যতীত যুদ্ধ সম্পন্ন হয়না। মঙ্গলকাব্যগুলিতে যুদ্ধদৃশ্যের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের উল্লেখ করেছেন কবিগণ। যেমন- রামেশ্বর রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে 'দক্ষসেনার সহিত বীরভদ্রের সংগ্রাম' অংশে এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে-

"ক্ষুরধার তরোয়ার শেল শূল সাঙ্গী।
ডাবুষ পট্টিশ খড়্গ খট্বাঙ্গ টাঙ্গী।।
সুকুঠার কুঠার খরধার ছুরি।
বহু তীর সতূণীর কোদন্ডধারী।।"[১০০]

রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লাউসেনের 'লোহার গন্ডার বধ' করার অংশে উল্লেখিত হয়েছে-

"জয়দুর্গা অস্ত্র বীর নিল ডানি করে।
ভবানী বসিল সেই খড়্গের উপরে।।"[১০১]

চণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'দানখন্ডে' রাধার উক্তি-

"শঙ্খ চক্রগদা শারঙ্গ ধরোঁ
অঙ্কে দেব শ্রীবনমালী।"[১০২]

পূর্বোক্ত বিভিন্ন অস্ত্রাদির উল্লেখ যেমন তৎকালীন সময়ে রচিত বিভিন্ন কাব্য সাহিত্যে পাওয়া যায়, তেমনি মন্দির ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মন্দির শিল্পীগণ নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন অস্ত্রাদি সহযোগে যুদ্ধদৃশ্যের চিত্রায়ন ঘটিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে সাধারণ মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রাদি সজ্জিত দৃশ্যাবলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য রয়েছে। এই দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, হস্ত্যারোহী ঢাল-তরোয়ালধারী সৈনিক এবং অনেকগুলি ছুটন্ত অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট সৈনিকদল। উক্ত মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে পূর্বোক্ত স্থানেই ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে অনুরূপ আর একটি যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে।

বৈদ্যপুর গ্রামের রাস্তার ধারে অবস্থিত জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে পঞ্চরত্ন শিবমন্দিরটির প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, দুটি ছুটন্ত ঘোড়ার পৃষ্ঠে অবতরণরত তরোয়ালধারী দু'জন সৈনিক। চতুর্থ ফলকে দেখা যায়, দু'জন বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্য দণ্ডায়মান এবং পঞ্চম ফলকে হস্ত্যারোহী বন্দুকধারী সৈন্যদলের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ সব ফলকগুলি মিশিয়ে একটি যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

কাটোয়ার শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের বামদিকের দেউল মন্দিরটির প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে তরোয়ালধারী দেশিয় নিম্নজাতির পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায়ের ঢাল-তরোয়ালধারী অশ্বারূঢ় সৈন্যদের যুদ্ধদৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে।

দেশিয় সৈন্যগণ দিগম্বর, মাথায় মুকুট ও কণ্ঠে মালা রয়েছে। উক্ত মন্দিরের প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে অশ্বারোহী তরোয়ালধারী বিদেশি সৈন্য, তার পরবর্তী দৃশ্যে হস্ত্যারোহী তরোয়ালধারী সৈন্য ও পদাতিক সৈন্যের যুদ্ধদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে দক্ষিণপার্শ্বের মন্দিরটির প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে অশ্ব- হস্ত্যারোহী উপবিষ্ট সৈন্যগণ ঢাল- তরোয়াল নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত। অশ্বারূঢ় সৈন্যদের পিঠে তিরপূর্ণ তিরদানী রয়েছে। অশ্বের পায়ের কাছে শিকারি কুকুর দেখা যায়। দ্বিতীয় ফলকে হাতি এবং ড্রাগনমুখী একধরনের জন্তুর পিঠে উপবিষ্ট সৈন্যদের পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত দৃশ্য লক্ষ করা যায় এবং পরবর্তী তৃতীয় ফলকে অশ্বারূঢ় ঢাল- তরোয়ালধারী সৈনিকের যুদ্ধরত দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের ত্রিখিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দার মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের তলদেশ থেকে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে, অশ্বের উপর দণ্ডায়মান সৈন্য তার বিপরীত দিকে হস্ত্যারোহী সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত এইরূপ একটি দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

যুদ্ধযাত্রার একটি অপূর্ব দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে কালনার লালজী মন্দিরের পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলগুলি জুড়ে। প্রথম অংশে ঢাল, তরোয়াল, ধ্বজ নিয়ে শিঙা বাজিয়ে একদল পদাতিক সৈন্যর যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অংশে দেখা যায় বল্লম, তিরধনুর্ধারী পদাতিক ও অশ্বারূঢ় সৈন্যদল, হস্ত্যারোহী উপবিষ্ট সৈন্যদলের পরপর সজ্জিত ফলকগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশ্বের পায়ের কাছে শিকারি কুকুর লক্ষ করা যায়।

এই যুদ্ধদৃশ্যগুলি ব্যতীত মন্দিরসজ্জায় বিভিন্ন ভঙ্গিমার দেশি- বিদেশি অস্ত্রধারী সৈন্যের মূর্তি ফলক লক্ষ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ ব্লকগুলির তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ব্লকে দেখা যায়, ঢাল- তরোয়ালধারী দণ্ডায়মান দেশিয় পুরুষ। তৃতীয় ব্লকে দু'হাতে ধনুক ধরে উপবিষ্ট দেশিয় পুরুষ মূর্তি লক্ষ করা যায়। এদের পরনে রয়েছে ধুতি এবং দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউল মন্দিরটির মুখ্যপ্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দ্বিতীয় কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ ব্লকগুলির তলদেশ থেকে দশম ফলকে ঢাল- তরোয়ালধারী অশ্বারূঢ় বিদেশি সৈন্যের মূর্তি ফলক লক্ষ করা যায়।

পূর্বোক্ত ফলকগুলির অনুরূপ ফলক বর্ধমান জেলার বিভিন্ন টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরে লক্ষ করা যায়। সামাজিক মানুষের অস্ত্রাদি সহযোগে যুদ্ধদৃশ্যের পর মন্দিরগাত্রে পৌরাণিক দেব- দেবীদের যে যুদ্ধদৃশ্যগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেই সকল দৃশ্য ফলকের মধ্যে থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, তবে ফলকগুলির বিস্তৃত বিবরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া হল না। কারণ, ইতিপূর্বেই পৌরাণিক দেব- দেবী প্রসঙ্গ আলোচনায় ফলকগুলির বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে শুধুমাত্র দেব- দেবীদের নাম এবং তাঁদের দ্বারা ব্যবহৃত অস্ত্রের উল্লেখ করা হল। যেমন- দেবী দুর্গার হস্তে ত্রিশূল; দেবী কালীর হস্তে খড়্গ; রাবণের হস্তগুলিতে ঢাল, তরোয়াল, বল্লম; রামের হস্তে তীর- ধনুক; পরশুরামের হস্তে কুঠার; শ্রীবিষ্ণুর হস্তে চক্র ইত্যাদি।মন্দিরগাত্রে অলংকরণগুলির মধ্যে তৎকালীন সময়ের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার আভাস পাওয়া যায় খুব সহজেই। গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানে ভূস্বামীদের মধ্যে ক্ষমতা বিস্তারের লড়াই বা রাষ্ট্রনায়কদের রাজ্যদখলের জন্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাব সমাজের উপর যেমন পড়েছিল, তেমনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দির নির্মাণ শিল্পটিও এরদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, পূর্বোক্ত যুদ্ধদৃশ্যগুলি তার প্রমাণচিহ্নই বহন করে চলেছে।

মন্দিরগাত্রের অলংকরণ সজ্জায় দেশি- বিদেশি মানুষের ‘বৃত্তিগত জীবনের’ দৃশ্যাবলি-

মন্দিরসজ্জায় মানুষের বৃত্তিগত জীবনের দৃশ্যাবলী সংক্রান্ত আলোচনায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আর্থিক পরিস্থিতি অর্থাৎ তাদের জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

জাতিবর্ণ প্রথা ভারতীয় হিন্দু সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জাতিবর্ণের বিভাগই ভারতীয় সমাজের গতি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক।[১০৩] এছাড়াও এই গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা। মধ্যযুগীয় বাংলার শাসকগণ চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের স্তরবিন্যাস প্রচার করেছিলেন। বর্ণের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো বাংলায়ও গড়ে উঠেছিল ‘জাত’ ব্যবস্থা। এর পেছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ হল, শ্রমবিভাগ। এক একটি বৃত্তির সঙ্গে এক একটি গোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। মধ্যযুগে কেন্দ্রীয় শাসনতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ কম থাকার জন্য, স্থানীয় জমিদার ও রাজারাই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাদের নিজস্ব স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার বলেই, তারা জাত ব্যবস্থা ঠিকমত মানা হচ্ছে কিনা, তার তদারকি করতেন। জাত সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার ভার তারই উপরে থাকত। স্থানীয় রাজ্যন্যবর্গই কৃষির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, পতিত জমির উদ্ধারের ব্যবস্থা করতেন এবং কারিগর শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন।[১০৪] বৃত্তি পরিবর্তন সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত জাতির মানুষই সমস্ত রকম বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকত। বৃত্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাত-কাঠামোয়ও স্থান পরিবর্তন ঘটত। যেমন- মূলত ভূমিহীন কৃষক হলেও, পরবর্তীকালে অনাবাদি জমি চাষ করে, জমিদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করেছে। বাংলার সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও, অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের প্রাধান্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন- বৈদ্য ও কায়স্থদের পরবর্তীকালে সমাজে প্রভাবশালী জাতি হিসেবে গণ্য করা হত।[১০৫]

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, মঙ্গল কাব্য গুলিতে বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তিধারী মানুষের উল্লেখ রয়েছে। যেমন- ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে বিভিন্ন বৃত্তির উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

“নগরে করিআ শোভা নিবসে অনেক ধোবা
দড়ায় শুখায় নানা বাসে
দরজি কাপড় শিঞে বেতন করিআ জিঞে
গুজরাটে বৈসে এক পাশে।
শিউলি নিবসে পুরে খাজুর কাটিআ ফিরে
গুড় করে বিবিধ বিধানে
ছুথার নগর মাঝে চিড়া কুটে মুড়ি ভাজে
কেহ করে চিত্র নির্মাণে।
পাটনি নগরে বৈসে রাত্রি দিন জলে ভাসে
পার করি লয় রাজকরে
আসি পুর গুজরাটে বৈসে জত জগাভাটে
ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘরে”।[১০৬]

‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে ভারতচন্দ্র ‘পুরবর্ণন’ অংশে মানুষের বিবিধ জাতি ও বৃত্তির উল্লেখ করেছেন, যেমন-

“কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেনে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি।।
গোয়ালা তাম্বুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার।।
আগরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগী চাসাধোবা চাসা কৈবর্ত্ত অনেক।।
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী।।”[১০৭]

‘চণ্ডীমঙ্গল’, ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে যে পেশা বা বৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে কিছু কিছু বৃত্তি মন্দিরগাত্রে চিত্রায়িত হয়েছে। বর্ধমান জেলার টেরাকোটার কারুকার্য সমৃদ্ধ মন্দিরগুলির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষদের মূর্তি ফলক লক্ষ করা যায়। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল-

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে প্রথম উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ চৌকো ব্লকের তলদেশ থেকে অষ্টম ব্লকে দেখা যায়, খেজুরগাছে অবতরণরত একজন ব্যক্তি। এদের বলা হয় 'সিউলি'। এরা খেজুরের রস দিয়ে গুড় তৈরি করে।

উক্ত মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে বামদিক থেকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, একজন সাপুড়ে দুটি পা পেছনে মুড়ে বসে, সাপের ঝাঁপি থেকে সাপ বাইরে বের করে আনছেন এবং তৃতীয় ফলকে একজন দণ্ডায়মান ব্যক্তি একটি দড়ি দিয়ে একটি ভাল্লুককে বেঁধে খেলা দেখাচ্ছেন। ব্যক্তিটির হাতে একটি দীর্ঘ দণ্ড রয়েছে।

সাপ খেলা দেখানোর আর একটি দৃশ্য রয়েছে পূর্বোক্ত মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে। এখানেও সাপুড়ে হাতে সাপটি নিয়ে দণ্ডায়মান। তার পায়ের কাছে সাপের ঝাঁপিটি রয়েছে।

কামার বসে জলের পাত্রে লোহা নিমজ্জিত করছে এবং বামহাতে হাপরটি ধরে আছে, এমন দৃশ্য লক্ষ করা যায়, প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালের মুখ্য প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ডানদিক থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে তৃতীয় ফলকে।

উক্ত মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম অন্তঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম ফলকে দেখা যায়, গোয়ালা গরুড় বাট ধরে গরুড় পায়ের কাছে বসে রয়েছে। অর্থাৎ গরুড় দুগ্ধদোহন দৃশ্যটি উৎকীর্ণ ফলকটিতে লক্ষ করা যায়।

গোয়ালা বৃত্তির একটি খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়, লালজী মন্দিরের পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দ্বিতীয় দক্ষিণমুখী দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে। এখানে দেখা যায়, একজন মহিলা গরুড় মাথায় হাত বোলাচ্ছেন, আর একজন গরুড় দুধ দোয়াচ্ছেন।

দর্জির মূর্তি ফলক দেখা যায়, শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরে। এই মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে নকশা করা করা, ফলকের মধ্যে উৎকীর্ণ মূর্তির উল্লম্ব সারিটির তলদেশ থেকে দ্বাদশ ফলকে বস্ত্র সেলাই করছেন একজন ব্যক্তির মূর্তি লক্ষ করা যায়।

মন্দিরগাত্রে সাধু সন্ন্যাসীদের একাধিক মূর্তি ফলক লক্ষ করা যায়। এদের কোন নির্দিষ্ট পেশা থাকে না, এরা ভিক্ষাবৃত্তি করেই জীবনধারণ করেন। বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউল মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের প্রথম কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে সপ্তম ফলকে দেখা যায়, একজন ভিক্ষুক বামকাঁধে ঝোলা এবং বামহাতে চাটি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে চলেছেন।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে বামদিক থেকে প্রথম উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে লক্ষ করলে, ষষ্ঠ ফলকে দেখা যায় একজন বৈষ্ণব সাধু ডানহাতে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। তার কপালে হরিমন্দির অঙ্কিত, মুখমন্ডলে সামান্য দাড়ি এবং মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা রয়েছে। তার পরনে রয়েছে একটি কৌপীন এবং উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত।

মধ্যযুগে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলিতে অলংকরণে পরিচারিকা বৃত্তির প্রভাব ব্যাপক ভাবে পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে পৌরাণিক দৃশ্য অথবা সামাজিক দৃশ্যাবলির মধ্যে পরিচারিকা, সেবাদাস-দাসীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই ফলকগুলির সংখ্যাধিক্য দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন সমাজে সেবাদাস-দাসীদের চাহিদা ছিল।

মধ্যযুগে দাসদাসী কেনাবেচাও প্রচলিত ছিল। নবাব সুলতান ও বাদশাহের হারেমে হাজার হাজার দাসী থাকত। সাধারণত এই সকল দাসদাসীদের হাট থেকে কেনা হত, তবে এর জন্য বিশেষ দলিলপত্রও তৈরি করা হত।[১০৮] এছাড়াও বাংলায় দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল। মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরে এরা নৃত্যগীত পরিবেশন করতেন। এছাড়া বৈষ্ণবী সেবাদাসী সেবাদাসদের সঙ্গে দলবেঁধে উৎসবের সময় দেবালয়গুলিতে নেচে গেয়ে বেড়াতেন, বর্তমানেও এই প্রথার প্রচলন রয়েছে। পরবর্তী সময়ে নৃত্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 'নাচনী'দের উল্লেখ করা

হবে। এই 'নাচনী' আজকের স্বদাসীতে পরিণত।[১০৯] এরা সাধারণত জনসমক্ষে নেচে গেয়ে বেড়ায়, রসিক তাল ধরে এবং দাসীদের মতোই নাচনীর উপার্জিত অর্থে রসিকের সংসার চলে। সপ্তদশ শতকের পরবর্তী সময় থেকে বৈষ্ণব আখড়াগুলিতে কিশোরী নৃত্য ও ভজন প্রথার প্রচলন হয়। কুমারী সংগ্রহ করে সেবাদাসী বৃত্তিতে নিযুক্ত করা হত। সেবাদাসী সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতিও ছিল। বাংলার গ্রামে যত গুরু, তত আশ্রম আর তত সেবাদাসী-বৈষ্ণব। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইসমস্ত সেবাদাসী, বৈষ্ণব, সাধনসঙ্গিনীদের অসহায়ভাবেই জীবন অতিবাহিত করতে হয়।[১১০]

বাংলার মঙ্গলসাহিত্যে দাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বলা হয়েছে- 'আট দিগে নানা কর্ম করে দাসীগণ।'[১১১]

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দাসু বাসু নামে দু'জন সেবকের পরিচয় পাওয়া যায়। 'দাসু বাসুর খেদ' অংশে পরস্পরের কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, তারা হলেন ভবানন্দ মজুন্দারের মাইনে করা চাকর বা সেবক। তারা একে অপরকে বলছে-

"দাসু বলে বাসুভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরি পাব বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে।।"[১১২]

লক্ষ করে দেখা গেছে যে, কাব্যের তুলনায় মন্দির ভাস্কর্যে দাসদাসীদের প্রভাব অধিক। মন্দিরগাত্রের দ্বারের শীর্ষে অথবা অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলে দাসদাসী বা পরিচারিকার মূর্তি ফলক লক্ষ করা যায়। যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল-

শ্রীবাটির চন্দ্র'পরিবারের দেউল মন্দিরের বামপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে দশভুজা মহিষমর্দিনীর ফলকের বামপার্শ্বে পাখা দ্বারা ব্যজনরত দণ্ডায়মান সেবাদাসী এবং দক্ষিণপার্শ্বে চামর নিয়ে দণ্ডায়মান সেবাদাসীর ফলক রয়েছে। উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে ভোলানাথ মন্দিরটির মুখ্যদ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের মধ্যেখানের ফলকে একটি প্রসস্থ সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট অভিজাত সম্প্রদায়ের সেবারত একজন পুরুষ পাখা দ্বারা ব্যজনরত।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালের মুখ্যদ্বারের শীর্ষে রামসীতা'র ফলকে রামের দক্ষিণপার্শ্বে ছত্রধারী সেবক এবং সীতার বামপার্শ্বে পাখা দ্বারা ব্যজনরত সেবাদাস। উক্ত মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালে কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে পাখা দ্বারা ব্যজনরত, চামরধারী, ছত্রধারী সেবাদাসীদের মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্যদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে ষষ্ঠ ফলকে, দু'হাতে লণ্ঠন নিয়ে দণ্ডায়মান পরিচারিকার মূর্তি দেখা যায়।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউল মন্দিরের মূলদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের প্রথম কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে, একটি খাটিয়াতে তাকিয়ায় মাথা রেখে শুয়ে রয়েছেন একজন রাজপুরুষ। তার দক্ষিণপার্শ্বে তিনজন চামরধারী সেবাদাস রয়েছে।

পূর্বোক্ত ফলকগুলি ব্যতীত বিভিন্ন মন্দিরে যে অভিজাত সম্প্রদায়ের বা নবাবদের বিলাসবহুল 'দোলা' বা 'সুখাসন' করে যাত্রার ফলকগুলি দেখতে পাওয়া যায়, তার তলদেশে দণ্ডায়মান সেবাদাসীদের হুকোর নল ধরে থাকতে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ সেকালের বর্ধিষ্ণু ও অর্থশালী পরিবারে যে ব্যজনকারিনী, সেবক, পরিচারিকার একান্ত চাহিদা ছিল, মন্দিরগাত্রে এই জাতীয় ফলক দেখে সহজেই অনুমান করা যায়।

বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে নারীপুরুষের বিভিন্ন বৃত্তির ফলক অল্প পরিমাণেই লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাংলার মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি ও জেলে বৃত্তির কোন মূর্তি ফলক মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়নি। সাধারণ কোন ব্যক্তিকে চাষের বা মাছধরার কোনরকম সরঞ্জাম সহযোগে কোন চিত্র কোন ফলকেই দৃশ্যায়িত হয়নি।

পূর্বোক্ত বৃত্তিগুলি ব্যতীত বাংলার মানুষজন যেসব বৃত্তিগুলি অবলম্বন করতেন, যেগুলির মূর্তি ফলক সচরাচর মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়, সেগুলি হল- পালকি বাহক, রথচালক, গরুড় গাড়ির গাড়োয়ান, পদাতিক সৈন্য,

পাহারাদার বা প্রহরী প্রভৃতি। এছাড়াও তৎকালীন সমাজে আর একধরনের বৃত্তির প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছিল। সেটি হল বণিক বৃত্তি।

'বণিক' বলতে সাধারণ ছোট মাপের ব্যবসায়ীকে বোঝাত। ব্যবসায়ীরা কখনও 'বণিক', কখনও 'সার্থবহ', আবার কখনও বা 'শ্রেষ্ঠী' বলে অভিহিত হত।[১১৩] সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায়, কৃষি ও কুটির শিল্পের উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও পরিবর্তন ঘটে। উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় বৃদ্ধি পায়, ফলে সৃষ্টি হয় এক নতুন শ্রেণির, যারা বণিক শ্রেণি নামে পরিচিত হন। ছয় শতক থেকে বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকার আর্থসামাজিক পটভূমিতে পরিবর্তন সূচিত হয়, এক শ্রেণির বিত্তবান মানুষের মাধ্যমে যারা অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছিল। চতুর্দশ শতক থেকে তাদের পুনরুত্থান ঘটে।[১১৪] মধ্যযুগে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনের পর বর্তমান হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে বন্দর গড়ে উঠলে, সপ্তগ্রামের সাথে বর্ধমান ও কাটোয়ার সড়ক পথে সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। এইসময়ে বেশ কয়েকটি সড়ক নির্মিত হয়। সেগুলির মধ্যে সপ্তগ্রাম-পাণ্ডুয়া- সেলিমাবাদ- বর্ধমান- মঙ্গলকোট- কাটোয়া সড়ক কটি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে বর্ধমান শহর থেকে বেশ কয়েকটি সড়ক নির্মিত হওয়ায় বণিকরা ও যাত্রীরা এসে বর্ধমানে, বিশ্রাম নিতেন। ফলে বর্ধমান অন্যতম 'সরাই' শহরে পরিণত হয়। বর্ধমান শহরের উপর থেকে প্রসারিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাজপথ ছাড়াও, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে বাংলায় অসংখ্য পথ গড়ে উঠেছিল, যাদের কথা মধ্যযুগে রচিত মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখিত।[১১৫] বণিকগণ যে সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে; এই কাব্যে দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড ব্যতীত আর এক খণ্ড সংযোজিত হয়েছিল, সেটি হল 'বণিক খণ্ড'। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'লখিন্দরের বিবাহ' অংশটিতে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বণিকদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন-

"বর্ধমান উজানী নগর সপ্তগ্রাম।
সতেক বণিক আইল কত লব নাম।।
বর্ধমান হৈতে আইল সাধু দত্ত বেনে।
সমাজ সহিত আইল নিমন্ত্রণ শুনে।।
ধনপতি আইল লক্ষপতির জামাতা।
বহুত বণিক সঙ্গে আইল মহাত্মা।।"[১১৬]

স্থলপথগুলি ছিল গ্রামবাংলার বিভিন্ন অংশের সাথে প্রাচীন ও মধ্যযুগে গড়ে ওঠা নগর সমূহের যোগসূত্র এবং এই পথগুলি বাংলার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

চৈতন্য পরবর্তীকালের সাহিত্যে নবদ্বীপ বা শান্তিপুরের কথা পাওয়া যায়। কোন বৈষ্ণব কবি নবদ্বীপকে সামুদ্রিক বন্দর বলেননি, যদিও নবদ্বীপের বণিকদের ঘরে বারাণসী, উড়িষ্যা, তিব্বত এমনকি কাশ্মীরের জিনিসপত্রও পাওয়া যেত। অনুমান করা যায়, এগুলি হয়ত স্থলপথের মাধ্যমে নবদ্বীপে আসত। বৈষ্ণব সাহিত্যে বারংবার বণিক ও ব্যাপারী কথা এসেছে। সেখানে কৃষক ও জমিদার উপেক্ষিত হচ্ছে। চৈতন্য সময় থেকে ধনী জমিদার, বণিক এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের বৈষ্ণব করার জন্য চৈতন্য সহ অনেক বৈষ্ণব উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র, সনাতন, রূপ, রামানন্দ রায়, রঘুনাথ দাস চৈতন্যের অনুবর্তী হয়েছিলেন। সপ্তগ্রামের বণিকরা নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরকে 'চৈতন্যদাস' নাম দিয়ে দীক্ষিত করেছিলেন। শ্রীখন্ডের বৈষ্ণবগণ কাশিমবাজারের রাজবংশের আনুগত্য লাভ করেন।[১১৭] উত্তর রাঢ়ে কাটোয়ার বণিকগণ কাটোয়ার বৈষ্ণবধর্ম প্রচারকার্যকে অব্যাহত রেখেছিলেন।[১১৮] বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত বণিক সম্প্রদায়ের কথ্যা পাওয়া যায়, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। পারাবত ক্রীড়ায় ধনপতির সহচরদিগের যে নামগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি প্রত্যেকটি বৈষ্ণব নাম, যথাক্রমে- মুকুন্দ, মাধব, নারায়ণ, বনমালী, জগন্নাথ, শ্রীধর ইত্যাদি।

সুতরাং তৎকালীন সমাজে ধনোৎপাদক শ্রেণি হিসেবে বণিক শ্রেণি সমাজ তথা রাষ্ট্রযন্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী চরিত্র হিসেবেই গুরুত্ব অর্জন করেনি, সমগ্র সমাজও এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থাগমের সূত্র ধরেই রাষ্ট্রে বণিকগণ আধিপত্য লাভ করেছিল। বাণিজ্যের সঙ্গে নগর- সভ্যতা একান্তভাবে যুক্ত। মঙ্গলকাব্য

গুলিতে, বিত্তবান বণিকদের বাসস্থানের নামে ‘নগর’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিনিময় প্রথার সমৃদ্ধির সূত্রে বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও নগরগুলি গড়ে ওঠে। বণিকদের সম্পর্কে কোশাম্বীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য- *“The traders had become so wealthy that the most important person in a earlier town, was generally ‘sresti’.”* তখন সমাজে বাণিজ্যে বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। উৎপন্ন পণ্যসম্ভার নিয়ে বণিকগণ বাণিজ্যে যেত এবং নিয়ে আসত সেইসব দেশের উৎপাদিত নানা দ্রব্য। বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের বিবরণে রয়েছে-

“মূলার যত গুণ কহিতে নাহি অন্ত।
ইহার বদলে দিবা গজ হস্তীর দন্ত।।”[১১৯]

‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গলের’ কেন্দ্রীয় চরিত্র সকলেই বণিক বা সওদাগর। তাদের নাম হল চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর ও তার পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর ইত্যাদি। সমাজে শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের স্থান উচ্চ ছিল এবং তারা ছিলেন রাজাদের অর্থের ভাণ্ডার। এই কারণেই দেবী মনসা ও চণ্ডী, তাঁদের দ্বারা পূজা নিয়ে সমাজে উচ্চস্তরে স্থান পেতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। এই বাণিজ্যের সূত্র ধরেই ১৪৯৭খ্রিঃ পর্তুগিজ ভাস্কো- দা- গামা ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শেরখান সূরীর সঙ্গে বাংলার সুলতান মুহম্মদ শাহের দ্বন্দ্বের সময়ই পর্তুগিজ বণিকগণ প্রথম বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ পায়।[১২০] কালক্রমে চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলি এদের বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। এরা বিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য স্থাপন করে দেশবাসীর উপর অত্যাচার চালাত। কোন স্থায়ী শাসনপদ্ধতি এদের ছিলনা। পরবর্তী সময়ে মগ জাতির সঙ্গে সদভাব গড়ে ওঠায়, এরা একত্রিত হয়ে বাংলায় লুঠপাট চালাতে শুরু করে। ১৬০৭খ্রিঃ আরাকান রাজ তার রাজ্যের সমস্ত পর্তুগিজদের নিহত করার আদেশ দেওয়ায়, তারা অতিশয় দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছিল।[১২১] খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরঙ্গজেব পর্তুগিজদের বাণিজ্য কুঠিগুলি ভেঙ্গে দেওয়ায়, তারা অনন্যোপায় হয়ে জলদস্যু বৃত্তি অবলম্বন করে। পর্তুগিজরা জলযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোগল সৈন্যের কাছে এই পর্তুগিজ ও মগ দস্যুদল পরাজিত হয়ে, পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের নানাস্থানে গুলিবারুদের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। ‘মনসামঙ্গল’এর অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি দ্বিজ বংশীদাস’এর কাব্যে কবি বলেছেন,

“মগ ফিরিঙ্গি যত বন্দুক পলিতা হাত
একেবারে দশ গুলি ছোটে।
সিলই হাওই দবা স্থানে স্থানে করে শোভা
গন্ডগোল কালঞ্জিয়া ঠাটে।।”

এখানে ফিরিঙ্গি বলতে পর্তুগিজদের কথাই বলা হয়েছে। কারণ মধ্যযুগের শেষে বিধ্বস্ত পর্তুগিজগণই বাংলার পল্লী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, এই বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে আরম্ভ করেছিলেন।[১২২]

বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে দেশিয় বণিকদের দৃশ্যফলক প্রায়ই বিরল। তাই দৃষ্টান্ত হিসেবে বিদেশি বণিকদের দৃশ্যফলকের উল্লেখ করা হল- পর্তুগিজ বণিক বোঝাই জাহাজের দৃশ্য লক্ষ করা যায়, কালনার লালজী মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে।

কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের সম্মুখাংশে ত্রিখিলান যুক্ত বারান্দার মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, পাঁচজন পর্তুগিজযাত্রী সহ একটি ভাসমান জাহাজ। এদের মধ্যে একজন যাত্রী একটি দড়ি জাহাজ থেকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে আরেকজন ডুবন্ত যাত্রীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। জাহাজের যাত্রীদের পরনে রয়েছে আঁটসাঁট পোশাক, জামা এবং পাতলুন। তাদের মাথায় টুপি রয়েছে।

কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে দক্ষিণপার্শ্বের মন্দিরটির প্রবেশপথের বাম দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে দেখা যায় একটি মালবাহী ভাসমান বিদেশি জাহাজ এবং জাহাজের খোলে মানুষ রয়েছে।

পূর্বোক্ত ফলকের অনুরূপ একটি দৃশ্যফলক লক্ষ করা যায়, বৈদ্যপুর গ্রামের চালা শিবমন্দিরটির প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে অষ্টম

বা শেষতম ফলকে এবং কালনার পাঁচরখী গ্রামের রাস্তার ধারে রঘুনাথদাস দে'র প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে পঞ্চম ফলকে।

অর্থাৎ পূর্বোক্ত ফলকগুলির দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমান করা যায় যে, বাংলার মধ্যযুগীয় সময়সীমার মধ্যে সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। মন্দির শিল্পীগণ মন্দিরগাত্রে ফলকগুলি নির্মাণকালে সমাজের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, পাশাপাশি তৎকালীন সময়ে রচিত বিভিন্ন সাহিত্য দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে সাহিত্যে উল্লেখিত বিভিন্ন বৃত্তি মন্দিরগাত্রে স্থান পেয়েছে।

মন্দিরসজ্জায় নৃত্যদৃশ্য ও বাদ্যযন্ত্র -

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত নৃত্য কল্পনা করা যায় না। তাই মন্দির সজ্জায় ব্যবহৃত এই দুটি বিষয়কে পাশাপাশি রেখে দৃষ্টান্তমূলক আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক। বাংলার সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাসে ধারাবাহিকতার সূত্রপাত পাল রাজাদের সময় থেকে। সেন যুগও ছিল সংস্কৃত কাব্যের সুবর্ণযুগ। সেই যুগে নৃত্যগীত চর্চায় কবি পণ্ডিতগণ বিমুখ ছিলেন না। যাঁরা 'নট' বৃত্তি অবলম্বন করতেন, সমাজে তাঁদের স্মরণীয় আসন ছিল। 'নট' উপাধিতে তাঁরা ভূষিত হতেন। 'নট' গঙ্গোক রচিত কয়েকটি শ্লোক শ্রীধর দাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে রক্ষিত আছে।[১২৩] দ্বাদশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গে রসভাবপুষ্ট উচ্চাঙ্গ নৃত্যাভিনয় প্রচলিত ছিল। আবরণ পটযুক্ত মঞ্চে এই নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'এর পদগুলিতে সেকালের নৃত্যগীত বা নাটযাত্রা পালার নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই তথ্যই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় নৃত্যশাস্ত্রের গভীর অনুশীলন হত। ফলে বাংলা সাহিত্যে নৃত্যের বর্ণনা জীবন্তভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবসাহিত্য, এই দুটি দিকই নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আলোচনায় ও তথ্যে সমৃদ্ধ।[১২৪] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত এই নৃত্য প্রাচীনযুগের শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরেই দণ্ডায়মান ছিল। মধ্যযুগে তুর্কি আক্রমণের পর থেকেই, সমগ্র ভারতে নৃত্যকলা অত্যন্ত নিন্দনীয় হয়ে পড়েছিল; কারণ নৃত্যকলা তখন ভোগসর্বস্ব কাম কলা যুক্ত সস্তা আনন্দের প্রকরণে পর্যবসিত হয়েছিল।

নৃত্যকলা আবার শ্রীচৈতন্যের সময় থেকে গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। চৈতন্যদেবই একমাত্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে নৃত্যকলাকে ভোগসর্বস্ব সস্তা চটুলতা থেকে ভক্তিরসাশ্রিত নৃত্যে উন্নীত করেন। নৃত্যকলার ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাংলার এই গৌরবময় নৃত্য ঐতিহ্য অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। এরপরেই আবার নৃত্যকলার অন্ধকারময় যুগ শুরু হয়।[১২৫] মধ্যযুগে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালি গান ও তার সঙ্গে নৃত্য। প্রধান গায়ক একহাতে চামর ও অন্যহাতে মন্দিরা এবং পায়ে নূপুর পরে নাচের সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতেন, সঙ্গে মৃদঙ্গ বাদক তাল রক্ষা করতেন।

'কীর্তন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'প্রশংসা'। শ্রীচৈতন্যের সময়কাল থেকে এই কীর্তন নতুন রূপ ধারণ করে। চৈতন্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'নৃত্য সংকীর্তন' হয়েছিল সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে রথযাত্রার সময়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ একসঙ্গে মিলিত হয়ে, মহাসংকীর্তন করেছিলেন। এই সংকীর্তনে চৌদ্দ মৃদঙ্গ ব্যতীত ছাপ্পান্ন জোড়া করতাল বেজেছিল।[১২৬]

নৃত্য হল ভাবতাল যুক্ত গীতাভিনয়, নৃত্যের সময় মুখে থাকবে গান, হস্তে অঙ্গব্যঞ্জক নানা মুদ্রা বা হস্তকর্ম, চোখে থাকবে ভাবের অভিব্যক্তি এবং পায়ে রাখতে হবে তাল। লক্ষণীয় হল নাট্যশাস্ত্রের 'নৃত্য' সম্বন্ধে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। এমনকি, একথাও বলা হয়নি যে, নৃত্য হল গীতার্থ সংবদ্ধ অর্থভাবক এবং তাল লয়াশ্রিত। কিন্তু নৃত্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে, একথা নিশ্চয় বলা যেতে পারে।[১২৭]

নৃত্য ও সঙ্গীত এদেশে নারীদের সাধনার বিষয়বস্তু ছিল। অর্থাৎ গভীরভাবে অনুশীলন করে শিখতে হত। নৃত্যকালে তালভঙ্গ সে যুগের সমাজে পাপ বলে গণ্য হত। মনসামঙ্গল কাব্যে উষা-অনিরুদ্ধ'র তালভঙ্গের বর্ণনা পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও স্বর্গ নর্তকী রত্নমালার এই প্রকার তালভঙ্গ ও তার জন্য স্বর্গসভা থেকে অভিশপ্ত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। অষ্টাদশ শতকে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও একটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের বর্ণনা

পাওয়া যায়। নৃত্যগীত দ্বারা মঙ্গল অর্চনার জন্য যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হত, জগজ্জীবন রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কেদার রাগে তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

"মদালসা আদি সহচরী হইয়া কুতুহল।
নৃত্যগীত হরষিতে করিল মঙ্গল।।"[১২৮]

বিভিন্ন কবিদের দ্বারা রচিত মঙ্গলকাব্যে নৃত্যভঙ্গিমা যেমন- ত্রিভঙ্গি, মরালগতি, দৃষ্টিভেদ, ভ্রমরী, আকাশ ভ্রমরী, জানু ভ্রমরী ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। এছাড়া এর পাশাপাশি বাংলার নর্তন বৈশিষ্ট্য, যেমন- পাক বা ভ্রমরী, চারী এবং বিভিন্ন রাগরাগিণীর নাম, যেমন- বসন্তবাহার, লাচারী, পঠমঞ্জরী প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্য গুলিতে নটীদের কথাও পাওয়া যায়। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের সুরিক্ষা হলেন নটী বেশ্যা। গোপীচন্দ্রের গানে নটীদের কথা পাওয়া যায়। রাঢ়বঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে স্থানীয় রাজাদের রাজদাসী- নটী থাকত, যাদের কথ্য ভাষায় 'নাচনী' বলা হয়। যিনি নাচনী রাখতেন তাকে রসিক বলা হত। রসিকের সঙ্গীতে অর্থাৎ গীত- বাদ্য- নৃত্যে ব্যুৎপত্তি থাকত, তিনি নাচনীকে কলাবিদ্যার শিক্ষা দিতেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন রাজাগণ রসিক হতেন, নাচনীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।[১২৯]

কেতকদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'দেবসভায় বেহুলার নৃত্য' অংশে বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে নৃত্য পরিবেশনের সুন্দর দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে-

"দেবতা সভায় গিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা লইয়া
নৃত্য করে বেহুলা নাচনী।
যতেক দেবতা দেখি যেন মত্ত হয়ে শিখী
গায় যেন কোকিলের ধ্বনি।।৪।।
ঘন ঘন তালে রাখে অঞ্চলে বয়ান ঢাকে
হাসি হাসি বদন দেখায়।
মুখে গায় মিষ্ট বোল খদির কাষ্ঠের খোল
তাথই তাথই ঘন বায়।।৮।।
আগুতে পেছুতো গিয়া নাচে ঘন পাক দিয়া
চরণেতে বাজিছে ঘুঙ্গুর।
নবীন কোকিল যেন অহরহ ঘন ঘন
মুখে গায় বচন মধুর।।১২।।"[১৩০]

ঊনবিংশ শতকের বাংলায় বিশেষত কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলায় একটি নৃত্যধারার প্রচলন হয়েছিল, সেটি হল বাঈ-নাচ। মূলত ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ এর প্রচলন করেছিলেন। গ্রাম বাংলায় সাধারণত নৃত্য- গীত পরিবেশিত হত বাংলার মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির গুলিতে। বর্তমানেও নাটমন্দির গুলিতে কীর্তন, মনসামঙ্গল, পালাগান, গাজন নৃত্য, গম্ভীরা, কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি হয়ে থাকে।[১৩১]

এরপর বর্ধমান জেলায় সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে যে বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমায় নারীপুরুষের মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক-

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সম্মুখ বারান্দার প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উল্লম্বভাবে সজ্জিত পাঁচটি ফলক নিয়ে গঠিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে তৃতীয় অনুভূমিক সারির বামদিক থেকে প্রথম ফলকে একজন নর্তকী বৈষ্ণব ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান হয়ে নৃত্যরত। পঞ্চম ফলকে নর্তকী প্রেঙ্খনা ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। উক্ত প্যানেলের পঞ্চম সারির বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে অঞ্জলি ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে উৎকীর্ণ সংকীর্তন দৃশ্যে চাঁদোয়ার তলদেশে চৈতন্যদেব অর্ধমণ্ডল ভঙ্গিমায় নৃত্যরত, চৈতন্যের দক্ষিণপার্শ্বের ভক্ত ব্যক্তিটি ললিত ভঙ্গিমায় নৃত্যরত এবং বামপার্শ্বের পার্ষদ বা ভক্ত শ্রীখোল বাজনরত ও তার সাথে অর্গল ভঙ্গিমায় নৃত্যরত।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত পাঁচটি ফলক নিয়ে গঠিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে তৃতীয় অনুভূমিক সারির বামদিক থেকে চতুর্থ ও পঞ্চম ফলকে সমপাদ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান হয়ে নৃত্যরত নর্তকীমূর্তি লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার মধ্যবর্তী এবং দক্ষিণপার্শ্বের দ্বারের অলিন্দদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে অষ্টম ফলকে অর্ধরেচিত ভঙ্গিমায় নৃত্যরত নর্তকের মূর্তি এবং মধ্যবর্তী দ্বার ও বামপার্শ্বের দ্বারের অলিন্দদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে সপ্তম ফলকে পরাবৃত্ত ভঙ্গিমায় নৃত্যরত নর্তকীর মূর্তি রয়েছে।

বনপাসের দেউলেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের চতুর্থ কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে উৎকীর্ণ রাসমণ্ডলের ফলকে শ্রীকৃষ্ণ অর্ধরেচিত ভঙ্গিমায় নৃত্যরত।

কাটোয়ার শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরে বাঘের মুখোশের অনেকগুলি ফলক লক্ষ করা যায়। এই মুখোশের ফলকগুলি হয়তো লোকশিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে অনুমান করা যায়। বর্ধমান জেলার সদর থানার অন্তর্গত ভৈটা গ্রামে 'বাঘনাচ' অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই গ্রামের তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন এই অনুষ্ঠানটি পালন করেন। দু'জন লোকশিল্পী বাঘের মুখোশ এবং লেজযুক্ত বাঘের সাজ পড়ে, বাঘ সাজে। এবং একজন বহিরাগত বুনো লোক সেজে বাঘ নাচাতে আসে। তার সঙ্গে থাকে ঢাকি। এইভাবে বাজনার তালে তালে বাঘবেশি মানুষ নানা ভঙ্গিমায় নাচ দেখায়। শারদীয়া পূজার সময় প্রতিবছর এই বাঘনাচ অনুষ্ঠিত হয়।[১৩২] এই শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরে বাঘের মুখোশের দৃশ্যফলকগুলি দেখা যায়, মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ ও চতুর্দশ ফলকে। এছাড়া মন্দিরটির অন্যান্য দেওয়াল গুলিতেও অনুরূপ মুখোশ লক্ষ করা যায়।

মন্দিরগাত্রে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে নৃত্য পরিবেশনের দৃশ্য যেমন রয়েছে, তেমনি বাদ্যযন্ত্র বাদনরত পুরুষ ও মহিলাদের একক মূর্তিফলকও রয়েছে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ হল, পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত কিছু তথ্যও দেওয়া হল-

কাটোয়ার শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরটির মুখ্যদ্বারের শীর্ষভাগে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে তৃতীয় অনুভূমিক সারির মাঝের ফলকটিতে দেখা যায় সারেঙ্গি বাজনরত উপবিষ্ট পুরুষ, তার দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট তবলাবাদক। এদের মাঝে নৃত্যরত ও সঙ্গীতরত তিনজন বাইজি রয়েছেন। যারা গাইছেন, তারা নিজ কানে হাত দিয়ে রয়েছেন। উক্ত মন্দিরেই মুখ্যদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলে খঞ্জনি বাজনরত একজন নারী দণ্ডায়মান।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউলেশ্বর মন্দিরের প্রবেশদ্বারের শীর্ষের দু'পাশে সজ্জিত দুটি ফলকে বাদ্যবাজনরত দণ্ডায়মান পুরুষ লক্ষ করা যায়। দু'পাশেই বাদ্যকর ঢোল, শিঙা বাজাচ্ছে। শুধু দক্ষিণপার্শ্বের ফলকে একটি বালককে ঝাঁঝর বাজাতে দেখা যায়।

শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের ঊর্ধ্বাংশে একেবারে কোণের স্থানে কার্নিশের তলদেশে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে তিনজন পুরুষ হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট। দেখা মনে হচ্ছে কোন জলসায় বা গানবাজনার আসরে বসে রয়েছেন। ফলকটির বামদিক থেকে প্রথম বাদ্যকরের হাতে বেহালা এবং তৃতীয় ব্যক্তিটির হাতে ঢাক রয়েছে। মধ্যবর্তী ব্যক্তিটি হলেন শ্রোতা। এদের প্রত্যেকের দেহ সম্পূর্ণ বস্ত্রে আবৃত, শিরে পাগড়ি, গলায় উত্তরীয় এবং কানে কুণ্ডল রয়েছে।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালের মুখ্যদ্বারের অলিন্দ শীর্ষে বামপার্শ্বের দৃশ্য ফলকে বাদ্যকরদের মধ্যে কাঁসর বাজনরত একটি বালককে লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের ভিত্তিতলের উপর ডানদিক থেকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে চতুর্থ ফলকে দণ্ডায়মান বেহালাবাদক এবং দক্ষিণমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দ্বিতীয় উল্লম্ব সারির প্রথম

ফলকে উপবিষ্ট বেহালাবাদকের মূর্তিফলক রয়েছে। এখানে বেহালাবাদক দেশিয় ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে বসে বুকের কাছে বেহালাটি ধরে বাজাচ্ছেন।

দুর্গাপুর কোকওভেন থানার অন্তর্গত বীরভানপুর গ্রামের আচার্য পরিবারের জোড়া শিবমন্দিরের বামপার্শ্বের দেউল মন্দিরের প্রবেশদ্বারের খিলানশীর্ষে সেতার বাদনরত শিব উপবিষ্ট। তাঁর বামপার্শ্বে গৌরী, ঢোল বাদনরত গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালের একেবারে কিনারায় উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে তৃতীয় সারির বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে দোতারা বাদনরত একজন মহিলা বাদ্যকর উপবিষ্ট এবং তার পাশে আরেকজন মহিলা শ্রোতা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে, মাথায় হাত রেখে উপবিষ্ট। এই ফলকে মহিলাগণের সাজপোশাক ও অঙ্গভঙ্গি দেখে অনুমিত হয়, এরা বারবনিতা।

কালনার গোপালজী মন্দিরের বামপার্শ্বের উত্তরমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে দক্ষিণমুখী দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অবস্থিত বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে পাখোয়াজ বাদনরত দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি রয়েছে।

বনপাসের রায় পরিবারের শিবমন্দির প্রাঙ্গণের বামদিক থেকে লক্ষ করলে তৃতীয় দেউল মন্দিরটির প্রবেশপথের অলিন্দ শীর্ষে সজ্জিত বামপার্শ্বের প্রথম ফলকে ঢোল ও কাঁসর বাজনরত বিদেশি পুরুষ লক্ষ করা যায়। এরপাশে উপবিষ্ট আর একজন বিদেশি পুরুষ হাতে ঢাল- তরোয়াল নিয়ে উপবিষ্ট।

মন্তেশ্বর ব্লকের কাইগ্রামের বরাহবিষ্ণুদেবের মন্দিরে ত্রিখিলান যুক্ত বারান্দার প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর বামদিক থেকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে প্রথম ফলকে বাদ্যকরগণ বাদ্যবাজনরত অবস্থায় দণ্ডায়মান এবং সম্মুখে নৃত্যরত নর্তকী নৃত্যের ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট। ফলকটির মধ্যে মূর্তিগুলির মুখমণ্ডল খুব স্পষ্ট নয়।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউলেশ্বর মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের পঞ্চম কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্ব সারির তলদেশ থেকে পঞ্চদশ ফলকে ঢাক বাজনরত ঢাকীর মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়। ঢাকের সজ্জায় একটি পালক ব্যবহৃত হয়েছে।

দেবীপুরের মন্দিরটির সম্মুখস্থিত বারান্দার দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের প্রান্তদেশে ভিত্তিতলের উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে তৃতীয় অনুভূমিক সারিটির মধ্যে উৎকীর্ণ পাঁচটি ফলকের মধ্যে বামদিক থেকে প্রথম দুটি ফলকে ও শেষ দুটি ফলকে নৃত্যভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান রমণী এবং মধ্যের ফলকে বাদ্যকর দুটি তবলা বস্ত্র দ্বারা কটিতে বন্ধন করে দণ্ডায়মান। এদের প্রত্যেকের পরনে লম্বা ঝুলের পোশাক এবং কেশ মাঝখান থেকে সিথি করে দু'ভাগে ভাগ করে সজ্জিত। উক্ত মন্দিরের বামপার্শ্বের দেওয়ালেও পূর্বোক্ত স্থানেই অনুরূপ একটি প্যানেল সজ্জিত রয়েছে।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের অলিন্দ শীর্ষে বামপার্শ্বে ও দক্ষিণপার্শ্বে সজ্জিত ফলক দুটিতে বাদ্যকর তাসা বাজাচ্ছেন। দু'জনেই গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে যন্ত্রটি বাজাচ্ছেন। দু'জনের দেহে দু'রকম পোশাক হলেও, মাথায় দু'জনেরই পাগড়ি রয়েছে।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউল মন্দিরে মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের প্রথম কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে চতুর্থ ফিগারেটিভ প্যানেলে সংকীর্তন দৃশ্যে চৈতন্য পারিষদগণের মধ্যে তুরি বাদনরত একজন পুরুষকে লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের মুখ্যদ্বারের বামপার্শ্বের চতুর্থ কৃত্রিমদ্বারের অলিন্দ শীর্ষের বামপাশে সজ্জিত প্রথম ফলকে ডুবকি বাজনরত রমণী এবং দক্ষিণপার্শ্বে খঞ্জরি বাজনরত রমণী দণ্ডায়মান।

দ্বিতীয় সারিতে রাসলীলা মন্ডলের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান ডুবকি বাজনরত একজন নারী এবং দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান বেহালা বাদনরত নারী। এবং এই সারিটির উর্ধ্বে সজ্জিত সারিটির বামপার্শ্বে একজন নারীর হাতে রয়েছে চামর ও আরেকজনের হাতে রয়েছে সেতার। এবং দক্ষিণপার্শ্বে একজন সেতার বাদনরত নারী দণ্ডায়মান।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউলেশ্বর মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের প্রথম কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে সপ্তম ফলকে চাটি বাজনরত একজন ভিক্ষুক ব্যক্তিকে দেখা যায়। অষ্টম ফলকে একজন হিন্দু পুরুষ করতাল বাজনরত এবং নৃত্যরত।

দেবীপুরের মন্দিরটির সম্মুখস্থিত বারান্দায় প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে কোণের স্থানে উল্লম্বভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে কাঁসর বাজনরত দণ্ডায়মান বৈষ্ণব পুরুষ। পরনে ধুতি ও চাদর, গলায় মালা এবং কপালে হরিমন্দির আঁকা। মাথার চুল জটাবদ্ধ। পরবর্তী তৃতীয় ফলকে বংশীবাদনরত স্বস্তিক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান বৈষ্ণব পুরুষ। চতুর্থ ফলকে শঙ্খ বাজনরত দণ্ডায়মান পুরুষ, পরনে ধুতি ও চাদর।

শ্রীবাটির চন্দ্র'পরিবারের মন্দির প্রাঙ্গণের বামপার্শ্বের দেউল মন্দিরটির দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে জোড়া সিংহের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট দেবী সিংহবাহিনীর মূর্তিফলকের বামপার্শ্বে ঘন্টা বাজনরত এবং দক্ষিণপার্শ্বে কাঁসর বাজনরত দুই নারীর মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়। পূর্বে নৃত্যদৃশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে করতাল বাদ্যটির উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে 'সারেঙ্গি' হল 'তত' জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রটির টেরাকোটা ফলকে রূপায়ন ঘটেছে সপ্তদশ শতক থেকে। রাগসঙ্গীত যন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এই যন্ত্রটি। প্রায় তিনফুট লম্বা একখণ্ড খোদাই করা কাঠ দ্বারা সারেঙ্গির অবয়ব গঠিত হয়। এতে ২৫ থেকে ৩০ তরফের তার থাকে। সারেঙ্গির কোন সারিকা থাকে না। সাধারণত মাটিতে জোড়াসন অবস্থায় বসে বা কাঁধে ঠেকা দিয়ে সারেঙ্গি কোলের উপর রেখে বাজান হয়।

ঢোল বা ঢোলক হল তাল ও ছন্দ সৃষ্টিকারী তালবাদ্য। গানের আসরে, নাচের মঞ্চে, বিবাহোৎসবে, শোভাযাত্রায়, যুদ্ধযাত্রায়, পূজা মন্ডপে, লোকগীতিতে ও লোকনৃত্যে ঢোলকের অবাধ ব্যবহার হয়ে থাকে। এখনও বহু স্থানে গ্রামের হাটবাজার এলাকায় ঢোল পিটিয়ে সরকারি পরোয়ানা জারি করার রেওয়াজ আছে। মধ্যযুগের মঙ্গলসাহিত্যে যুদ্ধের বাদ্য হিসেবে ঢোলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঢোল কাঠের খোলের তৈরি, উভয়প্রান্ত আচ্ছাদিত হয় চামড়া দিয়ে। কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাজানো হয়। আধুনিক যুগের তবলা আকৃতির ঢোলকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল প্রাচীন বাংলায়। সঙ্গীত প্রিয় বাঙালিদের মধ্যে ছোট ঢোলকের ব্যবহার ছিল। এই ছোট ঢোল ফিতা দিয়ে বেঁধে বহন করা হত।

ঝাঁঝর হল বৃহদাকৃতির গোলাকার তালবাদ্য। কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাজাতে হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই ঝাঁঝ বাদ্যের প্রচলন রয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে এই বাদ্যের প্রচলন রয়েছে। কীর্তন গানে এটি বহু ব্যবহৃত একটি বাদ্য।[১৩৩]

বেহালা যন্ত্রটি টেরাকোটার ফলকে বহুল ব্যবহৃত একটি বাদ্যযন্ত্র। বিদেশি প্রভাবে সেই সময় বাংলার অভিজাত পরিবারে এই যন্ত্রটির বহু ব্যবহার হওয়ার দরুন, মন্দির শিল্পীদের কাছে বেশ সমাদর পেয়েছিল এই আদ্যপান্ত বিদেশি বাদ্যযন্ত্রটি।[১৩৪]

খঞ্জনি হল একপ্রকার ঘনবাদ্য। এটি বিশেষত বাউল বৈরাগীদের হাতে দেখতে পাওয়া যায়।

শিঙা হল শুষির বা ফুঁৎকার লোকবাদ্য। শিঙা অর্থাৎ গরু বা মহিষের পরিত্যক্ত শিং। অরণ্যবাসী মানুষের কাছে শিঙার ব্যবহার ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্রটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রায় আট ইঞ্চি দীর্ঘ বৃষ শিঙের খণ্ড যোজনা করা হত। শিঙার অগ্রভাগে ফুঁৎকারের জন্য একটি ছিদ্র করা হত। বর্তমানে ধাতু নির্মিত শিঙার প্রচলন শুরু হয়েছে।[১৩৫]

সেতার'ও একধরনের 'তত' জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। বীণা'ও তাই। প্রাচীনযুগ থেকে ভারতবর্ষের যাবতীয় তন্ত্রী বাদ্যকেই বীণা বলা হত। এই বীণা হল অতিপ্রাচীন একটি বাদ্যযন্ত্র। খ্রিঃপূঃ চার হাজার বছর পূর্বে সিন্ধু সভ্যতার সভ্যসমাজে বীণার বহুল ব্যবহার ছিল। তাদের তৈরি বীণা, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাদ্য বলে স্বীকৃত। বীণা থেকে নির্গত সুর হল মিষ্টি- মধুর সুর। ভারতবর্ষে দেবী সরস্বতী'কে বিদ্যা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পনা করা হয় এবং তাঁর মূর্তিতে সর্বদাই তাঁকে বীণাবাদ্য ধারণ করা অবস্থায়ই দেখা যায়।

দোতারা হল বাংলার একটি প্রাচীন ‘তত’ পর্যায়ের বাদ্যযন্ত্র। দোতারা নাম হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর তারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ। ভাওয়াইয়া গানে দোতারা আবশ্যিক। কাঠের খণ্ডকে খোদাই করে এটি নির্মাণ করা হয়। দোতারা’র প্রথম তারটি হয় লোহার এবং বাকি তারগুলি হয় মুগা সুতা বা নাইলনের। দোতারা’র পঞ্চম তারটিকে চিকারি বলা হয়। ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে জওয়া ধরে বামহাতে পটরির বুকে স্থাপিত ইস্পাতের উপর তার চেপে জওয়া আঘাত করে দোতারা বাজান হয়।

পাখোয়াজ হল একটি তালবাদ্য। মৃদঙ্গ থেকে এর সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। পাখোয়াজ একটি পারসিক শব্দ বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। পাখ (পবিত্র) ও আওয়াজ (ধ্বনি) শব্দ থেকে এই নামকরণ করা হয়েছে। এটি কাঠের তৈরি। লম্বায় আড়াই ফুট এবং অনেকটা নলাকৃতির। কোলের উপর রেখে দু’হাতের আঙুলের সাহায্যে এটি বাজান হয়। পাখোয়াজ’কে মৃদঙ্গও বলা হয়ে থাকে। যদিও দুটির মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে।

ঢাক হল অতিপ্রাচীন ‘আনদ্ধ’ শ্রেণির বাদ্যযন্ত্র। খোলকে দু’পাশে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ঢেকে ঢাক তৈরি হয়। এর দু’দিকে দুটো মুখ থাকে, যার ব্যাস দেড়হাত পরিমাণ। অনেকসময় পাখির পালক দিয়ে বাদ্যযন্ত্রটি শোভিত করা হয়।[১৩৬]

পূর্বোক্ত তুরি হল শুষির বাদ্য। পিতল নির্মিত বাঁশি জাতীয় এই যন্ত্রটি নীচের দিকে ক্রমশ মোটা একটি পিতলের নলকে মাঝখানে একটি আয়তাকার প্যাঁচ দিয়ে যন্ত্রটি তৈরি হয়। এতে কোন ছিদ্র থাকে না। বিশেষত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এটি ব্যবহৃত হয়। এর আরও অনেক নাম রয়েছে, যেমন- তুরতুরি, তিত্তির, তুড়ুকিনী প্রভৃতি।[১৩৭] ডুবকি হল চর্ম দ্বারা আবদ্ধ একধরনের তালবাদ্যযন্ত্র। খঞ্জরিও তাই।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে যেসকল বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া গেল, সেগুলির মধ্যে চাটি বাদ্যযন্ত্রটি হল কাঠের তৈরি একটি বাদ্য। এর দু’মাথায় বেশ কয়েকটি করে টিনের গোল চাকতি থাকে।

করতাল যন্ত্রটি তালবাদ্য। পিতল বা কাঁসার তৈরি দুটি কাঁধ শূণ্য সমান ছোট রেকাবের মতো বস্তুর নাম করতাল। এগুলি দেখতে গোলাকার। এদের ঠিক মাঝখানে একটু সামান্য উঁচু স্থানটিতে ছিদ্র থাকে। যার মধ্যে দিয়ে নরম রজ্জু প্রবেশ করিয়ে দু’হাতের আঙুলে জড়িয়ে একে অপরের প্রান্তদেশে আঘাত করে বাজান হয়।

শঙ্খ হল শুষির যন্ত্র। প্রাচীন বাংলায় সঙ্গীত আসরে শঙ্খতরঙ্গ বাজান হত। বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যে শঙ্খের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাকালে এই বাদ্যটি যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে এবং সমরক্ষেত্রে যুদ্ধের নির্দেশাদি ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য বাজান হত। বর্তমানে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ও প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানে, পূজাপার্বণে বাজান হয়।

ঘন্টা একধরনের ঘনবাদ্য অর্থাৎ ধাতু নির্মিত যন্ত্র। সাধারণত পিতল দিয়ে এটি প্রস্তুত করা হয়। এর তলদেশটি উন্মুক্ত, দেখতে অনেকটা ধুতুরা ফুলের মতো। একটি ধাতব পাত্রের মধ্যে, একটি ধাতব দণ্ড যুক্ত থাকে। যার কিছুটা অংশ ভেতরে এবং কিছুটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। দণ্ডটি হাতের মুঠোয় নিয়ে নাড়ালেই শব্দ উৎপন্ন হয়।

পূর্বোক্ত বাদ্যযন্ত্র গুলির মধ্যে কাঁসর হল গোলাকার উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট থালার মতো আকৃতির ধাতব বাদ্যযন্ত্র। ছোট কাঁসরকে কাঁসি বলা হয়। প্রধানত হিন্দুদের মাঙ্গলিক পূজাপার্বণে এটি বাজান হয়। কবিগানে ঢোলের সাথে কাঁসি বাজান প্রায় আবশ্যিক।[১৩৮]

মন্দিরগাত্রের অলংকরণে পূর্বোক্ত আলোচিত বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যতীত আরও বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্রের দৃশ্যফলক লক্ষ করা যায়, যেগুলি বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রগুলির দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বাদশ ফলকে কৃষ্ণের হাতে একটি লয়বাঁশি লক্ষ করা যায়।

দেবীপুরের পূর্বোক্ত মন্দিরেরই সম্মুখস্থিত বারান্দার মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভে তলদেশ থেকে তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ এবং দু’জন গোপবালক বা রাখাল বালক গরু নিয়ে দণ্ডায়মান। প্রথমজন শিঙা বাজনরত, দ্বিতীয়জন মুখবাঁশি বাজনরত।

সারুল গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পরিত্যক্ত শিব মন্দিরটির দ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলে ষাঁড়ের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হরগৌরীর মূর্তিফলক রয়েছে। বামপার্শ্বে কার্তিকের পরে স্বস্তিক ভঙ্গিমায়

দণ্ডায়মান বীণা বাদনরত সরস্বতী মূর্তির একটি অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এছাড়া পূর্বে বীণা বাদনরত নারদমুনি এবং ডমরুধারী মহাদেবের চিত্রফলক আলোচনা প্রসঙ্গে বীণা ও ডমরু বাদ্য দুটির উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে লয় বাঁশি সচরাচর বাঁশের'ই হয়ে থাকে। অবয়বে মুরলী বা সরল বাঁশির মতো বা তারচেয়েও বড় হয়ে থাকে। এই বাঁশিকে সরল ভাবে ধরেও বাজানো যায় আবার বক্রভাবে ধরেও বাজানো যায়। এই বাঁশির দুই মুখ অনাবদ্ধ থাকে। এবং সরল বংশীতে যে একটি বায়ু নির্গমন রন্ধ্র থাকে, এই বাঁশিতে তা থাকে না।

মুখবাঁশির মুখটা গোলাকৃতি এবং বড় ধরনের হয়। বাদক এই বাঁশিটি বাজানোর সময় ভেতরে শ্বাসপ্রশ্বাস ঘুরিয়ে নিতে পারে। এই বাঁশি ভারতবর্ষের সর্বত্রই লভ্য। বাঁশ থেকে তৈরি হয় বলেই, এই বাদ্যের নাম বাঁশি। বর্তমানে বাঁশ ছাড়াও পিতল, কাঠ এবং মাটি দ্বারা বাঁশি তৈরি হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত বাদ্যগুলির মধ্যে বীণার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

ডমরু বা ডুগডুগি হল আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। ডমরু তৈরি হয় একখণ্ড কাঠ থেকে। যার মধ্যভাগটি চাপা ও দুইপ্রান্ত একটু স্ফীত হয় এবং ফাঁপা থাকে। দুই প্রান্ত চামড়া দিয়ে আবৃত থাকে। খোলের মাঝে একখণ্ড সুতো বেঁধে তাতে একটুকরো সিসা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। একহাতে খোলের মাঝখানটি ধরে নাড়া দিলেই, সুতোয় ঝোলানো সিসার গুলি চর্মাচ্ছাদিত অংশে আঘাত করে, ফলে একপ্রকার ধ্বনি উত্থিত হয়।[১৩৯] প্রাচীন ও মধ্যযুগে ডমরু'র ব্যাপক প্রচলন এবং জনপ্রিয়তার কথা বিভিন্ন সাহিত্য থেকে জানতে পারা যায়।

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য সাহিত্যেও বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। যেমন- 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের শেষখন্ডে বৃন্দাবন দাস কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

"মৃদঙ্গ, মুহরী, শঙ্খ, দুন্দুভি, কাহাল।
ঢাক, দগড়, কাড়া বাজয়ে বিশাল।।"[১৪০]

জগজ্জীবন ঘোষাল রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের 'বানিয়া খণ্ড'এ বেহুলা ও লখিন্দরের বিবাহ প্রসঙ্গে বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"নানা জাতি বাদ্য বাজে থরে থরে বাদ্য সাজে
দামা ভেউর বাজে করতাল
জোড়া পড়া বীণা বাঁশী দগড় মান্দল কাসি
শঙ্খ শিঙ্গা মৃদঙ্গ করনাল।
ঢাক কাড়া আর ঢোল মহাশব্দে গন্ডোগোল
বেণু বীণা পিনাক সাহিনী।"[১৪১]

নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ'এ (আনুমানিক ষোল শতকের প্রথমার্ধ) বহু সংখ্যক বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। বেহুলার নৃত্য প্রসঙ্গে, কবি তাঁকে ঊষা রূপে অভিহিত করেছেন।

"দেবসভা সুসজ্জিত হইল বিশেষ।
বিদ্যাধরীগণ কৈলা নৃত্যেতে প্রবেশ।।
যার যেই যন্ত্র হাতে লইয়া সংযোগ।
গীত বাদ্য আরম্ভিলা তাল যন্ত্ররাগে।।
বিদ্যাধরী অপ্সরা গন্ধর্বে গীত গায়।
আপনি যে চিত্রসনে মৃদঙ্গ বাজায়।।" [১৪২]

উদ্ধৃতাংশে, ঊষার নৃত্যস্থল ও আসরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রগুলি যথাযোগ্য বাদ্যকরের হাতে অর্পিত হল এবং যন্ত্র সংযুক্ত হল নৃত্যের সঙ্গে; যে নৃত্য গীতিযুক্ত।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ'এর রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে স্বর্গসভায় বেহুলার নৃত্যানুষ্ঠান বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমে মৃদঙ্গের উল্লেখ থাকলেও পরে তা 'খদির কাষ্ঠের খোল' রূপে অভিহিত হয়েছে। খদির কাষ্ঠ হল 'খয়ের কাঠ'। সেকালের মৃদঙ্গ'এর খোল খয়ের কাঠ দিয়ে তৈরি হতো। এর সাথে আবার বাদ্যযন্ত্র রূপে 'কাংস্য করতালে'র উল্লেখও রয়েছে। যেমন-

"করে কাংস্য করতাল বলে ধনী ভাল ভাল
কটিতে কিঙ্কিণি ঘন বাজে।।"[১৪৩]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ে যে যে নৃত্য ও নাট্য প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, সে সকল ক্ষেত্রে নৃত্য ও সংগীতের তালে বাদ্যযন্ত্র বাদনের প্রসঙ্গ রয়েছে। কাব্যে রত্নমালার নৃত্য প্রসঙ্গে যে বর্ণনা রয়েছে, তা হল-

“তা থৈ তা থৈ যিনি মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
ঘন বাজে রতন কঙ্কণ।”[১৪৪]

এই নৃত্যে স্বর্ণবলয়, মৃদঙ্গ মন্দিরার সঙ্গে বাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া পদাবলি সাহিত্যে বাঁশি, বেণু, মুরলী এই শব্দগুলি বারংবার এসেছে। বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সংক্রান্ত, বিপ্রদাস ঘোষ রচিত একটি পদের কিছু অংশ উল্লেখ করা হল-

“অলকা তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে
শিংগা-বেএ-বেণু দেহ হাতে।”[১৪৫]

চণ্ডীদাস বিরচিত ‘বংশী শিক্ষা ও নৃত্য’ বিষয়ক একটি পদে উদ্ধৃত হয়েছে-

“আজু কে গো মুরলী বাজায়
এত কভু নহে শ্যামরায়।।”[১৪৬]

পূর্বোক্ত পদটি ব্যতীত চণ্ডীদাস আরেকটি পদে বলেছেন-

“বিষম বাঁশির কথা কহিল না হয়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়।।”[১৪৭]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বড়োই বিষম, সেকথা আর নাই বা বললাম। সে যেন ডাক দিয়ে কুলবতী নারীকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। বাঁশি প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদের উদাহরণই শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে বলরাম দাস রচিত একটি পদে শিঙা ও বাঁশির উল্লেখ পাওয়া যায়। পদটি হল-

“চাঁদ মুখে ধ্বনি দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু উর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে।।
....
ঘন বাজে শিঙা বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু
পথে চলে করি রঙ্গে।”[১৪৮]

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের অন্তর্গত ইন্দ্রের শিবপূজার বর্ণনায় লোকবাদ্য রূপে শঙ্খধ্বনি, ডমরুর উল্লেখ পাই এইভাবে,

“ষোড়শ উপচারে পূজিল দেব হরে।
সকল পরিজন সঙ্গে।।
ডম্বুর ডিমি ডিমি বাজান দেব স্বামী।
সুশঙ্খ ঘন ঘন শিঙা।।”[১৪৯]

রামকৃষ্ণ রায় রচিত ‘শিবায়ন’ কাব্যে দরিদ্র শিবের বিবাহে যে বাদ্যগুলি বেজেছিল, সেগুলি হল-

“বাজে বাদ্য বীণা বেণু বেড়া জাল কাঁসি।
শঙ্খ সিংহ নাদ ভুঙ্গা করতাল বাঁশি।।”[১৫০]

পূর্বোক্ত সম্পূর্ণ বিষয়টি আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজজীবনে প্রচলিত তৎকালীন বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে যেসব বাদ্যযন্ত্রগুলি টেরাকোটার ভাস্কর্যে রূপায়িত হয়েছে, তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিবেশিত হল। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ধমান জেলার মন্দিরগুলিতে অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের চিত্রায়ন হয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। কিন্তু টেরাকোটা ফলকে উৎকীর্ণ বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত তালিকাটি সম্পূর্ণ করা যায়নি। এই বিষয়ে এখনও যথেষ্ট অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

মন্দির ভাস্কর্যে পোশাক- পরিচ্ছদ ও অলংকার-

বর্ধমান জেলার টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দির সমূহে নারীপুরুষের বেশভূষা ও অলংকারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে পোশাকের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মন্দিরগাত্রে বেশভূশা অলংকরণের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় সমাজের স্তরভেদটি খুব স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতকের বিভিন্ন টেরাকোটা

সমৃদ্ধ মন্দিরগুলিতে অসংখ্য মানুষের মূর্তির উপস্থিতির সূত্র ধরেই নানাবিধ পোশাকের সমাহার সহজেই দর্শককে মুগ্ধ করে। প্রথমে পুরুষের পরিধান সম্পর্কিত আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

উক্ত বিষয়টিতে দেশি ও বিদেশি পুরুষ গোষ্ঠীর পাশাপাশি পৌরাণিক ও অন্যান্য দেবতাদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং দেশি বিদেশি মহিলাদের পাশাপাশি পৌরাণিক ও অন্যান্য দেবীগোষ্ঠীর পোশাক পরিচ্ছদ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। মন্দিরগাত্রের টেরাকোটার ফলকগুলির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার যোগসূত্রটিও অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

মন্দির সজ্জায় যে সকল পুরুষ মূর্তিগুলি লক্ষ করা যায়, তার মধ্যে অধিকাংশ পুরুষের পরনেই দেহের অধোবাস হিসেব ধুতি লক্ষ করা যায়, তা সে পৌরাণিক চরিত্রই হোক বা অভিজাত সম্প্রদায় কিংবা নিম্নবর্গের মানুষ।

মন্দিরগাত্রে ধুতি পরিহিত কয়েকটি পুরুষ মূর্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক- কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে একাদশতম ফলকে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান দেব চরিত্রটির পরনে হাঁটুর উপর পর্যন্ত ধুতি রয়েছে কিন্তু কোঁচাটি গোড়ালি পর্যন্তই নিম্নগামী এবং কটিদেশ বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করা রয়েছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে চতুর্থ সারির বামদিক থেকে ষষ্ঠ ফলকে বালকদের নৃত্যদৃশ্যে বালকগণ ধুতি পরিহিত। তবে এই ধুতির নিম্নাংশটি হাঁটুর তলায় নামেনি, কিন্তু কোঁচাটি দীর্ঘায়িত।

অনুরূপ আরেকটি এই ধরনের ধুতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের সম্মুখস্থিত ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দায় প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের দক্ষিণপার্শ্বের একটি দীর্ঘায়িত ফলকের মধ্যে।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় সারিতে গৌর- নিতাইয়ের দণ্ডায়মান মূর্তিফলক রয়েছে। সেখানে গৌর- নিতাই নিম্নাঙ্গে ধুতি ও ঊর্ধ্বাঙ্গে চাদর আবৃত করে রয়েছেন। ধুতির কোঁচাটি দীর্ঘ এবং ভূমি স্পর্শ করে রয়েছে।

কাটোয়ার শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্যদ্বারের শীর্ষের দক্ষিণপার্শ্বে সজ্জিত প্রথম সারিতে উৎকীর্ণ মৃৎফলকে ঢাকির পরনে কোঁচা দেওয়া ধুতি এবং ঊর্ধ্বাঙ্গে জামা রয়েছে। এই মন্দিরেরই মুখ্যদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে একজন ঢাল- তরোয়ালধারী দেশিয় সৈন্য মালকোঁচা পদ্ধতিতে ধুতি পরিধান করে রয়েছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পরবর্তী ষষ্ঠ ফলকেও অনুরূপ পদ্ধতিতে ধুতি পরিহিত সৈন্য কোমরে ঢাল, বামহাতে তরোয়াল এবং ডানহাতে একটি লম্বা দণ্ড নিয়ে দণ্ডায়মান।

পূর্বোক্ত মূর্তিফলকগুলিতে ধুতি পরিধানের বিভিন্ন ভঙ্গিমার উল্লেখ করা হয়েছে। 'ধুতি' শব্দটির উৎপত্তি ধৌতক থেকে, অর্থাৎ ধোয়া বা সাদা কাপড়।[১৫১] ফলকগুলিতে ধুতি পরিধানের ভঙ্গিমা দেখে অনুমান করা যায়, সচ্ছল গৃহস্থ পুরুষদের অধোবাস হিসেবে ধুতি পরার ধরনটি ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছিল। প্রথম দিকে ধুতির বহর হাঁটু পর্যন্ত ছিল, কোঁচাটিও সেই অনুপাতে খাটো ছিল। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ পনেরো থেকে ষোল শতকের মধ্যেই ধুতির কোঁচা ভূমি স্পর্শ করেছে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অন্যতম চরিত্র ভাঁড়ুদত্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'মাগের বসন পরে ভুমে নামে কোঁচা'।[১৫২]

আর একধরনের বেশ পদ্ধতি হিন্দু তথা আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে গৃহীত হয়েছিল, সেটি হল বীরধড়া, বীরধটি বা কচ্ছুটি। এই পদ্ধতিতে ধুতির সম্মুখের কোঁচা দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে পেছনে নিয়ে কাছা বা কচ্ছের সঙ্গে খুব শক্ত করে বাঁধা হত। অতিরিক্ত দৃঢ়তারজন্য কোমরে পটুকা বা *Belt* বাঁধা হত। এই রীতিকে সাধারণ ভাবে বলা হত 'মালকচ্ছ' বা 'মালবন্ধ'। পরবর্তীযুগে 'মালকোঁচা' নামে শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[১৫৩]

বঙ্গদেশ মুসলিম প্রশাসনের আওতায় আসার আগে থেকেই, এখানে সেলাইকরা কাপড় পরার প্রচলন ছিল, বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধুতির উপর জামা পরিধানের দৃশ্য লক্ষ করলে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষগণ মুসলমান কেতার কুর্তা-পিরান-ইজের, প্রয়োজনে কখনও বা চোগা চাপকান নয়তো জোব্বা পরতেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির পোশাকে হিন্দু, মুগল ও বিলেতি রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, "পূর্বে পোশাক ছিল চোগা, চাপকান, কাবা, পাগড়ি। এখন হ্যাট, কোট, ওয়েস্টকোট ও পেন্টলুন"। এর সঙ্গে হিন্দু রীতি মিশ্রণে যা তৈরি হল, তা হচ্ছে ধুতি-চাদর-চাপকান-মোজা-কলার বা ধুতি-শার্ট-ফুলমোজা-বুটজুতো-ছাতা। কেউ কেউ অবশ্য হিন্দু ও বিলিতি পোশাকের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেই পরতেন। হিন্দু জমিদার, রাজন্যবর্গ ও অভিজাতবর্গের মধ্যে মুসলমানি দরবারি পোশাকের প্রচলন সতের শতক থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত তা মোটামুটি অক্ষুণ্ন ছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে পোশাকের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রভাবের কারণে বাঙালি ধনীদের মধ্যে দরবারি পোশাকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। মানিক গাঙ্গুলী'র 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে কাবা বা কাবাইয়ের কথা বারবার উল্লেখিত হয়েছে। কাবা, কাবাই, চোগা, চাপকান প্রভৃতি পরিচ্ছদের নামগুলি মুসলিমদের হাঁটুর তলা অবধি লম্বা পোশাকের প্রকারভেদ। কাবা বা কাবাই হল হাঁটুর তলা পর্যন্ত লম্বা ঢিলা ঘের যুক্ত ও ঢিলা আস্তিনের আলখাল্লা জাতীয় একপ্রকার পোশাক। এর সম্মুখভাগ উন্মুক্ত, যা দড়ি বা ফিতের সাহায্যে আবদ্ধ করা হয়। 'সুচেল' জোড়া বলতে বলা হত, উর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের মূল্যবান বস্ত্রের জোড়াকে। মানিক গাঙ্গুলী'র কাব্যে আছে, 'পটুকা পামরি জাদ', যার অর্থ হল রেশমি বস্ত্রের কোমর বন্ধনী, তার উপর ফিতের বাঁধন। ষোল শতক থেকে এই শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়।[১৫৪]

পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী, সুচেল জাতীয় পোশাক পরিহিত হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তির মূর্তি ফলক লক্ষ করা যায়, কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালের মুখ্য প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালের প্রান্তে সজ্জিত উল্লম্ব সারির তলদেশ থেকে তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্যদ্বারের শীর্ষে সজ্জিত অনুভূমিক প্যানেলের তলদেশ থেকে চতুর্থ ফিগারেটিভ প্যানেলের মধ্যবর্তী ফলকে উৎকীর্ণ জলসার দৃশ্যে বাদ্যকরের পরনে যে পোশাকটি দেখা যায়, তার নিম্নাংশটি স্পষ্ট নয়; কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গে রয়েছে ছোট হাতা যুক্ত জামা এবং তারপর হাতাবিহীন জ্যাকেট, যার সম্মুখাংশটি উন্মুক্ত। মাথায় রয়েছে গোল টুপি।

মধ্যযুগে সৈন্যদের সাধারণত পাইক বলা হত। এই পাইক সংগ্রহ করা হত বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে। এইসব পাইকদের যোদ্ধবেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক তথা গোষ্ঠীগত প্রভাব পড়েছিল। সতের-আঠার শতকের যোদ্ধা, সেপাই বা পাইকদের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল মুসলিম শাসন, বিশেষ করে মোগল শাসনের প্রভাবে। মুকুন্দ চক্রবর্তী'র 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে অঙ্গরাখী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। সৈন্যরা অঙ্গরাখী বা আঙ্গিয়া (উর্ধ্বাঙ্গে চর্মনির্মিত বর্ম), চেলনা (একপ্রকার জাঙ্গিয়া), পটুকা (কোমরবন্ধ) এগুলি পরিধান করতেন। এছাড়া সৈন্যরা 'সানা' নামে একপ্রকার চর্মনির্মিত গাত্রবাস পরতেন নিরাপত্তার জন্য।[১৫৫]

কালনার লালজী মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দক্ষিণমুখী দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলে শিঙরা গোঁফ বিশিষ্ট চেলনা পরিহিত সৈন্যদল লক্ষ করা যায়।

পূর্বোক্ত বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে পুরুষমূর্তি ফলকগুলি থেকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ধুতি পরিধানের একটি ধারণা পাওয়া গেল। এরপর আসা যাক মধ্যযুগীয় বিভিন্ন সাহিত্যের পুরুষদের পোশাক সম্পর্কিত আলোচনায়। মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ধুতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'লখিন্দরের বিবাহ' অংশে বলা হয়েছে-

> "হরিদ্রা মাখিয়া গায় কাঞ্চনের দ্যুতি।
> পরিধান করিল পবিত্র পীত ধুতি।।"[১৫৬]

মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে পুরুষের বিবাহ বেশ হিসেবে ‘হরিদ্রাযুত ধুতি’র উল্লেখ পাওয়া যায়। বরের ধুতিটি হলুদ দিয়ে ছোপানো হত, তাই এইরকম নাম।[১৫৭]

‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’এ ভবানন্দ মজুমদারের পোশাক সম্বন্ধে কবি ভারতচন্দ্র বলেছেন-

“শিরে চীরা হীরা তায় বিলাতী খেলাত গায়
নানাবন্ধে কোমর বান্ধিলা।”

অথবা “শিরে চীরা জামা গায় কটি আঁটি পটুকায়।”[১৫৮]

ভারতচন্দ্র ভবানন্দের ‘ধুতি’ পোশাক সম্পর্কে বলেছেন,

“দরবেরে পোষাক ছাড়িল মজুন্দার।
দাসু যোগাইল ধুতি জোড় পরিবার।।”[১৫৯]

কবিকঙ্কণ রচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে কালকেতু ও কলিঙ্গরাজের মধ্যে যুদ্ধ প্রসঙ্গে আদিবাসী পাইকদের যোদ্ধাবেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। কবি, পাইকদের পরিধান সম্পর্কে লিখেছেন-

“পরিধান বীর ধড়ি মাথায় জালের দড়ি
অঙ্গে লেপিত রাঙা মাটি।।”[১৬০]

‘ধটি’ বা ‘ধড়া’ হল পুরনো শব্দ। এর অর্থ বস্ত্রখণ্ড।[১৬১] দ্বিজমাধব পালকি বাহক খাড়ুয়াদের পোশাকের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন- “সভার চরণে নেপুর খাড়ুয়া হরিষ প্রচুর।
রাঙা পাটের ধড়া পৈহ্রে কটির ওপর।।”[১৬২]

পূর্বোক্ত ফলকগুলি ব্যতীত মন্দিরগাত্রে সাধুসন্ন্যাসীদের পোশাক হিসেবে লেঙ্গটা বা কৌপীন অধিকমাত্রায় লক্ষ করা যায়। যেমন, প্রতাপেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের নিম্নাংশে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে তিনজন দণ্ডায়মান বৈষ্ণব সাধুর পরনে কৌপীন রয়েছে। এদের প্রত্যেকের ললাটে হরিমন্দির আঁকা রয়েছে। উক্ত মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিমদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ ব্লকের তলদেশ থেকে পঞ্চম ফলকে কৌপীন পরিহিত বৈষ্ণব সাধু দণ্ডায়মান।

এছাড়াও মন্দিরগাত্রে শুধু কৌপীন পরিহিত মূর্তিফলক দেখা যায়। যেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সতেরো-আঠারো শতকে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে মুনি ও যতি বেশের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈষ্ণব ও শৈব সন্ন্যাসীদের বেশবিন্যাস এবং অঙ্গরাগের পার্থক্য ছিল। বৈষ্ণবগণ কপালে চন্দনের ‘হরিমন্দির’ তিলক ও কণ্ঠে তুলসীবীজের কণ্ঠি এবং শৈবগণ কপালে ‘অর্ধচন্দ্র’ তিলক ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের কণ্ঠি পরতেন। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে ‘ঋষিগণের কাশিযাত্রা’ অংশে ঋষিগণের বেশভূষার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কবি বলছেন-

“হাতে কানে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা।
বিভূতিভূষিত অঙ্গ পরি বাঘছালা।।
রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা ভালে।
ববম্ ববম্ বম্ ঘন রব গালে।।
কোশাকুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে।।
অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পরে উরূপর।
নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁপে বিশদ চামর।।”[১৬৩]

‘চৈতন্যচরিতামৃত’এ বাইরে বহির্বাস এবং ভেতরে কৌপীন পরার রীতির উল্লেখ রয়েছে।[১৬৪] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে লখীন্দর ও বেহুলার যোগীবেশের বর্ণনায় কবি বলেছেন,

“রঙ্গন বসন পরে শ্রবণে কুণ্ডল দোলে
জটা কৈল মস্তকের কেশে।
ধবল দশন পাঁতি অঙ্গে লেপে বিভূতি
তেজিয়া গলার শতেশ্বরী
পিনাকিণী হৈল সুন্দরী।
শঙ্খের কুণ্ডল কানে

যোগী হয়্যা দুইজনে।
গলায় রুদ্রাক্ষমালা
কান্ধে ঝুলি হাতে বালা।"[১৬৫]

এই বর্ণনায় যোগীবেশের পরম্পরাগত ঐতিহ্যই প্রতিফলিত হয়েছে। এরপর যাওয়া যাক পৌরাণিক দেবতাদের পোশাক সম্পর্কিত আলোচনায়। মন্দিরগাত্রে দেবতাগণের পোশাকের কল্পনা মন্দির শিল্পীগণ সাধারণ মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই করেছেন। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের বারান্দার সম্মুখস্থিত মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় সারির বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে গোপিনিদের মাঝে স্বস্তিক ভঙ্গীমায় দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণের পরনের ধুতিটির বহর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত এবং কোঁচাটিও গোড়ালি পর্যন্ত অর্থাৎ ভূমি স্পর্শ করেনি। লক্ষণীয় হল, ধুতির উপর বস্ত্র দিয়ে কোটিবন্ধন করা হয়েছে।

উনিশ শতকের কলকাতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে বাবু কালচারে যেরকম, ভঙ্গীমায় ধুতি পরিধানের রীতি প্রচলিত ছিল, প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালের মুখ্যদ্বারের শীর্ষে রামচন্দ্রের পরনে ঐরকম বৃহৎ বহরযুক্ত কোঁচা দেওয়া ধুতি লক্ষ করা যায়। রামের পরনে ধুতির উর্ধ্বাঙ্গে চোস্তা রয়েছে।

পূর্বে পৌরাণিক দেবতা প্রসঙ্গে নারদমুনির নাম উল্লেখিত হয়েছে। মন্দিরগাত্রে নারদমুনির যে দৃশ্যফলক রয়েছে, সেখানেও তাঁর পরনে ধুতি ও কণ্ঠে উত্তরীয় লক্ষ করা যায়। রামেশ্বর বিরচিত 'শিবায়ন' কাব্যে কবি নারদমুনির বেশভূষার বর্ণনা প্রসঙ্গে 'নারদের কৈলাসগমন সজ্জা' অংশে বলেছেন-

"মুনিবর আপনার করেন সাজন।
বিশদ বদনে' কৈল বিভূতি ভূষণ।।
একখানি ছেঁড়া কাণি পায়্যাছিল পথে।
কান্ধে ছিল কটির কৌপীন কৈল্য তাতে।।
বান্ধিল রুদ্রাক্ষমালে মস্তকের জটা।
নাসাগ্রে দিল মুনি দিব্য অঙ্গ ফোটা।।
দ্বাদশ তিলক তবু সাজিল সুন্দর।
রজত পর্ব্বতে যেন শোভে শশধর।।
শঙ্খ চক্রগদা পদ্ম লিখে বাহুমূলে।
হরিনাম লিখিল সকল অঙ্গস্থলে।।
গলে দিল গাঁথ্যা গাঁথ্যা তুলসীর দাম।
আনন্দে অবশ অঙ্গ মুখে হরিনাম।।"[১৬৬]

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত ব্যতীত অন্যান্য যে সকল পৌরাণিক দেবতাদের মূর্তিফলক মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই পরনে অধোবাস হিসেবে ধুতি আর ঊর্ধ্ববাস হিসেবে রয়েছে 'উত্তরী' বা উত্তরীয়।

পুরুষদের পোশাকের মধ্যে দুটি বিশেষ অঙ্গ হল পাগড়ি এবং জুতো। মাথায় পাগড়ি এবং পায়ে জুতো না থাকলে পোশাকটি সম্পূর্ণ হয় না। প্রথমে আসা যাক 'পাগড়ি' প্রসঙ্গে। মাথায় বাঁধার বস্ত্রকে কখনও 'পাগ' নামেও অভিহিত করা হত, বাঙালিদের বাঁধা পাগড়ি নানারকম হত। এবং তাদের নামও বিচিত্র ছিল। যেমন- পাক, পাগ, পাগড়ি, মুরেঠা বা মারাঠা ইত্যাদি। এগুলি সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড, লঘু শিরোবেষ্ট নীরূপে মাথায় জড়ানো হত। মাথায় পাগড়ি বাঁধার এই রীতিটি কৃত্তিবাসের আমল থেকে প্রায় উনিশ শতক পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে চলেছিল। যদিও এটি সার্বজনীন ছিলনা। মুসলিমরা পাগড়ির ক্ষেত্রে কিছু কিছু অভিনবত্ব এনেছিল। যেমন- গামন্তী, শামলা প্রভৃতি লখনউয়ের অভিজাত মহলে উদ্ভূত হয়ে পরে এবং অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। উনিশ শতকের বাংলায় শামলা শিরোভূষণ হিসেবে জনপ্রিয় ছিল।[১৬৭]

পাগড়ির সম্মুখভাগে বাঁধা পাখির পালক, ধাতু বা রত্নের সূক্ষ্ম শীর্ষ অলংকরণকে বলা হয় 'কলগী'। তোরা বা কলগী পাগড়ির সম্মুখে একটু ডানদিক ঘেঁসে লাগানো হত, ফলে বেশ বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেত। এই কলগী বাঁধার রেওয়াজ বহুদিন পর্যন্ত বাংলার জমিদারদের মধ্যে সচল ছিল। অবশ্য পাগড়িতে কলগী বাঁধতেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন।

১৮৬০সাল পর্যন্ত সাধারণ বাঙালি মানুষ ও স্বচ্ছল মানুষদের মধ্যে পাগড়ির ব্যবহার ছিল যথেষ্ট। ১৮৬০খ্রিঃর পর থেকে তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে।[১৬৮]

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রের অলংকরণে অভিজাত সম্প্রদায়ের পুরুষ মূর্তিগুলিকে শিরে পাগড়ি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পায়ে জুতো পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল-

কাটোয়ার শ্রীবাটির চন্দ্র'পরিবারের ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্যদ্বারের শীর্ষের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দক্ষিণপার্শ্বের প্রথম ফলকে পাগড়ি পরিহিত তিনজন বাদককে লক্ষ করা যায়। অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় সারির বামদিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফলকে অভিজাত সম্প্রদায়ের পুরুষ দণ্ডায়মান, পরনে উর্ধ্বাঙ্গে অর্ধেক হাতাযুক্ত জামা এবং নিম্নাঙ্গে লম্বা ঝুলের এবং দীর্ঘ বহরযুক্ত পোশাক রয়েছে। দু'জনেরই হাতে একটি করে বস্ত্রখণ্ড রয়েছে। দু'জনেরই শিরে কলগীযুক্ত পাগড়ি লক্ষ করা যায়।

পাগড়ির পর যাওয়া যাক পাদুকা সংক্রান্ত আলোচনায়। মানুষের পোশাকের একটি বিশেষ অঙ্গ হল পাদুকা বা জুতো। আবদুল হালিম শরর তাঁর 'পুরনো লখনউ'তে বলেছেন যে, মুসলমানদের আগমনের আগে ভারতবর্ষে জুতোর ব্যবহার একেবারেই ছিল না। কারণ ধর্মীয় দৃষ্টিতে হিন্দুদের চামড়ার পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। পাদুকা বা জুতোর বদলে ব্যবহার হত খড়ম। যদিও এই মন্তব্য সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক। প্রাচীন সূর্যমূর্তির পায়ে চামড়ার জুতো দেখা যায়।[১৬৯] আর একধরনের জুতো হল লপেটা জুতো। এই জুতোর সম্মুখে বাঁকানো শুঁড় তোলা থাকত। এই প্রকারের জুতো পরিহিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক -

লপেটা জুতো পরিহিত পুরুষমূর্তি দেখা যায়, শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে চতুর্থ ফলকে বল্লম ও ঢাল নিয়ে দণ্ডায়মান সৈন্যর ঊর্ধ্বাঙ্গে রয়েছে কলারযুক্ত অর্ধেক হাতা যুক্ত জামা এবং নিম্নাঙ্গে রয়েছে দীর্ঘ ঝুলের বহরযুক্ত পোশাক। পায়ে লপেটা জুতো, মাথায় পাগড়ি।

লপেটা জুতোর আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়, উক্ত মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের কৃত্রিম প্রবেশদ্বারের নিম্নাংশে হিন্দু রাজা ও তার পরিকর বর্গের ব্যভিচারের দৃশ্যটির মধ্যে। এখানে রাজার পরিকর বর্গের মধ্যে তিনজনের পায়ে লপেটা জুতো রয়েছে। আর দু'জনের পায়ে লপেটা জুতোর মতো দেখতে জুতো পরা রয়েছে, কিন্তু জুতোর সম্মুখভাগ বাঁকানো নয়।

মন্দিরগাত্রের চিত্রফলকের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য সাহিত্যে পাগড়ি ও জুতোর যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার কয়েকটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হল। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কবি ভারতচন্দ্র সুন্দরের সাজসজ্জার বর্ণনায় বলেছেন-

"বিলাতী খেলাত পরে জরকাশী চীরা।
মানিক কলগী তোরা চকমকে হীরা।।
গলে দোলে ধুকধুকী করে ধকধক।
মণিময় আভরণ করে চকমক।।"[১৭০]

কবি ভারতচন্দ্র ধূমকেতু নামক নগর কোটালের পায়েও চামড়ার জুতো পড়িয়েছেন। ভারতচন্দ্র বলেছেন- 'চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাদুকার চটচটি'।[১৭১] কৃত্তিবাসী রামায়ণে বহুবার 'পাদুকা' শব্দটি পাওয়া যায়; যেমন কবি একস্থানে বলেছেন, 'শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে'।[১৭২] চামড়ার পাদুকা ব্যতীত লপেটা জুতোর উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে, যার সম্মুখাংশ বাঁকানো শুড়ের মতো হতো। অভিজাত বা ধনী সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে জুতো পরার রীতি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। রামপ্রসাদ সেন জুতোর ফারসি প্রতিশব্দ 'পয়জার' শব্দটি একবার ব্যবহার করেছিলেন।[১৭৩]

মন্দিরগাত্রের অলংকরণে দেশিয় পুরুষদের পোশাক সংক্রান্ত আলোচনার পর কিছু ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশি পুরুষ মূর্তিগুলির পোশাকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল- কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে সপ্তম ফলকে দণ্ডায়মান ইংরেজ পুরুষটির ঊর্ধ্বাঙ্গে পুরোহাতা জামা, নিম্নাঙ্গে রয়েছে পাতলুন এবং পায়ে বুট জুতো।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্যদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত নকশার মধ্যে উৎকীর্ণ ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে ষোড়শতম ফলকে একজন ইংরেজ পুরুষের দেহের ঊর্ধ্বাংশটুকু অঙ্কিত হয়েছে। পুরুষটির পরনে কলার দেওয়া অর্ধেক হাতাযুক্ত পোশাক এবং কণ্ঠ বন্ধনী রয়েছে। মাথায় গোল টুপিটি কান পর্যন্ত নেমেছে। পরবর্তী বিংশতি ফলকেও ইংরেজ পুরুষের বক্ষ পর্যন্ত দৃশ্যায়িত হয়েছে। পুরুষটির কণ্ঠের কাছে ফাঁপানো কুচি দেওয়া বস্ত্র দ্বারা কণ্ঠ বন্ধনী করা হয়েছে।

কালনার লালজী মন্দিরের বারান্দায় পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের তৃতীয় দক্ষিণমুখী দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে ইংরেজ সৈন্যদলের একটি দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। সৈন্যগণ প্রত্যেকেই হাঁটু পর্যন্ত পাতলুন এবং দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গে পুরোহাতা জামা পরে রয়েছে। দুটি পায়ের মাঝখানে কোমর থেকে একটি দড়ি ঝুলছে। মাথায় রয়েছে গোল টুপি এবং হাতে রয়েছে বন্দুক।

শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরে বিদেশি মঙ্গোলয়েডদের ফলক দেখা যায় দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের শেষ প্রান্তে চারটি ফলক দ্বারা নির্মিত অনুভূমিক সারির উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে পঞ্চম সারি পর্যন্ত। তাদের পরনে ঊর্ধ্বাঙ্গে রয়েছে জামা এবং নিম্নাঙ্গে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলের ঘেরযুক্ত পোশাক। মুখমন্ডলে ছুঁচাল দাড়ি এবং মাথায় বিচিত্র মুকুট বা পাগড়ি। হাতে একটি লম্বা দণ্ডও রয়েছে। এইরকম পোশাক পরিহিত ফলক লক্ষ করা যায়, উক্ত মন্দিরেরই সম্মুখভাগের দেওয়ালের দু'প্রান্তে।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে ভিক্টোরিয়ান চেয়ারে উপবিষ্ট বিদেশির পরনে সর্বাঙ্গ আবৃত পোশাক রয়েছে। পোশাকটি দেহের সঙ্গে আঁটসাঁট করে লাগানো রয়েছে। মাথায় রয়েছে বিচিত্র টুপি, যার অগ্রভাগটি বাঁকানো।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত মূলক আলোচনাটি থেকে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন জাতি, ধর্মের পুরুষ মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে কিছু খণ্ডচিত্র পাওয়া গেল। এরপর মন্দিরগাত্রের অলংকরণে মহিলাদের বেশভূষার দৃষ্টান্ত মূলক আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক। বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে নারীদের যে ফলকগুলি লক্ষ করা যায়, সেগুলির মধ্যে নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু'ধরনের পোশাক পরিধান করে রয়েছেন; এক শাড়ি এবং দুই ঘাগরা।

'শাড়ি' শব্দটির উৎস 'শাট' বা 'শাটক' শব্দজাত 'শাটিকা'। শাটক শব্দের মূল অর্থ ছিল ফালির মতো সরু দৈর্ঘ্যের জোড়া দেওয়া কাপড়। বঙ্গদেশে বহু পূর্ব থেকেই এটি প্রচলিত ছিল। শাটক জোড়া দিয়ে যে বস্ত্র তৈরি হত, তা নারী পুরুষ উভয়েই পরতেন। নিম্নাঙ্গ ও ঊর্ধ্বাঙ্গ এই দুই স্তরে একটি শাড়িকে দুই বেড় দিয়ে পরার রীতিকে বলা হত 'দোছাট'।[১৭৪] সতের-আঠার শতকের নারীবেশে ধীরগতিতে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও, মোটের ওপর তা মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য থেকে খুব বেশি দূরে সরে যায়নি।[১৭৫] মন্দিরগাত্রে সজ্জিত কয়েকটি ফলকের দৃষ্টান্ত থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে প্রথম উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ ব্লকের তলদেশ থেকে অষ্টম ফলকে উপবিষ্ট নারীর পরনে রয়েছে শাড়ি। বক্ষদেশ ঐ একই কাপড়ে আবৃত এবং মাথায় অবগুণ্ঠন রয়েছে।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউলেশ্বর শিবমন্দিরটির দক্ষিণপার্শ্বের প্রথম কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে তলদেশ থেকে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় সারির বামপার্শ্বের প্রথম ফলকটিতে দু'জন স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান, তাদের পরনে রয়েছে শাড়ি এবং ব্লাউজ, মাথায় অবগুণ্ঠন।

অষ্টাদশ-উনিশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে নারীগণের মূর্তিফলকে যে শাড়িগুলি লক্ষ করা যায়, সেই শাড়িগুলিতে পাড়ের সুপ্রচুর ব্যবহার লক্ষণীয়। শাড়ি যে সর্বদা সামনের দিকে ভাঁজ করে বা কুচি দিয়ে পরা হত, তাই নয়, মাঝেমাঝে দু'পা বেষ্টন করে পেছনে কচ্ছ দিয়েও পরা হত।[১৭৬] শাড়ি পরিধানের বিভিন্ন কায়দা লক্ষ করা যায় পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে। সেগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল।

দেবীপুরের মন্দিরটির সম্মুখস্থিত ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দায় বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে মাতা যশোদা, বালক কৃষ্ণকে নিয়ে দণ্ডায়মান। এখানে মাতা যশোদা আটপৌরে করে শাড়িটি পরিধান করেছেন, মাথায় অবগুণ্ঠন রয়েছে।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে রাম- রাবণের যুদ্ধ দৃশ্যের মাঝে দেবী আধুনিক কালের শাড়ি পরিধানের ভঙ্গিমায় শাড়িটি পরিধান করেছেন। কটি থেকে কুচি দেওয়া এবং বামকাঁধে শাড়ির আঁচলটি রয়েছে। বর্তমানে যেমন দেবী দুর্গার মূর্তিতে শাড়ি পরানো থাকে, ঠিক তেমনই দেখতে লাগছে এই মূর্তি ফলকটিতে।

উক্ত মন্দিরেরই পূর্বমুখী দেওয়ালের মুখ্যদ্বারের শীর্ষে 'রামরাজা'মোটিফে দেবী সীতা আধুনিক রীতিতে শাড়ি পরিধান করে রয়েছেন। কটিদেশ থেকে কাঁচাটি ছড়িয়ে রয়েছে এবং মাথায় অবগুণ্ঠন দিয়ে শাড়ির আঁচলের বাকি অংশটুকু বামহাতে ধরে রয়েছেন। শাড়িটির পাড়ে সুন্দর নকশা করা রয়েছে।

দুর্গা এবং সীতা এই দুই পৌরাণিক নারীমূর্তিগুলিতে শাড়ি পরিধানের রীতিটি আধুনিক। যদিও মন্দিরগাত্রের অলংকরণে মহিলাদের আটপৌরে করে শাড়ি পরা ফলকের সংখ্যাই অধিক। পার্শিদের অনুপ্রেরণায় সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এই রীতির প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তীকালে কোচবিহারের মহারানি যার কিছুটা সংস্কার করেন। প্রতাপেশ্বর মন্দিরটির নির্মাণের সময়কাল ১৮৪৯খ্রিঃ এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নতুন কায়দায় শাড়ি পরার সময়কাল আনুঃ ১৮৬৫খ্রিঃ। আধুনিক কায়দায় শাড়ি পরিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতাপেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করে ঠাকুরবাড়ির দাবি অস্বীকার করেছিলেন অমিয়কুমার মজুমদার মহাশয়।[১৭৭]

এই রীতিতে কাপড় পরিধানরত মূর্তি রয়েছে, বনকাটির গোপালেশ্বর মন্দিরের দ্বারের শীর্ষে 'রামরাজা'মোটিফে। উক্ত ফলকে সীতা এইভাবে দু'পা বেষ্টন করে কাপড় পরিধান করে রয়েছেন। মাথায় অবগুণ্ঠনটি বৃহদাকারে দেওয়া রয়েছে।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নারীগণের পোশাক বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। শাড়ি পরিধান নিয়ে কবি ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে একজন নারীর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন এইভাবে, 'শাখা সোনা রাঙ্গা শাড়ি না পরিনু কভু'।[১৭৮] কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থে অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী যে পোশাক পরিধান করে শিশু চৈতন্য'কে দেখতে গিয়েছিলেন, তাতে কাটোয়া অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদিগের বস্ত্রালঙ্কারের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বস্ত্রের যে পরিচয় গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায়, সেই অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা হল-

"চিত্র বর্ণের পট্টশাড়ি ভুনিফোতা পট্টপাড়ি,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন।"[১৭৯]

অর্থাৎ সেকালের ভদ্রমহিলাগণ কেবল শাটী মাত্র পরিধান করেই ভিন্ন স্থানে যেতেন না। তখনকার 'ভুনিফোতা' একালের চাদর বা ওড়নার ন্যায় আবরণ বস্ত্র ছিল।[১৮০]

ষোড়শ শতাব্দীর কবি দ্বিজবংশীবদনের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে গঙ্গাজলি শাড়ি, নেতের উড়ানি, পাটশাড়ি, ঘুঘরা, নীতিবন্ধ ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন সুচেল নামক পট্টবস্ত্র হতো। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসার- ভাসানে চেলি, মলমল, জোড়ধুতি, ছিট উড়ানি, আনন্দাই শাড়ি, চিকন বনাতে, গর্ভসুতি- ডুর্‍্যা, নীলশাড়ি, পাটাম্বর, সালমের থান, জামাজোড় ও ভোট কম্বলের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী খুল্লনাকে, 'দোছাট করিয়া তসরের সারি' পরিয়ে সাধুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়েছিলেন।[১৮১]

বর্ধমান জেলার মন্দির ভাস্কর্যে নারীমূর্তিগুলির মধ্যে অভিজাত পরিবারের মহিলাদের সেমিজ বা ব্লাউজের উপর শাড়ি পরা মূর্তি লক্ষ করা গেছে। এছাড়া আর একধরনের পোশাক মন্দিরগাত্রে বহুলাংশে লক্ষ করা যায়, সেটি হল ঘাগরা।

মধ্যযুগীয় সময়সীমায় সাধারণ নারীদের পোশাক হিসেবে শাড়ি, কাঁচলি এমনকি ঘাগরা পরিধানের কথাও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত ঘেরদার ঢিলে পোশাকের নামই হল ঘাগরা।

ঘাগরার সঙ্গে কাঁচুলির ব্যবহার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বঙ্গদেশে কাঁচুলির ব্যবহার বেশ কিছু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের সময় (চোদ্দ শতকের শেষভাগ) থেকে আমরা কাঁচুলির উল্লেখ পাই।[১৮২]

এই কাঁচুলি সেলাই করেইও নির্মিত হতো বলে মনে করা হয়। বিজয় গুপ্ত'র কাব্যে সেলাই করে কাঁচুলি তৈরির কথা স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে। *Charles Fabri* ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই কাঁচুলি, চোলির সমর্থক। অষ্টাদশ শতকের বাঙালি মেয়েরা ঘাগরা, চোলি ও ওড়না ব্যবহার করতেন এবং বিভিন্ন ধরনের শাড়িও পরতেন। পোড়ামাটির মূর্তিফলকে ঘাগরা- চোলি- ওড়নার প্রচুর দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। ভারতীয় নারীদের এই তিনখন্ডের পোশাকের কথাই *Charles Fabri* বলেছেন। এই তিনখন্ডের পোশাকের প্রস্থ বা *Set* বঙ্গদেশের নারীদের সাধারণ পরিধেয় ছিল না। এই পোশাক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন নর্তকী এবং বাইজিরা। এছাড়া মুসলমান সমাজেও এই রীতির পোশাকের ধারাবাহিকতা অনেকদিন পর্যন্ত রক্ষা হয়েছিল। ইউরোপীয়দের মনোরঞ্জনের জন্য ঘাগরা, চোলি, ওড়নায় সজ্জিতা হতেন নর্তকীগণ। ঘাগরার কাপড়ে বিভিন্ন নকশা করা হত। চোলির হাতা কনুই পর্যন্ত হতো। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার দরিদ্র মানুষেরা প্রধানত পাটের কাপড়ই পরতেন। অন্যদিকে দিল্লির মুসলমান অভিজাত ও বাদশাহি পরিবারের অনুকরণে বাংলার হিন্দু- মুসলমান অভিজাত নারীদের মধ্যে আঙ্গিয়া বা ব্লাউজ জাতীয় ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক পরার রীতি প্রচলিত হয়েছিল, সঙ্গে ছিল শাড়ি। মুসলমান অভিজাত মহিলাগণ অনেকসময় ঘাগরাও পরতেন, সেই সঙ্গে ছিল ব্রিচেস ও শার্ট।[১৮৩]

বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলিতে শাড়ি পরিহিত নারীদের পাশাপাশি ঘাগরা, চোলি, ওড়নি পরিহিত নারীদের ফলকও লক্ষ করা যায়। এই ঘাগরা পরিহিত নারীমূর্তি ফলক অধিক পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়, কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরে। এই মন্দিরের প্রতিটি দেওয়ালেই ঘাগরা পরিহিত নারীমূর্তি ফলক লক্ষ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য মন্দিরগুলিতে কম- বেশি ঘাগরা পরিহিত নারীমূর্তিফলক লক্ষ করা যায়। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল-

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিমদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে বিভিন্ন রীতিতে ঘাগরা পরিহিত ছয়জন নারীর দণ্ডায়মান মূর্তিফলক রয়েছে। বামদিক থেকে প্রথম জনের পরনে চোলি ও ঘাগরা রয়েছে। ডানহাতের উপর থেকে ওড়নিটি নীচের দিকে ঝুলে রয়েছে। দ্বিতীয় জনের পরনে ঘাগরা রয়েছে, কিন্তু চোলি বা কাঁচুলি কিছুই নেই, বক্ষাবরণ হিসেবে বৃহৎ ওড়না ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয় নারীটির পরনে নিম্নাঙ্গে রয়েছে ঘাগরা, ঊর্ধ্বাঙ্গে রয়েছে চোলি বা ব্লাউজ। ওড়নাটি বামহাতের উপর থেকে নীচের দিকে ঝুলছে। চতুর্থ নারীটির পরনে নিম্নাঙ্গে রয়েছে ঘাগরা এবং ঊর্ধ্বাঙ্গে ব্লাউজ রয়েছে। ওড়নাটি কোমরে বাঁধা রয়েছে। পঞ্চম নারীটির পরনের ঘাগরাটি দ্বিতীয় নারীটির অনুরূপ। ষষ্ঠ নারীটির পরনে চতুর্থ নারীটির অনুরূপ ঘাগরা রয়েছে।

উক্ত মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালে মুখ্যদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে পঞ্চম ফলকে দেখা যায়, দু'জন নারী দণ্ডায়মান এবং দু'জনের পরনেই ঘাগরা রয়েছে। দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গে রয়েছে কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা নকশা করা ব্লাউজ। ওড়না নেই।

উক্ত মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে চতুর্থ ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় ফলকে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট দু'জন নারীর বক্ষ অনাবৃত, কিন্তু পরনে ঘাগরা ও ওড়না রয়েছে। ওড়নাটি কোমরে গুজে বামপাশ থেকে মাথার উপর দিয়ে নিয়ে ডানকাঁধের থেকে সামনের দিকে নেমে এসেছে।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্যদ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে চতুর্থ ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে বাইজির নৃত্যদৃশ্যে বাইজির পরনে রয়েছে দীর্ঘ ঘেরযুক্ত ঘাগরা, ঊর্ধ্বাঙ্গে কনুই পর্যন্ত হাতাযুক্ত ব্লাউজ এবং তার উপরে হাতাবিহীন চোগা। বাইজি বামহাত দিয়ে ঘাগরার একপ্রান্ত উঁচু করে ধরে রয়েছেন এবং ডানহাত দিয়ে ঘাগরার সম্মুখাংশ কিছুটা কুচি উঁচু করে ধরে রয়েছে।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দায় বহিঃদ্বারগুলির সম্মুখাংশের ফলকগুলিতে যে সকল নারীদের মূর্তি লক্ষ করা যায়, তাদের প্রত্যেকের পরনে রয়েছে ঘাগরা, চোলি ও ওড়না। কিন্তু ঘাগরার বহর অনেকটাই ছোট। কোন নারীর মাথায় ওড়না নেই, কোমরে বিভিন্ন কায়দায় বাঁধা রয়েছে।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি ব্যতীত মন্দিরগাত্রে পৌরাণিক চরিত্রের চিত্রফলকেও ঘাগরা, চোলি লক্ষ করা গেছে। কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান রয়েছেন রাধা। রাধার পরনে ঘাগরা, চোলি। চোলির উপর কনুই পর্যন্ত হাতাযুক্ত চোগা যেটির বুকের কাছে কাটা এবং ঢিলা। মাথায় রয়েছে ওড়না। রাধার বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান দু'জন গোপিনির পরনে রয়েছে ঘাগরা এবং বক্ষাবরণ হিসেবে রয়েছে ওড়না।

আধুনিক কালের মতো প্রাচীনযুগের বাঙালি নারী শাড়ির সাহায্যে ঊর্ধ্ববাস রচনা করতেন না। তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গ অধিকাংশ সময় অনাবৃত থাকত। ডঃ নিহাররঞ্জন রায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, যে উচ্চস্তরে ও নগরাঞ্চলে কতকটা মধ্য ও উত্তর- পশ্চিম ভারতের আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রেরণায় কেউ কেউ উত্তরীয় বা ওড়নার সাহায্যে ঊর্ধ্বাঙ্গের কিছু অংশ আবৃত করতেন; অনেকে বক্ষাবরক হিসেবে চোলি বা স্তনপট্ট ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ সেলাই করা একজাতীয় জামার দ্বারা স্তন, নিম্নবাহু ও বাহুমূল পর্যন্ত দেহাংশ ঢেকে রাখতেন। এছাড়াও তিনি বলেছেন যে, নারীদের দেহের, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করে রাখার ঐতিহ্য শুধু বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, বস্তুত সমগ্র প্রাচীন আদি অস্ট্রেলীয় পলিনেশীয় মেলানেশীয় গোষ্ঠীর মধ্যেই এটিই সাধারণ নিয়ম ছিল।[১৮৪]

মন্দিরগাত্রে নারীদের বিভিন্ন প্রকার পোশাক পরিহিত মূর্তিগুলি ব্যতীত এমন কিছু মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়, যেখানে নারীদের বক্ষে কোন আবরণ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বারাঙ্গনাদের ফলকগুলিতে এইরকম দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কালনার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষাংশে রাম- রাবণের যুদ্ধদৃশ্যে রাবণের পশ্চাতে খড়্গ হাতে দণ্ডায়মান দিগম্বরী মূর্তি লক্ষ করা যায়। উক্ত দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ফলকে দিগম্বরী নারীমূর্তি লক্ষ করা যায়।

মন্দির ভাস্কর্যের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় বিভিন্ন সাহিত্যে নারীগণের ঘাগরা, চোলি পোশাকটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- সতের শতকে রচিত 'ময়নামতীর গান', আঠারো শতকে 'শিবায়ন', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে ঘাগরা বা ঘাগুরি'র উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮৫]

রামেশ্বর রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে 'গৌরীর বাল্যলীলা'য় গৌরীর পরিধান প্রসঙ্গে কবি লিখছেন-

"কটিদেশ কিঙ্কিণী করিছে কলরব।
ঘাঘরের উপরে ঘণ্টার ঘটা সব।।
বিচিত্র কাঁচলি বান্ধা বুকের উপর।
উডুগণ আলো কর্য়া আছে নিরন্তর।।" [১৮৬]

বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'দানখণ্ডে' শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলছেন- 'কাঞ্চলী ঘুচাআঁ রাধা দেহ মোরে কোল'।[১৮৭] গোবিন্দদাস 'দানলীলায় রসাবেশ বর্ণনা' প্রসঙ্গে কিশোরীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'কাচলি পর নীলমণি হারিণি'।[১৮৮]

সেকালের বাঙালি মহিলাদের নানা রঙের কাঁচুলি ব্যবহারের কথা প্রায় সকল কাব্যেই অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। কাঁচুলির চলন পশ্চিমের মতো বঙ্গদেশেও ছিল, কারণ কবি কৃত্তিবাস থেকে ধর্মমঙ্গলের রূপরাম ঘনরাম পর্যন্ত সকলেই কাঁচুলির অল্পবিস্তর বর্ণনা দিয়েছেন। ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতে কার্তিকেয় রায় মহাশয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের কথায় লিখেছেন, 'রাজ্ঞী, রাজবধূ ও রাজকন্যারা কার্পাস বা কৌষেয় শাটী পরিতেন, কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভ কর্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশিয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলি ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করতেন'। পরবর্তীকালে পুরুষদের পাগড়ির সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের কাঁচুলি পরার রীতিও এদেশ থেকে প্রায় অন্তর্ধান হয়ে যায়।[১৮৯]

মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যে দেশিয় নারী ব্যতীত কিছু বিদেশি নারীমূর্তিও লক্ষ করা যায়, যারা বিভিন্ন ধরনের বিদেশি পোশাক পরিহিতা। এইরূপ মূর্তিফলকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হল- শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের

দক্ষিণপার্শ্বের কার্নিশের ঊর্ধ্বে উৎকীর্ণ ফলকে কুচি দেওয়া গ্রাউন পরা মেমসাহেবের মূর্তি লক্ষ করা যায়। তার হাতে একটি দণ্ড রয়েছে। এবং তার বামপাশের দেওয়ালে কার্নিশের উর্ধ্বে কুচি দেওয়া গ্রাউন পরিহিতা মেমসাহেবের মূর্তিফলক দেখা যায়।

উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণের ভোলানাথ মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে নকশার মতো উৎকীর্ণ ফলকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত প্যানেলটির উপর থেকে পঞ্চম ফলকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত আঁটসাঁট একটিমাত্র পোশাক পরিহিত মেমসাহেবের মূর্তি লক্ষ করা যায়। ইনি দুটি হাঁটু পেছনে মুড়ে কোলের মাঝে একটি টুপি বামহাত দিয়ে ধরে বসে রয়েছেন।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালের শেষ প্রান্তে উল্লম্ব ভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের চারটি করে ফলক নিয়ে গঠিত সারিগুলির মধ্যে তলদেশ থেকে ষষ্ঠ সারির বামপার্শ্ব থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ ফলকে গ্রাউন পরিহিত মেমসাহেবের মূর্তি লক্ষ করা যায়। তৃতীয় ফলকে মেমসাহেব গ্রাউনের উপর পুরোহাতা ঢিলে চোগার মতো দেখতে বস্ত্র পরে রয়েছেন। কোমরে কাপড়ের বন্ধনী রয়েছে। চতুর্থ ফলকেও মেমের কোমরে কোমর বন্ধনী রয়েছে।

ইংরেজ মেমসাহেবের মূর্তিফলক দেখে অনুমান করা যায় যে, তাদের পোশাকের মধ্যে টুপি পরাটা আবশ্যিক ছিল। তবে জুতো পায়ে মেমের মূর্তিফলক কোন মন্দিরগাত্রে দেখা যায়নি, এমনকি কোন দেশিয় মহিলার পায়েও জুতো দেখা যায়নি।

অবশেষে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ বিভিন্ন ফলকে নারীপুরুষের বেশভূষণ দেখে বলা যায় যে, পৌরাণিক চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে শিল্পীগণ অধিকাংশক্ষেত্রে দরবারি পোশাককেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন, রাবণের পোশাক সর্বদা দরবারি। কোন কোন ক্ষেত্রে রামসীতার বেশভূষায় আধুনিকতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকে কলকাতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে যে বাবুকালচারের প্রাধান্য ছিল, তারই প্রভাব মন্দিরগাত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে সাধারণ পুরুষদের পোশাকের অধিকাংশই ধুতি, চাদর, উত্তরীয় লক্ষ করা যায়। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে পোশাক সাধারণত দরবারি। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল দেবদেবীদের অঙ্গাবরণ রচনার সময় ভাস্করগণ মানবসমাজে ব্যবহৃত পরিধেয়কেই অনুকরণ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে কোন কাল্পনিক নমুনার বশবর্তী হননি।

মন্দির সজ্জায় নরনারীর অলংকার চিত্রণ-

দেহের শোভা বৃদ্ধির কৃত্রিম উপায় হল বসন ও ভূষণ।[১৯০] ভূষণের মধ্যে গহনা বা অলংকার সর্বাপেক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে তা বলাইবাহুল্য। ভূষণের প্রতি এই আকর্ষণ মানুষের কতকাল হতে, তা বলা অসম্ভব। তবে অতি প্রাচীনকাল হতে মানুষ ভূষণ হিসেবে গহনার ব্যবহার করে আসছে।[১৯১] আদিম মানুষ রচিত চিত্র বা মূর্তি এবং তাদের ব্যবহৃত গহনা দেখে অনুমান করা যায়, যে তারা দেহের শোভা বৃদ্ধির চেষ্টা করত। তার মসৃন প্রস্তর বা উপলখণ্ড বা কোন শ্বাপদের নখ ও দন্ত, কোন হিংস্র জন্তুর চোয়াল, ঝিনুক বা শুক্তি ইত্যাদিতে ছিদ্র করে, পশুলোম বা পশুচর্ম নির্মিত সুতার সাহায্যে অলংকার অভিলাষী ব্যক্তির অঙ্গে পরিয়ে দেওয়া হত।[১৯২] তারপর ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে গহনার ব্যবহার ও গহনা নির্মাণ ও রচনা, কলাবিশেষে পরিণত হয়েছিল, এখনও সেই বিদ্যা বর্তমান রয়েছে। কারণ যাই হোক না কেন মানুষ পরিচালিত সমাজে শ্রেণিবিভাগের মতো ভূষণসামগ্রীর উপকরণের মধ্যেও কৃত্রিম শ্রেণিবিভাগ হয়ে গেছে। দেশ ও কালের প্রভেদে রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে, যা একদেশের মতে সুন্দর, তা অন্যদেশে কুৎসিত; এককালে যা সৌন্দর্য ও রুচিবোধের পরিচায়ক ছিল, এখন তাকে হেয় জ্ঞান করা হয়। তবে সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে, সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধ যদিও দেশ- কাল- পাত্র হিসেবে পৃথক হয় এবং একই দেশে একই সময়ে ও সমাজে ভিন্ন রুচির লোক দেখা যায়, কারণ সমাজ, পরিবার ও শিক্ষাস্থলের আপেক্ষিক প্রভাবের উপর লোকের রুচিবোধ অনেকখানি নির্ভর করে- তবু একথা সত্য যে, পৃথিবীতে এমন অনেক স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সুন্দর জিনিস আছে যার সৌন্দর্য, দেশ- কাল- পাত্র নির্বিশেষে অধিকাংশ সভ্য মানুষেরই রুচিতে ভাল লাগে।[১৯৩]

অলংকার প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে। তবে বর্তমানে মন্দিরগাত্রের অলংকরণে নারীপুরুষের অলংকার সজ্জার বিষয়টির দৃষ্টান্তমূলক আলোচনা করা হবে। মন্দিরগাত্রে নারী- পুরুষ উভয়

মূর্তিতেই অলংকার লক্ষ করা গেছে। যেমন- কানে কুণ্ডল, কণ্ঠে হার, হস্তে বালা, চুড়ি, পায়ে নূপুর ইত্যাদি। এছাড়া বাজুবন্ধ, ললাটিকা ইত্যাদি অলংকার পরিহিত মূর্তি অল্প পরিমাণে হলেও মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে।

পূর্বোক্ত অলংকার গুলির মধ্যে কুণ্ডল, হার, বালা বা চুড়ি, নূপুর ইত্যাদি মন্দিরগাত্রের প্রায় অধিকাংশ মূর্তিফলকেই লক্ষ করা যায়। তাই এই অলংকারগুলি পরিহিত কোন মূর্তিফলকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল না। অধিকাংশ সাধারণ পুরুষ ও নারী মূর্তিদের দেহে পূর্বোক্ত গহনাগুলি দেখা গেছে। তবে পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে কিছু কিছু গহনা লক্ষ করা গেছে, যেগুলি সাধারণ নারীপুরুষের পরনে লক্ষ করা যায়নি। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল-

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম ফলকে কৃষ্ণের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান রাধার মূর্তিফলকে দু'হাতে কঙ্কণ লক্ষ করা যায়।

বনকাটির গোপালেশ্বর শিবমন্দিরের দ্বারের শীর্ষাংশে রামসীতার ফলকে রামের হাতে বালা, কণ্ঠে হার ও কানে কুণ্ডল রয়েছে এবং সীতার কানেও কুণ্ডল, কণ্ঠে হার, হাতে চুড়ি ও বালা, পায়ে নূপুর রয়েছে।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দায় প্রবেশের বামপার্শ্বের বহিঃদ্বার সংলগ্ন স্তম্ভের তলদেশ থেকে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের তিনটি ফলকেই বাজুবন্দ পরিহিত নারীমূর্তির ফলক লক্ষ করা যায়। উক্ত তিনজন নারীর মাথায় ললাটিকা রয়েছে। মাথার সিঁথিতে 'ললাটিকা' অলংকারটি পরা হয়।

মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মূর্তিফলক গুলিতে নারী পুরুষ উভয়ের কপালেই টিপ লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব পুরুষদের মধ্যে হরিমন্দির তিলক কাটা দেখা যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশেরই ললাটে টিপ লক্ষ করা যায়। কোন কোন সময় কৃষ্ণের মূর্তিফলকেও কৃষ্ণের ললাটে টিপ পরিলক্ষিত হয়।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের মুখ্যদ্বারের শীর্ষে উৎকীর্ণ পূর্বোক্ত 'রামরাজা'মোটিফে রামের ললাটে হরিমন্দির ও সীতার ললাটে টিপ লক্ষ করা যায়। দু'জনের কানেই কুণ্ডল এবং পায়ে নূপুর রয়েছে। রামের শিরে মুকুট শোভা পাচ্ছে।

মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ফলকগুলির দৃষ্টান্ত উল্লেখের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যা থেকে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত গহনা বা অলংকার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে, কারণ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যময় অলংকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে'লখিন্দরের বিবাহ করিতে গমন' অংশে বেহুলার সাজসজ্জার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-

"সুবর্ণ কুন্ডল দিল কর্ণেতে তাহার
নবীন জলদে যেন শোভে শশধর।।"[১৯৪]

ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'বিদ্যার বিপরীত বিহার' প্রসঙ্গে লিখেছেন-

"ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে।
রন রন রন নূপুর গাজে।।"[১৯৫]

কেতকাদাস 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'লখিন্দরের বিবাহ' প্রসঙ্গে লখিন্দরের অলংকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন-

"মকর কুন্ডল কানে ঘন ঘন দোলে।
গজ মুকতার হার শোভে তার গলে।।
নানা অলংকারে সাজে শিশু লখিন্দর।
হাতে হেম তাড়বালা মুখ শশধর।।"[১৯৬]

রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে গৌরীর বাল্যলীলা প্রসঙ্গে কবি বিবিধ অলংকারের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন-

"কণ্ঠদেশে করে শোভা কত রত্নহার।
মণির মোহন মালা মূল্য নাঞি যার।।
সুবলিত ভুজে শোভে সুবর্ণের চুড়ি।
সূর্য্য রহিলেন যেন সৌদামিনী বেড়ি।।

রজতের কঙ্কণ রহিল তার কোলে।
হাটকজড়িত হীরা দপ্ দপ্ জ্বলে।।
আগে শোভে পৈঁছি পশ্চাতে বাজুবন্দ।
দিব্য ঝাঁপা পাট থোপা দেখিতে সুনন্দ।।”[১৯৭]

পূর্বোক্ত ‘পৈঁছি’ হল হাতের মণিবন্ধে পরার অলংকার বিশেষ। এবং বাজুবন্ধ হল উপর হাতের অলংকার। অনেকদিন ধরেই এই অলংকার দুটি জনপ্রিয় ছিল। বাজু (বাহু) শব্দটি যুক্ত হয়ে বাজুবন্দ নামটি সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত হয়েছিল।[১৯৮]

কৃষ্ণচন্দ্র কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী যে অলংকারগুলি পরিধান করেছিলেন শিশু চৈতন্য’কে দেখতে যাওয়ার জন্য, তার একটি বর্ণনা দেওয়া হল-

“সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজতের পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ,
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।
ব্যাঘ্র নথ হেম জড়ি, কটি পট্টসূত্র ডোরি,
হস্ত পদের যত আভরণ
চিত্র বর্ণের পট্টশাড়ি, ভুনিফোতা পট্টপাড়ি,
স্বর্ণ রৌপ মুদ্রা বহুধন।”[১৯৯]

বিদ্যাপতি রচিত কাব্যে ‘মণিময় মঞ্জীর পায়’, ‘কঙ্কণ মণিময় হার’, ‘নাসায় বেসর মণি কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল’ ইত্যাদি যে বিভিন্ন ধরনের অলংকারের কথা জানা যায়, সেগুলি বঙ্গের ধনীঘরের অলংকার হিসেবেই পরিচিত। তবে ‘কিঙ্কিণি কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন, ঘন ঘন নূপুর বাজে’ ইত্যাদি এই গহনাগুলি সাধারণের কানেও বেজে উঠত বলে ধরে নেওয়া যায়।[২০০]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী খুল্লনার অলংকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘শ্রবণ উপরে পরে কনক বউলি’, ‘মণি বিরাজিত হেম মধুরা কিঙ্কিণি’ ইত্যাদি; এছাড়াও শিরোমণি, ললাটের সিঁথি, গলায় পদক ও হেম পাশুলিও রয়েছে।[২০১] এছাড়া চণ্ডীদাস বিরচিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এবং ‘বৈষ্ণব পদাবলি’ কাব্যে ‘নূপুর’ অলংকারটির কথা বারংবার এসেছে।

সবশেষে বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় সমাজে নারী পুরুষগণ বিভিন্ন ধরনের অলংকার ব্যবহার করতেন, কিন্তু সেই সমস্ত অলংকারের অধিকাংশেরই চিত্রিতরূপ মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায় না। শুধুমাত্র সাধারণ কয়েকরকমের অলংকারই মন্দিরগাত্রে মূর্তিফলকের শোভাবর্ধন করেছে। তবুও বলা যায়, উৎকীর্ণ ফলকগুলিতে গহনা বা অলংকারের প্রাচুর্য এবং সামান্য বৈচিত্র্যও দর্শককে মুগ্ধ করে।

মন্দির সজ্জায় নরনারীর কেশসজ্জা-

পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার দুটি’ই নারী- পুরুষ উভয়েরই সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এর পাশাপাশি সুন্দর কেশবিন্যাসও উভয়ের সৌন্দর্যের মাত্রাকে একটু বাড়িয়ে দেয় বলা চলে। মন্দিরগাত্রে টেরাকোটার মূর্তিফলকগুলিতে নারী- পুরুষ উভয়েরই বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কেশবিন্যাস লক্ষ করা যায়। তবে সেই সকল মূর্তিফলকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কারণ অধিকাংশ মূর্তিফলকের মধ্যে পুরুষদের শিরে রয়েছে পাগড়ি, টুপি বা অন্যান্য মস্তকাবরণ এবং নারীদের মস্তক বস্ত্রাভরণে আবৃত। আর পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাথায় মুকুট অথবা উন্মুক্ত কেশ বা কেশগুচ্ছ চূড় করে উপযুক্তভাবে বাঁধা। মন্দিরগাত্রে কেশসজ্জার যে ভঙ্গিমাগুলি অভিজাত মানুষের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল-

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার বহিঃদ্বারগুলির সম্মুখাংশে উৎকীর্ণ ফলকগুলিতে যেসকল নারীমূর্তি লক্ষ করা যায়, তাদের মস্তকের মধ্যবর্তী স্থানে খোঁপা বাঁধা রয়েছে। পূর্বোক্ত এই ধরনের খোঁপাকে বলা হয় ‘ঝুটকি’। এই ধরনের খোঁপা মাথার ব্রহ্মতালুর উপর এলোচুলেই বাঁধা হতো। দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বৃহৎবঙ্গ’ বইতেও

'ঝুটকি' খোঁপার কথা পাওয়া যায়।[২০২] মন্দিরগাত্রে দু'এক জায়গায় নারীদের কাঁধের কাছে খোঁপা লক্ষ করা যায়, একে বলে 'লোটন' খোঁপা। এই খোঁপা পেছনে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে থাকে।[২০৩]

পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে কৃষ্ণের মূর্তিফলকে, কৃষ্ণের মাথায় মুকুট অথবা শিখিপাখা দেখা যায়। আর একধরনের চুল বাঁধার প্রথা হল মাথার উপর উভঝুঁটি বাঁধা। এটি অতিপ্রাচীন চুল বাঁধার ধরন। কখনও কখনও মালার পুঁতি, তাবিজ বা তুলসীর বীজ গেঁথে দীর্ঘ চুলকে বাঁধা হত। দীর্ঘ চুলকে বেঁধে রাখার জন্যই মাথায় দড়ি বাঁধার প্রয়োজন হত।[২০৪] উভঝুঁটি ছাড়া কৃষ্ণের আর একধরনের চুল বাঁধার ভঙ্গিমা হল 'ঘোড়াচুল'। এই 'ঘোড়াচুল' শব্দটিকে ঝুঁটি ও ঘাড়ের ওপর লম্বিত কেশ, এই দুটি অর্থে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।[২০৫] শ্রীকৃষ্ণের শিশু ও বালক বয়সের কিছু চিত্রে 'ঘোড়াচুল' লক্ষ করা যায়। পৌরাণিক দেবীমূর্তি ফলকগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিরে মুকুট অথবা উন্মুক্ত কেশ।

পূর্বোক্ত বিভিন্ন কেশবিন্যাসের উল্লেখ মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও পাওয়া যায়। যেমন- বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে জ্ঞানদাস রচিত একটি পদে, কবি লিখছেন-

"চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনোলোভা।"[২০৬]

'ঘোড়াচুল'এর উল্লেখ পাই চণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'দানখণ্ডে'। কবি এখানে লিখেছেন,

"পত্রর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।
চাঁচরী খেলাওঁ মোএঁ যমুনার কূলে।।"[২০৭]

পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি ব্যতীতও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিভিন্ন প্রকার কেশসজ্জার, কেশবিন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সকল কেশবিন্যাস বা সজ্জার ভঙ্গিমাগুলি মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যে লক্ষ করা যায়নি। এরথেকে অনুমান করা যায় যে, মন্দির শিল্পীগণ মূর্তিগুলির কেশবিন্যাসের দিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদর্শন করেননি। কেশসজ্জার বিভিন্ন উপকরণের উল্লেখ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়, কিন্তু মন্দিরগাত্রে কোন ফলকের কেশসজ্জায় কোন অলংকার বা ফুলের মালা লক্ষ করা যায়নি। সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হওয়া গেল না।

মন্দির সজ্জায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান-

সুদূর অতীতকাল থেকেই মানুষ উৎসব প্রবণ। যদিও প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি বিরাট অনিশ্চয়তা ছিল। জীবনের সমস্ত ভাবনা ও কর্ম সে সময় অতিবাহিত হত হতো কেবলমাত্র খাদ্য সংগ্রহের জন্য। কিন্তু সেদিনেও মানুষ যৌথ উদ্যোগেই পশুশিকার করতে যেত, শিকার করতে পারলে সম্মিলিতভাবেই তারা আনন্দ প্রকাশ করত। এটাও ছিল একপ্রকার উৎসব।[২০৮]

উৎসব মানুষের স্বার্থহীন সামাজিক রূপ প্রকাশ করতে সাহায্য করে। মানুষের মধ্যে জন্মায় ঐক্যবোধ এবং জীবন হয়ে ওঠে সুন্দর- সমাজে মানুষ হয় সংঘবদ্ধ। উৎসব যেমন একদিকে মানুষের একঘেয়ে জীবনে আনে বৈচিত্র্যের আস্বাদ, অন্যদিকে মানুষের শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সত্তার প্রকাশ ঘটাতেও সাহায্য করে।[২০৯]

আমাদের দেশে অধিকাংশ উৎসব, মেলা, পার্বণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় কোন না কোন ধর্মের দেবতার পূজা-অর্চনাকে কেন্দ্র করেই। বছরের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাসে অথবা নির্দিষ্ট দিনে দেবদেবীদের পূজা অর্চনা উপলক্ষ্যে কিছু আচার- অনুষ্ঠান, অনেক মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে যখন পালন করেন, তখন সেই অনুষ্ঠানটিই একটি উৎসবে পরিণত হয়। যেমন- দুর্গোৎসব, দীপাবলি বা কালীপূজা, শিবপূজা উপলক্ষ্যে চড়ক উৎসব, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য যে কোন ধর্মেই একই ব্যাপার লক্ষ করা যায়।

আমাদের গবেষণার মূল কেন্দ্র যেহেতু বর্ধমান জেলার মন্দির, তাই মন্দিরগুলিতে যে হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করেই উৎসব, মেলা,পার্বণের চিত্রিত ফলকগুলি দেখা যাবে তা বলাইবাহুল্য। মন্দিরগাত্রে সাধারণত শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই তিন ধর্মের প্রভাবই অধিকমাত্রায় লক্ষ করা যায়। এই তিন ধর্মেরই প্রধান দেবদেবীদের পূজাঅর্চনার দৃশ্য মন্দিরগাত্রে অধিকমাত্রায় স্থান পেয়েছে এবং দু'একটি ফলকে উক্ত দেবদেবীদের কেন্দ্র করে যে উৎসব পালিত হয়, তার দৃশ্যও শিল্পীগণ মন্দিরগাত্রে চিত্রায়িত করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল-

মহাসমারোহে কালীপূজার একটি দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে, কালনার লালজী মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দায় প্রবেশের মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে তৃতীয় সারিতে। এই সারিটির মধ্যবর্তী ফলকে দেখা যায় চতুর্ভুজা কালীমাতা শায়িত শিবের উপর দণ্ডায়মান। দেবী মূর্তির বামপার্শ্বের ফলকে দু'জন দণ্ডায়মান পুরুষ কাঁসর ও শঙ্খ বাজনরত। এবং দক্ষিণপার্শ্বের ফলকে দণ্ডায়মান রয়েছেন একজন পুরুষ ও মহিলা। পুরুষটির হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি ছাগশিশু রয়েছে। দেবীর নিকট বলিদানের উদ্দেশ্যে ছাগশিশুটি আনা হয়েছে, তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত ফলকটির পরবর্তী ফলকে রয়েছেন ঢাক বাজনরত ঢাকি।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির সংলগ্ন উন্মুক্ত বারান্দায় পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে চতুর্থ সারিটি জুড়ে কালীমাতার পূজার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। শায়িত শিবের উপর দণ্ডায়মান চতুর্ভুজা দেবী কালিকার মূর্তির দু'পাশে প্রণামরত দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট দু'জন স্ত্রীলোক লক্ষ করা যায়। দেবীর ফলকটির বামপার্শ্বের আর একটি ফলকে ঢাক ও শিঙা বাজনরত দু'জন দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি লক্ষ করা যায়। এর পরবর্তী ফলকটিতে মহিলাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, একজনের ক্রোড়ে শিশুও রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে তারা পূজায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছেন।

বহু পুরুষ একত্রিত হয়ে শিবলিঙ্গ পূজায় অংশগ্রহণের চিত্র লক্ষ করা যায়, কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত তলদেশ থেকে চতুর্থ ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে। শিবলিঙ্গ পূজারত দৃশ্যফলকের দৃষ্টান্ত পূর্বে শিব প্রসঙ্গ আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

শিবপূজাকে কেন্দ্র করে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে যে চড়ক উৎসব পালিত হয়, তার দু'একটি দৃশ্যফলকও মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিকদের মতে মধ্যযুগের প্রথমদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বৌদ্ধরা দলে দলে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে থাকে, 'চড়ক' এদেরই উৎসব। তন্ত্র সাধনার অনুপ্রবেশ ভারতে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসের অন্যতম কারণ। চড়কে নিষ্ঠুর প্রথাগুলির বহুল প্রচলন এই তন্ত্র সাধনার প্রভাব থেকে। তাদের সন্ন্যাস, ব্রত পালন, সারা মাস জুড়ে ভিক্ষা, কৃচ্ছসাধন ও সংযম ইত্যাদি সবই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কথা স্মরণ করায়।[২১০]

পৌরাণিক মতে, চৈত্র সংক্রান্তির দিন মহাপরাক্রান্ত অসুররাজ, শৈবমতালম্বী বাণ মহাদেবের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতির পর পাত্র- মিত্রসহ সকলে রক্তদান করেছিলেন। সেই কারণেই চড়ক উৎসবের সঙ্গে রক্তপাতের মতো নিষ্ঠুর প্রথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে রয়েছে। তাই বাণ- ফোঁড়, আগুনে ঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ ইত্যাদি প্রাণঘাতী প্রথাগুলি উৎসবের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আত্মপীড়ন অর্থাৎ নিজেকে আঘাত করা পীড়ন করাই চড়ক উৎসবের প্রধান আকর্ষণ।[২১১] 'চড়ক' শব্দটির উৎপত্তি 'চক্র' থেকে। গ্রামবাংলার লোকজীবনের বর্ষশেষের উৎসবই হল 'চড়ক'। এই চড়ক উৎসব প্রধানত নদীর ধারে- গ্রামে গঞ্জে শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছিল, পরে ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন জেলায় জেলায়। রাঢ়ভূমিই ছিল এই উৎসবের উৎস বা কেন্দ্রভূমি। মহারাজ শশাঙ্ক ছিলেন এই উৎসবের প্রধান উদ্যোগী।[২১২]

পূর্বোক্ত এই 'চড়ক' উৎসবের কিছু খণ্ডদৃশ্য কয়েকটি মন্দিরগাত্রে চিত্রায়িত হয়েছে। যেমন- কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে বামপার্শ্বের শিবমন্দিরটির বারান্দার প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে চড়ক দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

পাঁচরখী গ্রামের রঘুনাথদাস দে'র প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটির প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে চড়ক দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কালনার কুলটি গ্রামের রাস্তার পাশে প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে আটচালা মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে পূর্বোক্ত ফলকের অনুরূপ চড়ক দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

মন্দিরগাত্রে শৈব এবং শাক্ত ধর্মাবলম্বীদের উৎসব-পার্বণেরই দু'একটি দৃশ্যফলক লক্ষ করা যায়, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কোন উৎসব-পালা-পার্বণের দৃশ্যফলক লক্ষ করা যায়নি। মধ্যযুগীয় বিভিন্ন কাব্যসাহিত্যে শিবপূজা, কালীপূজা, রাধাকৃষ্ণ পূজার উল্লেখ রয়েছে। তবে সর্বাধিক বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কথা।

'মনসামঙ্গল' কাব্যে চাঁদসদাগর'কে পরম শিবভক্তরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি একমাত্র শিবের আরাধনা করেই, সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চেয়ে বলেছিলেন-

"শিবের ভরসা করি না পূজিনু বিষহরি
দেবতা-মনুষ্যে হৈল কক্ষা।"[২১৩]

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কালীপূজার এবং সুন্দরের মুখে দীর্ঘ কালীস্তুতি বর্ণিত হয়েছে। 'বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশ যাত্রা' অংশে বলা হয়েছে-

"রাজা গুণ সিন্ধু রায় পুলকে পূর্ণিত কায়
সুন্দরের রাজ্যভার দিলা।
সুন্দর আনন্দচিত লয়ে গুরু পুরোহিত
নানা মতে কালীরে পূজিলা।।"[২১৪]

এছাড়া কৃষ্ণ বা বিষ্ণু পূজার উল্লেখ চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়, তা বলাই বাহুল্য। অবশেষে বলা যায়, যে গ্রামবাংলায় বারোমাসে তেরোপার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। আর উৎসবই হল শিল্প সংস্কৃতি প্রকাশের মাধ্যম। মানুষের জীবনে বহু অভাব, অভিযোগ, দুঃখ-যন্ত্রণা এসব কিছুরই টানাপোড়েনের মাঝে বিভিন্ন উৎসব, পালা-পার্বণ মানুষকে অল্পসময়ের জন্য হলেও নিজেদের দুঃখ-যন্ত্রণা, অভাব-অভিযোগের কথা ভুলে গিয়ে একত্রে আনন্দে মেতে উঠতে শেখায় এবং জীবনের চলার পথে নতুন করে জীবনী শক্তির সঞ্চার করতেও সাহায্য করে।

অর্থাৎ বলা যায়, মধ্যযুগে বাংলায় বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল, যেমন- শৈব, শাক্ত এবং বলাইবাহুল্য বৈষ্ণব ধর্ম। মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণলীলা ও বিষ্ণুমূর্তির আধিক্য দেখে, তা সহজেই অনুমিত হয়। তবে মন্দিরগাত্রে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ পূজারত কোন মূর্তিফলক দেখা যায়নি। তবে কৃষ্ণলীলা মোটিফের পাশাপাশি চৈতন্য সংক্রান্ত মোটিফ গুলি দেখে মনে করা যায় যে, পূর্বোক্ত ধর্মবিশ্বাসের পরিমন্ডলে বৈষ্ণবধর্ম একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

মন্দির সজ্জায় যানবাহন-

যানবাহন বলতে আমরা বুঝি যার মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। এই যান সাধারণত তিনপ্রকার- স্থলযান, জলযান ও আকাশযান। স্থলযান হিসেবে বর্তমান যুগে আমরা বাস, অটো, ট্রেন ইত্যাদি, জলযান হিসেবে- নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদি এবং আকাশযান হিসেবে- এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার ইত্যাদির নাম করতে পারি।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, 'মন্দির সজ্জায় যানবাহন'। উক্ত বিষয়ে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্র অনুসন্ধান করে যে যানবাহনগুলির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং পাশাপাশি মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যে সকল যানবাহনগুলি উল্লেখিত হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হবে। প্রথমেই মন্দিরগুলির টেরাকোটা সজ্জায় কোন কোন যানবাহন লক্ষ করা গেছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কালনার গোপালজী মন্দিরে উত্তরমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দক্ষিণমুখী দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে গরুড় গাড়ির রথে চড়ে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষের যাত্রার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। পুরুষটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে হাতে হুঁকোর নলটি ধরে উপবিষ্ট। তার সম্মুখে গরুড় গাড়ির চালক বসে রয়েছে।

কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে বামদিকের শিবমন্দিরটির প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দ্বার লাগোয়া স্তম্ভে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে, দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে মালপত্র বোঝাই গরুড় গাড়ির দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

উক্ত স্তম্ভ লাগোয়া দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের তৃতীয় ফলকে একটি মনুষ্যবাহী দোলার মধ্যে একজন নবাব হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট। দোলার তলায় হুঁকোর নল ধরে রয়েছেন একজন সেবিকা। দোলার সম্মুখে দু'জন ও পশ্চাতে দু'জন মানুষ দোলাটি কাঁধে নিয়ে দণ্ডায়মান। দোলার সম্মুখে ও পশ্চাতে দুটি ধ্বজ লক্ষ করা যায়।

এরপর দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে মকড় রথে চড়ে অভিজাত পরিবারের মানুষজন গানবাজনা করতে করতে যাত্রা করছেন এবং মকড়ের মাথার উপর দণ্ডায়মান রয়েছে রথচালক।

এরপর চতুর্থ ফলকে ঘোড়ায় টানা রথে অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীপুরুষের বিলাস দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। রথের সম্মুখে ঘোড়ার লাগাম বামহাতে এবং ডানহাতে চাবুক ধরে বসে রয়েছেন সারথী। তার পশ্চাতে দণ্ডায়মান একজন সেবিকা।

উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণপার্শ্বের মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে যাত্রীবাহী ছিপনৌকায় সাধারণ মানুষজন রয়েছে। নৌকার দু'দিকে দু'জন মাঝি দাড় বাইছেন। প্রত্যেকের পরনে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি এবং দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দার পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে মকড় রথে বাজনা বাজিয়ে অভিজাতদের বিলাসবহুল যাত্রার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। মকর রথের শীর্ষে রথচালক দণ্ডায়মান। রথের মধ্যে উপবিষ্ট দু'জন পুরুষের মধ্যে একজন শিঙা বাজাচ্ছেন, অন্যজনের হাতে কোন বাদ্য আছে কিনা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা। রথের পশ্চাদংশে একজন ব্যক্তি হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট।

ঘোড়ায় টানা রথের একটি সুন্দর ফলক বনকাটির গোপালেশ্বর মন্দিরের মুখ্যদ্বারের শীর্ষাংশে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত, তলদেশ থেকে প্রথম প্যানেলে অলিন্দশীর্ষে লক্ষ করা যায়।

শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের ভোলানাথ মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিম প্রবেশদ্বারের নিম্নাংশে জলের উপর ভাসমান বজরা এবং তার দু'পাশে দুটি নৌকার অর্ধেকাংশ লক্ষ করা যায়। বজরার মধ্যে একজন ব্যক্তি রয়েছে, তবে তার মুখমণ্ডলটি স্পষ্ট নয়। বজরার দু'পাশে দু'জন মাঝি বসে রয়েছে বৈঠা হাতে এবং নৌকাগুলিতে মাঝিরা বৈঠা বাইছে।

বনকাটির গোপালেশ্বর মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত, তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে যাত্রীবাহী নৌকার দৃশ্য দেখা যায়।

পূর্বোক্ত ফলকগুলি ব্যতীত পূর্বে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে বিভিন্ন রকম রথের উল্লেখ করা হয়েছে। এবং বণিকবৃত্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন জলযানের উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরায় আর সেই ফলকগুলির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল না।

অর্থাৎ মন্দির সজ্জায় আমরা যে সকল যানবাহনগুলি লক্ষ করেছি, সেগুলি হল- স্থলপথে মনুষ্যবাহী দোলা বা সুখাসন, জলপথে নৌকা, বজরা, জাহাজ ইত্যাদি। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মধ্যে 'মঙ্গলকাব্য' গুলিতেই নৌকা, ডিঙি, রথ এই যানবাহনগুলির অধিকমাত্রায় উল্লেখ পাওয়া যায়, কারণ মঙ্গলকাব্য গুলিতে সদাগর, বণিক শ্রেণির মানুষদের কথাই বলা হয়েছে। যারা বিভিন্ন যানবাহনের সাহায্যে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বা দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন।

এছাড়া বিবাহ বা কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উপাদানে তৈরি দোলা, চতুর্দোলা ইত্যাদির উল্লেখও পাওয়া যায়। যেমন- 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'লখিন্দরের বিবাহ' অংশে পাটের দোলার উল্লেখ পাওয়া যায়, কবি বলছেন, 'চড়িয়া পাটের দোলা লখিন্দর চলে'।[২১৫] 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও পাটের দোলার উল্লেখ রয়েছে; কবি এখানে বলেছেন, 'ডিঙ্গা তেজি চাপে দোলা সঙ্গে রাজসুতা সিলা'।[২১৬]

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সম্পাদিত ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’ মহাকাব্যে কবি ‘ভরতের নিকট কৌশল্যার খেদ ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া’ অংশে লিখছেন-

“মুকুতা প্রবাল আনে বহুমূল্য ধন
চতুর্দোলে আনিল বিচিত্র সিংহাসন।।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর।
চতুর্দোল চড়াইল রাজারে সত্বর।।”[২১৭]

আবার ‘ভরতের পাত্রমিত্র সহিত পরামর্শ ও শ্রীরামকে আনিতে বনযাত্রা’ অংশে কবি লিখেছেন,

“ঘোড়া হাতী চলে রথ সাজায়ে সারথি।
ভরত আনিতে রামে যায় শীঘ্রগতি।।”[২১৮]

রামায়ণ মহাকাব্যে ‘চতুর্দোলা’ এবং রথ যানটির উল্লেখ বারংবার হয়েছে। ‘রাবণের লঙ্কায় উত্তরণ’ অংশে বলা হয়েছে, ‘রথ হৈতে সীতাকে নামায় লঙ্কেশ্বর’।[২১৯]

মঙ্গলকাব্যগুলিতে স্থলযান হিসেবে যেমন দোলা, চতুর্দোলা, রথ ইত্যাদির বহুল ব্যবহার দেখা যায়, তেমনি জলযান হিসেবে নৌকা, ডিঙ্গা, তরী, নাএ এরও বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে ‘চাঁদের নৌকাডুবি’ অংশে নৌকা, ডিঙ্গা, তরী এই সকল জলযান গুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে ‘ডিঙ্গা’ জলযানটির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এখানে ‘ডিঙ্গা’ গুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন কবি লিখেছেন,

“প্রথমে তুলিলা ডিঙ্গা নামে মধুকর
সুদুই সুবর্ণে জাহার রই ঘর।
আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে দুর্গাবর
আখন্ড চাপিআ তার বসিব গাবর।
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখি
দুপুরের পথে জার মালুমকাঠ দেখি।
আর ডিঙ্গা তুলিল নামেতে শঙ্খচুর
আসী গজ পানি ভাঙ্গিয়া লয় কুল।
আর ডিঙ্গা তুলিল নামে মধুপাল
জাহে ভরা দিতে দুকূল হয় আল।
আর ডিঙ্গা তুলিল নামে ছোটমুঠি
সেই নায়ে ভরা চালু বায়ন্ন পউটি।
মম ধুনা দিআ গাইল সাত নায়
`অবিলম্বে সদাগর সাজন চাপায়।”[২২০]

মঙ্গলকাব্য ব্যতীত রামায়ণ মহাকাব্য ও ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যেও নৌকার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। রামায়ণের ‘জয়ন্তকাকের নেত্রবিদ্ধকরণ’ অংশে গুহক রামচন্দ্রকে গঙ্গানদী পার করার প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-

“সাত কোটি নৌকা তার গুহক চণ্ডাল।
আনিল সোনার নৌকা সোনার কেরাল।।[২২১]

এরপর,

“প্রাতঃকালে নৌকা গুহ করিল সাজন।
পার হৈয়া কূলেতে উঠেন তিন জন।।”[২২২]

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে ‘অথ নৌকাখন্ডঃ’ নামক একটি পৃথক খণ্ড রচিত হয়েছে। উক্ত খন্ডে রাধাকৃষ্ণলীলা একটি নৌকাকে কেন্দ্র করেই বর্ণনা করা হয়েছে। কবি কখনও লিখেছেন, ‘দধির পসার নাএ চড়াহ আসিআঁ’[২২৩], আবার কখনও লিখেছেন, ‘হেন ভাঙ্গা নাএ চঢ়িতে না জুআএ’[২২৪]; ‘নাএ’ অথবা ‘নাও’ শব্দগুলি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে উক্ত কাব্যে।

গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের পক্ষে যানবাহনের বিলাসিতার কোন চিত্র মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়না। অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষজন মর্যাদাপূর্ণ বাহন হিসেব চতুর্দোলা এবং রথ ব্যবহার করতেন, অধিকাংশ টেরাকোটা ফলকে এই দৃশ্যই দৃশ্যায়িত হয়েছে। মন্দিরগাত্রে ঐসমস্ত যানবাহনের চিত্রফলকের দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রভাব যে মন্দিরগাত্রে অধিকমাত্রাতেই পড়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করা হলে বিষয়টি সম্পূর্ণ হবে না, সেটি হল নৌশিল্প। সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। স্মরণাতীত কাল থেকেই হিন্দু কর্মকার ও সূত্রধর নৌশিল্পে সিদ্ধহস্ত ছিল, একথার ভূরি ভূরি প্রমাণ এ যুগে আবিস্কৃত হয়েছে।[২২৫]

প্রাচীন বঙ্গে বহু পূর্বকাল থেকেই বৃহৎ সমুদ্রগামী তরণি নির্মিত হত। এই প্রাচীনের স্মৃতি আবহমানকাল ধরে চাঁদ সদাগর, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বণিকের বাণিজ্যযাত্রার কাহিনিগুলি পোষণ করে এসেছে। হিন্দুযুগে নিম্নবঙ্গে নদীমুখের ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপযোগী জাহাজ যে নির্মিত হত তাতে সন্দেহ নেই। 'শিল্প সংহিতা'য় নৌকা রঙ করা এবং স্বর্ণ- রৌপ্য- তাম্রাদি মণ্ডিত করার বিষয়ও আছে। মাস্তুলগুলি বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করবার উপদেশও দেওয়া আছে। তরণির অগ্রভাগে ও মুখে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মকর, সর্প, ভেকাদি বা ময়ূর, হংস প্রভৃতি পক্ষীর মুখের অনুকৃতি দেওয়ার রীতি ছিল।[২২৬]

মঙ্গলকাব্য গুলিতে বিভিন্ন নামের নৌকার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- সিংহমুখী, টিয়ামুখী, ময়ূরপঙ্খী, মকরমুখী, শুকপঙ্খী, শঙ্খচূড়, হংসখল প্রভৃতি। তৎকালীন বাংলায় কাঠের তৈরি নৌকা বা ডিঙিগুলির গলুইতে খোদাই করা হতো হাঙর, মকর, অশ্ব, গজ, রাক্ষস ইত্যাদি মুখাবয়ব। বিশেষ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে নানাবিধ আকারে নৌকা নির্মাণ করে আসছেন সূত্রধরগণ এবং আবহমানকাল ধরে তারা এই ধারাবাহিকতাকে টিকিয়ে রেখেছেন।[২২৭] নৌযান নির্মাণের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় জগজ্জীবন বিরচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে। এখানে কবি বলেছেন,

"বৃক্ষ কাটি কামিলা রাখি সারি সারি।
চিরিয়া করিল তক্তা লক্ষ তিন চারি।।
বাছিয়া বসায় তক্তা কর্ম্ম করে ভাল।
সারি সারি হানিলেক লোহার গোজাল।।
আসন বান্ধিয়া বান্ধিল জলপাট।
বান্ধিয়া ডিঙ্গার গোড়া তোলে মালকাট।।
প্রথমে বান্ধিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
বাঘমুঁহা ভেড়ামুঁহা ধাউর ভ্রমর।।"[২২৮]

পরবর্তীযুগে বৃহৎ তরণির প্রয়োজনাভাবে এই শিল্পের অবনতি হয়েছিল। তবে নদীবহুল স্থানে বাণিজ্যের উপযোগী তরণি চিরদিনই প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তমলুকে জাহাজ আসা বন্ধ হলে, চট্টগ্রাম সাগর মোহনায় সন্দীপ ও নদীমুখের নিকটবর্তী সপ্তগ্রাম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে। দেশে শাল, পিয়াল, সেগুন, জারুল প্রভৃতি শক্ত আঁশের কাঠের কোনও কালেই অভাব হয়নি।[২২৯] তাই আজও নদী বা সমুদ্রপথে যাতায়াতের জন্য বড় বড় ডিঙ্গা নির্মিত হয়।

মন্দির সজ্জায় বাসস্থান-

সামাজিক মানুষের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল তাদের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ তাদের বাসস্থান। মধ্যযুগীয় সমাজে চিরকালই গ্রামবাংলার মানুষজন চালারীতির ঘরে বসবাস করে অভ্যস্ত। এছাড়া সমাজের অভিজাত বা রাজন্যবর্গের ধনী মানুষজন প্রাসাদ, পুরী, গড় ইত্যাদি নির্মাণ করেই বসবাস করে আসছেন।

মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যেও প্রধানত দু'টি স্তরের মানুষের বাসস্থানের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে তা খুবই সামান্য। মন্দিরগাত্রে দু'একটি চালা ঘরের দৃষ্টান্ত, কিছু অট্টালিকার অংশ বিশেষ এবং দেবালয় বা মন্দিরের কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলক লক্ষ করা যায়। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল-

উনিশ শতকের শহরাঞ্চলে নির্মিত বাড়ির দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরে। এই মন্দিরের মুখদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিম প্রবেশদ্বারের শীর্ষে বামদিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যায়, একটি ত্রিতল বিশিষ্ট বাড়ির প্রথম তলায় দীর্ঘ জানালায় খড়খড়ি দেওয়া রয়েছে।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের তলদেশ থেকে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং পঞ্চম ফলকে দেখা যায়, দীর্ঘ জানালার বাইরে হাত রেখে দণ্ডায়মান নারী ও পুরুষ মূর্তি।

সামাজিক দৃশ্য ছাড়াও পৌরাণিক দৃশ্যে চালাঘর এবং প্রাসাদের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন- কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের মুখ্যদ্বারের শীর্ষে 'রামরাজা'মোটিফে রাম-সীতার ফলকটি লক্ষ করলে দেখা যায়, সেখানে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির নানা লক্ষণ রয়েছে। যেমন- ডোরিক বা আয়োনিক পিলার, খড়খড়ি, ত্রিকোণ আর্চ ইত্যাদি। উক্ত ফলকে রামের দক্ষিণপার্শ্বে রয়েছে দোতলা বিশিষ্ট নহবৎখানা। যার উপরের দুটি কক্ষে গানবাজনা চলছে এবং নীচের দুটি কক্ষে বন্দুকধারী সৈন্যদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সীতার দক্ষিণপার্শ্বে দোতলা বিশিষ্ট বাড়িটির উপরে দুটি কক্ষে নৃত্যরত নর্তকী রয়েছে এবং নীচের কক্ষ দুটিতে দুটি জানালা লক্ষ করা যায়।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দায় পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে দক্ষিণমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলে পুতনার কৃষ্ণ'কে স্তন্যপানরত দৃশ্যটিতে একটি চালাঘর এবং কৃষ্ণের জন্মদৃশ্যের ফলকে একটি প্রাসাদের অংশবিশেষ চিত্রিত হয়েছে। এছাড়া কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দির, অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের বহিঃদ্বারের শীর্ষে দেবালয় বা মন্দিরের চিত্রফলক দেখা যায়, যার মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে।

উনিশ শতকে নির্মিত কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দির ও শ্রীবাটির মন্দিরগুলিতে গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রভাব কমই লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে শ্রীবাটির মন্দির গুলির ক্ষেত্রে একথা বলা যায়, কারণ শ্রীবাটির চন্দ্রবংশের বাণিজ্য জলপথ্যে বিস্তৃত ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের বিরাট অঞ্চল জুড়ে তাই এই মন্দিরের ভাস্কর্যে অন্যান্য মন্দির গুলির তুলনায় অনেক বেশি শহুরে প্রভাব লক্ষ করা যায়।[২৩০]

ফলে মন্দির পৃষ্ঠপোষকদের গ্রামবাংলার বাইরে শহর বা নগর সভ্যতার সংস্পর্শে আসার প্রমাণ পাওয়া যায় মন্দিরগুলির ভাস্কর্যে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যগুলিতে ঘর, বাড়ি, প্রাসাদ, পুরী এই শব্দগুলি মানুষের বাসস্থান প্রসঙ্গে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'নিছনি গ্রামে লখিন্দর ও বেহুলার ভিক্ষা' অংশে কবি লিখেছেন-

"বেহুলার বাপ যিনি সায় সদাগর।
নগরের মধ্যস্থলে তার বটে ঘর।।
অপূর্ব ঘরের দ্বার বিচিত্র আকার।
প্রাচীর প্রচুর বড় চারিদিকে তার।।
বাটীর ভিতরে ঘর সোনার নিছনি।
সায় সদাগর তাতে অমলা বেনেনী।।"[২৩১]

কবিকঙ্কণ রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কবি বলছেন-

"ইনাম বাড়ি তোলা ঘরে তুমি কর ঘর
ধান্য বাড়ি নাহি দেহ লজ্য কলন্তর।"[২৩২]

কবি আবার কাব্য মধ্যে ঘর শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এইভাবে-

"শূণ্য মোর সুরলোক অবিরত বাড়ে শোক
ঘর বন নীলাম্বর বিনে
আন্ধার ঘরের বাতি বধূ মোর ছায়াবতী
কবে আর পাব দরশনে।"[২৩৩]

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কবি বারবার ঘর শব্দটির উল্লেখ করেছেন। উক্ত কাব্যে পুরী, নগর ইত্যাদি শব্দের উল্লেখও পাওয়া যায় এইভাবে, 'দ্বারিকা সমান পুরী বিশাই করিল নির্মাণ'।[২৩৪]

তারপর- 'নগর বসায় বীর বনের ভিতরে'।[২৩৫]

ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে, কবি লিখেছেন-

"দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল।
চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইল।।"[২৩৬]

উক্ত কাব্যেই 'ভবানন্দের স্বদেশ উপস্থিতি' অংশে ভারতচন্দ্র লিখেছেন- 'বাড়িতে সংবাদ দিতে দাসু পাঠাইল।।'[২৩৭]

'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' মহাকাব্যে 'জটায়ুর সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ' অংশে কবি একস্থানে লিখেছেন-

"অগ্নিপূজা করিয়া হইলা গৃহবাসী।।
লতা-পাতা-নির্মিত সে কুটীর পাইয়া।"[২৩৮]

উক্তকাব্যে বাসস্থান হিসেবে নিকেতন, ঘর, ভবন, পুরী, অট্টালিকা প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- 'ভরতের শ্রীরামাণ্বেষণ' অংশে কবি একস্থানে লিখেছেন-

"বিশ্বকর্মা প্রথমতঃ হন আগুয়ান।
আশ্রমে অপূর্ব্ব পুরী করিতে নির্ম্মাণ।।
মুনি বলে, বিশ্বকর্ম্মা, শুনহ বচন।
নির্ম্মাণ করহ, যেন মহেন্দ্র-ভবন।।
অশীতি যোজন করে পুরীর পত্তন।
সোনার আবাস ঘর করিল গঠন।"[২৩৯]

অর্থাৎ মন্দিরগাত্রের অলংকরণের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করায় এই বিষয়টি স্পষ্ট অনুধাবন করা গেল যে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মানুষের বাসস্থানের যেমন যেমন বর্ণনা পাওয়া যায়, তেমনি মধ্যযুগীয় সময়ের মধ্যে নির্মিত মন্দিরগুলিতেও শিল্পীগণ সেইরকমই বাসস্থানের বিভিন্নরূপকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

মন্দির ভাস্কর্যে আসবাবপত্র-

আসবাবপত্র ছাড়া কোন গৃহস্থবাড়ি কল্পনা করা যায়না। কোন রকম আসবাবপত্র ছাড়া বাড়িটি বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। বিভিন্ন আসাবাবপত্র দ্বারাই মানুষ তার সাধের বাসস্থানটি আকর্ষণীয় করে তোলে। এই আসবাবপত্র কাঠ বা ধাতু নির্মিত হতে পারে। আসবাবপত্রের মধ্যে প্রধান হল খাট বা পালঙ্ক। এছাড়া চৌপায়া, কেদারা, জলচৌকি, সিংহাসন ইত্যাদিও আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য করা হয়।

বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে শিল্পীগণ মাটির ফলকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রের চিত্রিতরূপ অঙ্কন করেছেন। মূর্তি ফলকগুলির বিভিন্ন অবস্থা বোঝাতে গিয়েই শিল্পীগণ আসবাবপত্রের সাহায্য নিয়েছেন। ঐ আসবাবপত্র গুলি দেখে সহজে অনুমান করা যায় যে, বঙ্গে ঐ সময় কেমন ধরনের আসবাবপত্র প্রচলিত ছিল। তবে আসবাবপত্রের সংখ্যাধিক্য মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায় না। যেগুলি দেখা যায়, তারমধ্যে রয়েছে- খাট, চৌপায়া, চৌকি, কেদারা, সিংহাসন ইত্যাদি। নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল-

শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণে ভোলানাথ মন্দিরের মূলদ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে তৃতীয় সারির বামদিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় ফলকে দুটি চৌকি লক্ষ করা যায়। প্রথমটির উচ্চতা দ্বিতীয়টির থেকে কম। দুটি চৌকির পায়াতেই নকশা রয়েছে।

উক্ত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় সারির বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে একটি চৌকি দেখা যাচ্ছে। এটি ক্ষুদ্রাকার, কিন্তু পায়াগুলিতে খুব সুন্দর নকশা করা রয়েছে।

উক্ত মন্দিরেরই মূল প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে ভিক্টোরিয়ান চেয়ারে উপবিষ্ট একজন ইংরেজ। চেয়ারটির পাশে এবং পায়ায় নকশা করা রয়েছে।

উক্ত মন্দিরেরই দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের (বামদিক থেকে) প্রথম ফলকে একটি ছোট চৌকি দেখা যায়। এই চৌকির উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন একজন নারী। চৌকির তলদেশে একটি পিকদানি রয়েছে।

এই মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের কৃত্রিমদ্বারের তলদেশে উৎকীর্ণ দেশিয় রাজার ব্যভিচারের দৃশ্যে, রাজাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখা যায়। সিংহাসনটিতে পেছনে হেলান দেওয়ার জায়গা এবং দু'পাশে হাতল রয়েছে এবং পায়াগুলিতে নকশা করা।

উক্ত মন্দিরেরই বামপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলে পূর্বোল্লিখিত অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে দৃশ্য ফলকটির উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে একজন রাজা একটি দীর্ঘ চৌকির উপর আরেকটি ক্ষুদ্র আসনে উপবিষ্ট। দীর্ঘ চৌকির পায়াগুলিতে বাঘের মুখাবয়বের নকশা করা রয়েছে।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালে পূর্বোক্ত ‘রামরাজা’মোটিফে রাম- সীতা , নকশা করা একটি দীর্ঘ চৌকির উপর উপবিষ্ট। চৌকির পায়াগুলিতে একটু বাঁকাভাবে নকশা করা রয়েছে।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দায় মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে একটি শিশুর ক্ষুদ্রাকৃতির খাটে শয়নদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের উল্লম্ব সারিতে ভিক্টোরিয়ান চেয়ারের উল্লেখ পূর্বে অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাপন আলোচনা প্রসঙ্গে করা হয়েছে।

বনপাসের রায়পাড়া’র রায় পরিবারের মন্দির প্রাঙ্গণের বামপার্শ্ব থেকে তৃতীয় মন্দিরটির মুখ্যদ্বারের শীর্ষে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় সারির বামদিক থেকে প্রথম ফলকে যে খাটটি দেখা যায়, সেটির পায়াগুলি সুন্দর নকশা করা এবং তৃতীয় ফলকে সুন্দর নকশা খোদিত চৌকির চিত্র লক্ষ করা যায়।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মন্দির সজ্জায় আসবাবপত্র হিসেবে খাট অথবা বিভিন্ন নকশা করা চৌকির প্রাধান্যই বেশি। এছাড়া কয়েকটি মন্দিরে ভিক্টোরিয়ান রীতিতে নির্মিত চেয়ারের দৃশ্যফলকও লক্ষ করা যায়। তবে তার সংখ্যা অধিক নয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, বর্ধমান জেলায় রাজাদের প্রাধান্য থাকলেও সিংহাসনের খুব বেশি ফলক লক্ষ করা যায়নি। অথবা রাজা বা অভিজাতদের ব্যবহৃত চেয়ার বা অন্যান্য আসবাবপত্র মন্দিরগাত্রে স্থান পায়নিই বলা যায়। সিংহাসনের স্থানে একটি বৃহৎ চৌকির ফলকই লক্ষ করা যায়। রাম- সীতার ফলকগুলিতে রামসীতাকে দীর্ঘ নকশা খোদিত চৌকির উপর উপবিষ্ট হতেই লক্ষ করা গেছে। অর্থাৎ বলা যায়, মন্দিরগাত্রে আসবাবপত্রের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়নি।

মধ্যযুগীয় সমাজে আসবাবপত্র ব্যবহারের যে চল ছিল, তা তৎকালীন সময়ে রচিত সাহিত্য ছাড়াও, মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য গুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায়। মধ্যযুগে গ্রামীণ ভূস্বামী ও বিত্তশালী পরিবারের মানুষজন বিশ্রামের জন্য আসবাবপত্র হিসেবে পালঙ্ক বা খাট ব্যবহার করতেন। সূত্রধর খাটের পায়াগুলিকে কুঁদে তৈরি করতেন এবং থামের সদৃশ সেই পায়ার উপর খোদাই করতেন নানাবিধ জ্যামিতিক নকশা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে বিলেতি ভাবধারার প্রভাবে এই সব খাট বা চৌকির নকশাও পরিবর্তিত হয়ে, দেশিয় শিল্পীগণ হাতি বা সিংহের থাবার অনুকরণে নকশা করতে শুরু করেন। ছাতরির গঠন হয়ে পড়ে আয়োনিয়ান বা ডোরিক স্তম্ভের মতো এবং সেইসঙ্গে অঙ্গসজ্জায় দেখা যায়, পরী, ময়ূর, ডানা মেলা ঈগল, সিংহমুখ প্রভৃতি। খাট, পালঙ্ক বা চৌকি নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশিয় শিল্পীদের দক্ষতা প্রমাণিত হয়।[২৪০]

উক্ত প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মধ্যে থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চৌকি, খাট, পালঙ্ক ইত্যাদি শব্দগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে ‘সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা’ অংশে কবি লিখছেন- ‘বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতি পতি।।’[২৪১]

আবার সুন্দরের ‘বর্ধমান প্রবেশ’ অংশে কবি লিখছেন- “চৌদিকে সহরপনাদ্বারে চৌকী কত জনা
মুরুচা বুরুজ শিলাময়।”[২৪২]

কৃত্তিবাসী রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ‘শ্রীভরতের অযোধ্যায় আগমন’ অংশে কবি লিখেছেন, ‘নিদ্রাগত ভরত সে পালঙ্ক-উপর’,[২৪৩] এবং তারপরে ‘ভরতের নিকট কৌশল্যার খেদ ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া’ অংশে কবি একস্থানে লিখছেন, ‘চতুর্দ্দোলে আনিল বিচিত্র সিংহাসন’।[২৪৪]

বৃন্দাবন দাস রচিত ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যের নবম অধ্যায়ে কবি বলছেন-

“সকল ভক্তের ভাগ্যে এ-দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে।।
আর-সব-দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া।।”[২৪৫]

কবিকঙ্কণ বিরচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে ‘রামের সেতুবন্ধন’ বর্ণনা প্রসঙ্গে সিংহাসনের উল্লেখ রয়েছে। কবি লিখছেন-

“রামে অনুগত প্রজা দেখি দশরথ রাজা
সিংহাসন দিতে কৈল মন।”[২৪৬]

অর্থাৎ পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যে আসবাবপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেইসব আসবাবগুলির চিত্রিতরূপ মন্দিরগাত্রেও লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ সাহিত্য অনেকাংশেই মন্দিরশিল্পকে প্রভাবিত করেছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

মন্দিরগাত্রে বিলাসব্যসন সামগ্রীর চিত্রিতরূপ-

এরপর আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয় হল, ‘মন্দিরগাত্রে বিলাসব্যসন সামগ্রীর চিত্রিতরূপ’। মন্দিরগাত্রে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাসব্যসনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিসপত্র মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়। যেমন- বালিশ, পাখা, চামর, ছাতা ইত্যাদি। তৎকালীন অর্থাৎ আমাদের আলোচিত সময়সীমার মধ্যে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় ব্যতীত কিছু সাধারণ মানুষও পূর্বোক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহার করতেন। মন্দিরগাত্রের তারই কয়েকটি টেরাকোটা ফলকের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হল-

শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের মুখ্যদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের শেষ প্রান্তে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে ছত্রধারী একজন পুরুষ দণ্ডায়মান এবং তার পশ্চাতে একটি চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। এছাড়াও এই মন্দিরের মুখ্যদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে দেওয়ালে উৎকীর্ণ কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে একটি সুন্দর ঝালর লাগানো পাখা নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষমূর্তি লক্ষ করা যায়। পরনে বৃহৎ বহরযুক্ত পোশাক ও মাথায় গোলাকৃতির পাগড়ি রয়েছে।

শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের বামপার্শ্বের দেউল মন্দিরটির বামপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিম প্রবেশদ্বারের শীর্ষে মহিষমর্দিনী’র ফলকের দু’পাশের দুটি ফলকের মধ্যে বামপার্শ্বে পাখা নিয়ে দণ্ডায়মান সেবিকা এবং দক্ষিণপার্শ্বে চামর নিয়ে দণ্ডায়মান সেবিকার মূর্তি লক্ষ করা যায়।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের শীর্ষাংশে সজ্জিত দুটি ফলকের মধ্যে ডানদিকের ফলকটিতে একজন গণিকা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে এবং তার বামপার্শ্বে একজন পুরুষমূর্তি লক্ষ করা যায়। গণিকার দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত এবং নিম্নাঙ্গে একটি বস্ত্রখণ্ড লক্ষ করা যায়। এছাড়া উক্ত মন্দিরে পাশবালিশ ব্যবহারকারী মহিলা, পুরুষের মূর্তিও লক্ষ করা যায়।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য ভাণ্ডারেও পূর্বোক্ত বিলাস-ব্যসনের সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- বৃন্দাবন দাস রচিত ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যের নবম অধ্যায়ে কবি লিখেছেন- “ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোনো ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায়।।”[২৪৭]

‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’এর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ‘সুগ্রীবের সৈন্য-সঞ্চয় এবং শ্রীরামসহ মিলন’ অংশে কবি লিখেছেন, ‘চারিভিতে চামর ঢুলায় দাসগণ’[২৪৮], আবার অন্য একটি স্থানে কবি লিখেছেন, ‘সকল বানরগণ ধরে ছত্রদণ্ড’।।[২৪৯]

‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে কবি ভারতচন্দ্র বালিশ শব্দটি ব্যবহার করেছেন ‘বিদ্যাসুন্দরের বিহার’ বর্ণনা অংশে। কবি লিখেছেন- “সম অবলম্বন বালিশ আলিশ
মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে।।”[২৫০]

পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে রামচন্দ্রকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছত্রের তলায় লক্ষ করা যায়। তাঁর পাশে পাখা দ্বারা ব্যজনকারীও দণ্ডায়মান। এছাড়া অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসনের চিত্রফলকেও ছত্রের ব্যবহার দেখা গেছে। মোটামুটিভাবে মন্দিরগাত্রে পূর্বোক্ত বিলাস-ব্যসনকারী দ্রব্যাদির চিত্রিতরূপ লক্ষ করা যায় এবং পাশাপাশি মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও ঐধরনের দ্রব্যাদির পরিচয় মেলে।

মন্দিরসজ্জায় তৈজসপত্র-

আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে বিভিন্ন তৈজসপত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। গৃহস্থালীর জীবনযাত্রা এগুলি ছাড়া ভাবাই যায় না। শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই সমস্ত তৈজসপত্র ব্যবহৃত হয় না, এর বিভিন্ন উপযোগীতাও আছে। যেমন- এগুলি সহজলভ্য, খুব সহজেই কারিগর এগুলি গড়তে পারেন এবং অত্যন্ত সহজমূল্য। এই সমস্ত কারণেই হয়ত মানুষের জীবনে স্থায়িত্ব আসার সময় থেকেই তৈজসপত্রের ব্যবহার হয়ে আসছে। এগুলি বিভিন্ন আকারের হয় এবং বিভিন্ন উপাদান দ্বারা তৈরি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মাটি অথবা কাঁসা, পিতল ইত্যাদি নানাধরনের ধাতুর দ্বারা তৈজসপত্রগুলি নির্মিত হয়। গ্রামবাংলার মানুষজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাটির হাঁড়ি, থালা, কলসি ও অন্যান্য বাসনপত্র, প্রদীপ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। আর সম্ভ্রান্ত বা বিত্তশালী পরিবারের মানুষজন ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র ব্যবহার করে থাকেন।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে কিছু তৈজসপত্রের অলংকরণ লক্ষ করা যায়। খুব অধিক সংখ্যায় এগুলি মন্দিরগাত্রে স্থান পায়নি। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ বিভিন্ন তৈজসপত্রের অলংকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক- বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউলেশ্বর শিব মন্দিরের মুখ্য দ্বারের বাম পার্শ্বের তৃতীয় কৃত্রিম দ্বারের অলিন্দশীর্ষের বামপার্শ্বে উৎকীর্ণ ফলকে দেখা যায়, একটি উনুনের উপর হাঁড়ি বসানো রয়েছে এবং সম্মুখে একজন মহিলা হাতে বাটি নিয়ে দণ্ডায়মান।

উক্ত মন্দিরের মূল প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রথম কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বাম দিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, একটি পিঁড়ি'তে যোগী পুরুষ উপবিষ্ট। তার সম্মুখে রয়েছে একটি থালা এবং পাশে জলের ঘটি রয়েছে, যার উপর ঢাকনা দেওয়া। পাশে একটি প্রদীপও লক্ষ করা যায়। যোগীর সম্মুখে একজন মহিলা দণ্ডায়মান এবং তাঁর পশ্চাতে একজন পুরুষ হাতজোড় করে দণ্ডায়মান।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দায় মধ্যবর্তী অন্তঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত, তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে দণ্ডায়মান তিনজন স্ত্রীলোক ও একটি শিশুকন্যার হাতে সংকীর্ণ গলাযুক্ত কলস লক্ষ করা যায়।

কালনার লালজী মন্দিরের বারান্দার পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের প্রথম দক্ষিণমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে, সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অধিকসংখ্যায় মহিলার হাতে বাটি দেখা যাচ্ছে।

দেবীপুরের মন্দিরটির সম্মুখাংশে বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত পাঁচটি ফলক নিয়ে গঠিত, তলদেশ থেকে তৃতীয় অনুভূমিক সারির বামদিক থেকে পঞ্চম ফলকে রয়েছে কমন্ডলু হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান যোগী পুরুষ। তার বামহাতে একটি ছত্র রয়েছে। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, বক্ষদেশ অনাবৃত।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির মন্দিরের মুখ্যদ্বারের বামপার্শ্বের দ্বিতীয় কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে ষোড়শতম ফলকে, ডানহাতে দণ্ড এবং বামহাতে কমন্ডলু নিয়ে দণ্ডায়মান পুরুষমূর্তি লক্ষ করা যায়। পরনে রয়েছে ধুতি।

এছাড়া প্রতাপেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে তৃতীয় ফলকে বামহাতে কমন্ডলু নিয়ে দণ্ডায়মান যোগীপুরুষ মূর্তি লক্ষ করা যায়। তবে ফলকটির মুখমণ্ডলটি ক্ষয় হয়ে গেছে।

গ্রামবাংলার একটি অতিপরিচিত দৃশ্য 'কাঁখে কলস নিয়ে দণ্ডায়মান রমণী'র ফলক দেখা যায় দেবীপুরের মন্দিরটিতে। উক্ত মন্দিরের বহিঃদ্বারের শীর্ষে অর্থাৎ মন্দিরের সম্মুখাংশে কার্নিশের তলায় অর্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত উপর থেকে তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে ষোড়শতম ফলকে পূর্বোক্ত দৃশ্যটি লক্ষ করা যায়।

পৌরাণিক দৃশ্যগুলির মধ্যে উক্ত মন্দিরেরই সম্মুখস্থিত বারান্দায় দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের সম্মুখাংশে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত, তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে

কাঁখে কলস নিয়ে দণ্ডায়মান নারীর মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় ফলকে মাতা যশোদা এবং নন্দের ক্রোড়ে শিশুকৃষ্ণের দৃশ্যটিতে চৌকির তলদেশে হাঁড়ি ও জলের পাত্রের দৃশ্য দেখা যায়।

উক্ত মন্দিরের সম্মুখাংশে প্রতিষ্ঠাফলকের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উৎকীর্ণ শিবের বিবাহসভার দৃশ্যে, গৌরীর বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান রমণীর মাথার উপর কুলো বা বরণডালা লক্ষ করা যায়।

বনকাটির গোপালেশ্বর শিবমন্দিরের মুখ্যদ্বারের শীর্ষে 'রামরাজা' মোটিফে রাম-সীতার বসবার আসনটির তলদেশে কিছু মাটির তৈজসপত্র লক্ষ করা যায়।

এছাড়া পূর্বোক্ত পৌরাণিক দৃশ্যাবলির মধ্যে কৃষ্ণের দধিমন্থনের দৃশ্যে ননির হাঁড়ি এবং নৌকালীলায় গোপবঁধূদের মাথায় দধিদুগ্ধের হাঁড়ি লক্ষ করা যায়। এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিলাসব্যসন বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন পানপাত্র, পিকদানির উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্দিরগাত্রের উৎকীর্ণ ফলকগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়ার পাশাপাশি, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যে সকল তৈজসপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে থালা, বাটি, হাঁড়ি, কুম্ভ, ডাবর, ধুনচি, চুপড়ি, কুলা, ডালা, প্রদীপ ইত্যাদি তৈজসপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যে থালার বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন প্রসঙ্গে থালার উল্লেখ করেছেন কবি। যেমন, 'নিছনি গ্রামে লখিন্দর ও বেহুলার ভিক্ষা' অংশে কবি বলছেন- 'থালার উপরে কেও দেয় চাউল কড়ি'।[২৫১]

আবার 'মাতার নিকট বেহুলার পরিচয় প্রদান' অংশে বলছেন- 'থালা দিতে কেন উবে কড়ি আর তন্ডুল।।'[২৫২]

'বেহুলার শ্বশুরালয়ে গমন' অংশে কবি কুম্ভের উল্লেখ করে কবি লিখেছেন- 'ধীরে ধীরে যায় বাঁড়ী কুম্ভ করি কক্ষে।'[২৫৩]

কবিকঙ্কণ বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কবি লিখেছেন-

"খন্ড মুগের সুপ উভরে ডাবরে
আচ্ছাদন থালা খানি দিলেন উপরে।"[২৫৪]

আবার লহনার রন্ধন প্রসঙ্গে বলছেন- 'থালার ওদন বাটী ভরিআ বেঞ্জন।'[২৫৫]

কৃত্তিবাসী রামায়ণে'ও থালার উল্লেখ পাওয়া যায়- "বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বসে
হাতে থালা করিয়া ইল্বল আসে পাশে।।"[২৫৬]

ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কবি 'ঋষিগণের কাশিযাত্রা' অংশে কবি লিখছেন, 'কমন্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে'।।[২৫৭]

বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যের আদিখন্ডে কবি লিখেছেন-"তপোধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি।।
কৃষ্ণাজিন দন্ড কমন্ডলু জটা ধরি।"[২৫৮]

'মনসামঙ্গল' কাব্যে কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ আরও কিছু তৈজসপত্রের নামোল্লেখ করেছেন ঘটনা প্রসঙ্গে। 'স্ত্রী আচার ও লকিন্দরকে কন্যা সম্প্রদান' অংশে বলা হয়েছে-

"মঙ্গল হরিষতে বরণ করিতে
লইয়া বরণ ডালা।
সুগন্ধি চন্দন অনেক আয়োজন
বরণ করিতে গেলা।।"[২৫৯]

তারপর আবার এই অংশেই কবি বলছেন,

"হয়ে আনন্দিত অমলা ত্বরিত
দীপ আচ্ছাদন কৈল।।"[২৬০]

অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যেসকল তৈজসপত্রগুলির উল্লেখ পাচ্ছি, তার মধ্যে মন্দিরগাত্রে পূর্বোক্ত তৈজসপত্রগুলির অল্পকিছু লক্ষ করা যায়। যেমন থালা, বরণডালা, বাটি, প্রদীপ, কুম্ভ, হাড়ি ইত্যাদি। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সমাজে গৃহস্থ মানুষজন যেসকল তৈজসপত্র ব্যবহার করতেন, মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র দেখে সেই সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এবং বর্তমানকালে ব্যবহৃত তৈজসপত্রের সঙ্গে সেগুলির সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

মন্দির সজ্জায় নারী-

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান কখনও দেবীরূপে, কখনও বা গণিকা রূপে, কখনও সন্তনারী, কখনও অন্তঃপুরবাসিনী অথবা ক্রিতদাসী বা পরিচারিকা রূপে দেখানো হয়েছে। আমাদের গবেষণার বিষয় যেহেতু মধ্যযুগের বিভিন্ন সময়ে নির্মিত মন্দির সমূহ, তাই মধ্যযুগের সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে দিয়ে মন্দিরগাত্রের অলংকরণে নারীসত্ত্বার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হবে।

মন্দির সজ্জায় নারীকে দেবীরূপে, বারবনিতা ও অন্তঃপুরিকা, এই তিনরূপের অবস্থানেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। এছাড়া সেবাদাসী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীদের অবসর সময় ব্যতীত করার কয়েকটি মূহুর্তও টেরাকোটার উৎকীর্ণ ফলকে লক্ষ করা যায়। মন্দিরগাত্রে দেবীরূপের মূর্তিফলকগুলির দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেবদেবী প্রসঙ্গ আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে, তাই পুনরায় তা আর দেওয়া হল না। অন্যান্য যে সকল নারীমূর্তিফলক মন্দিরসজ্জায় প্রত্যক্ষ করা গেছে, তার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হল-

মন্দিরগাত্রে নারীর মাতৃরূপের মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়, কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে তৃতীয় ফলকে তিনজন হিন্দু নারী দণ্ডায়মান। মধ্যবর্তী নারীর ক্রোড়ে রয়েছে একটি শিশু এবং শিশুটি পার্শ্ববর্তী নারীটির ক্রোড়ে যেতে উদ্যত হয়েছে।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্রজী মন্দির লাগোয়া বারান্দার সম্মুখাংশে প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে চারজন নারীকে একত্রে একটি শিশুর সঙ্গে দেখা যায়। একজন নারী শিশুটিকে শয্যায় শোয়াচ্ছেন, এবং তার পশ্চাতে দণ্ডায়মান আরেকজন নারী শিশুটির দৃষ্টি একটি ঝুলন্ত খেলনার দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন। চতুর্থ ফলকে একজন নারী তার একহাতে একটি শিশুকে ধরে রয়েছেন এবং অন্য আর একটি শিশু নারীটির ক্রোড়ে উঠতে উদ্যত হয়েছে। পঞ্চম ফলকে পাঁচজন নারী সার বেঁধে দণ্ডায়মান। তাদের সম্মুখে তিনজন শিশু নৃত্যরত। মাঝের শিশুটি খোল বাজনরত, নারীরা হাতে এবং করতাল সহযোগে তাল দিচ্ছেন।

সাংসারিক কর্মের গৃহবধূর মূর্তিফলক দেখা যায়, দেবীপুরের ঁলক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরে। মন্দিরটির সম্মুখ দেওয়ালে দ্বারের শীর্ষে অর্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে সপ্তদশ ফলকে দেখা যায়, একজন বধূ কাঁখে কলসি নিয়ে দাঁড়িয়ে, ডানহাত দিয়ে তার শিশুকে ধরে রয়েছেন এবং শিশুটিও তার মায়ের পরনের কাপড়খানি ধরে রয়েছে।

অন্তঃপুরিকাদের কয়েকটি দৃষ্টান্তের পর, এবারে আমরা বারবনিতাদের কিছু মূর্তিফলকের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব- কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফলকে বাতায়নে দণ্ডায়মান বারবনিতার মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়।

শ্রীবাটির পঞ্চরত্ন শঙ্কর মন্দিরে সঙ্গীতরত বারবনিতার দৃশ্যফলকের উল্লেখ বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এই গ্রামেরই ভোলানাথ মন্দিরে মূল প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের শীর্ষাংশে সজ্জিত দুটি ফলকের মধ্যে ডানদিকের ফলকটিতে একজন গণিকা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে এবং তার বামপার্শ্বে একজন পুরুষ মূর্তি লক্ষ করা যায়। নারীটির দেহের উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত এবং নিম্নাঙ্গে একটি বস্ত্রখণ্ড লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরেই উর্দ্ধাংশে আরও বেশ কয়েকটি বারবনিতার মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের তলদেশ থেকে শীর্ষস্থানে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় ফলকে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট বারবনিতাদের নৃত্যদৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে।

এছাড়া নারীর উপর অত্যাচারের দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে, কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের বারান্দার মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত বামদিক থেকে প্রথম ফলকে। এখানে দু'জন পুরুষ একজন নারীর দুটি হাত টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

এরপর সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের কয়েকটি দৃশ্যফলকের উল্লেখ করা যাক- কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে পঞ্চম ফলকে, পদ্মাসনে উপবিষ্ট মহিলার মূর্তিফলক দেখা যায়। তার পরনে রয়েছে কাপড় এবং মস্তকটি কাপড়ের আঁচল দিয়ে ঢাকা। ডানহাতটি দিয়ে আঁচল ধরে রয়েছেন।

উক্ত মন্দিরেরই উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে পূর্বোক্ত ফলকের ন্যায় অনুরূপ একটি দৃশ্যফলক লক্ষ করা যায়। নারীটি ফুলকারি নকশার মধ্যে উৎকীর্ণ হয়েছে।

পূর্বোক্ত ফলকগুলি ব্যতীত মন্দির সজ্জায় বাতায়নবর্তিনী নারীদের মূর্তিফলকও লক্ষ করা যায়। প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের বামদিক থেকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে পঞ্চম ফলকে বাতায়নবর্তিনীর মূর্তি লক্ষ করা যায়।

উক্ত মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভে তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয়, পঞ্চম ফলকে বাতায়নবর্তিনীর মূর্তি লক্ষ করা যায়।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের কৃত্রিম প্রবেশ দ্বারটি শহরের বাড়ির দরজার অনুকরণে তৈরি করেছেন ভাস্করগণ। উক্ত দরজাটি সামান্য ফাঁক করে একটি নারীর উঁকি দেওয়ার দৃশ্যটি আকর্ষণীয়।

উক্ত মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে কৃত্রিম প্রবেশদ্বারের অলিন্দ শীর্ষের বামপার্শ্বে লক্ষ করলে দেখা যায়, একটি উঁচু তিনতলার বাড়ির ছাদে দু'জন অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণের শঙ্কর মন্দিরের মুখ্যদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে কার্নিশের তলদেশে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে বাতায়নবর্তিনীর সুন্দর একটি ফলক লক্ষ করা যায়। এখানে দু'জন নারী পাশাপাশি জানালায় দণ্ডায়মান।

শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের ভোলানাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে পঞ্চম ফলকে সম্ভ্রান্ত বা বিত্তশালী পরিবারের মহিলা ক্রোড়ে একটি পোষ্য নিয়ে দণ্ডায়মান।

দেবীপুরের ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে একটিমাত্র ফলকে, অভিজাত সম্প্রদায়ের নারী হাতে ময়ূর নিয়ে দণ্ডায়মান। তার পরনে দীর্ঘ ঝুলের পোশাক এবং অবগুণ্ঠনরত।

কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে সপ্তম ফলকে, একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা ক্রোড়ে ময়ূর নিয়ে উপবিষ্ট। মূর্তিটির মুখমণ্ডলটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দার পূর্বমুখী বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত দুটি সারির মধ্যে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় সারিটির তলদেশ থেকে ষষ্ঠ ফলকে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা, তার সম্মুখে দণ্ডায়মান একটি ময়ূরকে খাওয়াচ্ছেন।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের কৃত্রিমদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে নকশার মধ্যে উৎকীর্ণ ফলকগুলির উল্লম্বভাবে সজ্জিত প্যানেলের তলদেশ থেকে অষ্টম ফলকে মুসলিম রমণীর বইপড়ার দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

মন্দিরগাত্রে বিভিন্ন ফলকগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়ার পাশাপাশি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, যার ফলে মধ্যযুগীয় সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা করা যাবে। মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর অবস্থান খুব

সম্মানের ছিলনা, তা সেই সময়ে রচিত বিভিন্ন কাব্য- মহাকাব্য থেকেই জানা যায়। সামন্ত প্রভুদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়েছিল নারীরা। নারায়ণ দেব রচিত 'পদ্মপুরাণ' কাব্যে বাণিজ্যযাত্রা পথে মনসার ছলনায় সর্বহারা চাঁদসদাগর কাঠ বিক্রি করে কড়ি উপার্জন করার পর, চাঁদের উক্তিতে বক্তব্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

"চান্দ বলে অর্ধেক কড়ি বৈসায়া খাটাইব।
আর অর্ধেক কড়ি আমি নটীরে বিলাইব।।"[২৬১]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'গোদার সহিত কথোপকথন' অংশে গোদার মুখের কথা শুনে মনে হয় তৎকালীন সমাজে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী বা নারী থাকতে পারত। এবং সে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী'কেও ভোগ্যপণ্য মনে করে তাকেও কামনা করার দুঃসাহস করে কুপ্রস্তাব দিতে পারত। তা গোদার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বেহুলার প্রতি গোদার উক্তি-

"চারি নারী মোর ঘরে অনেক বিলাস করে
খাসা গুয়া খায় ছাঁচিপান।
সিঁথায় সিন্দুর ভরা সুখে ঘর করে তারা
জঞ্জাল গোদের মাত্র ঘ্রাণ।।
তুমি হৈলে পাঁচ নারী সুখে লয়ে ঘর করি
উপদেশ মিলাইয়া আনি।
এই নিবেদন রাখ আমার মন্দিরে থাক
জলে ভেসে কেন যাবে ধনী।।"[২৬২]

'মনসামঙ্গল' কাব্যে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যা সমাজে নারী জাতির অবস্থানকে কলঙ্কময় করে তুলেছিল। ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'ব্যাসকৃত গঙ্গা তিরস্কার' অংশে ব্যাস গঙ্গাকে বেশ্যা বলতে, কুণ্ঠা বোধ করেননি। ব্যাসের উক্তি-

"বেশ্যাধর্ম লয়ে আছ জাতি কুল নাহি বাছ
রূপ গুণ যৌবন না চাও।"[২৬৩]

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে বঙ্গে বর্গির আক্রমণের ফলে যে দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার মধ্যে বাংলার স্ত্রীজাতির প্রতি অন্যায় অত্যাচারের দিকটিও তুলে ধরেছেন কবি। তিনি বলেছেন-

"কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।।"[২৬৪]

উক্ত কাব্যে নারীদের শারীরিক নির্যাতনের কথাও পাওয়া যায় 'মালিনী নিগ্রহ' অংশে। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে দেবী দুর্গা স্বেচ্ছায় গণিকারূপে লাউসেন'কে ছলনা করার উদ্দেশ্যে লাউসেনের আখড়া ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। মধ্যযুগীয় কাব্যধারায় যেমন কানাড়া, বেহুলার মত তেজস্বিনী পতিব্রতা সতী নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, পাশাপাশি নয়ানীদের মত কুলনা শ্রেণির নারীদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নয়ানী চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে। সপ্তদশ শতকের কবি কাশীরাম দাস, 'মহাভারত'এ শিব মোহিনীরূপী নারায়ণ'কে চিনতে না পেরে বলেছেন-

"শিব বলে কন্যা এই সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা বিনা নাহি জানি আর।।
ত্যাজিলাম সর্ব কর্ম ভার্যা পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন।।"[২৬৫]

মধ্যযুগীয় সমাজে নানা কুপ্রথা নারীদের জীবন অন্ধকারময় করে তুলেছিল। তারমধ্যে একটি প্রথা হল, 'বাল্যবিবাহ' এবং অপরটি হল 'বহু বিবাহ'। বহু বিবাহের দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৃদ্ধ পুরুষের সঙ্গে বালিকা কন্যার বিবাহের নিদারুণ প্রথাটি তৎকালীন বাংলার সমাজে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন কাব্য সাহিত্যে এই 'বাল্যবিবাহ' প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, 'শিবায়ন' কাব্যে, হর- পার্বতীর বিবাহে পার্বতী জননির হৃদয়ের বেদনাতে কবি, বাংলার গৃহস্থ মায়েদের বেদনারই প্রতিফলন দেখিয়েছিলেন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে বলা হয়েছে-

"আই আই ওই বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।"[২৬৬]

'শিবায়ন' কাব্যে 'মেনকা বিলাপ' অংশে মেনকার উক্তি-

“ছি ছি ছি কি বলিব তারে
খেপা বুড়া দিগম্বর ধাক্ক্যা মার‍্যা বারি কর
আইবুড় ঝি থাকুক মোর ঘরে।।
বাপ মায়ের বয়স প্যায়া বিভা করিবেন লাজ খায়্যা
আস্যাছেন ঘুট্যাপাশ মাখ্যা।”[২৬৭]

উক্ত সকল দৃষ্টান্তের মধ্যে নারীর অস্তিত্বের বিপন্নতাই প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী সাধারণত কুলবতী, পতিব্রতা, রূপ ও যৌবনবতী হওয়াই ছিল একমাত্র কাম্য। তাই এইসময় রচিত সাহিত্যে নারীদের দেহ সৌন্দর্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই সময় নারী জাতির বিদ্যার উপর কোন অধিকার ছিলনা। তারা শুধু কুল রক্ষার্থেই জন্মগ্রহণ করত। পতিব্রতার শিরোপা শিরে নিয়ে নারীকে স্বামীর অনেক অন্যায় ইচ্ছা নীরবে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকত না। সতী নারীর স্বামীকে বেশ্যাগৃহে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তও সাহিত্যে পাওয়া যায়। সংসারে নারীর পরিচয়, ‘পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা’। অর্থাৎ নারী, পুরুষের যৌনইচ্ছা চরিতার্থ করবে ও বংশরক্ষা করবে।[২৬৮]

পূর্বে শ্রীবাটির চন্দ্র’পরিবারের ভোলানাথ মন্দিরে যে মুসলিম রমণীর বই পড়ার দৃশ্য লক্ষ করা যায়, এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন সমাজে নারীদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি কোন অধিকার ছিলনা, তাই কোনও মন্দির ভাস্কর্যে দেশিয় মহিলাদের বই বা পুথি হাতে কোন মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়নি। মন্দির শিল্পীরা হয়ত মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার গুরুত্বটা অনুভব করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোনও দেশিয় মহিলার পুথি বা বই হাতে কোন চিত্রফলক মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করার সাহস দেখাতে পারেননি।

বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হয়েছিল। চৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতা দেবী, নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানি প্রভৃতি মহিলাগণ বৈষ্ণব সমাজে সমাদরে উচ্চাসন লাভ করেছিলেন। এদের বহু শিষ্য ছিল। স্ত্রী গুরু হিসেবে জাহ্নবী দেবী বৃন্দাবনে বিশেষ সমাদর পেয়েছিলেন।[২৬৯]

অর্থাৎ, ‘মন্দির সজ্জায় নারী’ এই বিষয়টি আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তৎকালীন অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সমাজে নারীজাতি নানা কুপ্রথার শিকার হয়ে, অশিক্ষার অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করত। বৈষ্ণব আন্দোলনের পর থেকে, নারীজাতির জীবন ক্রমশ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে থাকে। তবে এই পথ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়নি, কিছু অভিজাত সম্প্রদায়, বিত্তশালী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মন্দির ভাস্কর্যে বিদেশি বা আগন্তুকের প্রভাব-

বর্ধমান জেলার মন্দির ভাস্কর্যে বিদেশি পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমায় চিত্রায়িত করা হয়েছে। অধিকাংশই মন্দিরগাত্রেই বিদেশি প্রভাব লক্ষণীয়। মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারায় বিভিন্ন শাখায় যেমন বিদেশি শব্দের প্রবেশ ঘটেছিল, তেমনই তৎকালীন বাংলার মন্দিরগাত্রেও দেশিয় মানুষের পাশাপাশি বিদেশি মানুষেরও বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ভাস্করগণ সমানভাবে যত্নসহকারে চিত্রায়িত করেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসনের ফলে শিক্ষিত বাঙালির কাছে ব্রজভাষা অনেকটা পরিচিত হয়েছিল। রাজকার্যের ভাষা ছিল তখন ফারসি, সুতরাং ফারসি ভাষাও অনেকে শিখতে শুরু করেছিলেন। এই ফারসি জ্ঞানের পথ ধরে হিন্দুস্থানিরও প্রবেশ বাংলায় ঘটেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর কোন কোন আখ্যায়িকা কাব্যে তাই পশ্চিমা ভাট ও সিপাইয়ের মুখে অথবা সম্ভ্রান্ত মুসলমান কিংবা পীরের জবানিতে ব্রজভাষার ও হিন্দুস্থানির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় ফারসি ও আরবি শব্দের প্রবেশ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অবারিত হয়ে গেল। বেশ কিছু এমন ফরাসী শব্দ নেওয়া হল যেগুলির কোন প্রতিশব্দ বাংলায় ছিলনা। আবার অনেকগুলি নূতন বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সেইসব বস্তুর পোর্তুগিজ নামও বাংলায় গৃহীত হল। বিশিষ্ট ফারসি শব্দের মতো এগুলিও বাঙালির শব্দভাণ্ডারে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। যেমন- জানালা, বালতি, তিজেল,পরাত ইত্যাদি। বাংলাভাষার সঙ্গে পোর্তুগিজ ভাষার উল্লেখযোগ্য সংস্পর্শ ঘটেনি, সুতরাং বাংলাভাষা পোর্তুগিজ ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি বলা যায়। তবে পোর্তুগিজ পাদরিরা তাদের ধর্মপ্রচারের

উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যে ছোটখাট নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে কম-সংস্কৃত জানা শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বাঙালি কারবার ছাড়া সরকারি দলিলপত্র সবই ফারসিতে লেখা হত।[২৭০]

মূলত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়, তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যে। যুগের প্রভাবে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য দেখা যায় কবিকঙ্কণের কাব্যে। গুজরাটে মুসলমানদের বসবাসের বিষয়ে বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি একাধিক আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেছেন।[২৭১] কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কারণ কবি বাল্যকালে ফারসি শিক্ষা পেয়েছেন এবং তিনি পরবর্তী সময়ে রাজসভার কবি হয়েছিলেন। তখন ফারসি ছিল দরবারী ভাষা।[২৭২]

অর্থাৎ তৎকালীন বাংলাসাহিত্যে বিদেশি ভাষার প্রভাব যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি মন্দিরগাত্রেও বিদেশি ও আগন্তুকদের চিত্রিত মূর্তিফলক লক্ষ করা যায়। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল-

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে প্রথম কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে সজ্জিত তলদেশ থেকে চতুর্থ ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে ভিক্টোরিয়ান চেয়ারে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ইংরেজ পুরুষ, আঁটসাঁট পুরোহাতা জামা ও পাতলুন পরিহিত; পায়ে বুটজুতো। তার হাতে বৈষয়িক দলিল-দস্তাবেজ রয়েছে। সম্মুখে ও পশ্চাতে দণ্ডায়মান দেশিয় অভিজাত সম্প্রদায়ের পুরুষগণ।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের বামপার্শ্বের ভিত্তিতলের উপর বামদিক থেকে প্রথম উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলে চারটি ফলক দ্বারা সজ্জিত অনুভূমিক সারিগুলির তলদেশ থেকে অষ্টম সারিতে চারটি ফলকেই বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান বিদেশি পুরুষ মূর্তি রয়েছে। প্রত্যেকের পরনে রয়েছে লম্বা ঝুলের গাউন, কোমরের কাছে চওড়া বন্ধনী রয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকের বাবরি চুল সিঁথি করে দু'ভাগে বিভক্ত। এই মন্দিরেরই পূর্বমুখী দেওয়ালের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়াল লাগোয়া থামের সম্মুখাংশে একেবারে শীর্ষস্থানে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে অশ্বারূঢ় ইংরেজ পুরুষ মূর্তি রয়েছে।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বাদশতম ফলকে ভিক্টোরিয়ান চেয়ারে উপবিষ্ট সাহেবের মূর্তি রয়েছে। পরনে রয়েছে গলাবন্ধ সম্পূর্ণ আঁটসাঁট পোশাক। পোশাকটির ঊর্ধ্ব ও নিম্নাংশ একসঙ্গে যুক্ত। পায়ে বুট জুতো এবং মাথায় বিচিত্র টুপি রয়েছে।

এই মন্দিরেরই মূল প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে নকশা করা ফলকের উল্লম্বসারির উপর থেকে পঞ্চম ফলকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত পোশাক পরিহিত মেমসাহেব হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট। ইনি বামহাত দিয়ে একটি টুপি ধরে রয়েছেন।

শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে সজ্জিত নকশা করা ফলকের উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে সপ্তম ফলকে একজন সাহেবের মুখমণ্ডলটুকু উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সাহেবের মাথার টুপি এবং কণ্ঠবন্ধনীটুকু দৃশ্যমান।

এই মন্দিরেরই দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের শেষ প্রান্তে চারটি ফলক দ্বারা নির্মিত হয়েছে একটি করে অনুভূমিক সারি, এই সারিগুলি উল্লম্বভাবে সজ্জিত। উক্ত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম সারি পর্যন্ত বিদেশি মঙ্গোলয়েড'দের মূর্তি ফলক লক্ষ করা যায়।

কালনার গোপালজী মন্দিরের দক্ষিণমুখী প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের পূর্বমুখী দ্বিতীয় দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় ফলকে অশ্বরূঢ় ইংরেজদের দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। এদের প্রত্যেকের পরনে আঁটসাঁট পোশাক ও পাতলুন রয়েছে।

শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে এবং প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালেও পূর্বোক্ত স্থানেরই ডানদিক থেকে লক্ষ করলে প্রথম ফলকে সারিবদ্ধ বন্দুকধারী বিদেশি সৈন্যদল লক্ষ করা যায়। সৈন্যদের মাথায় রয়েছে বিশেষ ধরনের টুপি, গায়ে আঁটসাঁট পুরোহাতা জামা এবং হাঁটু পর্যন্ত পাতলুন।

উপরোক্ত ফলকের অনুরূপ ফলক লক্ষ করা যায়, বনকাটি গ্রামের গোপালেশ্বর শিবমন্দির গাত্রে। মন্দিরে প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে।

কালনার লালজী মন্দিরের পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে তৃতীয় দক্ষিণমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে দুটি অশ্বের উপর উপবিষ্ট তরোয়ালধারী বিদেশি সৈন্য এবং তৃতীয় ফলকে দলবদ্ধ বন্দুকধারী বিদেশি পুরুষ দণ্ডায়মান। এদের পরনে ছোট জামা এবং হাঁটু পর্যন্ত পাতলুন রয়েছে।

কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের সম্মুখাংশে ত্রিখিলান যুক্ত বারান্দার মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে দেখা যায়, পাঁচজন পোর্তুগিজযাত্রী সহ একটি ভাসমান জাহাজ। এদের মধ্যে একজন যাত্রী একটি দড়ি জাহাজ থেকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে আরেকজন ডুবন্ত যাত্রীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। জাহাজের যাত্রীদের পরনে রয়েছে আঁটসাঁট পোশাক, জামা এবং পাতলুন। তাদের মাথায় টুপি রয়েছে।

কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে দক্ষিণপার্শ্বের মন্দিরটির প্রবেশপথের বাম দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে দেখা যায় একটি মালবাহী ভাসমান বিদেশি জাহাজ এবং জাহাজের খোলে মানুষ রয়েছে।

পূর্বোক্ত ফলকের অনুরূপ একটি দৃশ্যফলক লক্ষ করা যায়, বৈদ্যপুর গ্রামের চালা শিবমন্দিরটির প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে অষ্টম বা শেষতম ফলকে এবং কালনার পাঁচরখী গ্রামের রাস্তার ধারে রঘুনাথদাস দে'র প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের প্রবেশপথের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে পঞ্চম ফলকে। পূর্বোক্ত ফলকগুলি ব্যতীত বন্দুকধারী বিদেশি সৈন্যদের দৃশ্যফলক মন্দিরাত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মন্দিরগাত্রের পাশাপাশি তৎকালীন রচিত বাংলা সাহিত্যেও বিদেশিদের অনুপ্রবেশ এবং তাদের আচার-আচরণের নানা তথ্য পাওয়া যায়। যেমন- ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এইসব বিদেশি বণিকদের নিয়ে বলা হয়েছে-

"প্রথম গড়েতে কোলোপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস।।
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী।।
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান।।
তুরকী আরবি পড়ে ফার্সী মিশাল।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে।।"[২৭৩]

উক্ত গ্রন্থে বর্গি আক্রমণ প্রসঙ্গে তাদের দ্বারা হওয়া অত্যাচারের একটি করুণ দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবি লিখছেন,

"বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।।
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।।
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল।।"[২৭৪]

অর্থাৎ বলা যায়, পাশ্চাত্য থেকে আগত এই আগন্তুকদের জীবনযাপনের প্রভাব বাংলার জনজীবন, সমাজে ও সংস্কৃতিতে পড়েছিল। মন্দির নির্মাণ শিল্পীরাও পোর্তুগিজ জলদস্যু ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের জীবনযাত্রার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন, যার প্রমাণ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ফলকগুলি। ভাস্করগণ পরম যত্নসহকারে পোর্তুগিজ ও অন্যান্য বিদেশিদের যে জীবনালেখ্য মন্দিরগাত্রে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

মন্দির ভাস্কর্যে মিথুন দৃশ্য-

মন্দিরগাত্রের অলংকরণে মিথুন দৃশ্যের উপস্থিতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। মিথুন ভাস্কর্যের ধারাবাহিক বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন নারায়ণ সান্যাল, তাঁর ‘ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন’ গ্রন্থটিতে।

স্ত্রী-পুরুষের যৌনমিলন দৃশ্যের সন্নিবেশ উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে, বিশেষ করে পুরীর জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর এবং কোনারক মন্দিরে সর্বাপেক্ষা বেশি লক্ষ করা যায়। বলাই বাহুল্য, মন্দিরগুলি খ্রিস্টীয় একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। উড়িষ্যার আরও বহু মন্দিরে ঐ মিথুনদৃশ্য লক্ষ করা যায়।[২৭৫] কোন কোন সামন্ত শাসক এবং তাদের অনুগ্রহ ভাজক নিজেদের ব্যভিচারী জীবনকে একটা ধর্মের মোড়কে সমাজে সহনীয় করে তুলতে চেয়েছিল। ধর্মের মোড়ক না থাকলে হয়তো সেই বিশেষ রমণী ধনী সাধকের বিরংসায় অপ্রাপ্যই থেকে যেত। এ জাতীয় ব্যভিচারী ভূমধ্যকারী এবং ধনকুবের ক্ষেত্র বিশেষে তাদের ক্লেদাক্ত জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত করাবার আয়োজন করে থাকতে পারে। কিন্তু এটা সমগ্র ভারতব্যাপী একটা সাধারণ সূত্র নয়।[২৭৬]

ওড়িশা, উত্তরভারত, মধ্যভারত থেকে আরম্ভ করে এদেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মৈথুন মূর্তিগুলিই স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে শুধু একটি প্রশ্নই জাগিয়ে তোলে, যে কি ধরনের প্রেরণায় তৎকালীন শিল্পীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় স্থানে এই ধরনের মূর্তিগুলি গড়েছেন এবং রাজারাই বা কেন উৎসাহিত করেছিলেন শিল্পীদের। এই বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত, শিল্পী সমালোচকদের মত একেক রকম। এক শ্রেণির পণ্ডিতগণ মনে করেন মৈথুন বিষয়ক দৃশ্যগুলি তৎকালীন সমাজের নৈতিক মূল্যের প্রতি উদাসিনতা এবং চরিত্রহীনতার এক প্রকট প্রকাশ। সেকালে এই ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমই ছিল শিল্পকলা; সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি পৌঁছানোর জন্য মন্দিরের মাধ্যমে এই ধরনের ভাস্কর্য করা হয়েছে। আবার কিছু কিছু সমালোচকদের মতে, মৈথুন বিষয়ক ভাস্কর্যগুলি সে যুগের একটি বিশেষ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপের চিত্রণ, যা ভোগের মতো ভোগকে মোক্ষপ্রাপ্তির পথ বলে মনে করে এবং ভোগের এই ধরনের ক্রিয়াকে ধর্মানুষ্ঠান বা পূজাপাঠের মতোই সম্পন্ন করে থাকে। অনেকের মতে, এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল সে যুগে ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ, এই চারপ্রকার পুরুষার্থের চিত্রণ ফলে অন্যান্য দৃশ্যের সঙ্গে কামকলার দৃশ্যও উৎকীর্ণ হয়েছে মন্দিরের দেওয়ালে। আরও একটি মতের কথা জানা যায়, সেকালে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসংখ্য সাধু সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। ফলে সংসারে বৈরাগ্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং বৈদিককাল থেকে চলে আসা চারটি পুরুষার্থের পরম্পরা প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তাই বৈদিকধর্ম নির্দেশিত জীবনের উপযুক্ত পুরুষার্থকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এই ধরনের ভাস্কর্য মন্দিরের দেওয়ালে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।[২৭৭]

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে বিভিন্ন চরিত্রের ভোগজীবনের বর্ণনা করেছেন কবি ভারতচন্দ্র। আমরা জানি ভারতচন্দ্র আদিরসের কবি হিসেবেই খ্যাত। গোটা বিদ্যাসুন্দর কাব্য ভোগজীবনের উজ্জ্বল রসকাব্য হয়ে উঠেছিল। উক্ত কাব্যে ‘নারীগণের পতিনিন্দা’ অংশে কবি নারীপুরুষের অসম মিলনের অতৃপ্তি ও নৈরাশ্যের দিকটিও তুলে ধরেছেন।[২৭৮] উক্ত কাব্য ব্যতীত জগজ্জীবন রচিত ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে, বড়ু চণ্ডীদাস রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে বিভিন্ন ভাবে সম্ভোগ দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। সাহিত্যের পাশাপাশি বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে অলংকরণ হিসেবে মিথুন দৃশ্যকেও স্থান দেওয়া হয়েছে, তবে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে খুব সামান্যই মিথুন দৃশ্য লক্ষ করা যায়। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাক-

কালনার গোপালজী মন্দিরের দক্ষিণমুখী প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত প্রথম মৃত্যুলতার ফলকের দুইপার্শ্বেই মিথুন দৃশ্য রয়েছে। এবং দ্বিতীয় পূর্বমুখী দেওয়ালের মৃত্যুলতার ফলকের মধ্যে মিথুন দৃশ্য রয়েছে।

কুলটি গ্রামের রাস্তার উপর জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে বামপার্শ্বের চালা মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপরে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের প্রথম সারির ডানদিক থেকে তৃতীয় ফলকে এবং দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে মিথুন দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে ষষ্ঠ ফলকে মিথুন দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের বামপার্শ্বের দেউল মন্দিরটিতে মুখ্য প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ফাঁদগ্রন্থির নকশার প্যানেলের শীর্ষাংশে একটিমাত্র ফলক রয়েছে, যেখানে নারীপুরুষের সম্ভোগদৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। এই মন্দিরেরই প্রবেশদ্বারের ডানপার্শ্বের দেওয়ালে বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফাঁদগ্রন্থির নকশার প্যানেলের শীর্ষাংশে একটিমাত্র ফলকে মিথুন দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির শিবমন্দিরের মুখ্যদ্বারের বামপার্শ্বের তৃতীয় কৃত্রিমদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের একাদশ ফলকে মিথুন দৃশ্য রয়েছে।

উপরিউক্ত মন্দিরগুলি ব্যতীত মিথুন দৃশ্যের ফলক লক্ষ করা যায়নি। তবে অনুমান করা যায় যে, বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে মিথুন দৃশ্য প্রাধান্য পায়নি। মধ্যযুগের আগে সাধারণভাবে কামকলা নিয়ে কোনও ছুৎমার্গ ছিল না। সংস্কৃতে কাম ও প্রেম সমার্থক দুটি শব্দ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যখন বলছেন, "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম"- তখন থেকে কাম ও প্রেম পরস্পর বিরোধী শব্দ হিসেবে প্রতিপন্ন হল। এই নিষেধাজ্ঞার প্রভাবেই হয়তো অথবা মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতার কারণে, মধ্যযুগের বাংলার শিল্পে যৌনতা বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেনি।[২৭৯] তবে বাংলার মন্দিরশিল্পে চৈতন্যোত্তর যুগে এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে আঠার-উনিশ শতকের মন্দিরগুলিতে এই দৃশ্য বেশি লক্ষ করা যায়। 'মিথুন' দৃশ্যকে পারিভাষিক শব্দে 'মণি' বলা হয়। মন্দিরের বহিরঙ্গে এর সন্নিবেশের ফলে বজ্রপাত প্রভৃতির ভয় থাকে না। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশের ফলে 'মণি'র সন্নিবেশ বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যেতে থাকে, টেরাকোটা অলংকরণে বা প্রস্তর ভাস্কর্যে।[২৮০]

মন্দির ভাস্কর্যে দেবকল্প চরিত্র চিত্রায়ণ-

স্থানীয় জাতি- উপজাতি এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পকলার প্রসারের সাথে সাথে প্রাচীন শিল্পকলার যে ক্ষুদ্র অবশেষ মানুষের ধারণায় সুপ্ত অবস্থায় ছিল- তার নতুন আকারে উন্মেষ লক্ষ করা যায়। যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর মানুষের সেই প্রাচীন সংস্কারের বীজ থেকেই উদ্ভূত, যা ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মের কাহিনি, পুরাণ এবং সংস্কারের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এদের দৈহিক আকার এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাত সম্পর্কে যে চিত্রকল্প আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা উপজাতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক এবং এইজন্যই এদের রূপায়ণ বিশেষত্ব মাটির কাছাকাছি। কিন্তু অপ্রাকৃতিক কাহিনিকে আশ্রয় করে এদের চিত্রকল্প করা হয়েছে। কুবের সম্পদের অধীশ্বর, যিনি পরিবৃত্ত থাকেন ভয়ঙ্কর যক্ষ'দের দ্বারা। তিনি যক্ষ, রাক্ষস এবং গন্ধর্ব'দের সকলের প্রধান।

কুবের সভার অনতিদূরে শিব ও উমা বসবাস করেন। এছাড়া ওর সাথে থাকেন বিদ্যাধর'রা, তাদের প্রধান চক্রধর্মণ; এবং কিমপুরুষ'রা, তাদের প্রধান দ্রুম কুবের ও যক্ষদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এবং রাক্ষস'দের আশ্রয় দেন। যক্ষদের প্রধান অস্ত্র গদা। যক্ষ'দের আরেক বিভাজন আছে, নর এবং কিন্নর গান্ধর্ব। মানবিক এবং ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত, এই গন্ধর্ব'রা তাদের রূপ পরিবর্তন করেন অবস্থানুযায়ী। কুবেরের সভায় তার আসনের ভিত্তিতে গন্ধর্ব অথবা আধা- পাখি, আধা- ঘোড়া'র রূপ সদৃশ গুহকের অবস্থান। গন্ধর্ব'রা যোদ্ধা হিসেবে তির- ধনুক ব্যবহার করেন। যদিও তারা মানুষের আকৃতিতে জন্মগ্রহণ করেছে, তবুও তারা দানব ও রাক্ষসদের সাথে একই আসনে ঈশ্বরের শত্রু হিসেবে অধিষ্ঠিত। কিন্নর হল গান্ধর্ব'য়ের একটা রূপ। যাদের কুবের সভায় আলাদা ভাবে দেখা যায়।[২৮১] 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে গন্ধর্ব'দের উল্লেখ রয়েছে। 'পারিজাত সংগ্রহে নারদকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ' অংশে কবি লিখেছেন-

"আছএ অমৃত কোথা ইন্দ্র নন্দন বনে।
অনেক জোদ্ধা রাখে তোথা গন্ধর্ব্ব দেবগণে।।"[২৮২]

বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থে যক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর; এরা সকলেই উপদেবতা। সমাজের নীচুতলার মানুষদের দ্বারা পূজিত। পরবর্তীকালে এরা পৌরাণিক দেবতাদের বাহন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। প্রজাপতি ব্রহ্মার ক্ষুধা থেকে যক্ষ ও রাক্ষস’দের জন্ম। যক্ষরাজ ও কিন্নর’দের অধীশ্বর কুবের ও যক্ষরাজ রাবণ হলেন বৈমাত্রেয় ভাই। জৈন সাহিত্যে এদের বলা হয় ‘ব্যন্তর দেবতা’। বৌদ্ধ-জৈন সাহিত্যে এবং ধর্মতত্ত্বে এইসব উপদেবতার স্থান আছে। কুৎসিত নর অর্থে কিন্নর শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অশ্বমুখী নর বা নরমুখী অশ্ব হল ‘কিন্নর’। মধ্যযুগে বাংলার শিল্পে যক্ষ যক্ষিণীর নিদর্শন পাওয়া যায় না। অথচ চৈতন্যপূর্ব যুগ থেকে যক্ষ পূজার রমরমা ছিল।[২৮৩]

মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যে উপদেবতার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গন্ধর্ব’দের ফলক লক্ষ করা যায়। গন্ধর্ব আর কিন্নর সঙ্গীতে পারদর্শী বলে, মন্দিরগাত্রে এদের ফলকগুলিতে সঙ্গীতবাদ্য হাতে নিয়েই লক্ষ করা যায়। বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে মানুষ ও পাখি মিশ্রিত একপ্রকার জীব লক্ষ করা যায়, যারা বাদ্যযন্ত্রধারী। কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির সংলগ্ন বারান্দায় প্রবেশের মধ্যবর্তীয় অন্তঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে বীণাবাদনকারী মানুষ ও পাখি মিশ্রিত গন্ধর্ব মূর্তি লক্ষ করা যায়। যার দেহের ঊর্ধ্বাংশটি মানুষের মত এবং নিম্নাংশটি পাখির পায়ের মতো। এই মূর্তির অনুরূপ একটি মূর্তি লক্ষ করা যায়, কালনার বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দিরের প্রবেশপথের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের ডানদিক থেকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে পঞ্চম ফলকে।

দেবীপুরের মন্দিরটির পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে চতুর্থ সারির বামদিক থেকে প্রথম ফলকে বাদ্যরত ঘোড়ামুখযুক্ত বিহঙ্গ দেহবিশিষ্ট কিন্নর এবং তৃতীয় ফলকে নারী এবং বিহঙ্গের মিশ্রিত রূপের কিন্নরী মূর্তি লক্ষ করা যায়।

বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে পূর্বোক্ত উপদেবতাদের মূর্তি ফলকগুলি অধিকমাত্রায় লক্ষ করা যায় না। কিছু কিছু মন্দিরগাত্রে এদের দু’একটি মূর্তি ফলক লক্ষ করা গেলেও মন্দিরগাত্রে এই সকল মূর্তি ফলকের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়নি।

মন্দির ভাস্কর্যে মিশ্রজীব-

পূর্বোক্ত বিষয়টিতে যে সকল উপদেবতার উল্লেখ করা হল, তারাও একধরনের মিশ্রজীব, অর্থাৎ দুটি জীবের সংমিশ্রণে গঠিত এক বিশেষ জীব বা প্রাণী। যেমন- গজসিংহ, ড্রাগন, সিংহমানব, অশ্বাকৃতির সিংহ ইত্যাদি। বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে যে সকল মিশ্রজীবের ফলক লক্ষ করা যায়, তাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কালনার গোপালজী মন্দিরের উত্তরমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের পূর্বমুখী দেওয়ালের কিনারায় সিংহমানবের মূর্তি লক্ষ করা যায় মৃত্যুলতার প্যানেলের মধ্যে। যার মুখমণ্ডল মানুষের ন্যায়, বাকি দেহাংশ সিংহের মতো। কালনার লালজী মন্দিরের বারান্দায় পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে ড্রাগনের উপর দণ্ডায়মান পুরুষমূর্তি লক্ষ করা যায়।

শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের সম্মুখাংশের দু’পাশের কোণের স্থানে ড্রাগন জাতীয় জীবের ফলক লক্ষ করা যায়। অশ্বাকৃতির সিংহমূর্তি লক্ষ করা যায়, বনকাটির গোপালেশ্বর মন্দিরের কার্নিশের তলায় কোণের স্থানে। কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের শেষ প্রান্তে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় সারির বামদিকের চতুর্থ ফলকে একটি মৎস্যকন্যার মূর্তি দেখা যায়। যার ঊর্ধ্বাঙ্গ মানুষের মতো এবং নিম্নাঙ্গ মাছের মতো। বর্ধমান সদর মহকুমার সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির চত্বরে প্রবেশপথের বামপার্শ্বের মন্দিরটির বারান্দার মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের খিলানশীর্ষে সপরিবার দেবী দুর্গার ফলকে দুর্গার বাহন সিংহের মুখাবয়বটি ঘোড়ার মতো। এই মূর্তিকে হালআমলের মৃৎশিল্পীরা ঘোড়াসিংহ বা ‘ঘোড়াদাবাসিংহ’ বলেই উল্লেখ করেছেন।

মন্দির ভাস্কর্যে মৃত্যুলতা-

মধ্যযুগের শেষপর্বে নির্মিত বিভিন্ন রত্নমন্দির গুলির বহিরঙ্গ সজ্জায় যে অলংকরণগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তার বিষয়বস্তুগুলি অদ্ভূত ধরনের। গবেষকগণ এগুলির নাম দিয়েছেন 'মৃত্যুলতা ভাস্কর্য' বা *'The Chain of Death'* আবার কোন গবেষক এর নাম দিয়েছেন 'সংহার শৃঙ্খল মোটিফ'। মৃত্যুলতার ভাস্কর্যে মানুষ, জন্তু জানোয়ারের উল্লম্বভাবে একত্রীভূত এক মিছিলের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। হাতি, সিংহ, বাঘ বা হাতির উপর মানুষ তার উপর বাঘ বা হিংস্রজন্তু, বর্শাহত কোন অশ্বারোহী সৈনিক অথবা হস্ত্যারোহী সৈনিক তার উপর বাঘ থাবা বসিয়ে আছে ইত্যাদি নানা দৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই বিষয়গুলি বর্ধমান জেলার কালনার লালজী মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির এবং গোপালজী মন্দিরের ত্রিকোণাকার বাঁকানো চালের নীচ থেকে পাদমূল পর্যন্ত প্রতি কোণে কোণে সংস্থাপিত হয়েছে। এই প্রতিটি মন্দির পঁচিশটি রত্ন বিশিষ্ট। মাঝেমাঝে এই মৃত্যুলতার মিথুন দৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন, কালনার গোপালজী মন্দিরের দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

উক্ত মৃত্যুলতার নিদর্শনটি অনুপ্রাণিত হয়েছে, বাংলার দারুনির্মিত রথের স্থাপত্য ভাস্কর্য থেকে। কাঠের চূড়াযুক্ত রথের অনুকরণে বাংলার রত্নমন্দির গুলির স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয়েছে; পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, একুশরত্ন, পঁচিশরত্ন ইত্যাদি মন্দিরশৈলী হিসেবে খ্যাত হয়েছে। রথের গায়ে উৎকীর্ণ তক্ষণ ভাস্কর্যের অনুরূপ মন্দিরের 'টেরাকোটা' অলংকরণে প্রাভাবিত হয়েছে। এই অলংকরণগুলির মধ্যে শিবসেনা ও কালীসেনা'র মধ্যে যুদ্ধ দেখান হয়েছে।[২৮৪]

কালনার লালজী মন্দিরের বারান্দায় পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের কোণের স্থানে মৃত্যুলতার প্যানেলের মাঝে কালীসেনা'র যুদ্ধ দেখা যায়। শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের দু'পাশের দেওয়ালে উল্লম্বভাবে মৃত্যুলতার ভাস্কর্য লক্ষ করা যায়।

রথ বা মন্দির কোন অলংকরণে এই প্রথাগত ভাস্কর্যটির তাৎপর্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না বা সাধারণভাবে ভাস্করগণ এগুলিকে কী নামে অভিহিত করেছিলেন, তাও অজানা হয়ে গেছে। তবে প্রাচীন মূর্তি ভাস্কর্যের মধ্যে গজসিংহ বা গজশার্দূলের মূর্তি এককভাবে সংস্থাপিত হয়েছিল, তারই বেশ কিছুটা অনুকরণ দেখা যায় বাংলার রথ বা মন্দিরে ব্যবহৃত মৃত্যুলতার ভাস্কর্যে। এই ভাস্কর্যগুলি বাংলার রথ ও মন্দির নির্মাণ শিল্পীদের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল; যার প্রকাশ ঘটেছে মন্দিরগাত্রের বৈচিত্র্যময় অলংকরণের মধ্যে।[২৮৫]

মন্দির সজ্জায় প্রতীকী নিদর্শন-

বাংলার পল্লীরমণীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎসব, পালা পার্বণে যে বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে থাকে, সেগুলি হল- নানা ধরনের লতাপাতা, ফুল, ফল, পাতা, নদনদী, মাছ, পাখি, বিভিন্ন গৃহপালিত পশু, চন্দ্র- সূর্য- নক্ষত্র এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা উপকরণ। এই বিষয়গুলি মাঝে মধ্যে এক আশ্চর্য নকশায় রূপান্তরিত হয়, যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 'হাতে পো, কাঁখে পো' অর্থাৎ বহু সন্তান ক্রোড়ে জননির প্রতীকী স্মৃতি বহন করছে। আর একটি নারীকেন্দ্রিক লোকচিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত জনপ্রিয় প্রতীকী নিদর্শন হল 'শিখীচঞ্চুপুটে সর্প', অর্থাৎ একটি সাপকে ময়ূর দুটি ঠোঁটের মধ্যে ধরে রেখেছে এমন একটি দৃশ্য। এই বিষয়ে গবেষকগণ মনে করেছেন, ময়ূরের অতিরিক্ত প্রজনন শক্তির জন্য, এই প্রাণীটিকে উর্ব্বরতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করার রীতি সর্বত্র প্রচলিত। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কবি ময়ূরের সাপ ধরে ভক্ষণ করার একটি দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, এইভাবে-

"গুহার মউর ধাইতে বড় শূর
সাপ খেদি খেদি খায়।"[২৮৬]

আমরা জানি যে, সাপের শত্রু হল ময়ূর, অন্যদিকে বেজীও শত্রু হিসেবে গণ্য হলেও, এক্ষেত্রে সর্পসঙ্কুল বাংলায় প্রজনন ক্রিয়াচারের এই প্রতীকী নিদর্শন রূপে ময়ূরের অলংকরণই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। পল্লীবাংলার কাঁথার বুননেও এধরনের প্রতীকী নিদর্শন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হত। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, আশুতোষ মিউজিয়াম ও গুরুসদয় মিউজিয়ামে সংগৃহীত নকশিকাঁথায়।[২৮৭]

পূর্বোক্ত এই দুটি প্রতীকী নিদর্শনই বর্ধমানের জেলার মন্দিরগাত্রের অলংকরণে লক্ষ করা যায়। ‘হাতে পো, কাঁখে পো’ এই প্রতীকী নিদর্শনটি প্রায় অধিকাংশ মন্দিরগাত্রেই লক্ষ করা যায়। বহু সন্তান সঙ্গে জননির দৃশ্যের দৃষ্টান্ত পূর্বে ‘মন্দির সজ্জায় নারী’ এই বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তবুও আর একটি দৃষ্টান্ত আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে দেওয়া হল। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার শ্রীবাটি মন্দির প্রাঙ্গণের ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে নকশা করা ফলকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে পঞ্চম ফলকে একজন রমণীর কাঁখে একটি শিশু রয়েছে এবং তার ডানহাত দিয়ে আরেকটি শিশুকে ধরে রয়েছেন।

‘শিখীচঞ্চুপুটে সর্প’ এই প্রতীকী নিদর্শনটি লক্ষ করা যায়, দেবীপুরের মন্দিরটির সম্মুখ দেওয়ালের দু’ধারে কার্নিশের তলদেশে কোণের স্থানে। এখানে দেখা যায়, একটি ময়ূর, একটি সাপের লেজ ঠোঁটের মাঝখানে ধরে রয়েছে, সাপের ফনাটি নীচের দিকে রয়েছে।

পূর্বোক্ত দুটি প্রতীকী নিদর্শন ছাড়াও বলশালী ব্যক্তির প্রতীকী ফলক লক্ষ করা যায় শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে দ্বিতীয় ফলকে। এখানে একজন বলশালী পুরুষ, দুটি হাতে দুটি হাতির শুড় ধরে রয়েছেন, তার দুই বাহুমূলের মাঝে দুটি সিংহের কণ্ঠরোধ করে রেখে, একটি মানুষের মাথার উপর তার দুটি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মেসোপটেমিয়া’র লোককথায় এমন বলশালী বীর গিলগামেশের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতীয় জৈন, বৌদ্ধ বা পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে বিশেষ এই বলশালীর মূর্তি সম্পর্কে কোন উল্লেখ বা বর্ণনা আছে কিনা জানা যায় না। সুতরাং মন্দিরগাত্রে এইরূপ ভাস্কর্যের ফলকে অতিব বলশালী ব্যক্তিটির যে চিত্র লক্ষ করা যায়, তা কিসের দ্যোতক তা জানা না গেলেও, একটি বিষয় স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, আবহমানকালের কোন প্রথাগত প্রতীকী নিদর্শন এইভাবেই কালে কালে প্রদর্শিত হয়ে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।[২৮৮]

মন্দিরগাত্রের অলংকরণে পশুপাখির দৃশ্যায়ণ-

মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হিংস্র জন্তু জানোয়ারের পাশাপাশি গৃহপালিত পশুপাখির দৃশ্যও লক্ষ করা যায়। হিংস্র জন্তুদের মধ্যে বাঘ, সিংহ, শিকারী কুকুর, ড্রাগন জাতীয় একধরণের প্রাণীকে অধিকমাত্রায় লক্ষ করা যায়। এছাড়া গৃহপালিত বা নিরীহ বন্যজন্তু যেমন- হাতি, গরু, হরিণ, ভেড়া, ষাড়, উট, ঘোড়া, হনুমান, ইঁদুর, ভাল্লুক, শূকর ইত্যাদি প্রাণী। জলচর ও সরীসৃপ প্রাণীদের মধ্যে সাপ, কুমীর, মাছ, মকর ইত্যাদি প্রাণীর ফলক মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়। এই সকল জীবজন্তু ব্যতীত বিভিন্ন ধরণের পাখি, যেমন- ময়ূর, টিয়া, ঈগল, হাঁস, মুরগী, পেঁচা ইত্যাদি প্রাণীদের দৃশ্যফলক মন্দিরগাত্রে অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষ করা যায়।

বর্ধমান জেলার মন্দিরগাত্রে সজ্জিত পূর্বোক্ত পশুপাখিদের দৃশ্যফলকগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক- মন্দিরগাত্রে বাঘ, সিংহ’কে দেবীদের বাহন হিসেবে এবং শিকারদৃশ্যে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। শিবের বাহন হিসেবে ষাঁড়ের দৃশ্যফলকের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। হাতি, ঘোড়া, উটের পিঠে যোদ্ধা বা শিকারীদের দৃশ্যাবলি প্রায় অধিকাংশ মন্দিরগাত্রেই লক্ষ করা যায়। মানুষের বৃত্তি সংক্রান্ত আলোচনায় ভাল্লুক ও গরুর প্রসঙ্গ এসেছে। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা দৃশ্য বর্ণনায় গরুর উল্লেখ করা হয়েছে। গণেশের বাহন হিসেবে ইঁদুর এবং রামসীতার ফলকে বা রামের পৃথক দৃশ্যফলকের মধ্যে হনুমান’কে দেখা গেছে। রাম-রাবণের দৃশ্যে অধিক সংখ্যক হনুমান’কে লক্ষ করা যায় এবং সাথে জাম্বুবান’কেও।

‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে ‘অন্নপূর্ণা পুরীনির্মাণ’ অংশে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার, পাখির নাম উল্লেখিত হয়েছে। যেমন-

“সরভ কেশরী বাঘ বারন গন্ডার।
ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার।।
বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু।
বরাহ কুক্কুর ভেড়া খটাস সজারু।।
ঢোলকান খেঁকি খেঁকশিয়ালি ঘোড়ারু।

বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলারু।।
গাধা গোধা হাপা হাউ চমরী শৃগাল।
হোড়ার নকুল গোলা গবয় বিড়াল।।
কাকলাস ধেড়ে মুষা ছুঁটা আজ নাই।
সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িলা বিশাই।।"[২৮৯]

এছাড়াও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে, রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে, বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যেও বিবিধ জীবজন্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বর্ধমান জেলায় মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় গরুর ফলক এবং কুকুরের ফলক লক্ষ করা যায়। গরু অতিপরিচিত গৃহপালিত পশু। তাই এর ফলক মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যে স্থান পেয়েছে, এটি আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু বিভিন্ন মন্দিরের শিকার দৃশ্যে ও যুদ্ধদৃশ্যে'র অধিকাংশ ফলকেই শিকারী কুকুরদের সংখ্যাধিক্য আশ্চর্যের বিষয় এবং অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়-

দেবীপুরের মন্দিরটির সম্মুখস্থিত বারান্দায় প্রবেশদ্বারের দু'পাশের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলগুলিতে যে যুদ্ধযাত্রার চিত্রগুলি লক্ষ করা যায়, সেখানে হাতি, ঘোড়ার পায়ের কাছে রূপায়িত হয়েছে শিকারি কুকুর। কালনার গোপালজী মন্দিরগাত্রে শিকার দৃশ্য বর্ণনায় শিকারী কুকুরদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউরোপীয় সাহেব বা দেশিয় ভূস্বামী বা অভিজাতদের বিলাসবহুল দোলা বা সুখাসনে করে যাত্রার ক্ষেত্রে দোলা'র তলদেশে কুকুরের প্রতিকৃতি লক্ষ করা যায়। এখানে কুকুরকে প্রভুভক্ত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন মন্দির শিল্পীগণ। এই ধরণের ফলকগুলি তৈরির প্রেরণা এসেছে খ্রিস্টীয় সতের-আঠার শতকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ইউরোপীয় বণিক, কুঠিয়াল, রাজকর্মচারী বা কোন দেশিয় অভিজাত ভূস্বামী; যারা গ্রামাঞ্চলে নানা স্থানে যাতায়াত করতেন, তাদের বিলাসবহুল যাতায়াতের দৃশ্যগুলি থেকে। কালনার লালজী মন্দির, গোপালজী মন্দির, জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দির প্রভৃতি মন্দিরগুলিতে এই ধরনের দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

শিকারি দলের সঙ্গে যে কুকুরগুলি দেখা যায়, সেগুলি শুধুমাত্র পোষা বলেই শিকারি দলে আছে, নাকি শিকারের জন্য তালিমপ্রাপ্ত তা বলা সম্ভব নয়। তবে এই প্রসঙ্গে মোগল দরবারে প্রচলিত শিকার সংক্রান্ত নিয়মবিধি ও প্রথার পুরনো ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, সেইসময়ে মোগল বাদশাহদের শিকার যাত্রায় শিকারি কুকুর অবশ্যই থাকতো। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তার শিকার যাত্রার প্রয়োজনে তালিমপ্রাপ্ত শিকারি কুকুর এবং শিকারি বাজপাখি আমদানি করা হত, পারস্যের মত দূরদেশ থেকে। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় রাজকর্মচারী ও কুঠিয়ালগণ শিকার যাত্রায় শিকারি কুকুরের সাহায্য গ্রহণ করতেন।[২৯০] এমন একটি দৃশ্য লক্ষ করা যায়, লালজী মন্দিরের পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের প্রথম দক্ষিণমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে। এখানে কতকগুলি কুকুর নিয়ে ঢাল তলোয়ারধারী দণ্ডায়মান সৈন্যদল লক্ষ করা যায়।

দেবীপুর গ্রামের মন্দিরটির সম্মুখস্থিত বারান্দার স্তম্ভের লাগোয়া দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ ব্লকের তলদেশ থেকে চতুর্থ ফলকে দেখা যায়, একজন পুরুষ একটি শূকরকে ডানহাত দিয়ে ধরে পা উপরে এবং মাথাটি নিচের দিকে করে ঝুলিয়ে রেখেছেন। উক্ত মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দার পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের উত্তরমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে দুটি ভেড়ার, মুখোমুখি লড়াইয়ের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই মন্দিরেরই বারান্দার পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে দ্বিতীয় প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে দেখা যায়, দুটি হরিণ মুখোমুখি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কালনার লালজী মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার মধ্যবর্তী বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের স্তম্ভের সম্মুখাংশে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে প্রথম ফলকে দেখা যায়, উটের পৃষ্ঠে দু'জন পুরুষ একে অপরের দিকে পেছন ফিরে বসে রয়েছেন।

কালনার ২নং ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রামে রাস্তার পাশে অবস্থিত জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে বামদিকের চালা মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয় ফলকে, উটের পৃষ্ঠে অবতরণরত দু'জন পুরুষ এবং উটের মুখে দড়ি পড়িয়ে উটটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন আরেকজন পুরুষ, এইরূপ একটি দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

জলচর প্রাণীদের মধ্যে কুমিরের চিত্র দেখা যায়, কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দার পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দক্ষিণমুখী দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত, তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে। এই দৃশ্যে রয়েছে, একটি নৌকা থেকে বল্লম ছুড়ে একজন নারী একটি কুমিরকে হত্যা করছে, নৌকার আরেকদিকের কিনারায় আরেকজন নারী বৈঠা বাইছেন। বৈঠার তলদেশে জলের মধ্যে আরেকটি কুমিরকে ভাসমান অবস্থায় লক্ষ করা যায়। নৌকার মাখে একজন পুরুষ দু'দিকে কয়েকজন নারীদের নিয়ে দণ্ডায়মান।

মাছ কোন মন্দিরের ভাস্কর্যেই পৃথকভাবে দেখা যায়নি। কখনও বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের ফলকে বিষ্ণুর নিম্নাঙ্গ মৎস্যের মত করে দেখানো হয়েছে অথবা মৎস্যের মুখগহ্বরে বিষ্ণুর মূর্তি লক্ষ করা গেছে। মন্দিরগাত্রে মকর প্রাণীটিকেও গঙ্গার বাহন হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এছাড়া মকরমুখী রথের নিদর্শনও মন্দিরগাত্রে পাওয়া যায়, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যানবাহন প্রসঙ্গে। সাপ বা সর্প, মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায় শিবের কণ্ঠে এবং 'শিখিচঞ্চু পুটে সর্প' এক প্রতীকী দৃশ্যের মধ্যে। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের 'অঘাসুর বধ' পৌরাণিক লীলাদৃশ্য চিত্রায়ণে শিল্পীগণ প্রত্যেকটি স্থানে বৃহদাকার একটি সাপের মূর্তি উৎকীর্ণ করেছেন।

শ্রীবাটির শঙ্কর মন্দিরের মুখ্যদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ডানদিক থেকে উল্লম্বভাবে সজ্জিত তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে প্রথম ফলকে, দেখা যায় সর্প পরিবেষ্টিত একজন দেবতা, জলের মধ্যে ভাসমান একটি কুমিরের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট।

পাখিদের মধ্যে মন্দিরগাত্রে ময়ূরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য পাখিদের মধ্যে টিয়াপাখির অনেকগুলি ফলক বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে দেখা যায়। যেমন- প্রতাপেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে বামদিক থেকে প্রথম উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে সপ্তম ফলকে একজন বৈষ্ণব পুরুষ, একটি টিয়া পাখিকে ক্রোড়ে নিয়ে উপবিষ্ট। উক্ত মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালের মুখ্যদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে ত্রয়োদশ ফলকে দেখা যায়, একজন বিদেশি পুরুষ ডানহাতে একটি বাজপাখি নিয়ে দণ্ডায়মান।

দেবীপুর গ্রামের মন্দিরটির বারান্দার সম্মুখে দক্ষিণপার্শ্বের বহিঃদ্বার লাগোয়া প্যানেলের বামদিক থেকে দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ফলকে বিভিন্ন ধরণের পাখির দৃশ্য লক্ষ করা যায়। ষষ্ঠ ফলকে একটি টিয়াপাখির সুন্দর মূর্তি লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের বারান্দায় পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত প্রথম সারির বামদিক থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম ফলক জুড়ে বিভিন্ন রকম পাখির দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির শিবমন্দিরের মুখ্যদ্বারের বামপার্শ্বের দ্বিতীয় কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষাংশে টিয়াপাখির ফলক লক্ষ করা যায়।

জলের উপর ভাসমান হংসের সারি লক্ষ করা যায়, কালনার লালজী মন্দিরের বারান্দার পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে পূর্বমুখী দ্বিতীয় দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত তলদেশ থেকে দ্বিতীয় সারিতে। কাটোয়ার সীতাহাটি'র দেউল মন্দিরের সম্মুখাংশের দ্বারের দু'প্রান্তে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত তলদেশ থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলে হংসের সারি লক্ষ করা যায়। বনকাটির গোপালেশ্বর শিবমন্দিরের গর্ভগৃহের বামপার্শ্বের দেওয়ালের তলদেশে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত দ্বিতীয় সারির ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে, তিনটি মুরগীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার চিত্র দৃশ্যায়িত হয়েছে।

এছাড়াও দেবীপুরের মন্দির, কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বিভিন্ন স্তম্ভগুলির বিভিন্ন জায়গায় জোড়া পাখির ভাস্কর্য লক্ষ করা যায়। যেমন- দেবীপুরের মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারান্দার দক্ষিণপার্শ্বের দ্বারের দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের শীর্ষাংশে ফিগারেটিভ প্যানেলের সারির তলদেশে জোড়া পাখির ভাস্কর্য দেখা যায়। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে বলা যায়, মন্দির সজ্জায় যেমন মানুষ এবং মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপ স্থান পেয়েছে, তেমনই শিল্পীগণ তাদের পারিপার্শ্বিক প্রাণীজগৎকেও মন্দিরগাত্রে স্থান দিয়েছেন। বিষয় যাই হোক না কেন, পৌরাণিক বা লৌকিক, সর্বত্রই প্রাণীজগতের কোন না কোন জীবজন্তু ও পাখির ফলক লক্ষ করা যায়।

মন্দির সজ্জায় উদ্ভিদ ও জ্যামিতিক নকশা-

বাংলার রমণীগণ দেবগৃহে বা নিজ বাসস্থানের বিভিন্ন স্থানে যে আলপনা দিয়ে থাকেন বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে, সেই আলপনার বিন্যাসের মধ্যে দেখা যায় পদ্মকলি, কলমিলতা, শঙ্খলতা, খুন্তিলতা, ধান্যছড়া ইত্যাদি। এই আলপনার অনুকরণ'ই মন্দিরগাত্রের ভিত্তিতলের উপর, দ্বারের দু'পাশে; আবার কোন কোন মন্দিরের দু'পাশের দেওয়ালে লক্ষ করা যায়। ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি বাংলার প্রকৃতিতে যে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা প্রায় সকল মন্দিরের অলংকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে অল্পবিস্তর। এছাড়াও কিছু জ্যামিতিক নকশাও মন্দিরগাত্রে লক্ষ করা যায়, কিন্তু এই নকশার প্রচলন মুসলিম স্থাপত্যেই অধিক লক্ষ করা যায়, হিন্দু মন্দিরগুলিতে তার খুব একটা প্রচলন ছিল না। নব পর্যায়ের মন্দির নির্মাণের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত মন্দির গুলিতে ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশার রূপায়ণ ঘটেছে বেশি পরিমাণে।

পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ চৈতন্যোত্তর কালে নির্মিত মন্দিরগুলিতে আবার জ্যামিতিক নকশার বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে বৃহৎ আকৃতির ফ্লোরাল মোটিফ দ্বারা সজ্জিত ফলক লক্ষ করা যায়। যেমন- কালনার লালজী মন্দির, বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির ইত্যাদি। উক্ত মন্দিরগুলিতে পূর্বমুখী দেওয়ালে সহস্রদল পদ্মের ন্যায় নকশা করা ফুলের অলংকরণ লক্ষ করা যায়।

কালনার লালজী মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালে জানালার ঊর্দ্ধাংশে ফ্লোরাল মোটিফ লক্ষ করা যায়। এই মন্দিরের দু'পাশের দক্ষিণমুখী দ্বিতীয় দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দুটি ফিগারেটিভ প্যানেলের উপর পরপর তিনটি উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফ্লোরাল প্যানেল লক্ষ করা যায়। এছাড়াও মন্দিরটির বিভিন্ন দেওয়ালে উল্লম্বভাবে সজ্জিত ফ্লোরাল প্যানেল লক্ষ করা যায়, যেগুলি ভিত্তিতলের উপর থেকে সজ্জিত হয়ে কার্নিশের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ফ্লোরাল মোটিফের দু'পাশে জাফরির নকশাও লক্ষ করা যায়। জাফরির নকশার প্যানেলগুলিতে পূর্বোক্ত ফ্লোরাল প্যানেলের অনুরূপভাবে সজ্জিত হতে দেখা যায় মন্দিরের বিভিন্ন অংশে।

দেবীপুরের মন্দিরের দ্বারগুলির ঊর্ধ্বাংশে ফ্লোরাল মোটিফ, জ্যামিতিক নকশা লক্ষ করা যায়। আর মন্দিরের দু'পাশের দেওয়ালে লতাপাতার নকশা এবং বিভিন্ন ধরনের আলপনার নকশা লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের শীর্ষে অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত আলপনার নকশার মধ্যে ফ্লোরাল মোটিফ চিত্রায়িত হয়েছে।

পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির দু'পাশের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলগুলির তলদেশ থেকে দুটি সারি ব্যতীত অন্যান্য যে কটি সারি মন্দিরের কার্নিশ পর্যন্ত সজ্জিত হয়েছে, সেই সারিগুলিকে গ্রন্থিফাঁদ নকশার দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন- কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের দু'পাশেই দীর্ঘ গ্রন্থিফাঁদ লক্ষ করা যায়। গ্রন্থিফাঁদের উপরে এবং তলদেশে, দুই স্থানেই ফিগারেটিভ ফলকগুলি সজ্জিত হয়েছে। এছাড়া উক্ত মন্দিরে মিনারের নকশা উল্লম্বভাবে সজ্জিত রয়েছে।

গ্রন্থিফাঁদের নকশার মাঝে জাফরির অলংকরণ লক্ষ করা যায়, কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের প্রত্যেকটি দেওয়ালের দু'পাশে। এছাড়া কৃত্রিম অন্তঃদ্বারের দু'পাশের স্তম্ভেও অনুরূপ ভাস্কর্য লক্ষ করা যায়। উক্ত মন্দিরের কৃত্রিমদ্বার গুলিতেও বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা লক্ষ করা যায়। কালনার গোপালজী মন্দিরের কৃত্রিমদ্বার গুলিতে ফ্লোরাল মোটিফ দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। উক্ত মন্দিরে ফিগারেটিভ প্যানেলের তুলনায় ফ্লোরাল মোটিফ ও জাফরির আধিক্যই প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে মন্দিরের অধিকাংশ ভাস্কর্য ক্ষয় হয়ে, ফলকগুলি সমান হয়ে গেছে। দেবীপুরের মন্দিরের বারান্দার পূর্ব এবং পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের স্তম্ভ লাগোয়া দেওয়ালে ফুলকারি, লতাপাতার

ফলকের সারি লক্ষ করা যায়। এই সারিগুলি ভিত্তিতলের উপর থেকে মন্দিরের কার্নিশের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বস্থলী’র রায়-দোগাছিয়া’র গোপীনাথ মন্দিরে ফিগারেটিভ ফলক লক্ষ করা যায় না। সম্পূর্ণ মন্দিরগাত্রে বিভিন্ন রকম ফ্লোরাল মোটিফ লক্ষ করা যায়। এছাড়া ফুলকারি নকশার পাশাপাশি জাফরির অলংকরণও দেখা যায়।

মন্দিরগাত্রে কিছু উদ্ভিদের উৎকীর্ণ ফলক দেখা যায়, যেগুলি শিল্পীগণ বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্দিরগাত্রে চিত্রায়ণ করেছেন। যেমন- পৌরাণিক দৃশ্যাবলির মধ্যে কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ দৃশ্যে কদম্ব বৃক্ষের একটি বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে গোপিনিদের বস্ত্রহরণ করে কদম গাছের উঁচু শাখায় বসে থাকতে দেখা যায়। এবং গোপিনিদের ঐ গাছের তলদেশে নতজানু হয়ে করজোড়ে কৃষ্ণের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করতে দেখা যায়। এই দৃশ্য বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে চিত্রায়িত হয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। পৌরাণিক দৃশ্যাবলির মধ্যেই শিশু কৃষ্ণ ও তাঁর সখাদের বৃন্দাবনের তালবনে তাল গাছে উঠে তাল ভক্ষণের দৃশ্য লালজী মন্দিরে লক্ষ করা যায়। এই বিষয়টি নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মন্দিরগাত্রে খেজুর বৃক্ষের একটি ফলক উৎকীর্ণ হয়েছে প্রতাপেশ্বর মন্দিরে, যেখানে খেজুর গাছে উঠে একজন ব্যক্তির রস সংগ্রহের দৃশ্য দেখা যায়। পূর্বে বৃত্তি বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে এই শিউলী বৃত্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্বোল্লিখিত পৌরাণিক দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণ প্রসঙ্গে পারিজাত ফুলগাছের ফলকটি দৃশ্যায়িত হয়েছে দেবীপুরের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে। আর একটি ফুলগাছ অধিক পরিমাণে লক্ষ করা যায় মন্দিরগাত্রে, সেটি হল পদ্মফুলের গাছ। অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উপবিষ্ট ব্রহ্মা; এই দৃশ্যে বৃহৎ পদ্মের উপর ব্রহ্মাদেবকে উপবিষ্ট হতে দেখা যায়। দেবী গজলক্ষ্মীর হাতে পদ্মফুল দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে ফ্লোরাল মোটিফ হিসেবে পদ্মফুলের ফলকই অধিক দেখা গেছে।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে বলা যায় যে, কালনার বিভিন্ন মন্দিরগুলির তুলনায়, একটু পরবর্তী সময়ে নির্মিত দেবীপুরের মন্দিরে বৃহৎ ফুলকারি নকশা লক্ষ করা যায় না, যেমন দেখা যায় লালজী বা গোপালজী মন্দিরে। অন্যান্য মন্দিরগুলির তুলনায় দেবীপুরের মন্দিরে বিভিন্ন রকম আলপনার অলংকরণ, লতাপাতার প্যানেল দ্বারা মন্দিরগাত্র অলংকরণের মাধ্যমে মন্দিরটিকে দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন মন্দিরনির্মাণ শিল্পীগণ। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ফুলকারি নকশার সঙ্গে দু’একটা করে মূর্তি মন্দির সজ্জায় স্থান পেতে থাকে, তবে অনেক মন্দিরগাত্রে একটিও মূর্তি লক্ষ করা যায়নি। যেমন- পূর্বোক্ত রায়-দোগাছিয়া’র গোপীনাথ মন্দিরে। তবে বাংলায় নবপর্যায়ে নির্মিত প্রথমদিকের ভাস্কর্য ফলকগুলিতে জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশারই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। মানুষ বা পশুপাখির মূর্তি সেখানে কদাচিৎ। যেমন- বর্ধমানের কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রামে নির্মিত মন্দিরগুলিতে জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশারই প্রাধান্য দেখা যায়। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই মন্দির সজ্জায় মূর্তির স্থানই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং ফুলকারি নকশা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

চৈতন্য অনুপ্রেরণায় মন্দিরচর্চায় নবযুগ :

‘বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া’- এই ছন্দোবদ্ধ পংক্তিটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নিছক কবিকল্পনা নয়, এর চরণের ভিতর কবির গভীর অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে আজও পর্যন্ত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙালির মানসলোকে বহু বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের সৃষ্টি করেছে। বাঙালি মানস, বাঙালি সমাজ, বাঙালির ধর্ম, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, মন্দির ভাস্কর্য; এমনকি দৈনন্দিন জীবনাচারণে একটি মানুষের এমন সর্বাত্মক প্রভাব অন্যত্র প্রায় দেখাই যায় না।[২৯১]

বাংলার মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে চৈতন্যজীবন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভক্তিবাদের ঐতিহ্য বাঙালির জীবনে নবজাগরণের সূচনা করেছিল। ভক্তিধর্মের প্রেরণা ও পোষকতা পেয়েই বাংলায় সংস্কৃতি চর্চা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। যার ফলে শুধুমাত্র ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের সমৃদ্ধিই ঘটেনি, পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নানাবিধ বিষয়।[২৯২] আমরা জানি, সপ্তদশ শতকে বাংলায় মন্দির নির্মাণের ঢল নামে, তার জের চলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত। এই ত্রিশকব্যাপী মন্দির

নির্মাণের সূচনা হয়েছিল চৈতন্য আন্দোলনের সূত্র ধরেই। তবে বাংলা সাহিত্য যেমন বৈষ্ণব পদাবলি বা চৈতন্য জীবনী সাহিত্যে তৎক্ষণাৎ চৈতন্য প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমনটা মন্দিরের ক্ষেত্রে হয়নি। সাহিত্যের মতো ষোড়শ শতকে নয়, পরবর্তী শতকেই মন্দিরচর্চার গতি বৃদ্ধি পায়। কারণ মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা রয়েছে।[২৯৩] 'আচন্ডাল কোল' দেওয়ার সময়কালে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ কোটিপতি ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী বণিককেও কোল দিয়েছিলেন। বাংলার সর্বাধিক সংখ্যক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেকালের বণিক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়। ভূস্বামী বা ব্রাহ্মণকুলের অপরাপর দেবালয় নির্মাতারাও চৈতন্য প্রবর্তিত প্রবল ধর্মীয় তথা সামাজিক আন্দোলনের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। অপরপক্ষে স্থপতি বা মন্দির নির্মাণশিল্পী এবং ভাস্কর, যারা পুরাকীর্তি গুলি নির্মাণ করেছেন, তারা বর্ণশাসিত সমাজের নীচুতলার অধিবাসী হওয়ার দরুণ শ্রীচৈতন্যের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বর্জিত উদার প্রেমধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন।[২৯৪]

বর্ধমান জেলার মন্দির সজ্জায় চৈতন্যলীলার প্রধানত দুটি মোটিফ সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। একটি হল সংকীর্তন দৃশ্য ও অপরটি হল ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তি। সংকীর্তন দৃশ্যের একটি সুন্দর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দৃশ্যায়িত হয়েছে, কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরগাত্রে। মন্দিরটির পশ্চিমমুখী দেওয়ালের কৃত্রিম বহিঃদ্বারের শীর্ষভাগে পরপর তিনটি অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত প্যানেলের সবচেয়ে নিম্ন সারিটি অলিন্দের দু'পাশে বিভক্ত হয়ে সজ্জিত। বামপার্শ্বে ডুবকি ও খঞ্জনি বাদ্যরত ভক্তবৃন্দ এবং দক্ষিণপার্শ্বে মৃদঙ্গ সহযোগে নৃত্যরত পারিষদবর্গ রয়েছেন। এই সারিটির ঊর্ধ্বে সজ্জিত প্যানেলটিতে দেখা যায়, গৌর-নিতাই এবং তাঁদের ভক্তবৃন্দ ও পারিষদবর্গ খোল, করতাল, শিঙা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যরত। এদের মধ্যে কয়েকজন ধ্বজধারী ভক্তও রয়েছেন। এই সারিটির ঊর্ধ্বে সজ্জিত প্যানেলটির কেন্দ্রে চাঁদোয়ার তলদেশে দণ্ডায়মান গৌর-নিতাই মূর্তি এবং তাঁদের দু'পাশে ভক্তবৃন্দ খোল, করতাল ইত্যাদি বাদ্যসহ নৃত্যরত। এঁদের প্রত্যেকের পরনে ধুতি, চাদর অথবা উত্তরীয় রয়েছে। উক্ত মন্দিরের উত্তরমুখী দেওয়ালে কৃত্রিম বহিঃদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে দেওয়াল লাগোয়া স্তম্ভের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে দেখা যায়, চাঁদোয়ার তলদেশে দু'জন খোল বাজনরত ও নৃত্যরত পারিষদের মাঝে নৃত্যরত গৌরাঙ্গ মূর্তি।

কালনার জগন্নাথ ঘাটের জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে দক্ষিণপার্শ্বের শিবমন্দিরটিতে সংকীর্তন দৃশ্যের চিত্রায়িত ফলক দেখা যায়। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত তৃতীয় অনুভূমিক ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে পঞ্চম ফলকে দেখা যায়, খোল-করতাল সহযোগে শ্রীচৈতন্য ও ভক্তবৃন্দের নৃত্যরত মূর্তি। প্রত্যেকের পরনে রয়েছে ধুতি।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম মুখী প্রবেশদ্বারের শীর্ষে দক্ষিণপার্শ্বে রয়েছে নৃত্যরত গৌর-নিতাইয়ের মূর্তি ফলক এবং বামপার্শ্বে রয়েছে খোল-করতাল ইত্যাদি বাদ্য সহকারে নৃত্যরত ভক্তবৃন্দের দৃশ্য ফলক। কালনার লালজী মন্দিরের পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের দক্ষিণমুখী প্রথম দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিকভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় সারির বামদিক থেকে তৃতীয় ফলকে সংকীর্তন দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। মাঝে নৃত্যরত গৌরাঙ্গ এবং তাঁর দু'পাশে ঢোল, করতাল বাদ্যসহযোগে নৃত্যরত রয়েছেন পারিষদবর্গ ও ভক্তবৃন্দ।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির শিব মন্দিরটির মুখ্যপ্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের প্রথম কৃত্রিমদ্বারের শীর্ষে তলদেশ থেকে চতুর্থ ফিগারেটিভ প্যানেল জুড়ে সংকীর্তন দৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের বারান্দায় প্রবেশের পূর্বমুখী দ্বারের বামপার্শ্বের দক্ষিণমুখী দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের ডানদিক থেকে প্রথম ফলকে সংকীর্তনের দৃশ্য ফলক লক্ষ করা যায়।

অর্থাৎ পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, চৈতন্য পরবর্তী সময়ে নির্মিত মন্দিরে শৈব-বৈষ্ণব নির্বিশেষে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়েছিল, তার প্রমাণ হল বিভিন্ন শৈব মন্দিরগাত্রে সংকীর্তন বা কীর্তনের দৃশ্যের প্রতিফলন। কীর্তন হল বৈষ্ণবদের মধ্যে স্বীকৃত সাধন পদ্ধতি। শাস্ত্রবাক্য এর প্রমাণ। ভক্তিবাদী বৈষ্ণবদের মধ্যে কীর্তনের প্রচলন রয়েছে। দাক্ষিণাত্যের আড়বার সম্প্রদায়, মহারাষ্ট্রের বারকরী সম্প্রদায় এবং আসামের শঙ্করদেব

সম্প্রদায় সাধনমার্গে কীর্তনের উপর জোড় দিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩খ্রিঃ) সময় থেকে বাংলায় কীর্তনগানের সূত্রপাত হয়। কীর্তন একাকী বা কয়েকজন মিলে বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে নির্দিষ্ট সুর ও তালে সুশৃঙ্খলভাবে করাই নিয়ম। বহুলোক একত্রিত হয়ে নানাবিধ বাদ্য যেমন- মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা ইত্যাদি সহযোগে সমস্বরে কীর্তন করলে, তাকে বলা হয় সংকীর্তন।[২৯৫] 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে আদিলীলায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি, 'অবতরি প্রভু প্রচারিল সঙ্গীর্ত্তন'।

চৈতন্যলীলার একটি প্রধান অঙ্গ হল, নাম-সংকীর্তন। খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, শিঙা প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠিত সংকীর্তন, বাংলায় সম্ভবত চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের থেকেই প্রচলিত হয়েছে। একদা নবদ্বীপের কাজি অসন্তুষ্ট হয়ে নগরিয়াদের উপর উৎপীড়ন করেন এবং কীর্তন বন্ধের আদেশ দিলেন।
কাজির আদেশ অমান্য করে চৈতন্যদেব সকল ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে সংকীর্তন মিছিল করে কাজিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইতিহাসে এই 'কাজিদলন' একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলেই চিহ্নিত হয়েছে।[২৯৬]

রাজশাহীতে জমিদার সন্তোষ দত্তের আনুকূল্যে আয়োজিত খেতুরি মহোৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দর্শন বাংলার বৈষ্ণবদের উপর আরোপিত হয়। খেতুরির সময়কাল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবুও বলা যায় যে, সপ্তদশ শতকের গোড়াতেই গোস্বামীদের দর্শন বাংলায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই সময়কার শিল্পে সংস্কৃতিতে এই দর্শনের প্রতিফলন যথেষ্ট স্পষ্ট। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে খেতুরির উৎসবের পাশাপাশি শ্রীনিবাস আচার্যের দৌলতে বিষ্ণুপুর রাজসভারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[২৯৭]

১৪৩৪শকাব্দের (১৫১২ খ্রিঃ) রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য সাতটি সম্প্রদায়ের সংকীর্তন ও নৃত্যের আয়োজন করেছিলেন। তিনি নিজে রথের সম্মুখে নৃত্যরত অবস্থায় মিলনভাব প্রাপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর অকস্মাৎ ঐশ্বর্যমূর্তি জগন্নাথ দর্শনের ভাব উদয় হয়, তখন তিনি তাঁর প্রিয় পরকীয়া প্রেমের 'যঃ কৌমার হরঃ' শ্লোকটি বারবার আবৃত্তি করতে লাগলেন। এই মধুররসের প্রতি একান্ত আকর্ষণ ও ঐশ্বর্য বিমুখতা মহাপ্রভুর সমকালীন ও পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত কৃষ্ণকথার প্রধান আশ্রয় হয়ে ওঠে।[২৯৮]

সপ্তদশ শতকে মন্দির শিল্পীদের কাছে প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল রাধাকৃষ্ণ লীলা। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত মন্দির নির্মাণ শিল্পীগণ চৈতন্য ভক্তিধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মন্দির ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে চৈতন্যলীলাকেই মুখ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে নির্মিত বিভিন্ন শিল্প-স্থাপত্যের নিদর্শন থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

পূর্বে 'মন্দির ভাস্কর্যে শ্রীকৃষ্ণ লীলা' বিষয়ক আলোচনাটিতে দেখান হয়েছে যে, মন্দিরগাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে বিভিন্ন বয়সের নানা লীলাদৃশ্য শিল্পীরা কতটা যত্নসহকারে চিত্রায়িত করে তুলেছিলেন। বৈষ্ণব, শৈব সকল মন্দিরেই কৃষ্ণলীলা দৃশ্যের আধিক্য লক্ষণীয়। সেই অনুপাতে চৈতন্যলীলা মন্দিরগাত্রে বিশেষ ভাবে স্থান পায়নি। সংকীর্তন দৃশ্য ব্যতীত শুধুমাত্র ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তিই মন্দির সজ্জায় পরিলক্ষিত হয়। তবে একথাও ঠিক যে, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের ফলক নেই, এমন মন্দির খুবই কম দেখা গেছে। শ্রীচৈতন্যের ষড়ভুজ রূপের বর্ণনা পাওয়া যায় নরোত্তমের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে-

"হেনই সময়ে প্রভু ষড়ভুজ শরীর।
দেখি সার্বভৌম হইল আনন্দে অস্থির।।
উর্দ্ধ দুই হাত ধরে ধনু আর শর।
মধ্যে দুই হাতে ধরে মুরলী অধর।।
নিম্ন দুই হাতে ধরে দন্ড কমন্ডল।
দেখি সার্বভৌম হইল আনন্দে বিহ্বল।।"[২৯৯]

সার্বভৌমের কাছে চৈতন্য সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ করেন এবং তারপর তার স্বকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে শেষে ষড়ভুজ মূর্তি ধারণ করেন। তারপর সার্বভৌম আপ্লুত হয়ে শতশ্লোকে চৈতন্যের স্তব করেন। কবি বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের শেষ খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে এই ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

"শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইলা ষড়ভুজ অবতার।।"[৩০০]

রাম, কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের রূপধারী ষড়ভুজ মূর্তির সর্বাঙ্গ ধারণ করে রয়েছে দিব্যকান্তি চৈতন্যের মূর্তিতে, যা হয়ে উঠেছে একই অঙ্গে এত রূপ। এইরকম মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় সতেরো থেকে উনিশ শতকের মন্দির ভাস্কর্যে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল।

বর্ধমান জেলার কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের পূর্বমুখী দেওয়ালে অর্থাৎ মন্দিরের সম্মুখাংশে গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে স্বস্তিক ভঙ্গীমায় দণ্ডায়মান ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তি রয়েছে। ঊর্ধ্ব বামহস্তে রয়েছে ধনুক এবং নিম্নহস্তে কমন্ডলু। মধ্যের দুটি হস্তে মুরলীধারণ করে আছেন। ঊর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তে শর এবং নিম্ন হস্তে দণ্ড রয়েছে। পরনে রয়েছে ধুতি ও উত্তরীয়। শিরে ময়ূর পালক।

বনপাসের অষ্টকোণাকৃতির দেউল মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের চতুর্থ কৃত্রিম দ্বারের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে চতুর্থ সারির বামদিক থেকে চতুর্থ ফলকে এবং ষষ্ঠ কৃত্রিমদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের উল্লম্ব ফিগারেটিভ প্যানেলের তলদেশ থেকে চতুর্দশ ফলকে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তি রয়েছে।

বনকাটি গ্রামের গোপালেশ্বর শিবমন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালে ভিত্তিতলের উপর সজ্জিত প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে ষষ্ঠ ফলকে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তি লক্ষ করা যায়। এই মূর্তিটি পূর্বোল্লিখিত প্রতাপেশ্বর মন্দিরের ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তির অনুরূপ। এইরকম আর একটি মূর্তি দেখা যায়, শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণের দেউল মন্দিরটির দ্বারের শীর্ষে অনুভূমিক ভাবে সজ্জিত দ্বিতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলের বামদিক থেকে ষষ্ঠ ফলকে। এছাড়া কুচুট গ্রামের মাঝেরপাড়ার নবরত্ন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বের দেওয়ালের বামদিক থেকে প্রথম ফিগারেটিভ প্যানেলের উপর থেকে লক্ষ করলে দ্বিতীয় ফলকে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তি লক্ষ করা যায়। এছাড়াও নৃত্যরত চৈতন্যের মূর্তি রয়েছে কালনার অনন্তবাসুদেব মন্দিরের সম্মুখ দেওয়ালের দক্ষিণপার্শ্বের প্রবেশদ্বার লাগোয়া দেওয়ালের বামদিক থেকে প্রথম উল্লম্ব সারির তলদেশ থেকে ষষ্ঠ ফলকে।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রথম গৌরমূর্তি নির্মিত হয়। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণকারী বংশীবদন ছিলেন এই মূর্তির নির্মাতা। ষোড়শ শতকে বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দির প্রতিষ্ঠার পর যে কটি চৈতন্য মন্দির নির্মিত হয়, তাদের অধিকাংশই নির্মাণ করেন কোন না কোন চৈতন্য পার্ষদ। যেমন- কাটোয়ার দাস গদাধর ও কেশব ভারতীর শ্রীপাট, অম্বিকা কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত ও সূর্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট, কোগ্রামে লোচনদাসের শ্রীপাট, বাঘনাপাড়ায় রামাই ঠাকুরের শ্রীপাট, বড়বেলুনে পুরী গোস্বামীর শ্রীপাট, ঝামটপুরের কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপাট, বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাট ইত্যাদি। এই সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায় সপ্তদশ শতকে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদকর্তা বা চৈতন্য জীবনীকারদের শ্রীপাটে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি শোভা পেয়েছে, চৈতন্য বিগ্রহ নয়। অর্থাৎ মন্দির সজ্জার ক্ষেত্রে চৈতন্যের উপস্থিতির যে তারতম্য ঘটেছে, সেই রকমই চৈতন্য মন্দির নির্মাণ ক্ষেত্রেও একই রকম তারতম্য লক্ষ করা যায়। ষড়ভুজ চৈতন্যের মন্দির রয়েছে কাটোয়ার গৌরাঙ্গ পাড়ায়।[৩০১] লক্ষ করার বিষয় হল, যে সকল শ্রীপাট চৈতন্য পার্ষদ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, সেগুলির অধিকাংশই বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামে অবস্থিত।

খ্রিস্টীয় সতের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে বর্ধমান জেলায় যে সকল টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দির নির্মাণ হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণ অথবা শালগ্রাম শিলারূপী বহুবিধ নামের বিষ্ণু উপাসনার জন্য। পাশাপাশি কিছু শৈব ও শাক্ত মন্দিরও গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সেগুলির সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কেবলমাত্র শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরগুলিই টেরাকোটার কারুকার্য সমৃদ্ধ, শাক্ত মন্দিরগুলিতে টেরাকোটার কারুকার্য লক্ষ করা যায়নি। শাক্ত মন্দিরগুলি বেশিরভাগই চালা মন্দির অথবা দালান মন্দির, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় খুব কম নয়। শৈব মন্দিরগুলির অলংকরণে কৃষ্ণলীলা দৃশ্যের আধিক্য লক্ষ করা যায়। তেমনই আবার বৈষ্ণব ও শৈব মন্দিরেও দশমহাবিদ্যা ও অন্যান্য পৌরাণিক দেবীর মূর্তি ফলকের আধিক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর একটি কারণ হল, বাঙালি শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব পন্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ধর্মীয় সম্প্রীতি। এছাড়া আর একটি বিশেষ কারণ হল, সমকালীন

সুপ্রচুর বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য উচ্চ ও নিম্নস্তরের ভেদাভেদ অনেকাংশে লাঘব করেছিল। কৃষ্ণকথা থেকে রচিত লীলা কীর্তন, পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনি নিয়ে তৈরি কথকতা, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, মঙ্গলগান ইত্যাদি লোকরঞ্জনের প্রধান উপায় ও মাধ্যম হিসেবে গৃহিত হয়েছিল। এইসবের মাধ্যমে মানুষের মনে মূল্যবোধের যে আদর্শ গড়ে উঠত, শিল্পীরা মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে সেই আদর্শকেই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন পুরাণ ও মহাকাব্যের জনপ্রিয় কাহিনিগুলি। খুব সহজবোধ্য ভাবে শিল্পীরা তাঁদের শিল্প সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দর্শককে আনন্দ প্রদান করা।

ষোড়শ- সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজজীবনে চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। আর এই বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিরস ব্যাখ্যা ও আস্বাদনের মাধ্যম ছিল কীর্তন, কথকতা ও নৃত্যগীত মূলক অভিনয়। বৈষ্ণব শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় ছিল রাধাকৃষ্ণ অথবা চৈতন্যদেবের লীলা অবলম্বনে অনুষ্ঠিত লোকাভিনয় বা যাত্রাভিনয়। বাংলায় তখন সংস্কৃত নাট্য রচনার ধারাও বর্তমান ছিল। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, চৈতন্য ভক্তগণ চৈতন্যদেবের উপরেই নাটক রচনা করতেন, কিন্তু বৃন্দাবন ও নীলাচলের ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনেই নাটক রচনা করতেন।[৩০২] নটচূড়ামণি চৈতন্যদেবের নটলীলা সম্মুখে রেখে তাঁরা মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলা অবলম্বনেই নাটক লিখেছিলেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক নাটক লিখলেও শ্রীচৈতন্যদেবই ছিলেন তাঁদের মূল প্রেরণা।[৩০৩] রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' রচনা করেছিলেন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের অন্ত্যলীলায় কবি বর্ণনা করেছেন-

"স্বরূপে কহে কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে।।
আরম্ভিয়াছিলা এবে প্রভু আজ্ঞা পায়া।
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া।।
বিদগ্ধ মাধব আর ললিত মাধব।
দুই নাটকের প্রেমরস অদ্ভুত সব।।"[৩০৪]

ষোড়শ- সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি এবং সংস্কৃত ভক্তি ও রস বিষয়ক গ্রন্থগুলির অনুবাদ এবং কীর্তনের জনপ্রিয়তার ফলে রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক পালাগুলি গীত ও নৃত্যের সঙ্গে জনগণের সম্মুখে অভিনীত হত। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'যাত্রা' নামক প্রবন্ধে সমসাময়িক কালের মানুষের কৃষ্ণময়তার কথা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি অতীতকাল থেকে যে কৃষ্ণময়তার ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে, সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কৃষ্ণযাত্রার আর একটি নাম ছিল কালীয়দমন যাত্রা। এই যাত্রা শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবমূর্তি সম্মুখে রেখেই অভিনীত হত। কৃষ্ণযাত্রা প্রধানত বৈষ্ণব পদাবলির প্রভাবেই রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন বিষয়ের পালাগুলি জনপ্রিয় হলেও, নিমাই সন্ন্যাস পালা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল। শ্রোতাদের কাছে চৈতন্যদেবের অবতাররূপ অপেক্ষা, মানবীয় নবদ্বীপ লীলাই অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামী রচিত 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।[৩০৫] কৃষ্ণযাত্রার জগতে গোবিন্দ অধিকারীর স্বনামধন্য শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪১-১৯১১খ্রিঃ) অবদান অসামান্য। এছাড়া বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত ক্ষেমতা গ্রামের অধিবাসী রামচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর মেজভাই ভজরাম ঘোষও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বর্ধমান মহারাজার ছোট দেউড়ির ঠাকুরবাড়িতে রামচন্দ্র ঘোষের পুত্র কুঞ্জবিহারী ঘোষের বাঁধা আসর ছিল। এই বর্ধমান রাজাদের দ্বারা যেসকল মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেইসব মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে রাসপূর্ণিমা, দোল, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ, রাধাবল্লভ জীউ'র মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রা ও পালাগান অনুষ্ঠিত হতো। বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচাঁদ, পালা শুনে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়'কে প্রচুর সম্পত্তি দান করেছিলেন।[৩০৬]

যাত্রা যে কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল, তা অনুমান করা যায় মন্দিরগাত্রে তার প্রভাব লক্ষ করলে। কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরের চারটি দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে ফলকগুলিতে চাঁদোয়ার আধিক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই চাঁদোয়া তৎকালীন সময়ে যাত্রা বা রঙ্গমঞ্চে ব্যবহৃত হত। যাত্রা বা পালাগান শুনে গ্রাম্যসমাজের নিম্নস্তরের মানুষজন

তাদের অবসর যাপন করতেন। আর শিল্পীগণ এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আপন মনের কল্পনা দিয়ে, সে সব যাত্রাপালার কাহিনিকে বিষয় করে মন্দির সজ্জায় ব্যবহার করতেন।

মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলি নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে দুটি মৌলিক রূপ ধারণ করেছিল। একটি হল পাঁচালি আর অপরটি কবিগান। পাঁচালি প্রকৃতপক্ষে সংক্ষিপ্ত মঙ্গলগান এবং কবিগান বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলির লৌকিক রূপ। মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনায় বাংলা সাহিত্যলোকে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে, পাঁচালি, কবিগান, তর্জা, টপ্‌পা প্রভৃতি লৌকিক কাব্যের ধারা সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যের আসরটি অধিকার করে নিয়েছিল।[৩০৭]

মঙ্গলকাব্যের শেষ লগ্নে অষ্টাদশ শতকে কবিগানের উৎপত্তি। এর উৎস বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি ও মালসী গান।[৩০৮] এইসময়, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অনুকূল ছিল না। পশ্চিম মহাদেশের বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদেশের মুসলমান নবাব- বাদশাহের প্রায়ই যুদ্ধ হত। কিন্তু গ্রাম্যজীবন ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং শান্ত। বিভিন্ন লোকউৎসব; পূজাপার্বণ সংক্রান্ত উৎসবগুলি পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পেয়েছিল। সেইসময় পূজাপার্বণ গৌণ হয়ে, আমোদপ্রমোদই মুখ্য হয়ে উঠেছিল।[৩০৯] ফলে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে পালাগান ও পটুয়াগান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। পটুয়াগণ প্রায় পঁচিশ- তিরিশ হাত লম্বা কাপড়ে পাতলা মৃত্তিকা লেপনের ওপর কাগজ এঁটে রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি চিত্রিত করতেন এবং রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার পটপরিবর্তন সময়ে স্বরচিত গান করে চিত্রিত বিষয় জনসাধারণের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলতেন। সুদূর বাংলায় এখনও এই ধরনের চিত্রিত পটের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু খাস বাংলায় জড়ানো পটের চল উঠে গেছেই বলা যায়।[৩১০]

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি এবং রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ও পুরাণের ঘটনাগুলি পয়ার ছন্দে কবিতারূপে গীত হত। পটুয়ারা দৃশ্যের পর দৃশ্য তুলি ও রঙের সাহায্যে অঙ্কিত করে, পটের পর পট উন্মুক্ত করে দর্শককে দেখাতে দেখাতে বিভিন্ন ছন্দে কবিতার সুরে গান করতেন। এইসব পালার মধ্যে কালীয়দমন, চণ্ডীর ছলনা, বেহুলার বাসর, সীতাহরণ, দাতাকর্ণ, সুভদ্রাহরণ প্রভৃতি পালা থাকত।[৩১১] কবিগানের জনপ্রিয়তা যখন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল, তখন পাঁচালি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পাঁচালি গানের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য, বাংলার মঙ্গলকাব্য এবং পৌরাণিক সাহিত্যের প্রচুর ভাববস্তু থাকত। তাছারা খেমটা ও ঢপ সঙ্গীত ওইসময় প্রচলিত ছিল। কীর্তন বলতে বোঝাত নামকীর্তন, রসকীর্তন, লীলাকীর্তন। পুতুল নাচেরও প্রচলন ছিল। সাধারণত রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীর কাহিনিই ছিল পুতুল নাচের বিষয়বস্তু। কবিগান পাঁচালির সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের কলকাতায় টপ্‌পা গানের বেশ প্রচলন হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলি, মৈমনসিংহ গীতিকা ও বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের পরেও কলকাতার নাগরিক জীবনেও যে নিখাদ প্রেমগীত রচনা হতে পারে, টপ্‌পা গান তারই প্রমাণ। রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক, কাশী মির্জা, গোপাল উড়ে প্রভৃতি কবি সেদিন যে গান রচনা করেছিলেন, তা সেই সময়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষ ছুঁয়েছিল।[৩১২] পূর্বোক্ত গানগুলি ছাড়াও ঝুমুর, টুসু, ঢপকীর্তন, গোষ্ঠের গান, ভাদু প্রভৃতি লোকসঙ্গীত গুলিতেও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানগুলি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

বাংলার লোকসঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের নাম কোন সাম্প্রদায়িক পথ ধরে আসেনি, তার প্রমাণ মুসলমান কৃষক সমাজের লোকসঙ্গীতগুলি।[৩১৩] কোন লোকসঙ্গীত শুধুমাত্র একই অঞ্চলে আবদ্ধ থাকেনি, নানাভাবে সারা বাংলায় বিস্তার লাভ করেছিল; ফলে এইসব গানের ভাষাও আঞ্চলিক রূপ থেকে মুক্তিলাভ করে শ্রোতাদের বোধগম্য হয়ে উঠেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- বাউলগান, দেহতত্ত্বের গান, বৈরাগ্যমূলক গান, রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক গান ইত্যাদি। বাংলার পশ্চিমাঞ্চল বা রাঢ়অঞ্চলে খেমটি গান এবং পূর্বাঞ্চলের ঘাটু গানে রাধাকৃষ্ণ কাহিনিই মূল বিষয়বস্তু।[৩১৪]

পশ্চিম বাংলায় যে অংশ বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুর মানভূমের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করেছে, দীর্ঘকাল ধরে এই অঞ্চলে সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চলছে। জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু ধর্মের প্রভাব স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছিল। এই বিস্তৃত অঞ্চলটিতে মধ্যযুগে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে এই সমগ্র অঞ্চলটিতে বৈষ্ণবধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। মৌলিক আর্যেতর ধর্মের উপর বিভিন্ন উচ্চতর ধর্মের প্রভাব কতটা

প্রভাবশালী ছিল, তা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ধারা অনুসরণ করলে বুঝতে পারা যাবে না, বরং জনসমাজে প্রচলিত অলিখিত সাহিত্যের মধ্যেই তার সন্ধান মিলতে পারে।[৩১৫] অর্থাৎ বলা যায়, একদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত রাধাকৃষ্ণ কাহিনি যেমন সারা বাংলা ব্যাপী অখণ্ড ভাববিস্তার করেছিল, তেমনই সমস্ত দেশে এক অখণ্ড গীতিভাষার রূপও গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। রাঢ়ের প্রস্তরভূমি হোক বা পূর্ববাংলার নদ নদী, একই বৈষ্ণব পদাবলি দ্বারা লৌকিক প্রেমগীতি দুই অঞ্চলকেই প্রভাবিত করেছে। বাংলার পদাবলির রাধাকৃষ্ণ যেমন ভাগবত কিংবা বিষ্ণুপুরাণ থেকে আসেনি, তেমনই বাংলার লৌকিক প্রেমগীতের নায়ক- নায়িকা রাধাকৃষ্ণ কোন পৌরাণিক অলৌকিক চরিত্র নয়; সাধারণ প্রেমসঙ্গীতেরই নায়ক নায়িকা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে মানবিক গুণের অস্তিত্ব ছিল বলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে ভিত্তি করে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং বৈষ্ণব প্রেমসঙ্গীতের প্রেরণা যুগিয়েছে।[৩১৬]

মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে পুথির অবদান অস্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণব সাহিত্য, লোকগীতির পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের উপর অঙ্কিত পুথিগুলির দ্বারা মন্দির শিল্পীগণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। পুথি চিত্রণ শুধু বাংলার নিজস্ব সম্পদ নয়, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলেই হাতে লেখা পুথিতে চিত্রণের প্রথা প্রচলিত ছিল। আনুমানিক নবম শতকের প্রথম দিকে পাল সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে ধীমান ও তার পুত্র বীতপাল নামক দু'জন শিল্পী পূর্বভারতে এক নতুন শিল্পরীতির প্রবর্তন করেছিলেন। পালযুগে এই রীতির উদ্ভব হয়েছিল বলে, এই রীতি পালযুগের শিল্পরীতি নামে পরিচিত ছিল। দুটি ক্ষেত্রে এই রীতির প্রকাশ দেখা যায়, একটি ভাস্কর্যে ও ধাতুমূর্তি গঠনে এবং অন্যটি চিত্রকর্মে। পুথিতে কতগুলি চিত্র থাকবে তা সাধারণভাবে পুথির বর্ণনীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করলেও, পুথির ভবিষ্যৎ মালিক কে হবেন, তার আর্থিক সংগতির কথা বলে রেখেও শিল্পীরা চিত্রের সংখ্যা কম বেশি করতেন। বাংলা পুথিতে সাধারণত কেবলমাত্র প্রথম অথবা শেষ পত্রেই চিত্র পাওয়া যায়। তাই এদের বর্ণনীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা করা ও শোভাবর্ধক চিত্র না বলে, অলংকরণ বলাই শ্রেয়।[৩১৭]

ষোড়শ শতক থেকেই শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম সারা বাংলায় প্রচারিত হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপে বৈষ্ণব সাধুদের আখড়ায় পুথির অনুলিপি ও অর্চনা শুরু হয়। এইসব আশ্রমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্থানীয় ভূস্বামী ও বণিক সম্প্রদায়।[৩১৮] বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক পুথিগুলির বিষয়বস্তু প্রথমে ছিল রাধাকৃষ্ণ, পরে শ্রীচৈতন্য কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। এই শ্রেণির পুথির অলংকরণে প্রায়ই কৃষ্ণমূর্তি, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, শ্রীকৃষ্ণের চরণ এবং নৃত্যরত শ্রীচৈতন্যের আভাস মেলে। আর এইসব ক্ষেত্রে শিল্পীমনকে অতিক্রম করে আমাদের কাছে ভক্তহৃদয়টি সহজেই ধরা দেয়। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম লোকজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাকে কেন্দ্র করে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা যেমন পুষ্ট হয়েছিল, পাশাপাশি লোকশিল্পও পুষ্ট হয়ে উঠেছিল সমভাবেই। পট, পাটা, পুথির পাতায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবননাট্যের নানা কাহিনিকে অবলম্বন করে বহু শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।[৩১৯]

শ্রীচৈতন্যের চরণচিহ্ন আঁকা অনেক বৈষ্ণব বিষয়ক পুথি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহের চৈতন্যভাগবতের পুথিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংগ্রহে চৈতন্যচরিতামৃতের একটি পুথিতে প্রথম পত্রে লাল কালি দিয়ে পাঁচজোড়া চরণচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। শিল্পীরা বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক পুথিগুলিকে পাখি, ফুলগাছ, লতাপাতা, দেবদেবীদের মনোরম চিত্র ছাড়াও প্রাকৃতিক জগতের মনোরম আকৃতি, সুঠাম অঙ্গভঙ্গি, বিচিত্র গগন মুদ্রা, এছাড়া কিছু জ্যামিতিক নকশা দ্বারা অলংকরণ করতেন। অন্যান্য বিষয়ক পুথিতে বিভিন্ন লতাপাতা, ফুল, বৃক্ষ, মাছ, জীবজন্তু ইত্যাদি সব চিত্র দ্বারা অলংকরণ করা হত।[৩২০]

বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের একটি পুথির প্রতিটি পাতার মাঝখানে লাল ও কালো কালির ব্যবহারে শিবলিঙ্গের নানাধরনের ছবি আঁকা রয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, 'রথযাত্রা ও মথুরা বিরহ' নামের একটি পুথিতে পুরীর জগন্নাথের সুদৃশ্য ছবি আঁকা আছে। বিশ্বভারতী'র সংগ্রহের কাশীরাম দাসের মহাভারতের একটি পুথির প্রথম ও শেষ পত্রটি জুড়ে যুদ্ধের ছবি আঁকা রয়েছে। প্রথমপত্রে ঘোড়ার পিঠের উপর একটি মানুষ, আর ঘোড়ার পায়ের তলায় পদদলিত একটি মনুষ্যমূর্তি। শেষপত্রে সারিবদ্ধ বীরদর্পে দণ্ডায়মান পাঁচটি মনুষ্যমূর্তি আর তাদের

সম্মুখে অশ্বারূঢ় ব্যক্তির ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের তলায় শায়িত, পরাজিত এক মনুষ্যমূর্তি। কালোকালি দিয়ে আঁকা এই চিত্রগুলিতে পোশাক- পরিচ্ছদে পুরোপুরি ইংরেজ সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। অন্যান্য যেসব পুথিগুলি পাওয়া গেছে, তাতে পৌরাণিক বিষয় বহির্ভূত বহু চিত্র রয়েছে। যেমন ময়ূর আঁকা প্রচুর পুথির পাতা পাওয়া গেছে। পুথি যেহেতু কেনাবেচা চলত, তাই তার বহিরঙ্গের অলংকরণের দিকে দৃষ্টিপাত করা সহজ ছিল। যাতে পরে পুথিটি পাঠকের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে সহজে মূল্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। অলঙ্কৃত সুদৃশ্য পুথি সংগ্রহ ছিল আভিজাত্যের পরিচায়ক, তাই সেকালের শিক্ষিত মানুষজন হাতে লেখা পুথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন।[৩২১]

মন্দিরগাত্রের অলংকরণে একমাত্র শ্রীবাটির ভোলানাথ মন্দিরে প্রবেশদ্বারের শীর্ষাংশে সজ্জিত তলদেশ থেকে তৃতীয় ফিগারেটিভ প্যানেলে ডানদিক থেকে তৃতীয় ফলকে তিনজন বৈষ্ণব পুরুষ একটি বালককে নিয়ে দণ্ডায়মান যার মধ্যে দ্বিতীয় বৈষ্ণব পুরুষের দক্ষিণহস্তে একখানি পুথি লক্ষ করা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবননাট্য বাংলা লোকসাহিত্যে যে কতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সতেরো শতকের পরবর্তী সময়ে পট ও পাটার অলংকরণে তার খানিকটা ছাপ রয়েছে। কাঠের পাটার চিত্রণের কতকগুলি নিজস্ব বিষয় রয়েছে। যেমন- দশঅবতার, রামের অভিষেক, শ্রীকৃষ্ণলীলা, সমুদ্রমন্থন, সর্পযজ্ঞ, শিবের ভিক্ষা সংগ্রহ, রথযাত্রা ইত্যাদি। সতেরো শতকের পরে চৈতন্যলীলার বিভিন্ন বিষয় যুক্ত হয়েছিল, যেমন- মস্তক মুণ্ডন, নগর সংকীর্তন, নীলাচলে সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্য, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে চৈতন্যদেব, সন্ন্যাসগ্রহণ ইত্যাদি।[৩২২] সুদূর পশ্চিমবাংলায় পটুয়ারাই ছিলেন প্রধান শিল্পী। এঁদের চিত্রাঙ্কণের প্রধান উপকরণ ছিল পুথির পাটা। এই পাটার ওপর রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, পৌরাণিক ও বৈষ্ণবীয় ঘটনাবলি চিত্রিত হতে থাকে। পুথির ভিতরকার বিষয়গুলি তাঁরা পাটার ওপর প্রতিফলিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।[৩২৩] লক্ষণীয় যে, পাটা চিত্রে ভক্ত বৈষ্ণবের রূপে অনেক সময় পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিকৃতি চিত্র উৎকীর্ণ থাকত। অর্থাৎ একদিকে যেমন সমাজের নিম্নবর্গিয় মানুষ ডোম ও চন্ডাল আশ্রয় পেয়েছিল নতুন ধর্মের ছত্রছায়ায়, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উচ্চকোটির পৃষ্ঠপোষকরাও নিজেদের স্বার্থে একে গ্রহণ করে। শ্রীচৈতন্য গণ্য হন বিষ্ণুর দশঅবতারের মধ্যে। পুরীর রাজা ও বিষ্ণুপুরের সামন্তপ্রভু বীর হাম্বির পরিচিতি পেয়েছিলেন বৈষ্ণবভক্ত হিসেবেই। রাম ও কৃষ্ণলীলার মতোই চৈতন্যলীলা বাঙালি শিল্পীদের কাছে ক্রমশ চিত্রের বিষয় হয়ে ওঠে। ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ, একই সঙ্গে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চিহ্ন বহন করে নতুন রূপকল্পের মাধ্যমে দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যে।[৩২৪] মন্দির সজ্জার ক্ষেত্রে শিল্পীগণ যেমন সাহিত্যের জনপ্রিয় বিষয়গুলি কেন্দ্র করে তাদের শিল্প সৃষ্টি করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, তেমনই পুথি, পাটা, পট ইত্যাদির অলংকরণের দ্বারা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফলে মন্দিরগাত্রের অলংকরণে লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই।

বলাই বাহুল্য মন্দিরগুলি ভক্তগণের জন্য নয়, উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির ফরমায়েশ অনুযায়ী, মূলত তাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হত। অল্প সংখ্যক মন্দির পরবর্তী সময়ে তৈরি হয়েছিল জনগণের চাঁদার অর্থে অথবা বারোয়ারি পূজার জন্য। অধিকাংশ লৌকিক দেবতার স্থান হত গাছতলায় বা মাটির ক্ষুদ্র চালা ঘরে।[৩২৫] লক্ষণীয় বিষয় হল, চৈতন্য পূর্ববর্তী সময় থেকে বঙ্গদেশে জনগণের ধর্মাচরণ ছিল লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক, যেমন- চণ্ডী, বিষহরি, বাসুলী, যক্ষ, ষষ্ঠী প্রভৃতি। চৈতন্যভাগবতের আদিখন্ডে বৃন্দাবন দাসের বক্তব্যে তা প্রমাণিত। তিনি বর্ণনা করছেন-

" 'ধর্ম কর্ম' লোক, সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পুজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন।।"[৩২৬]

তারপর বলছেন-

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।।
বাসুলী পূজায়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।।"[৩২৭]

অর্থাৎ চৈতন্য পূর্ববর্তী সময় থেকেই সমাজে ঐসকল লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলির ভাস্কর্যে এইসকল দেবদেবীদের প্রভাব লক্ষ করা যায়না। বর্ধমান মন্দিরগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষা করে এইরকম কোন মূর্তি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সর্বোপরি বলা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বাংলার সংস্কৃতির যে বহুমুখী প্রকাশ ঘটেছিল, বিশেষ করে শিল্পকলায় শিল্পী ভাস্কররা তার নিদর্শন রেখে গেছেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে মহাত্মার আবির্ভাব ঘটেছে এবং তখন সেইসব যুগাবতারের প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশিয় শিল্পীগণ, তাঁদেরকে শিল্পকলায় অঙ্গীভূত করে শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন। যেমন, ইউরোপীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে যীশুখ্রিস্ট অথবা একসময় গোটা এশিয়া জুড়ে ভগবান বুদ্ধ শিল্পী সমাজের প্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন। তেমনই চৈতন্য ভক্তিধর্মে উজ্জীবিত বাঙালির শিল্পকলায় কৃষ্ণের বিভিন্ন রূপভেদের পাশাপাশি, শ্রীচৈতন্যদেব হয়ে উঠেছিলেন এক অন্যতম রূপকল্প, যার উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে মন্দির দেবালয়ের মূর্তি বিগ্রহে এবং স্থাপত্য ভাস্কর্যের অলংকরণের মধ্যে।[৩২৮]

॥ তথ্যঋণ ॥

১. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ.. ৪- ৭।

২. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ১৫।

৩. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ৩।

৪. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩; পৃ. ১০০।

৫. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ.. ৮,৯।

৬. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩; পৃ. ১০০।

৭. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ৪৪।

৮. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ.. ৯৮,১০২।

৯. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯; পৃ. ১৫১।

১০. তদেব পৃ. ১০৫।

১১. তদেব পৃ.. ৯৬,১০৫,১১২,১১৩।

১২. সরকার নীরদবরণ, বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত; কলকাতা; কল্যাণ বুক এজেন্সি; ২৪শে আগস্ট ২০০৮; পৃ. ২৫৭।

১৩. সেন সুকুমার, বটতলার ছাপা ও ছবি; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; জানুয়ারি ২০০৮; পৃ. ৪৭।

১৪. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ৯৪।

১৫. সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; ১৯৭৮; পৃ.. ১০৮,১১১,১১২।

১৬. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ.. ১০৫,১১৩,১১৪।

১৭. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪; পৃ. ২৪৯।

১৮. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ৫৯।

১৯. সেন সুকুমার, বটতলার ছাপা ও ছবি; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; জানুয়ারি ২০০৮; পৃ. ৪৭; পৃ. ৪৬।

২০. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু; কলকাতা; রত্নাবলী; মাঘ ১৪০৯; পৃ. ১৭৩।

২১. মিত্র খগেন্দ্র নাথ, সেন সুকুমার, চৌধুরী বিশ্বপতি, চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৯; পৃ. ১৩।

২২. বিশ্বাস অচিন্ত্য, বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকথা; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; শ্রাবণ ১৪২১; পৃ. ৫২৮।
২৩. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু; কলকাতা; রত্নাবলী; মাঘ ১৪০৯; পৃ. ১৯০।
২৪. মিত্র খগেন্দ্র নাথ, সেন সুকুমার, চৌধুরী বিশ্বপতি, চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৯; পৃ. ১৪।
২৫. তদেব পৃ. ১৭
২৬. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু; কলকাতা; রত্নাবলী; মাঘ ১৪০৯; পৃ. ২০৪।
২৭. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ৬৫।
২৮. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু; কলকাতা; রত্নাবলী; মাঘ ১৪০৯; পৃ.. ২০৭,২০৮।
২৯. তদেব পৃ. ২০৮
৩০. মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; শ্রাবণ ১৪০৭; পৃ. ২৪৫।
৩১. মিত্র খগেন্দ্র নাথ, সেন সুকুমার, চৌধুরী বিশ্বপতি, চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৯; পৃ. ৮৯।
৩২. মুখোপাধ্যায় অতনু শাসন, বিষয়ঃ শ্রীচৈতন্য; কলকাতা; দশদিশি; নভেম্বর ২০০৯; পৃ. ১৪৭।
৩৩. দাশগুপ্ত কল্যাণ কুমার, প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী; কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; ২০শে মে ২০০০; পৃ.. ১২,১৩,১৭।
৩৪. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ৫২।
৩৫. তদেব পৃ. ৭৩।
৩৬. দাশগুপ্ত কল্যাণ কুমার, প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী; কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; ২০শে মে ২০০০; পৃ.. ২০,২২,২৩।
৩৭. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ৭৪।
৩৮. সরকার সুধীরচন্দ্র সংকলিত, পৌরাণিক অভিধান; কলকাতা; এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি; পৌষ ১৪১২; পৃ. ২৪।
৩৯. দাশগুপ্ত কল্যাণ কুমার, প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী; কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; ২০শে মে ২০০০; পৃ. ২৬।
৪০. সরকার সুধীরচন্দ্র সংকলিত, পৌরাণিক অভিধান; কলকাতা; এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি; পৌষ ১৪১২; পৃ.. ২৫,২৬,৩৬১।
৪১. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, দ্বিতীয় পর্ব; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৫; পৃ.. ৩৪০-৩৪৩।
৪২. তদেব পৃ.. ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৮৬।
৪৩. তদেব পৃ. ৩৯৪।
৪৪. তদেব পৃ. ৩৯৪।
৪৫. তদেব পৃ. ৪০২।
৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ৫৬।
৪৭. তদেব পৃ. ১১১।
৪৮. মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি গবেষণা, বাংলার শিব ও লোকসংস্কৃতি (বিশেষ সংখ্যা); কলকাতা; লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ; কার্তিক-পৌষ-১৪১৩; পৃ. ২৮০।
৪৯. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১; পৃ. ১০৫।
৫০. মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি গবেষণা, বাংলার শিব ও লোকসংস্কৃতি (বিশেষ সংখ্যা); কলকাতা; লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ; কার্তিক-পৌষ-১৪১৩; পৃ.. ৩২৬,৩২৭।
৫১. ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস; কলকাতা; এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা.লি; ২০০৬; পৃ. ১৪২।

৫২. মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি গবেষণা, বাংলার শিব ও লোকসংস্কৃতি (বিশেষ সংখ্যা); কলকাতা; লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ; কার্তিক- পৌষ- ১৪১৩; পৃ.. ২৮০,২৮১।
৫৩. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১; পৃ. ৩৮১।
৫৪. দাশগুপ্ত কল্যাণ কুমার, প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী; কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; ২০শে মে ২০০০; পৃ.. ৪৪,৫১।
৫৫. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫; পৃ. ২২।
৫৬. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১; পৃ. ৩৮৫।
৫৭. মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি গবেষণা, বাংলার শিব ও লোকসংস্কৃতি (বিশেষ সংখ্যা); কলকাতা; লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ; কার্তিক- পৌষ- ১৪১৩; পৃ.. ণ,ত।
৫৮. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ.. ১৪২,১৪৩।
৫৯. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪; পৃ. ৩৩৫।
৬০. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, দ্বিতীয় পর্ব; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৫; পৃ.. ১২২,১২৩।
৬১. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ৮৩।
৬২. ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, দেবতার মানবায়ন; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; জানুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ১১৬।
৬৩. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪; পৃ. ৩৩৮।
৬৪. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, দ্বিতীয় পর্ব; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৫; পৃ. ১৬৭।
৬৫. ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, দেবতার মানবায়ন; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; জানুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ১১৭।
৬৬. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ৮৩।
৬৭. তদেব পৃ.. ৪৫,৪৬।
৬৮. তদেব পৃ. ৪৬।
৬৯. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, তৃতীয় পর্ব, কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৮৬; পৃ. ১৫৮।
৭০. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ১১৮।
৭১. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, তৃতীয় পর্ব, কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৮৬; পৃ. ১৮৪।
৭২. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ১১৯।
৭৩. শাস্ত্রী গৌরীনাথ সম্পাদিত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; নবপত্র প্রকাশন; জুলাই ১৯৯৭; পৃ.. ৩৪,৩৮,৩৯।
৭৪. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ১১৮।
৭৫. শাস্ত্রী গৌরীনাথ সম্পাদিত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; নবপত্র প্রকাশন; জুলাই ১৯৯৭; পৃ. ৩৪।
৭৬. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ.. ২৭০- ২৭২।
৭৭. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯; পৃ. ৪৭৮।
৭৮. তদেব পৃ. ৪৭৯।
৭৯. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ১২৭।
৮০. দাশগুপ্ত শশিভূষণ, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য; কলকাতা; শিশুসাহিত্য সংসদ প্রা.লি.; ভাদ্র ১৩৬৭; পৃ. ২০৬।
৮১. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, তৃতীয় পর্ব, কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৮৬; পৃ. ২৬৫।
৮২. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ.. ১৩১,১৩৪।

৮৩. তদেব পৃ. ১৩২।

৮৪. রায় অনিরুদ্ধ, চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি; কলকাতা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি; ১৯৯২; পৃ. ১৪১।

৮৫. তদেব পৃ. ১৪০।

৮৬. তদেব পৃ. ১৩১।

৮৭. তদেব পৃ. ১৩১।

৮৮. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯; পৃ.. ৬৮,৬৯।

৮৯. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ১৩৫।

৯০. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, তৃতীয় পর্ব, কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৮৬; পৃ.. ৩০৮,৩১০।

৯১. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ১।

৯২. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ২০।

৯৩. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯; পৃ.. ৭০,৯২,৯৪।

৯৪. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১; পৃ.. ১৭৬,১৭৭,১৭৯।

৯৫. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ১২।

৯৬. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫; পৃ. ৫১।

৯৭. মুখোপাধ্যায় মহুয়া, গৌড়ীয় নৃত্য; কলকাতা; দি এশিয়াটিক সোসাইটি; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ১৭২।

৯৮. ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস; কলকাতা; এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা.লি; ২০০৬; পৃ. ৩৪।

৯৯. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫; পৃ. ৮৮।

১০০. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১; পৃ. ৩৭০।

১০১. লালা আদিত্য কুমার সম্পাদিত, বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান; মালদহ; কল্যানী পাবলিকেশন; ডিসেম্বর ২০১১; পৃ. ৯৮।

১০২. বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৪১৪; পৃ. ৪১।

১০৩. রায় অনিরুদ্ধ, চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি; কলকাতা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি; ১৯৯২; পৃ. ১০০।

১০৪. তদেব পৃ. ১১০।

১০৫. তদেব পৃ.. ১১১,১১২।

১০৬. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫; পৃ. ৮৩।

১০৭. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ২১৬।

১০৮. মুখোপাধ্যায় মহুয়া, গৌড়ীয় নৃত্য; কলকাতা; দি এশিয়াটিক সোসাইটি; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ১৭১।

১০৯. তদেব পৃ. ১৭৫।

১১০. তদেব পৃ. ১৭২।

১১১. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫; পৃ. ১৫০।

১১২. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ৩৮৪।

১১৩. চক্রবর্তী রণবীর, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; শ্রাবণ

১৪১৯; পৃ. ১৩৫।

১১৪. গঙ্গোপাধ্যায় মুনমুন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল জীবন বীক্ষার আলোকে; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০১০; পৃ.. ১৯,২০।

১১৫. চক্রবর্ত্তী অসীম কুমার, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার বিশিষ্ট বন্দর ও জনপদ; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৪১৮; পৃ.. ২৭,২৮।

১১৬. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১; পৃ. ৩৫।

১১৭. রায় অনিরুদ্ধ, চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি; কলকাতা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি; ১৯৯২; পৃ.. ৫৫,৫৬,১৩০।

১১৮. ভট্টাচার্য ষষ্ঠীচরণ, বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি; কলকাতা; পুনশ্চ; ২০০১; পৃ. ৩২।

১১৯. গঙ্গোপাধ্যায় মুনমুন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল জীবন বীক্ষার আলোকে; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০১০; পৃ. ২০।

১২০. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ৯২।

১২১. সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; ১৩৪১; পৃ. ৮১৩।

১২২. ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস; কলকাতা; এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা.লি; ২০০৬; পৃ. ২১৩।

১২৩. মুখোপাধ্যায় মহুয়া, গৌড়ীয় নৃত্য; কলকাতা; দি এশিয়াটিক সোসাইটি; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ১০।

১২৪. তদেব পৃ.. ১১,১৩।

১২৫. তদেব পৃ. ২৯।

১২৬. তদেব পৃ.. ১৫,৩৪,৩৬।

১২৭. ঘোষ চৈতালী, নৃত্য- কলা সৃষ্টির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ৬৪।

১২৮. তদেব পৃ. ২৪।

১২৯. তদেব পৃ.. ২৪,১৭০,১৭৪।

১৩০. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১; পৃ. ৭৯।

১৩১. মুখোপাধ্যায় মহুয়া, গৌড়ীয় নৃত্য; কলকাতা; দি এশিয়াটিক সোসাইটি; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ.. ১৭৬, ২১৬।

১৩২. ভট্টাচার্য তরুন সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা ১৪০৩; কলকাতা; প্রকাশক তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; মার্চ ১৯৯৭; পৃ. ১৭৫।

১৩৩. ওয়াহাব আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; ডিসেম্বর ২০০৬ পৃ.. ১৬৭, ১৬৮,১৭৮, ২০৭, ২০৮।

১৩৪. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ৮২।

১৩৫. আবদুল ওয়াহাব, বাংলার লোকবাদ্য, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা- ৬৮; পৃ.. ১৪৮, ১৭৯।

১৩৬. তদেব পৃ.. ১৫৮, ১৬২, ১৭৮।

১৩৭. তদেব পৃ. ১৮৮।

১৩৮. তদেব পৃ.. ১৭৭, ১৮৩, ১৮৫, ১৯২।

১৩৯. তদেব পৃ.. ১৫৮, ১৮৫, ১৮৬, ২১২।

১৪০. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ৩৮৮।

১৪১. ভট্টাচার্য সুরেন্দ্রচন্দ্র, কাব্যতীর্থ ও দাস আশুতোষ সম্পাদিত, কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল; কলকাতা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৬০; পৃ. ১৭৮।

১৪২. আবদুল ওয়াহাব, বাংলার লোকবাদ্য, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতিবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা- ৬৮; পৃ.. ১০২, ১০৩।

১৪৩. তদেব পৃ.. ১০৩, ১০৪।

১৪৪. তদেব পৃ. ১০৫।

১৪৫. মিত্র খগেন্দ্র নাথ, সেন সুকুমার, চৌধুরী বিশ্বপতি, চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৯; পৃ. ১৬।

১৪৬. তদেব পৃ. ৭১।

১৪৭. আবদুল ওয়াহাব, বাংলার লোকবাদ্য, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতিবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা- ৬৮; পৃ. ১৫১।

১৪৮. তদেব পৃ.. ১৪৮, ১৫০।

১৪৯. তদেব পৃ. ২০০।

১৫০. তদেব পৃ. ২০০।

১৫১. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩; পৃ. ২২।

১৫২. তদেব পৃ. ৫১।

১৫৩. তদেব পৃ.. ৯২, ৯৩।

১৫৪. তদেব পৃ.. ৯৩, ৯৫, ১৬৪।

১৫৫. তদেব পৃ.. ৫৬, ৫৭।

১৫৬. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি;১৯৬১; পৃ. ৩৬।

১৫৭. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩; পৃ. ৮০।

১৫৮. তদেব পৃ. ৯৫।

১৫৯. তদেব পৃ. ৯৫।

১৬০. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫; পৃ. ৮৮।

১৬১. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩; পৃ. ৫৬।

১৬২. তদেব পৃ. ৫৬।

১৬৩. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ১২৭।

১৬৪. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩; পৃ. ৯৭।

১৬৫. তদেব পৃ. ৮১।

১৬৬. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১; পৃ. ৪৫৮।

১৬৭. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩; পৃ.. ৫০, ৬৫।

১৬৮. তদেব পৃ.. ৯৪, ৯৫, ১৪২।

১৬৯. তদেব পৃ. ৫৩।

১৭০. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ২০৯।

১৭১. তদেব পৃ. ২১৪।

১৭২. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯; পৃ. ১৬৮।

১৭৩. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩; পৃ.. ১০২, ১২৩।

১৭৪. তদেব পৃ.. ২৩, ৪৬।

১৭৫. তদেব পৃ. ৯৯।

১৭৬. তদেব পৃ. ৪৭।

১৭৭. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ.. ১৭৯, ১৮০।

১৭৮. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ৩২৪।

১৭৯. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ৩০৪।

১৮০. তদেব পৃ. ৩০৫।

১৮১. তদেব পৃ.. ৩০৬, ৩০৭।

১৮২. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩; পৃ.. ৭৮, ১০০।

১৮৩. তদেব পৃ.. ৭৮, ১০৩, ১০৪, ১১৩।

১৮৪. তদেব পৃ.. ২৯, ৩০।

১৮৫. তদেব পৃ. ১০০।

১৮৬. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১; পৃ. ৩৭৪।

১৮৭. বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৪১৪; পৃ. ২৩।

১৮৮. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ৩০৬।

১৮৯. তদেব পৃ. ৩০৯।

১৯০. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ৩১০।

১৯১. তদেব পৃ. ৩১১।

১৯২. তদেব পৃ. ৩১১।

১৯৩. তদেব পৃ.. ৩১২, ৩১৩, ৩১৪।

১৯৪. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১; পৃ. ৩৭।

১৯৫. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ২৭৪।

১৯৬. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১; পৃ. ৩৬।

১৯৭. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১; পৃ. ৩৭৪।

১৯৮. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩; পৃ. ৭৭।

১৯৯. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ৩০৪।

২০০. তদেব পৃ. ৩০৬।

২০১. তদেব পৃ. ৩০৭।

২০২. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩; পৃ. ১৮০।

২০৩. তদেব পৃ. ৪৩।

২০৪. তদেব পৃ. ৮২।

২০৫. তদেব পৃ. ৪৯।

২০৬. মিত্র খগেন্দ্র নাথ, সেন সুকুমার, চৌধুরী বিশ্বপতি, চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৯; পৃ. ২৫।

২০৭. বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৪১৪; পৃ. ৩১।

২০৮. মণ্ডল কাকলী সম্পাদিত লোক দর্পণ; কলকাতা; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়; ২০০৩; পৃ. ৫৭।

২০৯. তদেব পৃ. ৫৮।

২১০. তদেব পৃ. ৫৭।

২১১. তদেব পৃ. ৫৭।

২১২. তদেব পৃ. ৫৮।

২১৩. ভট্টাচার্য সুরেন্দ্রচন্দ্র, কাব্যতীর্থ ও দাস আশুতোষ সম্পাদিত, কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল; কলকাতা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৬০; পৃ. ১১৭।

২১৪. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ৩৫৬।

২১৫. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১; পৃ. ৩৬।

২১৬. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫; পৃ. ২৯৯।

২১৭. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯; পৃ. ১৬০।

২১৮. তদেব পৃ. ১৬১।

২১৯. তদেব পৃ. ১৯৮।

২২০. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫; পৃ. ১৯৫।

২২১. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯; পৃ. ১৫১।

২২২. তদেব পৃ. ১৫১।

২২৩. বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৪১৪; পৃ. ৬২।

২২৪. তদেব পৃ. ৬২।

২২৫. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ৬৪।

২২৬. তদেব পৃ.. ৪৭, ৪৮।

২২৭. সাঁতরা তারাপদ, বাংলার কাঠের কাজ; কলকাতা; সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিকাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া; নভেম্বর ২০০৬; পৃ. ৬৯।

২২৮. ভট্টাচার্য সুরেন্দ্রচন্দ্র, কাব্যতীর্থ ও দাস আশুতোষ সম্পাদিত, কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল; কলকাতা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৬০; পৃ. ১২১।

২২৯. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ৪৮।

২৩০. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ১৮৫।

২৩১. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১; পৃ. ৯০।

২৩২. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫; পৃ. ১০৬।

২৩৩. তদেব পৃ. ১০৭।

২৩৪. তদেব পৃ. ৭২।

২৩৫. তদেব পৃ. ৭৩।

২৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ১০১।

২৩৭. তদেব পৃ. ৪১১।

২৩৮. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯; পৃ. ১৮৩।

২৩৯. তদেব পৃ. ১৬৪।

২৪০. সাঁতরা তারাপদ, বাংলার কাঠের কাজ; কলকাতা; সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিকাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন

ইন্ডিয়া; নভেম্বর ২০০৬; পৃ. ৬৭।

২৪১. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ২৬৬।

২৪২. তদেব পৃ. ২১০।

২৪৩. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯; পৃ. ১৫৫।

২৪৪. তদেব পৃ. ১৬০।

২৪৫. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ১৬৪।

২৪৬. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৭৫; পৃ. ২৪৬।

২৪৭. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ১৬৫।

২৪৮. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯; পৃ. ২৩৩।

২৪৯. তদেব পৃ. ২৩৩।

২৫০. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ২৬৫।

২৫১. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১; পৃ. ৯৭।

২৫২. তদেব পৃ. ৯৮।

২৫৩. তদেব পৃ. ১০৩।

২৫৪. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৭৫; পৃ. ১৫০।

২৫৫. তদেব পৃ. ১৫০।

২৫৬. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯; পৃ. ১৮১।

২৫৭. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ১৫৭।

২৫৮. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ১৫।

২৫৯. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১; পৃ. ৩৮।

২৬০. তদেব পৃ. ৩৮।

২৬১. গঙ্গোপাধ্যায় মুনমুন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল জীবন বীক্ষার আলোকে; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০১০; পৃ. ২০।

২৬২. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১; পৃ.. ৬৫,৬৬।

২৬৩. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ১৫৫

২৬৪. তদেব পৃ. ১৫।

২৬৫. গঙ্গোপাধ্যায় মুনমুন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল জীবন বীক্ষার আলোকে; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০১০; পৃ. ২১।

২৬৬. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ৬২।

২৬৭. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১; পৃ. ৩৮৮।

২৬৮. গঙ্গোপাধ্যায় মুনমুন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল জীবন বীক্ষার আলোকে; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০১০; পৃ. ২২।

২৬৯. রায় অনিরুদ্ধ, চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি; কলকাতা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি; ১৯৯২; পৃ.. ১২৮, ১২৯।

২৭০. সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; ১৯৭৫; পৃ.. ৫,৬।

২৭১. মজুমদার অভিজিৎ, চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিখ খণ্ড) সংগঠন ও শৈলী বিচার; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; মাঘ ১৪১১; পৃ. ১৭৭।

২৭২. বসু শঙ্করীপ্রসাদ, কবি ভারতচন্দ্র; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৪; পৃ. ২৫৩।

২৭৩. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ২১৩।

২৭৪. তদেব পৃ. ১৫।

২৭৫. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪; পৃ. ২৬৫।

২৭৬. সান্যাল নারায়ণ, ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ২০০৬; পৃ. ১৪০।

২৭৭. ভারতী শিবশঙ্কর, ভারতের মন্দিরে মন্দিরে; কলকাতা; সাহিত্যম; ২০০৯; পৃ. ২৪৭।

২৭৮. বসু শঙ্করীপ্রসাদ, কবি ভারতচন্দ্র; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৪; পৃ. ১৩০।

২৭৯. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ১৮২।

২৮০. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪; পৃ. ২৬৫।

২৮১. ঘোষ নীহার, বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; মে ২০০০; পৃ.. ৩৬-৩৮।

২৮২. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু; কলকাতা; রত্নাবলী; মাঘ ১৪০৯; পৃ. ৩১৪।

২৮৩. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ১৫১।

২৮৪. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ৫৪।

২৮৫. তদেব পৃ. ৫৪।

২৮৬. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫; পৃ. ২৭

২৮৭. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ.. ৫২, ৫৩।

২৮৮. তদেব পৃ. ৫৪।

২৮৯. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪; পৃ. ১০৪।

২৯০. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ.. ৯০, ৯১।

২৯১. মুখোপাধ্যায় অতনু শাসন, বিষয়ঃ শ্রীচৈতন্য; কলকাতা; দশদিশি; নভেম্বর ২০০৯; পৃ. ১৪১।

২৯২. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ৭৫।

২৯৩. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ১৫।

২৯৪. ইনকোয়েস্ট জার্নাল; খড়গপুর; সেরা (*SERA*) ; এপ্রিল ২০১৫; পৃ.. ৪২, ৪৩।

২৯৫. সান্যাল অবন্তী কুমার, ভট্টাচার্য অশোক সম্পাদিত, চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান; কলকাতা; সারস্বত

লাইব্রেরী; ১৯৯৯; পৃ. ৩৯৯।

২৯৬. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ৭৬।

২৯৭. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ১৭।

২৯৮. গিরি সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ২০০৭; পৃ. ১৯২।

২৯৯. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ৭৫।

৩০০. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ৩০৫।

৩০১. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫; পৃ. ৮৮।

৩০২. ভট্টাচার্য জগদীশ সম্পাদিত, চৈতন্য প্রসঙ্গ; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৩৯৬; পৃ. ২০৮।

৩০৩. তদেব পৃ. ২০৪।

৩০৪. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত লঘু সংস্করণ; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬৩; পৃ. ১৬৫।

৩০৫. ভট্টাচার্য জগদীশ সম্পাদিত, চৈতন্য প্রসঙ্গ; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৩৯৬; পৃ.. ২০৯, ২১০।

৩০৬. দত্ত গোপেশচন্দ্র, কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়; কলকাতা; জিজ্ঞাসা; ২৫শে বৈশাখ ১৩৮৩; পৃ.. ৫৩, ৫৫, ১০৮।

৩০৭. ভট্টাচার্য গৌরী, বাংলার লোক সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ; কলকাতা; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; ৮ই চৈত্র ১৯৩৫; পৃ.. ২৭০, ২৭১।

৩০৮. তদেব পৃ. ২৭৬।

৩০৯. তদেব পৃ. ২৭৪।

৩১০. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ. ২৩১।

৩১১. ভট্টাচার্য গৌরী, বাংলার লোক সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ; কলকাতা; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; ৮ই চৈত্র ১৯৩৫; পৃ. ২৭৬।

৩১২. তদেব পৃ.. ৩০৯, ৩১০, ৩১৩।

৩১৩. তদেব পৃ. ৪০৭।

৩১৪. তদেব পৃ.. ৪০৪, ৪০৫।

৩১৫. তদেব পৃ.. ৪০৩, ৪০৪।

৩১৬. তদেব পৃ.. ৪০৬, ৪০৭।

৩১৭. মুখোপাধ্যায় অনিমা, পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনারীতি; কলকাতা; পুনশ্চ; ২০০১; পৃ.. ১৮৬, ১৮৭।

৩১৮. রায় অনিরুদ্ধ, চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি; কলকাতা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি; ১৯৯২; পৃ. ২০২।

৩১৯. মুখোপাধ্যায় অনিমা, পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনারীতি; কলকাতা; পুনশ্চ; ২০০১; পৃ.. ২০০, ২০৮।

৩২০. তদেব পৃ. ২০১।

৩২১. তদেব পৃ.. ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০৬।

৩২২. তদেব পৃ. ২০৭।

৩২৩. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪; পৃ.. ২২৯ - ২৩১।

৩২৪. রায় অনিরুদ্ধ, চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি; কলকাতা; কে পি

বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি; ১৯৯২; পৃ. ২০২।

৩২৫. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ৯।

৩২৬. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫; পৃ. ১২।

৩২৭. তদেব পৃ. ১২।

৩২৮. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫; পৃ. ৭৪।

****

চিত্র- ১.১

চিত্র- ১.২

চিত্র- ১.৩

চিত্র- ১.৪

চিত্র- ১.৫

চিত্র- ২.১

চিত্র- ২.২

চিত্র- ২.৩

চিত্র- ২.৪

চিত্র- ২.৫

চিত্র- ২.৬

চিত্র- ২.৭

চিত্র- ২. ৮

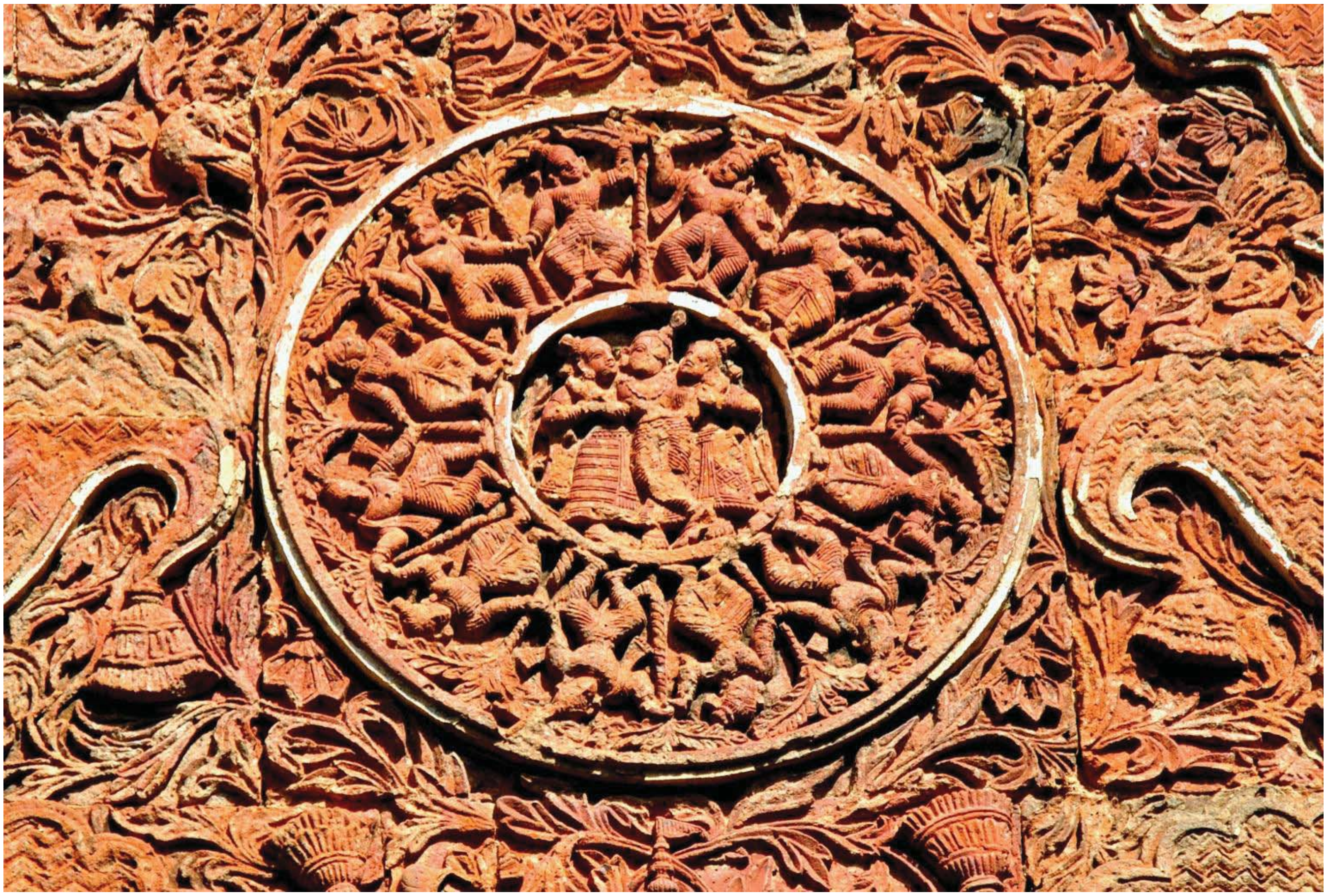

চিত্র- ২. ৯

চিত্র- ২. ১০

চিত্র- ২. ১১

চিত্র- ২.১২

চিত্র- ২. ১৩

চিত্র- ২. ১৪

চিত্র- ২. ১৫

চিত্র- ৩.১

চিত্র- ৩.২

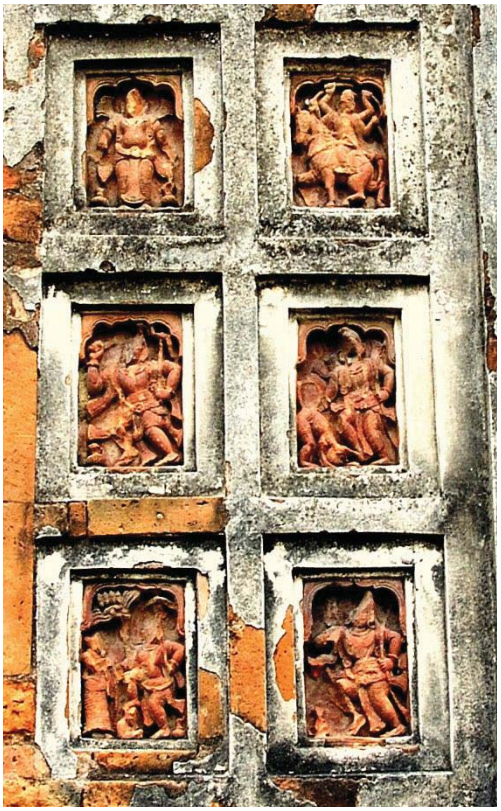

চিত্র- ৩.৩

চিত্র- ৩.৪

চিত্র- ৩.৫

চিত্র- ৪.১

চিত্র- ৪.২

চিত্র- ৫.১

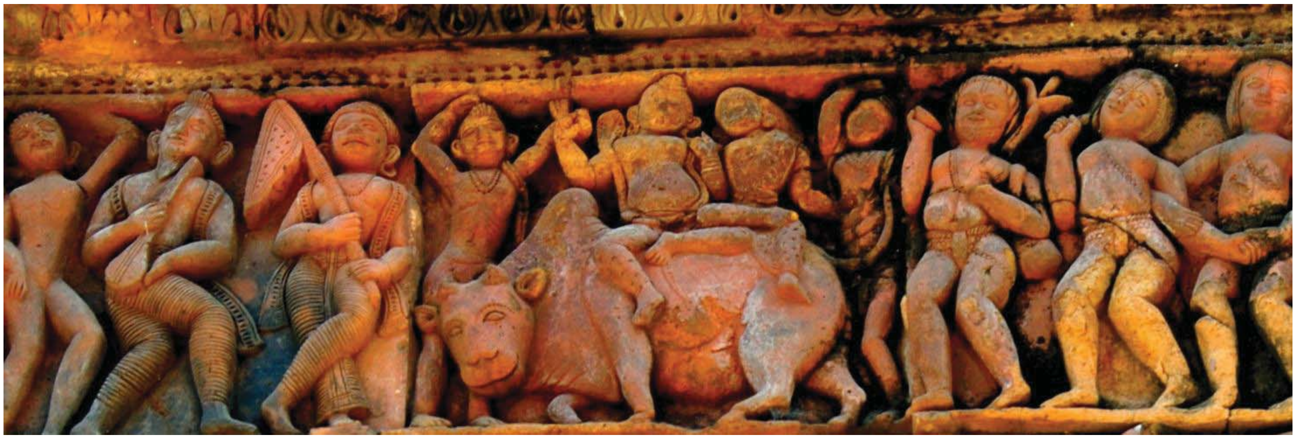

চিত্র- ৫.২

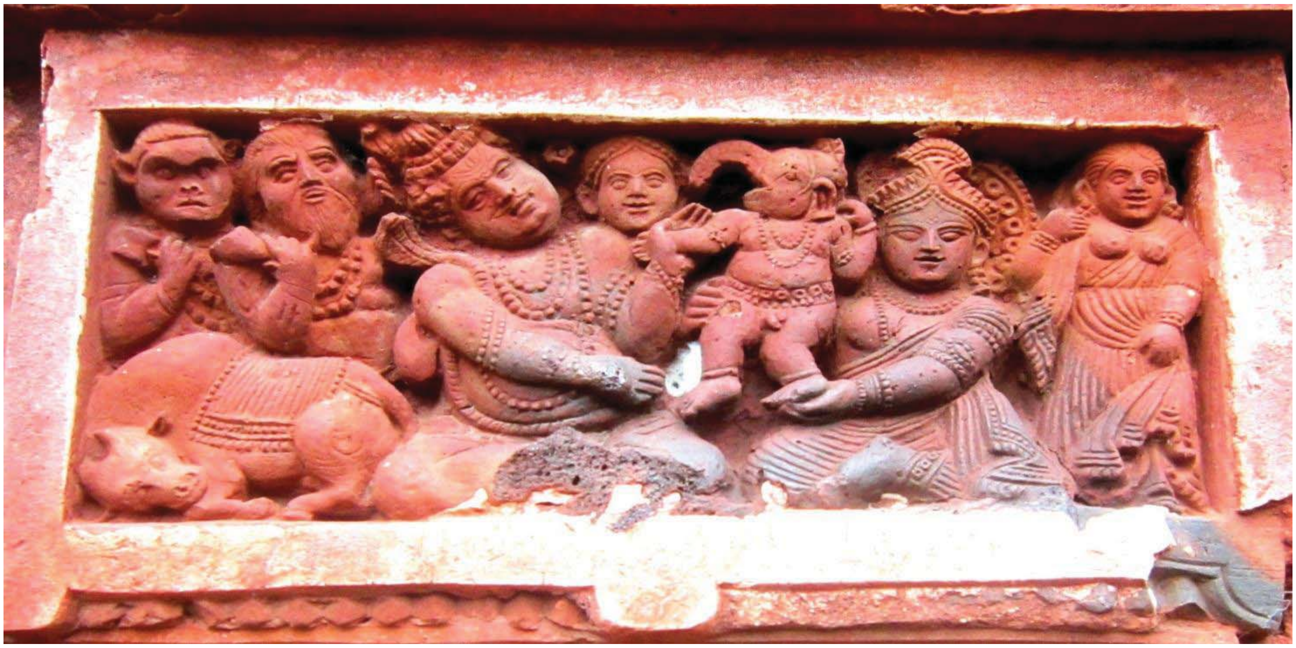

চিত্র- ৫.৩

চিত্র- ৫.৪

চিত্র- ৫.৫

চিত্র- ৫.৬

চিত্র- ৫.৭

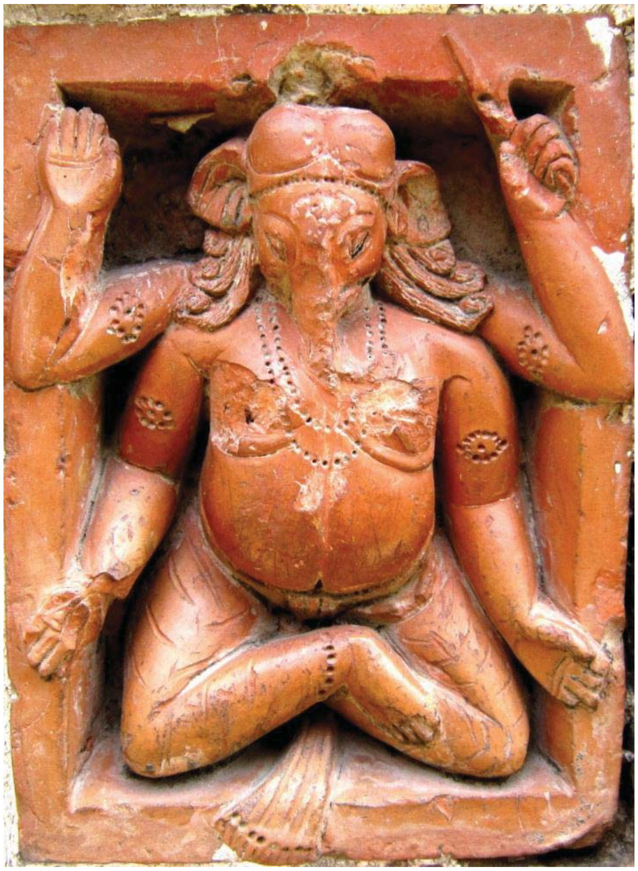

চিত্র- ৬.১

চিত্র- ৬.২

চিত্র- ৬.৩

চিত্র- ৭

চিত্র- ৮.১

চিত্র- ৮.২

চিত্র- ৮.৩

চিত্র- ১০.১

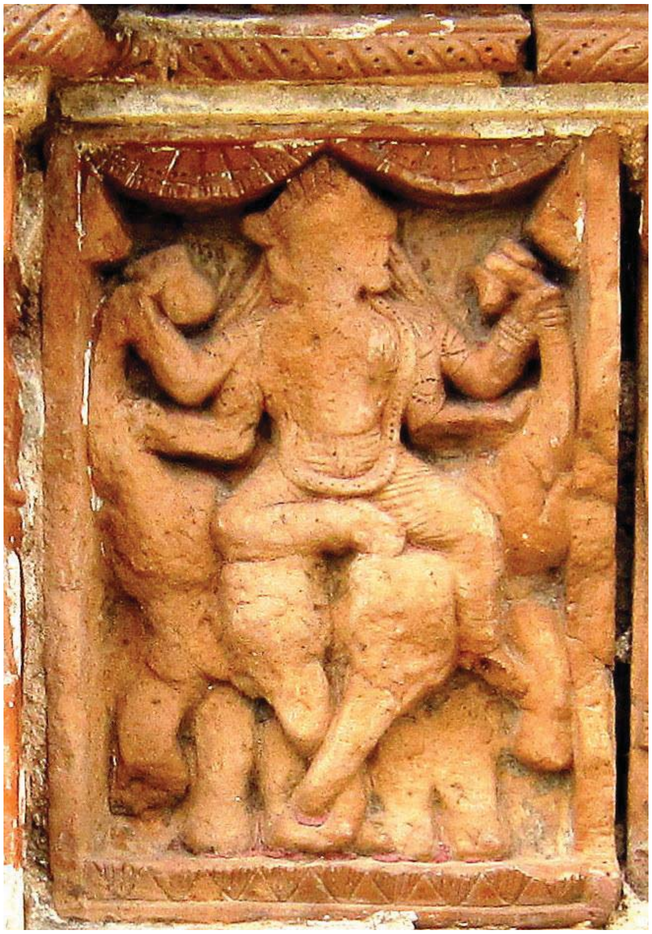

চিত্র- ১০.২

চিত্র- ১০.৩

চিত্র- ৮.৪

চিত্র- ৯

চিত্র- ১১.১

চিত্র- ১১.২

চিত্র- ১১.৩

চিত্র- ১২

চিত্র- ১৩.১

চিত্র- ১৩.২

চিত্র- ১৪.১

চিত্র- ১৪.২

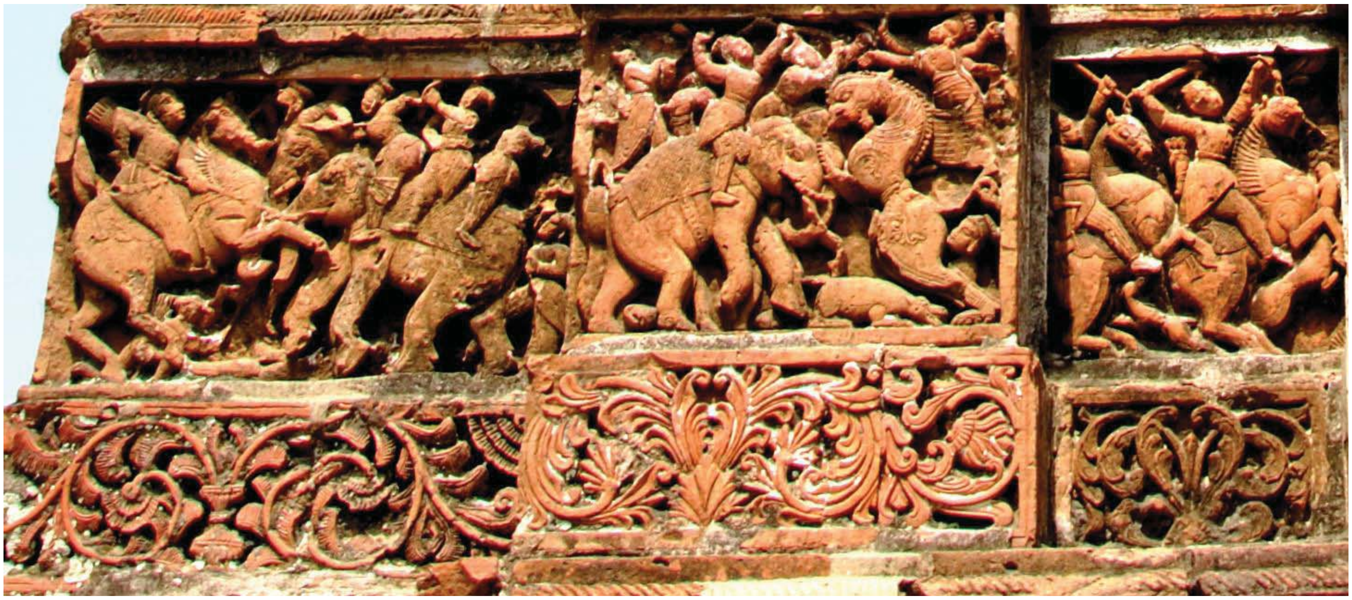

চিত্র- ১৫

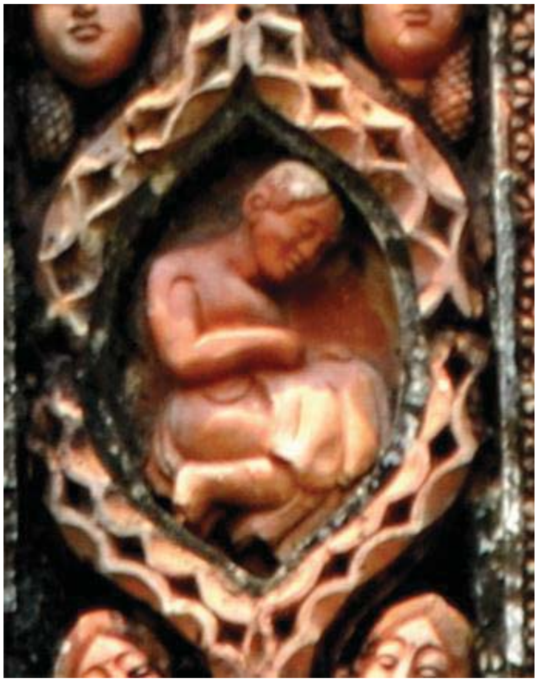

চিত্র- ১৬.১

চিত্র- ১৬.২

চিত্র- ১৬.৩

চিত্র- ১৬.৪

চিত্র- ১৬.৫

চিত্র- ১৭.১

চিত্র- ১৭.২

চিত্র- ১৭.৩

চিত্র- ১৭.৪

চিত্র- ১৭.৫

চিত্র- ১৭.৬

চিত্র- ১৮.১

চিত্র- ১৮.২

চিত্র- ১৮.৩

চিত্র- ১৮.৪

চিত্র- ১৮.৫

চিত্র- ১৮.৬

চিত্র- ১৮.৭

চিত্র- ১৮.৮

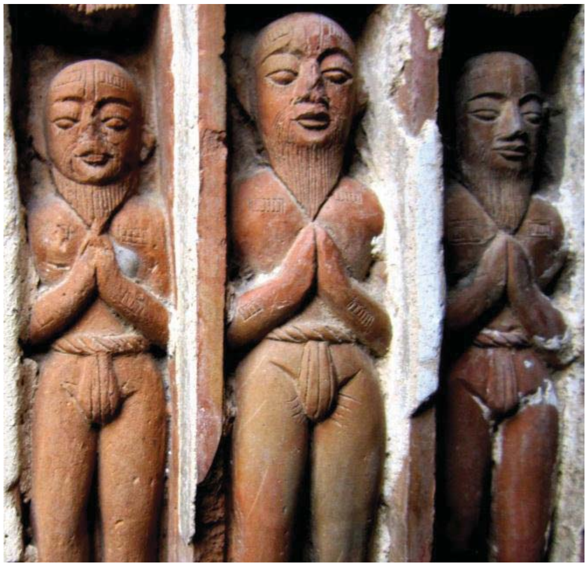

চিত্র- ১৮.৯

চিত্র- ১৯

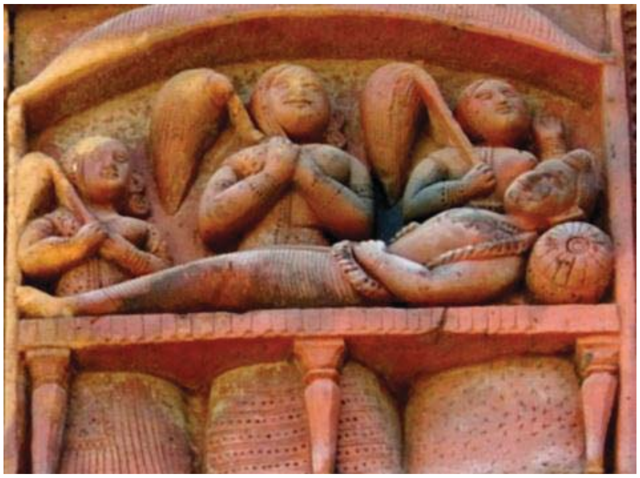

চিত্র- ২০.১

চিত্র- ২০.২

চিত্র- ২০.৩

চিত্র- ২০.৪

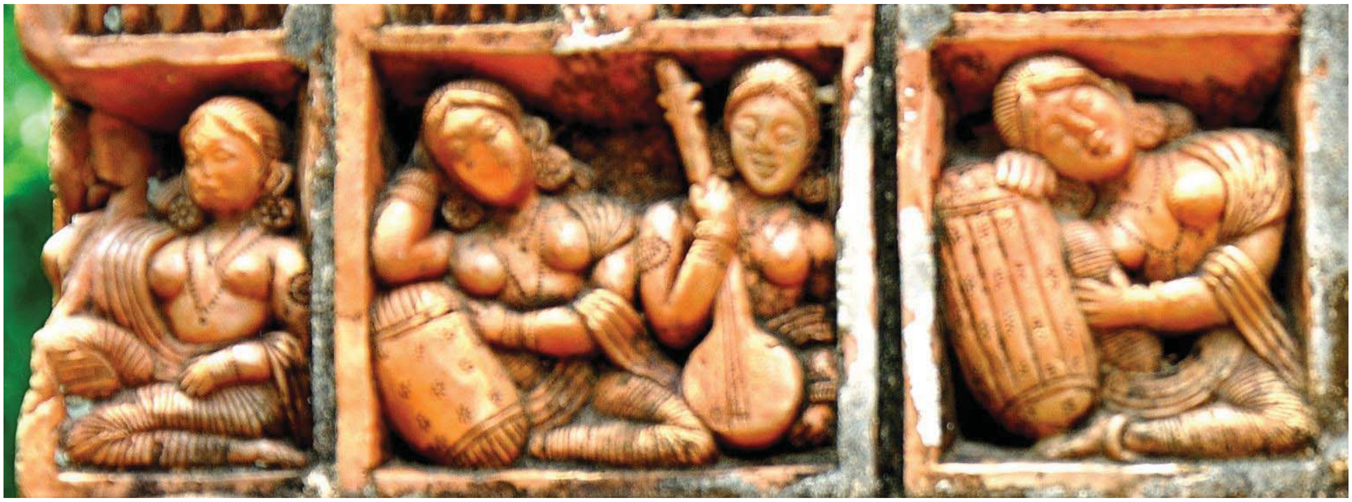

চিত্র- ২১

চিত্র- ২২.১

চিত্র- ২২.২

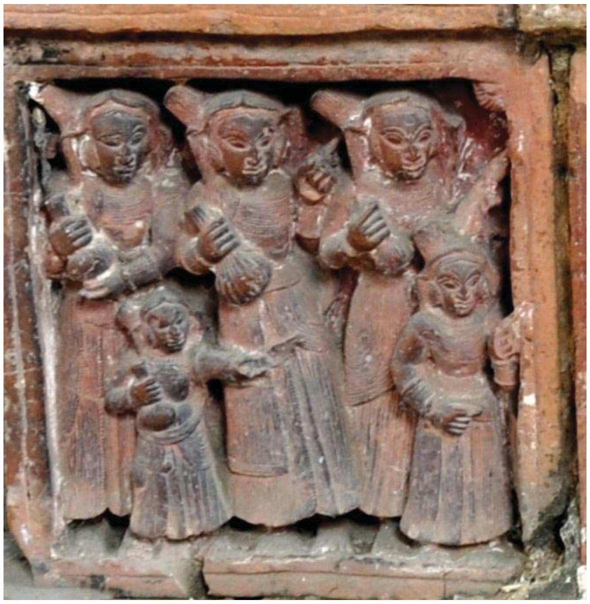

চিত্র- ২২.৩

চিত্র- ২৩.১

চিত্র- ২৩.২

চিত্র- ২৩.৩

চিত্র- ২৪.১

চিত্র- ২৪.২

চিত্র- ২৫.১

চিত্র- ২৫.২

চিত্র- ২৫.৩

চিত্র- ২৬

চিত্র- ২৭.১

চিত্র- ২৭.২

চিত্র- ২৮

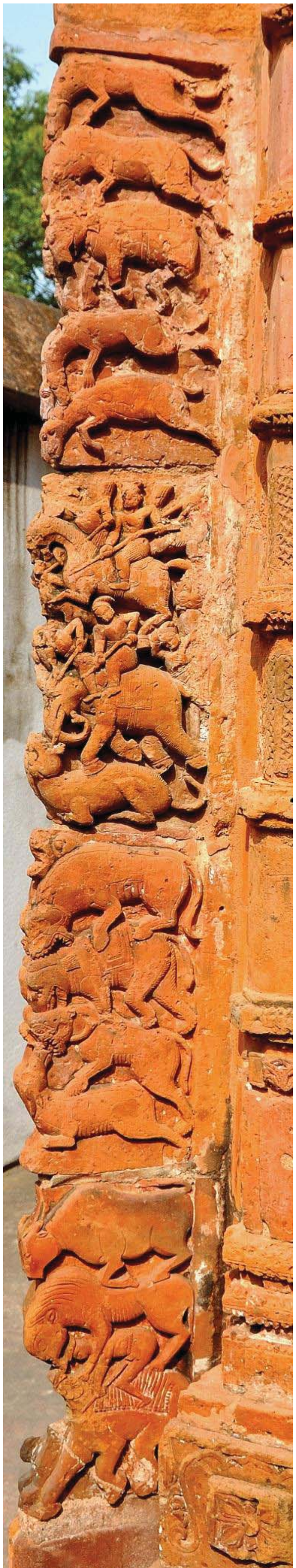

চিত্র- ২৯.১

চিত্র- ২৯.২

চিত্র- ৩০.১

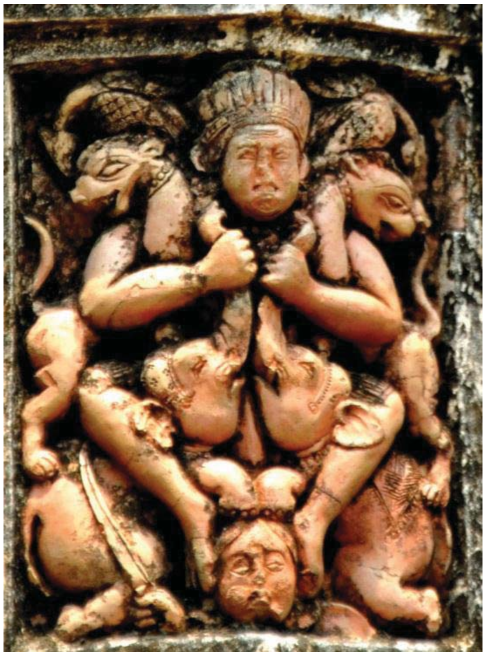

চিত্র- ৩০.২

চিত্র- ৩১.১

চিত্র- ৩১.২

চিত্র- ৩১.৩

চিত্র- ৩১.৪

চিত্র- ৩২.১

চিত্র- ৩২.২

চিত্র- ৩৩.১

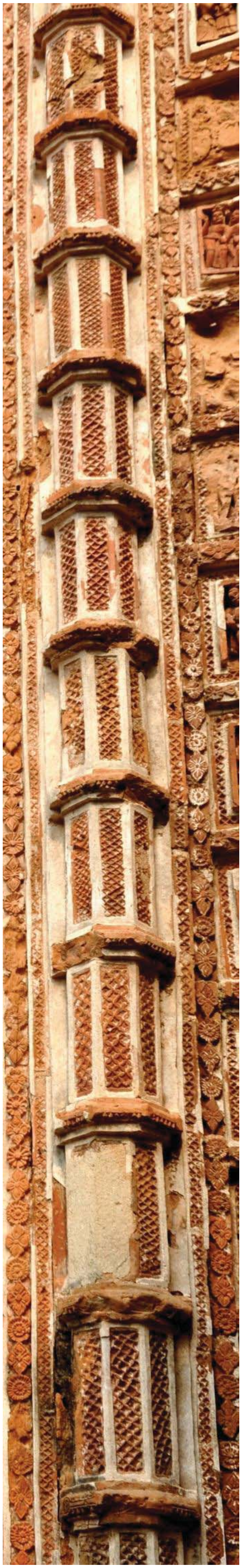
চিত্র- ৩৩.২

চিত্র- ৩৩.৩

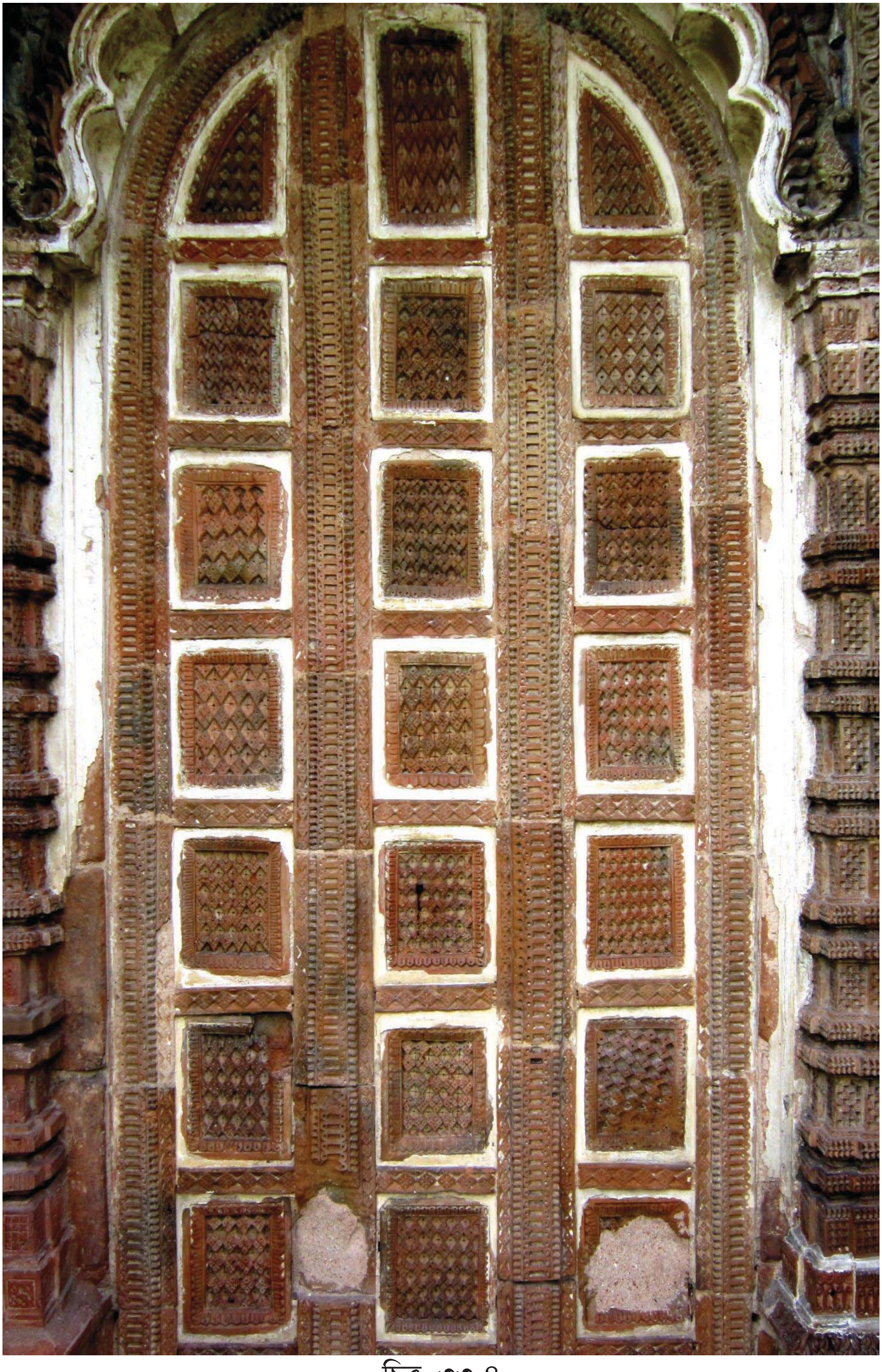

চিত্র- ৩৩.৪

চিত্র- ৩৪.১

চিত্র- ৩৪.২

চিত্র- ৩৪.৩

চিত্র- ৩৪.৪

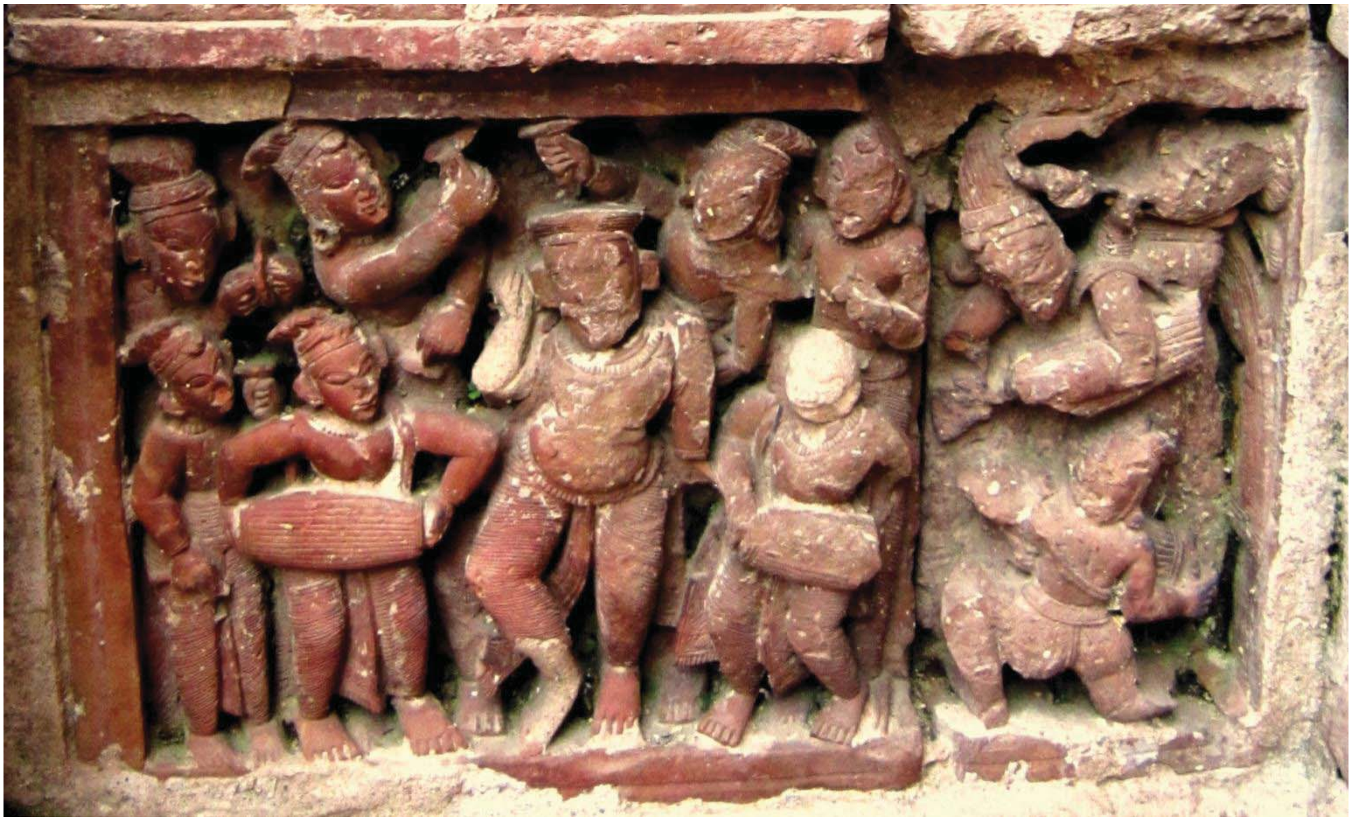

চিত্র- ৩৪.৫

॥ কথাশেষ ॥

রাঢ়ের মধ্যমণি রূপে খ্যাত বর্ধমান জেলা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই বৃহৎ জেলায় বিভিন্ন ভাষা, জাতি, ধর্মের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ধর্মই হল এখানকার মানুষের জীবনাচারের মূল আধার, সেই কারণে এই জেলায় ধর্মীয় স্থানেরও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাবে সেটাই স্বাভাবিক। বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষা করে বলা যায়, প্রধানত তিনটি ধর্মের প্রাধান্য এই জেলায় রয়েছে, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত। এছাড়াও কিছু মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ এদের পাশাপাশি অবস্থান করছেন, কিন্তু এদের প্রভাব অধিকমাত্রায় লক্ষ করা যায় না। আমাদের গবেষণার মূল বিষয় হল, **'বর্ধমান জেলার মন্দির : নির্মাণ ও ভাস্কর্য'**। এক্ষেত্রে ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মের মন্দিরগুলি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য পৃথকভাবে আলোচনা প্রসঙ্গেই করা হয়েছে এবং মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পূর্বোক্ত অধ্যায়ে করা হয়েছে।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন টেরাকোটার ভাস্কর্য সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষা করে মন্দিরগাত্র অলংকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ফলকগুলির বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মন্দিরগাত্রের অলংকরণে তৎকালীন সমাজে আচরিত ভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের প্রভাব যেমন পড়েছিল, পাশাপাশি নাগরিক সভ্যতার জীবনাচরণ দ্বারাও মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য ও অলংকরণ প্রভাবান্বিত হয়েছিল। বর্ধমান জেলার ধর্মসমন্বয়ের ধারা আবহমানকাল থেকেই মানুষের সমাজে সংস্কৃতিতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং আজও বর্তমান। তা সে সাহিত্যে হোক বা সঙ্গীতে, মন্দির নির্মাণ শৈলী বা ভাস্কর্যে, সব ক্ষেত্রেই ধর্ম সমন্বয়ের ধারাটি লক্ষণীয়।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য ধারায় কখনও ধর্মে ধর্মে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে, কখনও বা সমন্বয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কবি ভারতচন্দ্রের উক্তি- *"বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে"*।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ভাঁড়ুদত্ত বলছেন- *"প্রতি বাড়ি দেবস্থল বৈষ্ণবের অন্নজল*
দুই সন্ধ্যা হরিসঙ্কীর্তন।"

এই রকম অজস্র দৃষ্টান্ত মধ্যযুগীয় কাব্যসাহিত্যে লক্ষ করা যায়, যেখানে দুটি ধর্মের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় সাধন খুব স্পষ্টভাবেই কবিগণ পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন।

বাংলায় শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের কথা সর্বজনবিদিত। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বিষহরীর পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর গীতে জাগরণ এবং মদ্যমাংস দ্বারা যক্ষ, বাসুলী ইত্যাদি পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলিতে। সেই পটভূমিকায় বৈষ্ণবধর্মের জাগরণে সমাজে দুই ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্ব কলহ আজও বর্তমান। এখনও পর্যন্ত বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান উৎসব রাসপূর্ণিমার রাত্রে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির তেমাথা চৌমাথায় বৃহদাকৃতির দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে মহাসমারোহে পূজাঅর্চ্চনা করা হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে এক শাক্ত- বৈষ্ণব দ্বন্দ্বের একটা জনপ্রিয় সমন্বয়ের প্রবণতা দেখা যায়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে যে সকল যাত্রা- পাঁচালি রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণবের সমন্বয়ের সুর ধ্বনিত হতেই শোনা যায়। এই সব যাত্রা- পাঁচালিতে দেখা যায়, রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ ছিলেন শক্তি অর্থাৎ কালী উপাসক। রাধা লুকিয়ে কৃষ্ণপূজা করতেন। কুটিলা ননদিনী ভ্রাতা আয়ান'য়ের নিকট এই অভিযোগ করায়, আয়ান ভগিনীকে নিয়ে সেখানে স্বচক্ষে সব দেখার জন্য এলেন। এসে দেখলেন- *"কুঞ্জ কাননে কালী ত্যজে বাঁশী বনমালী,*
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত।
শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন করবে জীব ভ্রান্ত।।
পীতাম্বর পরিহরি হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি হেরি কি রূপের অন্ত।"

রামপ্রসাদের গানেও এই কৃষ্ণ- কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শাক্ত পদাবলি সাহিত্যে সমন্বয় সাধন শুধুমাত্র জনপ্রিয় কবিত্বের মারফতেই হয়নি, সেই সমন্বয়ের গভীর রূপ দেখা গিয়েছিল সাধক রামপ্রসাদের সত্যানুভূতির মধ্যে। তিনি শ্যাম ও শ্যামার কোথাও ভেদ দেখতে পাননি। তিনি অতি সহজেই বলেছেন-

"কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।"

এই ধর্ম সমন্বয়ের ধারাটি শুধুমাত্র সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, মন্দির নির্মাণশৈলী ও মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যেও তার প্রতিফলন লক্ষ করা গেল।

মুসলমানেরা বাংলায় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যে গঠন কৌশল ও প্রক্রিয়ার প্রচলন করেছিল, মধ্যযুগীয় মন্দির চর্চায় সেসব সম্পূর্ণরূপে গঠন করা হয়েছে। যেমন এই পর্যায়ের মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে চুন সুরকির গাঁথনি, প্রকৃত খিলান ভল্ট, গম্বুজ, কোণ খিলান ইত্যাদির বহুল ব্যবহার দেখা যায়, যা মুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া। এছাড়াও গর্ভগৃহের পেছনের দেওয়ালে কুলুঙ্গি, স্থূল স্তম্ভ, একাধিক দিক থেকে প্রবেশদ্বার এবং মন্দিরের সম্মুখভাগে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশদ্বার ইত্যাদিও সুলতানি ধর্মীয় স্থাপত্য থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেই নয়, মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রেও সুলতানি অলংকরণকে অনুকরণ করেছিলেন মন্দির শিল্পীগণ। মিশ্র মোটিফ, ডিজাইন এমনকি মন্দিরগাত্র সজ্জার বিন্যাস পদ্ধতিও আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্য থেকেই গৃহীত হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের রীতি ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তবুও মুসলমানদের ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দিরচর্চার উপরে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, তার কারণ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্মীয় স্থাপত্যের মূলগত চরিত্র বাঙালির আঞ্চলিক সত্তার অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি হয়েছে বলে।

একেবারে সূচনা থেকেই মন্দির অলংকরণ কখনও সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেনি, এমনকি অভ্যন্তরস্থ দেবমূর্তির দ্বারা সীমাবদ্ধও হয়নি। নিম্নবর্ণের মানুষের দেব-দেবীদের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা থাকলেও, তাদের নিজেদের আচরিত শৈব, শাক্ত ও রাধাকৃষ্ণ পূজারি বৈষ্ণবগণের ধর্মমতের মধ্যে যে বিশেষ অসদ্ভাব ছিল না, তা টেরাকোটার ভাস্কর্যের নজিরে প্রমাণিত হয়। তা না হলে চৈতন্যোত্তরকালে বৈষ্ণব প্রাধান্য সত্ত্বেও মন্দিরগাত্রের অলংকরণে শিব, ব্রহ্মা, দুর্গা, দশমহাবিদ্যা ইত্যাদির স্থান হত না, বা শৈব মন্দিরে কৃষ্ণলীলার মোটিফ প্রাধান্য পেত না। ফলে ধর্মে ধর্মে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব সমাজের বিভিন্ন স্তরে লক্ষ করা গেলেও মন্দিরগাত্রে তার কোন প্রভাব লক্ষ করা যায় না, সেখানে প্রতিটি ধর্মের আরাধ্য দেবতাদের পাশাপাশি অবস্থান করতেই দেখা যায়। অর্থাৎ মন্দির নির্মাণ শিল্পীগণ মন্দির অলংকরণের দ্বারা সমাজে ভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই করেছিলেন। এবং টেরাকোটার ভাস্কর্যগুলিও নানাবিধ ধর্মীয় আদর্শ রূপায়িত করে সুষ্ঠু সামাজিক নীতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একই ভূমিকা পালন করে আসছে বলা যায়। শুধু ভাস্কর্য নয়, গোপালেশ্বর মন্দিরটি নামে গোপাল মন্দির হলেও, বিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেব। অর্থাৎ মন্দিরের ভেতর-বাইরে নানা দেবদেবীর এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চৈতন্য আন্দোলনের সমন্বয়ের ধারণা থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। তাই মন্দিরগাত্রে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনায়াসে মিলেমিশে গেছে। মন্দিরগাত্রে নাগরিক জীবনের প্রভাব সম্পর্কে বলা যায়, যে জমিদার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা উচ্চস্তরের তাদের সঙ্গে নাগরিক জীবনের যোগাযোগ কিছুটা ছিল, সেই সূত্রে নাগরিক সভ্যতার একটা প্রভাব মন্দিরগাত্রে পড়বে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সে প্রভাব নিতান্তই বহিরঙ্গের কিছু আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। তার কারণ যারা মন্দির নির্মাণ এবং অলংকরণ করতেন, সেই স্থপতি বা ভাস্কর শিল্পীদের জীবন ছিল প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক। জাতিতে তারা মূলত সূত্রধর। বিত্তের দিক থেকেও তারা নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্ত। স্থপতি শিল্পীরা বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে মন্দির তৈরি করে বেড়াতেন। কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি খুব একটা বিস্তৃত ছিল না। ফলত জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা খুবই সীমাবদ্ধ। নাগরিক জীবনযাত্রা ও রুচি সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বিশেষ ছিল না, এমনকি স্থপতিরা যাদের কাজ করতেন তাদের মধ্যে বৃহত্তম অংশ গ্রামীণ জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতেন। নাগরিক জীবনের সঙ্গে স্থপতি শিল্পীদের যেটুকু পরিচয় হয়েছিল তা উচ্চস্তরের পৃষ্ঠপোষকদের অনুকৃতির মাধ্যমে, অথবা অভিজাত নাগরিক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের ভ্রমণ বা যুদ্ধযাত্রার সময় দূর থেকে তাদের জীবনযাত্রার যেটুকু দৃষ্টিগোচরে এসেছে তারই ভিত্তিতে। সম্ভবত এই কারণ বশতই অভিজাতদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত প্যানেলগুলিতে তাদের জাঁকজমক, বিলাসবহুল ভ্রমণ যাত্রা, শিকার দৃশ্য, যুদ্ধ, যানবাহন, বেশভূষা এগুলির রূপায়ণ হয়েছে পরিপাট্য সহকারে। অভিজাত সম্প্রদায় ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের সুসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় নাগরিক জীবন সম্পর্কে

শিল্পীদের অতিশয় আগ্রহের জন্যই মন্দিরগাত্রে এইধরনের বিষয়গুলি অধিকমাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা খুব কমই মন্দিরগাত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। ভাস্কর বা স্থপতিগণ লৌকিক জীবনযাত্রাকে অনেকাংশে পৌরাণিকতার মোড়কে আবদ্ধ রেখেই পরিবেশন করেছেন। মন্দিরগাত্রে পৌরাণিক দৃশ্যাবলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি চিত্রায়িত হয়েছে। যেমন- পৌরাণিক শিবের তুলনায় স্থূলকায়, নেশাখোর, গীতবাদ্য প্রেমিক লৌকিক শিবেরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে বলা যায়, শুধুমাত্র তাঁর অতিমানবিক লীলাগুলি ব্যতীত তিনি কখনও মায়ের একটি চঞ্চল, ননিচোর দুষ্টু বালক, কখনও সখা, কখনও ভ্রাতা এবং সর্বোপরি একজন প্রেমিক পুরুষ রূপে দেখা দিয়েছেন। পৌরাণিক দেবী দুর্গা হয়ে উঠেছেন শিবজায়া এবং গণেশজননি। হরগৌরীর বিবাহসভা, গণেশ'কে ক্রোড়ে নিয়ে গৌরীর অবস্থান ইত্যাদি দৃশ্যের আধিক্যই প্রমাণ করে যে মন্দিরগাত্রে পৌরাণিক দৃশ্যাবলির লৌকিক আবেদনই বেশি অথবা বলা যায়, পৌরাণিক দৃশ্যাবলির অন্তরালে লৌকিক জীবনকেই মহিমান্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দির ও মন্দিরাশ্রিত পোড়ামাটির অলংকরণের ভিত্তি ও অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ লৌকিক ছিল, সেটা অস্বীকার করা যায় না। মন্দিরগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ করলে, মন্দিরের সুবিস্তৃত গাত্রালঙ্কারে একটা সুবিস্তৃত ডিজাইন সৃষ্টির প্রচেষ্টাই দেখা যাবে, অর্থাৎ ডিজাইন বা নকশাটাই প্রধান, মূর্তিগুলি এসেছে তার অঙ্গ হিসেবে। মূর্তিগুলির দেহরচনায় কোনও সংহত সামগ্রিকতা বা পরিমিত দেহ সৌষ্ঠবের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার অনেকক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ, তাদের সংস্থাপনের ক্ষেত্রেও অপটু হাতের স্পর্শ লক্ষ করা যায়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, মূর্তিটি যে ক্রিয়ায় লিপ্ত তার জন্য শরীরের যেটুকু অংশ প্রয়োজন শিল্পীর আগ্রহ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছে, অন্য অংশগুলো তার তুলনায় অবহেলিত। তবে একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, দেহের বিশেষ করে মুখের ঢৌলে, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়নে, পরিসর ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুখমন্ডলের কমনীয় মাধুর্যে বা মগ্ন গাম্ভীর্যের মধ্যে সুপ্রাচীন শিল্পধারার স্মৃতি ফুটে উঠেছে। মূর্তিগুলির ক্রিয়ার সঙ্গে মিশে রয়েছে ইঙ্গিতময়তা। দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সজ্জার বিন্যাস এবং পরিবেশ রচনা, সবকিছুর মধ্যেই ইঙ্গিতের দ্যোতনা লক্ষণীয়। মন্দিরগাত্রের সুবিস্তৃত অলংকরণের মধ্যে এইধরনের মূর্তি ফলকগুলি হয়তো সামগ্রিক নকশার অঙ্গ হিসেবে গ্রথিত হলেও এর স্বতন্ত্র ধারাটিও চিনে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বর্ধমান জেলায় যেমন বিভিন্ন টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি বাংলার সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে, পাশাপাশি এমন অনেকগুলি মন্দিরও লক্ষ করা যায়, যেগুলিতে টেরাকোটার অসাধারণ কারুকার্য থাকা সত্ত্বেও কালের প্রভাবে অযত্নে আর মানুষের সচেতনতার অভাবে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। কোন কোন মন্দিরে হয়ত ফলকগুলিকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে সিমেন্ট কাস্ট করা হয়েছে, কিন্তু অনেকসময় এই কাস্ট বা প্লাস্টার করার পর ফলকটি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়না। ফলে প্লাস্টার জমে গিয়ে অলংকরণটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কালনার কয়েকটি মন্দিরে এইরকম প্লাস্টার করা ফলক লক্ষ করা যায়। সমগ্র জেলাটিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মন্দির ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ দ্বারা সংরক্ষিত হয় ঠিকই, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা গেছে যে, মন্দির চত্বর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তির অবহেলায় মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে এমন কতকগুলি মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যেগুলির টেরাকোটার অলংকরণের উপর শ্যাওলার আস্তরণ পড়ে গিয়েছে, ফলে স্পষ্টভাবে ফলকটিতে উৎকীর্ণ দৃশ্যটি অনুমান করা যাচ্ছে না। অথবা মন্দিরগাত্রে উদ্ভিদ জন্মে মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। পারিবারিক মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মন্দিরের মালিকপক্ষ মন্দিরটিকে সরকারকে হস্তান্তর করতে সম্মত নন, আবার সেটি রক্ষণাবেক্ষণ করতেও সক্ষম নন, ফলে মন্দিরটি ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে একদিন হয়ত পরিত্যক্ত মন্দিরে পরিণত হয়ে কালের প্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মানুষের অজ্ঞানতার পরিচয়ও পাওয়া যায়, কিছু মন্দিরের দুর্দশা দেখে। যেমন- মন্দির সজ্জায় ব্যবহৃত অলংকরণগুলির উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য হ্রাস পাওয়ায়, বিভিন্ন স্থানে সাধারণ স্থানীয় মানুষজন অথবা মন্দিরের মালিকপক্ষ ফলকগুলির উপর রঙের প্রলেপ চড়িয়ে মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন; এতে সৌন্দর্য কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বোঝা না গেলেও, মন্দিরটির প্রাচীনত্ব যে ধূলিসাৎ হয়েছে, তা বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না। আবার

অনেক মন্দিরে দেখা গেছে যে, ভাস্কর্যের ফলকগুলি তুলে নিয়ে গেছে সাধারণ গ্রামবাসীরা বা কোন সংগ্রহশালায় তা সংরক্ষিত করা হয়েছে। আরও এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যা দেখে শিউড়ে উঠতে হয়। যেমন- মন্দিরের ভাস্কর্যের গায়ে ঘুঁটে লেপা হয়েছে, মন্দিরের ভেতরে জ্বালানীর সুবিধার্থে কাঠকুটো সংগ্রহ করে ডাই করে রাখা রয়েছে কিংবা মন্দিরের বিগ্রহের ভারসাম্য রক্ষার্থে গৌরীপট্টের তলায় ইঁটের সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে প্রভৃতি।

প্রায় দু'তিনশ বছরের পুরনো মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিত্তশালী জমিদার বা সামন্তবর্গ। তাদের অসীম অর্থবল মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল বটে, কিন্তু আজ তাদের উত্তরসূরিদের সেই অর্থবলও নেই, সেই আবেগও নেই; ফলে মন্দিরগুলির করুণ পরিস্থিতি হয়ত অবশ্যম্ভাবী ছিল। নিজেদের চোখে না দেখলে হয়ত এই পরিস্থিতি বিশ্বাস হত না। মন্দিরগুলির দুরবস্থা দেখেও, স্থানীয় প্রশাসন বা স্থানীয় মানুষজন, কারোর মধ্যেই মন্দির সংস্করণের কোন সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্গসংস্কৃতির এই সমস্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তৎকালীন শিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত, কিন্তু এই অমূল্য সম্পদ রক্ষার তাগিদ যেমন সরকারের তেমনই সাধারণ মানুষের উপরেও বর্তায়। সরকার কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণের মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের এই লুপ্তপ্রায় মন্দির সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং এই বিষয়ে উদাসীনতা কাটিয়ে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে, তাহলেই হয়ত বঙ্গসংস্কৃতির এই অসামান্য অবদানগুলি রক্ষা করা সম্ভব হবে, নইলে কালের প্রভাবে এবং মানুষের অবহেলায় একদিন এই মন্দির সংস্কৃতি বঙ্গসংস্কৃতির ধারা থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লোকায়ত উৎস থেকে যে সমস্ত সম্পদ আত্তীকৃত হয়েছে, তার বিশদ ও সচিত্র উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়, এইসব মন্দির স্থাপত্য ও সজ্জার মধ্যে। ফলে সঙ্গত কারণেই সাহিত্য ও শিল্পের যুগ্মধারায় মধ্যযুগের বাংলায় মন্দির স্থাপত্য চর্চা এক অতি সমৃদ্ধতর অবস্থানে পৌঁছেছিল, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়।

****

পরিশিষ্ট

॥ মানচিত্র ॥

(অখণ্ড বর্ধমান জেলা)

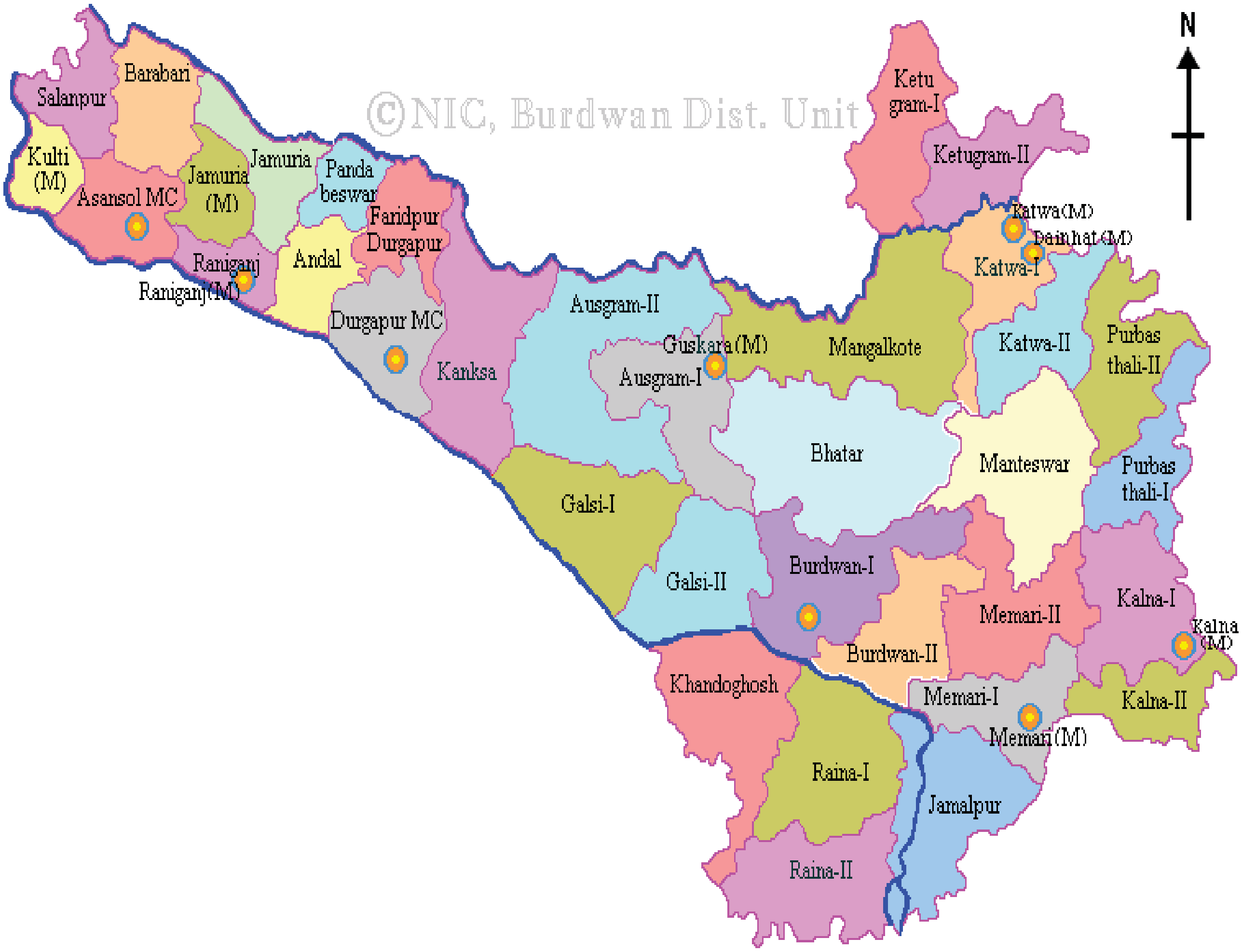

চিত্রঋণ-

১। National Informatics Centre.

ব্যক্তিগত চিত্র

শিবরাত্রি উৎসব মুখর কালনা রাজবাড়ি চত্বরের কিছু টুকরো ছবি

উৎসব প্রাঙ্গণে গবেষক

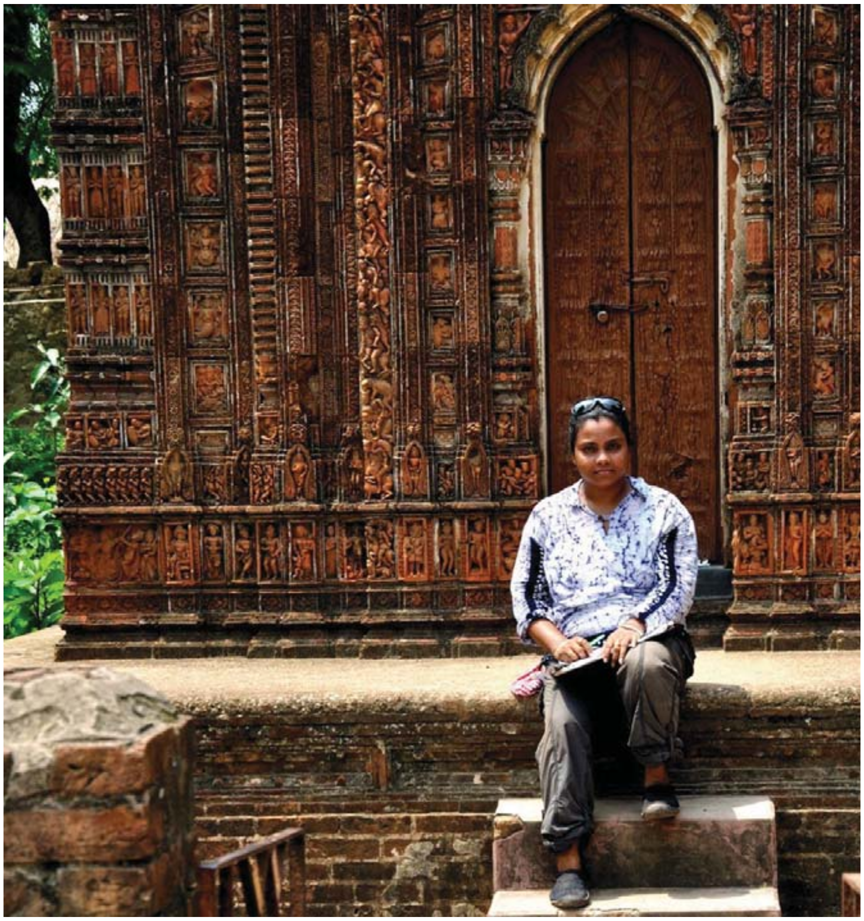

গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে শ্রীবাটির মন্দির প্রাঙ্গণে গবেষক

পুরোহিত কর্তৃক তথ্য সংগ্রহকালীন গবেষক, লক্ষ্মী- নারায়ণজীউ মন্দির, বর্ধমান সদর

॥ চিত্রসূচী ॥

১.১) রামরাজা মোটিফ, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১.২) রাম রাবণের যুদ্ধ, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১.৩) রাম রাবণের যুদ্ধ, জোড়া দেউল, বৈদ্যপুর।

১.৪) রাম রাবণের যুদ্ধ, দেউলেশ্বর শিব মন্দির, বনপাশ।

১.৫) ধনুর্ধারী রামচন্দ্র, সম্মুখে জানু মুড়ে উপবিষ্ট হনুমান, শঙ্কর মন্দির, শ্রীবাটি।

২.১) শ্রীকৃষ্ণের জন্মদৃশ্য, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

২.২) শ্রীকৃষ্ণের তালভক্ষণ, লালজী মন্দির, কালনা।

২.৩) শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

২.৪) দধি গ্রহণে উদ্যত শ্রীকৃষ্ণ, সম্মুখে মাতা যশোদা, শঙ্কর মন্দির, শ্রীবাটি।

২.৫) যশোদা, বলরামের হাত কৃষ্ণের মস্তকে রেখে দণ্ডায়মান, গোপালেশ্বর মন্দির, বনকাটি।

২.৬) গোষ্ঠদৃশ্য, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

২.৭) কালীয়দমন দৃশ্য, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

২.৮) বস্ত্রহরণ দৃশ্য, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

২.৯) রাসলীলা, নারায়ণ মন্দির, খণ্ডঘোষ।

২.১০) পারিজাত হরণ দৃশ্য, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

২.১১) রাধার মানভঞ্জন দৃশ্য, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

২.১২) কৃষ্ণের মথুরা গমন, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

২.১৩) কংসবধ দৃশ্য, নারায়ণ মন্দির, খণ্ডঘোষ।

২.১৪) রাধাকৃষ্ণের প্যানেল, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

২.১৫) রাধাকৃষ্ণ, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

৩.১) অনন্তশয্যায় বিষ্ণু, নারায়ণ মন্দির, খণ্ডঘোষ।

৩.২) নিম্নে বামদিক থেকে মৎস্য ও কূর্ম, ঊর্ধ্বে বামদিক থেকে নৃসিংহ ও বরাহ অবতার, রঘুনাথজীউ মন্দির, কুচুট।

৩.৩) নিম্নে বামদিক থেকে বামন ও পরশুরাম, ঊর্ধ্বে বামদিক থেকে জগন্নাথ ও কল্কি, মধ্যভাগে বামদিক থেকে বলরাম ও রামচন্দ্র অবতার, রঘুনাথজীউ মন্দির, কুচুট।

৩.৪) গরুড় বাহনে উপবিষ্ট শ্রীবিষ্ণু, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

৩.৫) বামদিক থেকে নৃসিংহ; কূর্ম; জগন্নাথ; মৎস্য; বরাহ ও বামন অবতার, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

৪.১) হংসবাহনে উপবিষ্ট চতুর্মুখী ব্রহ্মা, রঘুনাথজীউ মন্দির, কুচুট।

৪.২) চতুর্ভুজ বিশিষ্ট চতুর্মুখী ব্রহ্মা, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

৫.১) শিবের বিবাহসভা, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

৫.২) বৃষবাহনে উপবিষ্ট হরগৌরী, দেউলেশ্বর শিব মন্দির, বনপাশ।

৫.৩) হরগৌরীর ক্রোড়ে শিশু গণেশ, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

৫.৪) বীণাবাদনরত শিব, শিবমন্দির, মানকর।

৫.৫) তানপুরা বাদনরত শিব, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

৫.৬) শিবলিঙ্গ পূজারত পুরুষ, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

৫.৭) দণ্ডায়মান ভৈরবমূর্তি, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

৬.১) পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ গণেশ, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

৬.২) মূষিকপৃষ্ঠে উপবিষ্ট গণেশ, দেউল মন্দির, শ্রীবাটি।

৬.৩) ময়ূরপৃষ্ঠে কার্তিক ও কমলাসনে উপবিষ্ট গণেশ, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

৭) ঢেকির উপর উপবিষ্ট নারদমুনি, রঘুনাথজীউ মন্দির, কুচুট।

৮.১) সপরিবার দুর্গা, দেউলেশ্বর শিব মন্দির, বনপাশ।

৮.২) দেবী দশভুজা, দেউল মন্দির, শ্রীবাটি।

৮.৩) সপরিবার দুর্গা, লালজী মন্দির, কালনা।

৮.৪) সপরিবার দুর্গা, সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির, বর্ধমান।

৯) মকড় পৃষ্ঠে গঙ্গা, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

১০.১) বামদিক থেকে দেবী ছিন্নমস্তা, দেবী ষোড়শী মূর্তি, গোপালেশ্বর শিব মন্দির, বনকাটি।

১০.২) জোড়া ঐরাবতের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট দেবী কমলা, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১০.৩) ঊর্দ্ধ্ব ফলকে শিবের নাভিপদ্ম থেকে উদ্গাত দেবী ষোড়শী, নিম্নের ফলকে দণ্ডায়মান দেবী কালিকা মূর্তি, দেউল মন্দির, শ্রীবাটি।

১১.১) অভিজাত বিলাসবহুল যাত্রা, বামপার্শ্বের শিবমন্দির, জগন্নাথঘাট জোড়া শিবমন্দির, কালনা।

১১.২) কেদারায় উপবিষ্ট অভিজাত পুরুষের সম্মুখে নর্তকী, রঘুনাথদাস দে'র শিব মন্দির, পাঁচরখী।

১১.৩) একজন দেশিয় রাজা আসনে উপবিষ্ট, দু'পাশে সেবক ও সেবাদাসী দণ্ডায়মান, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

১২) যৌথভাবে বিভিন্ন অস্ত্রাদিসহ শিকারদৃশ্য, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

১৩.১) নারীদের কেশসজ্জা, রায় পরিবারের দু'জোড়া শিবমন্দির, বনপাশ।

১৩.২) মল্লক্রীড়ার দৃশ্য, দক্ষিণপার্শ্বের শিবমন্দির, জগন্নাথঘাট জোড়া শিবমন্দির, কালনা।

১৪.১) দেশিয় অভিজাতবর্গের ব্যাভিচারমূলক দৃশ্য, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

১৪.২) বিদেশিদের ব্যভিচার দৃশ্য, গোপালজীউ মন্দির, কালনা।

১৫) তিনটি ফলক জুড়ে অস্ত্রাদিসহ সৈন্যগণ যুদ্ধে লিপ্ত; বামদিক থেকে প্রথম ফলকে অশ্বারোহী ও হস্ত্যারোহীদের অধ্যে যুদ্ধ; দ্বিতীয় ফলকে হস্ত্যারোহী ও ড্রাগনমুখী বিচিত্র জন্তুর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ; তৃতীয় ফলকে অশ্বারূঢ় ঢাল-তরোয়ালসহ সৈন্যদের যুদ্ধদৃশ্য, দক্ষিণপার্শ্বের শিবমন্দির, জগন্নাথঘাট জোড়া শিবমন্দির, কালনা।

১৬.১) দর্জি বৃত্তি, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

১৬.২) কামার বৃত্তি, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১৬.৩) গোয়ালা বৃত্তি, লালজী মন্দির, কালনা।

১৬.৪) ভাল্লুক খেলা, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১৬.৫) সাপ খেলা, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১৭.১) রাসমণ্ডল দৃশ্য, ডুবকি- বীণা- বেহালা বাজনরত নারীপুরুষ, দেউলেশ্বর শিব মন্দির, বনপাশ।

১৭.২) সেতার বাজনরত শিব; খোল বাজনরত গণেশ, আচার্য পরিবারের জোড়া মন্দিরের বামপার্শ্বের শিবমন্দির, বীরভানপুর।

১৭.৩) বাদ্যযন্ত্রসহ নৃত্যদৃশ্য, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

১৭.৪) কাসর বাজনরত পুরুষ; বংশীধর কৃষ্ণ; শঙ্খ বাজনরত পুরুষ, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

১৭.৫) নৃত্যরত বাইজি; দু'পাশে তবলা ও সারেঙ্গী বাদক উপবিষ্ট, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

১৭.৬) চাঁদোয়ার তলায় নৃত্যরত শ্রীচৈতন্য; দু'পাশে শ্রীখোল বাজনরত পার্ষদ, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১৮.১) রাজসভায় রাম- সীতা উপবিষ্ট। রামের পরনে ধুতি ও উত্তরীয়; শিরে শিরস্ত্রাণ; দেবী সীতা পদযুগল বেষ্টন করে শাড়ি পরিহিত; দু'পাশে ধুতি ও বিদেশি পোশাক পরিহিত ব্যক্তিবর্গ দণ্ডায়মান, গোপালেশ্বর শিব মন্দির, বনকাটি।

১৮.২) রাধাকৃষ্ণের দু'পাশে চারজন নারী ভিন্ন ধরণের ঘাঘরা- চোলি পরিহিত, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১৮.৩) দুটি ফলকেই যশোদা আটপৌড়ে রীতিতে বস্ত্র পরিধান করে রয়েছে; বালক কৃষ্ণ হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরিহিত, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

১৮.৪) অভিজাত পুরুষ পিঠবস্ত্র যুক্ত সুঁচেল জাতীয় পোশাক পরিহিত, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১৮.৫) বন্দুকধারী সৈন্যদল; পরনে পুরোহাতা জামা; নিম্নাঙ্গে পাতলুন এবং শিরে টুপি, লালজী মন্দির, কালনা।

১৮.৬) বামদিক থেকে প্রথম ফলকে ঢাল- তরোয়াল নিয়ে দণ্ডায়মান রাজপুরুষের পায়ে লপেটা জুতো এবং দ্বিতীয় ফলকেও একজন দণ্ডধারী রাজপুরুষের পায়ে রয়েছে লপেটা জুতো, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

১৮.৭) বামদিক থেকে একজন মেমসাহেবের পরনে গলাবন্ধ, পুরোহাতা কুচি দেওয়া গ্রাউন; মেমের পাশের ফলকে একজন সাহেব রয়েছেন; মাথায় টুপি ও গলার কাছে কুচি দেওয়া পোশাক রয়েছে, শঙ্কর মন্দির, শ্রীবাটি।

১৮.৮) তিনটি ফলকে তিনজন বারাঙ্গনা নৃত্যভঙ্গিতে রয়েছে; দু'জনের ওড়না কটিদেশ থেকে বামদিক হয়ে মস্তক আবৃত করে রয়েছে, একজন অনাবৃত, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১৮.৯) কৌপীন পরিহিত তিনজন বৈষ্ণব সাধু, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

১৯) চড়ক উৎসব, রঘুনাথদাস দে'র শিব মন্দির, পাঁচরখী।

২০.১) ব্যজনরত সেবকগণের সম্মুখে একজন অভিজাত পুরুষ পালঙ্কে মাথায় বালিশ দিয়ে শায়িত, দেউলেশ্বর শিব মন্দির, বনপাশ।

২০.২) পায়াযুক্ত উঁচু চৌপায়ায় উপবিষ্ট নারীপুরুষ, দেউলেশ্বর শিব মন্দির, বনপাশ।

২০.৩) ভিক্টোরিয়ান কেদারায় উপবিষ্ট হুঁকো সেবনরত বিদেশি পুরুষ, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

২০.৪) নকশাকাটা চৌপায়ার উপর উপবিষ্ট অভিজাত পুরুষগণ, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

২১) বারাঙ্গনাদের গানবাজনার দৃশ্য। বামদিক থেকে প্রথম ফলকে একজন নারী বালিশে এবং অপর নারীটি বীণা নিয়ে রয়েছে ও দ্বিতীয় ফলকে একজন নারী দীর্ঘ বালিশের উপর হেলান দিয়ে রয়েছে, শঙ্কর মন্দির, শ্রীবাটি।

২২.১) নারীদের হাতে একটি করে পাত্র রয়েছে, লালজী মন্দির, কালনা।

২২.২) উনুনের উপর হাঁড়ি, সম্মুখে মাতা যশোদা ও তাঁর পশ্চাতে কৃষ্ণ ও বলরাম, দেউলেশ্বর শিব মন্দির, বনপাশ।

২২.৩) নারীদের হাতে লম্বা গলাযুক্ত কলস, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

২৩.১) মাতৃরূপী নারীদের বিভিন্ন দৃশ্য, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

২৩.২) একজন নারীর সৈন্যদ্বারা নিপীড়ন দৃশ্য, বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দির, কালনা।

২৩.৩) দুটি জানালা দিয়ে দু'জন নারী উঁকি দিয়ে রয়েছে, শঙ্কর মন্দির, শ্রীবাটি।

২৪.১) মঙ্গোলিয়ান'দের মূর্তি, শঙ্কর মন্দির, শ্রীবাটি।

২৪.২) বন্দুক হাতে পদাতিক বিদেশি সৈন্যদল, শঙ্কর মন্দির, শ্রীবাটি।

২৫.১) মালবাহী ও যাত্রীবাহী বজরা, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

২৫.২) ঘোড়াবাহিত রথে অভিজাতদের ভ্রমণ, লালজী মন্দির, কালনা।

২৫.৩) গোযানে উপবিষ্ট হুঁকো সেবনরত অভিজাত পুরুষ, গোপালজীউ মন্দির, কালনা।

২৬) মৃত্যলতা ভাস্কর্যে মিথুন দৃশ্য, গোপালজীউ মন্দির, কালনা।

২৭.১) মনুষ্য ও বিহঙ্গ মিশ্রিত বীণাবাদনরত গন্ধর্ব মূর্তি, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

২৭.২) অশ্ব ও বিহঙ্গ মিশ্রিত বিচিত্র দেহ বিশিষ্ট কিন্নর মূর্তি, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

২৮) ড্রাগন জাতীয় জন্তু, শঙ্কর মন্দির, শ্রীবাটি।

২৯.১) মৃত্যুলতা, গোপালজীউ মন্দির, কালনা।

২৯.২) মৃত্যুলতা, শঙ্কর মন্দির, শ্রীবাটি।

৩০.১) শিখিচঞ্চুপুটে সর্প, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

৩০.২) বলশালী ব্যক্তি প্রতীকী ফলক, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

৩১.১) যাত্রীবাহী নৌকা ও জলের উপর ভাসমান কুমীর, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

৩১.২) উটের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট দু'জন বিদেশি পুরুষ, জোড়া শিবমন্দিরের বামপার্শ্বের মন্দির,বৈদ্যপুর।

৩১.৩) শিকারি কুকুর নিয়ে যাত্রা, লালজী মন্দির, কালনা।

৩১.৪) মুখোমুখি দুটি হরিণ, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

৩২.১) বিভিন্ন প্রকার পাখি, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

৩২.২) জলক্রীড়ারত হংসদল, লালজী মন্দির, কালনা।

৩৩.১) ফ্লোরাল মোটিফ, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

৩৩.২) মিনার, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

৩৩.৩) শৈলীবদ্ধ পাতার কল্কা, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর।

৩৩.৪) জ্যামিতিক নকশা, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

৩৪.১) ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, গোপালেশ্বর শিব মন্দির, বনকাটি।

৩৪.২) ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

৩৪.৩) তিনজন বৈষ্ণব পুরুষ দণ্ডায়মান; মাঝের ব্যক্তিটির হাতে একটি পুথি রয়েছে, ভোলানাথ মন্দির, শ্রীবাটি।

৩৪.৪) সংকীর্তন দৃশ্য; মাঝে গৌর- নিতাই, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা।

৩৪.৫) ঢোল, করতাল সহযোগে সংকীর্তন দৃশ্য, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা।

****

॥ গ্রন্থপঞ্জি ॥

[ক] সহায়ক সরকারি নথি

১. *Annual Administrative Report of Burdwan Collectorate 2012-13, Office of The District Magistrate & Collector, Burdwan, Government of West Bengal.*

[খ] সহায়ক বাংলা গ্রন্থ সমূহ

১. ওয়াহাব আবদুল, বাংলার লোকবাদ্য; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; ডিসেম্বর ২০০৬।

২. কুন্ডু শ্যামাপ্রসাদ সম্পাদিত, বর্ধমান চর্চা; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৯।

৩. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ডিসেম্বর ২০০৯।

৪. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; ১০ই নভেম্বর ২০০০।

৫. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে বুক স্টোর; শ্রাবণ ১৪০৯ ।

৬. কোঙার গোপীকান্ত সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা; মিত্রম্ প্রকাশক; ফেব্রুয়ারী ২০১১।

৭. কোঙার গোপীকান্ত, ঠাকুর দেবেশ সম্পাদিত, রাখালদাস মুখোপাধ্যায়-এর বর্দ্ধমান রাজবংশানুচরিত ও জালপ্রতাপচাঁদ মামলা; বর্ধমান; ইন্দু পাবলিকেশনস্; ২০০৫।

৮. গঙ্গোপাধ্যায় মুনমুন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল জীবন বীক্ষার আলোকে; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ২০১০।

৯. গাইন বিশ্বজিৎ, কালনার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড; বর্ধমান; কালনা মহকুমা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র; অক্টোবর ২০১২।

১০. গিরি সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ২০০৭।

১১. গোস্বামী কাননবিহারী, বাঘনাপাড়া- সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য; কলকাতা; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; মে, ২০০৮।

১২. ঘোষ চৈতালী, নৃত্য- কলা সৃষ্টির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ২০০৪।

১৩. ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ১৯৯৫।

১৪. ঘোষ নীহার, বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; মে ২০০০।

১৫. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; প্রকাশ ভবন; চৈত্র ১৪১৬।

১৬. চক্রবর্ত্তী অসীম কুমার, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার বিশিষ্ট বন্দর ও জনপদ; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৪১৮।

১৭. চট্টোপাধ্যায় এককড়ি, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন; অক্টোবর ২০০১।

১৮. চক্রবর্ত্তী পঞ্চানন, রামেশ্বর রচনাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; অগ্রহায়ণ ১৩৭১।

১৯. চক্রবর্তী রণবীর, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; শ্রাবণ ১৪১৯।

২০. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯০।

২১. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

২২. চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; অক্টোবর ১৯৯৪।

২৩. জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ; ঢাকা; প্রকাশক পরিচালক, গবেষণা- সংকলন- ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী; মাঘ ১৪০২।
২৪. দাঁ সুধীরচন্দ্র, বর্দ্ধমান পরিক্রমা; কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রা.লি.; অক্টোবর ১৯৯২।
২৫. দাশগুপ্ত শশিভূষণ, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য; কলকাতা; শিশুসাহিত্য সংসদ প্রা.লি.; ভাদ্র ১৩৬৭।
২৬. দাশগুপ্ত কল্যাণ কুমার, প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী; কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; ২০শে মে ২০০০।
২৭. দত্ত গোপেশচন্দ্র, কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায়; কলকাতা; জিজ্ঞাসা; ২৫শে বৈশাখ ১৩৮৩।
২৮. দাশ বিবেকানন্দ, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি.; ১৯৯৯।
২৯. দাস সুমাল্য সম্পাদনা, অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্রঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস; কালনা; তটভূমি প্রকাশনী; ২০১৩।
৩০. পান মঙ্গল, সমুদ্রগড়ের ইতিহাস; সমুদ্রগড়; ব্যানার্জী বুক সিণ্ডিকেট; ৭ই ভাদ্র, ১৪১৭।
৩১. বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, চণ্ডীদাস বিরচিত; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৪১৪।
৩২. বিশ্বাস অচিন্ত্য, বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকথা; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; শ্রাবণ ১৪২১।
৩৩. বসু শঙ্করীপ্রসাদ, কবি ভারতচন্দ্র; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৪।
৩৪. বসু শ্রীলা, বসু অভ্র, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ; কলকাতা; সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; এপ্রিল ২০১৫।
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায় পুলক কুমার সম্পাদিত, বৈষ্ণবতীর্থ কুলীনগ্রাম; কলকাতা; পারুল প্রকাশনী প্রা.লি.; ২০১২।
৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; শ্রাবণ ১৪০৪।
৩৭. বসু স্বপন সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বৈশাখ ১৪১৫।
৩৮. ভট্টাচার্য সুরেন্দ্রচন্দ্র, কাব্যতীর্থ ও দাস আশুতোষ সম্পাদিত, কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল; কলকাতা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৬০।
৩৯. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪।
৪০. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, দ্বিতীয় পর্ব; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৫।
৪১. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, তৃতীয় পর্ব, কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৮৬।
৪২. ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, বর্ধিষ্ণু বর্ধমান; কলকাতা; ফার্মা কে এল এম প্রা.লি; ১৯৯৮।
৪৩. ভট্টাচার্য ষষ্ঠীচরণ, বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি; কলকাতা; পুনশ্চ; ২০০১।
৪৪. ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময়, সরকার গিরিধারী সম্পাদিত, বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; অগ্রহায়ণ ১৪১৯।
৪৫. ভট্টাচার্য জগদীশ সম্পাদিত, চৈতন্য প্রসঙ্গ; কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ১৩৯৬।
৪৬. ভট্টাচার্য গৌরী, বাংলার লোক সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ; কলকাতা; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; ৮ই চৈত্র ১৯৩৫।
৪৭. ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস; কলকাতা; এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা.লি; ২০০৬।
৪৮. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু; কলকাতা; রত্নাবলী; মাঘ ১৪০৯।

৪৯. ভট্টাচার্য বিজনবিহারী সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬১।
৫০. ভট্টাচার্য মালিনী, বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সম্পাদনা, জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ বর্ধমান; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০২।
৫১. ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ; কলকাতা; মণ্ডল এন্ড সন্স; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯।
৫২. ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, দেবতার মানবায়ন; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.; জানুয়ারি ১৯৯৫।
৫৩. ভারতী শিবশঙ্কর, ভারতের মন্দিরে মন্দিরে; কলকাতা; সাহিত্যম; ২০০৯।
৫৪. মজুমদার অভিজিৎ, চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিখ খণ্ড) সংগঠন ও শৈলী বিচার; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; মাঘ ১৪১১।
৫৫. মুখোপাধ্যায় অনিমা, পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনারীতি; কলকাতা; পুনশ্চ; ২০০১।
৫৬. মুখোপাধ্যায় মহুয়া, গৌড়ীয় নৃত্য; কলকাতা; দি এশিয়াটিক সোসাইটি; জানুয়ারি ২০০৪।
৫৭. মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; শ্রাবণ ১৪০৭।
৫৮. মুখোপাধ্যায় অতনু শাসন, বিষয়ঃ শ্রীচৈতন্য; কলকাতা; দশদিশি; নভেম্বর ২০০৯।
৫৯. মুখোপাধ্যায় ডঃ যুগল, লৌকিক দেবদেবী ও পুরাকীর্তির আলোকে মন্তেশ্বর; কলকাতা; নব দিগন্ত প্রকাশনী; ১৪১৯।
৬০. মিত্র খগেন্দ্র নাথ, সেন সুকুমার, চৌধুরী বিশ্বপতি, চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৯।
৬১. রায় অনিরুদ্ধ, চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি; কলকাতা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি; ১৯৯২।
৬২. রায় মলয়, বাঙালির বেশবাস; কলকাতা; মনফকিরা; জানুয়ারি ২০১৩।
৬৩. রায় প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।
৬৪. রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; ফাল্গুন ১৪১৬।
৬৫. লালা আদিত্য কুমার সম্পাদিত, বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান; মালদহ; কল্যানী পাবলিকেশন; ডিসেম্বর ২০১১।
৬৬. শাস্ত্রী গৌরীনাথ সম্পাদিত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; নবপত্র প্রকাশন; জুলাই ১৯৯৭।
৬৭. সরকার নীরদবরণ, বর্ধমান রাজইতিবৃত্ত; কলকাতা; কল্যাণ বুক এজেন্সি; ২৪শে আগস্ট ২০০৮।
৬৮. সান্যাল নারায়ণ, ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি ২০০৬।
৬৯. সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; ১৯৭৮।
৭০. সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; ১৯৭৫।
৭১. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত লঘু সংস্করণ; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি; ১৯৬৩।
৭২. সেন সুকুমার সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; নতুন দিল্লি; সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৫।
৭৩. সেন সুকুমার, বটতলার ছাপা ও ছবি; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি; জানুয়ারি ২০০৮।
৭৪. সরকার সুধীরচন্দ্র সংকলিত, পৌরাণিক অভিধান; কলকাতা; এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি; পৌষ ১৪১২।
৭৫. সান্যাল হিতেশরঞ্জন, নির্বাচিত প্রবন্ধ; কলকাতা; সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিকাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া; কার্তিক ১৪১১।
৭৬. সান্যাল হিতেশরঞ্জন, বাংলার মন্দির; কলকাতা; কারিগর; জানুয়ারী ২০১২।

৭৭. সান্যাল অবন্তী কুমার, ভট্টাচার্য অশোক সম্পাদিত, চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান; কলকাতা; সারস্বত লাইব্রেরী; ১৯৯৯।

৭৮. সাঁতরা তারাপদ, বাংলার কাঠের কাজ; কলকাতা; সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিকাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া; নভেম্বর ২০০৬।

৭৯. সাঁতরা তারাপদ, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ; কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী; জানুয়ারি ২০১৪।

৮০. সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড; কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং; ১৩৪১।

৮১. হালদার মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য; কলকাতা; উর্বী প্রকাশন; ২০১৩।

[গ] বিভিন্ন মন্দির কর্তৃক প্রাপ্ত সহায়ক গ্রন্থ সমূহ

১. চট্টরাজ তারকেশ্বর ও মণ্ডল দুর্গাপদ, শ্রীরাধাকান্তদেব সিঙ্গারকোণ শ্রীপাট; কাটোয়া; অজয় সাহিত্য পর্ষদ; ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

২. বন্দ্যোপাধ্যায় তাপস, গড়ের মা; মল্লারপুর, বীরভূম; ১৪০৯।

৩. ভট্টাচার্য্য হরনারায়ণ, ঈশানীর বাঁকে মহাতীর্থ অট্টহাসের কথা; শ্রীরামপুর; ৫ই নভেম্বর ২০১১।

৪. মণ্ডল দেবনাথ সম্পাদিত বর্ধমান ১০৮ শিব মন্দির; বর্ধমান; ১০৮ শিবমন্দির ট্রাস্ট বোর্ড; ১লা বৈশাখ ১৪১১।

৫. শ্রী যোগাদ্যা মন্দির উন্নয়ন কমিটি, ক্ষীরগ্রাম ও মা যোগাদ্যা; ক্ষীরগ্রাম, কাটোয়া; ১৪২০।

[ঘ] সহায়ক ইংরাজী গ্রন্থ সমূহ

১. *Halder Sibabrata & Halder Manju, Temple Architecture of Bengal; Kolkata; Urbee Prakashan; September 2011.*

২. *Mccutchion David J, Late Mediaeval Temples of Bengal; Kolkata; The Asiatic Society; December 2004.*

৩. *Niyogi (Miss) Pushpa, Buddhism in Ancient Bengal; Calcutta; 1960.*

[ঙ] সহায়ক পত্রিকা সমূহ

১. ইনকোয়েস্ট জার্নাল; খড়গপুর; সেরা (*SERA*) ; এপ্রিল ২০১৫।

২. প্রতিবিম্ব; কালনা; ১৬ই জুলাই ২০১০।

৩. ভট্টাচার্য তরুন সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা ১৪০৩; কলকাতা; প্রকাশক তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; মার্চ ১৯৯৭।

৪. ভট্টাচার্য মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; কলকাতা; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; জানুয়ারি ২০০৪।

৫. মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি গবেষণা, আলপনা ও লোকসংস্কৃতি (বিশেষ সংখ্যা); কলকাতা; লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ; বৈশাখ- আষাঢ়- ১৪১২।

৬. মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি গবেষণা, বাংলার শিব ও লোকসংস্কৃতি (বিশেষ সংখ্যা); কলকাতা; লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ; কার্তিক- পৌষ- ১৪১৩।

৭. মণ্ডল কাকলী সম্পাদিত লোক দর্পণ; কলকাতা; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়; ২০০৩।

৮. সাঁতরা তারাপদ সম্পাদিত কৌশিকী- ১, ১৯৭১- ১৯৮৮; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

৯. সাঁতরা তারাপদ সম্পাদিত কৌশিকী- ২, ১৯৭১- ১৯৮৮; কলকাতা; পুস্তক বিপণি; ২০০৪।

****